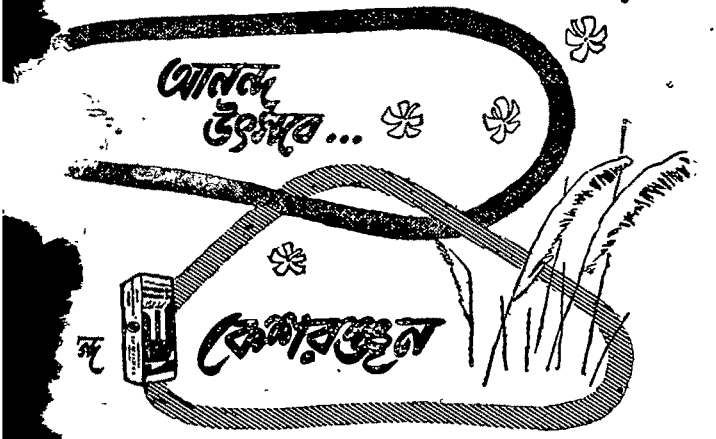
CUK-H01989-13-P.36195
সংখ্যা-9-10
P 36,195




এন,এন, সেন এণ্ড কোং,লিঃ। কলিকাতা

সদ্য প্রকাশিত হইল

ডেভিড রিকার্ডোর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

দি প্রিন্সিপ ল্‌স্ অব পোলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাকসেশনের

বাংলা অনুবাদ

# অর্থনীতি ও করতত্ত্ব

অনুবাদক : শ্রীসুধাকান্ত দে

ধনবিজ্ঞানের উষাকালে রিকার্ডোর লেখার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক দেখা গিয়াছিল, আজও তাহা দুর্লভ বলিয়া সকলেই স্বীক

মূল্য বারো টাকা।

তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সহ কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রামাণিক স

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ৬৷৹

বৌদ্ধগান ও দোহা —হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

শকুন্তলা —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সীতার বনবাস — ঐ

পালামৌ —সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্বর্ণলতা —তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সারদামঙ্গল —বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

মহিলা (১ম ও ২য় খণ্ড) —সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

আলালের ঘরের দুলাল —প্যারীচাঁদ মিত্র

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা —কালীপ্রসন্ন সিংহ

পদ্মিনী উপাখ্যান —রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সে কাল আর এ কাল —রাজনারায়ণ বসু

স্বপ্ন —গিরীন্দ্রশেখর বসু

পুরাণপ্রবেশ — ঐ

ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড) —ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-

## চন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস

ত্রসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫৲ ২। আশাকানন ২৲
বীরবাহু কাব্য ১৷৷০ ৪। ছায়াময়ী ১৷৷০ ৫। দশমহাবিদ্যা ৸০
চিত্ত-বিকাশ ১৲ ৭। কবিভাবলী ৪৲ ৮। রোমিও-জুলিয়েত ২৷৷০
নলিনী-বসন্ত ১৷৷০ ১০। চিন্তাতরঙ্গিণী ৸০। বিবিধ (যন্ত্রস্থ)

## সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস

### বঙ্কিমচন্দ্র

ন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, বিবিধ রচনা
খণ্ডে রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ৭২৲

### মধুসূদন

কাব্য, নাটক, প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

### ভারতচন্দ্র

ামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা
নে বাঁধানো ১০৲, কাগজের মলাট ৮৲

### দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্য দুই খণ্ডে
রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

### দ্বিজেন্দ্রলাল

বিতা, গান, হাসির গান
মূল্য ১০৲

### রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র রচনাবলী পাঁচ খণ্ডে
মূল্য ৪৭৲

### বলেন্দ্রনাথ

নাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী
মূল্য ১২৷৷০

### শরৎকুমারী

'শুভবিবাহ' ও অন্যান্য
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৷৷০

### রামমোহন

বাংলা রচনাবলী। রেক্সিনে
বাঁধাই। মূল্য ১৬৷৷০

### পাঁচকড়ি

অধুনা-দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে
নির্ব্বাচিত সংগ্রহ দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৲

**ব ঙ্গী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ**

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অপরাজিত ৫৷৷০ ইছামতী ৬৲ অনুবর্ত

নূতন সংস্করণ অসাধারণ ৩৲ দৃষ্টিপ্রদী

রণজিৎকুমার সেনের

রা ধা ২৷৷০

বিভূতিভূষণের

বনে পাহাড়ে

প্রমথনাথ বিশীর

অশ্বত্থের অভিশাপ

—সাড়ে চার টাকা—

প দ্ম

—চার টাকা—

তা রা শ ঙ্ক রে র গ ল্প-স ঞ্চ য়

—সাড়ে তিন টাকা—

সন্তোষকুমার ঘোষের

চীনে মাটি ৩৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

চড়াই উৎরাই

রূপদর্শীর

সার্কাস ৩৲

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের

অ্যা ল্ বা ট হ ল্ ৩

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তীর

বিপ্লবী বাংলা ৪৷৷০

দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা

কাছের যারা

কুমারেশ ঘোষ অনূদিত

ভ্যাগাবণ্ড্স ৩৲

বিমলাপ্রসাদের

নিমন্ত্রণ ২৷৷

মিত্রালয় :: ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট :: কলিকাতা-

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৬১

# কবির নিবেদন

একজন অনামা কবিকে আপনারা এই অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদে পতিত্ব করিবার জন্য ডাক দিয়াছেন। আপনাদের স্নেহে আমি ভূত, এ গুরু গৌরব আমি মাথায় তুলিয়া লইলাম, নিজের যোগ্যতার কথাই ভুলিয়া গেলাম। কৈশোরে গাহিয়াছিলাম—

দীন পল্লীর মেঠো গান তোর
কে শুনিবে রাজসভাতে ?
কি করিবি আর বসিয়া একাকী তফাতে ?

কিন্তু রাজসভাতেও বায়না পাইলাম।

আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করিতেছি—বিষ-বিজ্ঞানের যুগে।

সভ্যতা এল সূক্ষ্ম শরীরে আণবিক পর্যায়ে
র‍্যাটেল-সাপের টোটেম তাহার গায়ে।
হস্তেতে ফাঁস, কনক কলস কাঁখে,
উচাটন আর মারণ মন্ত্র হাঁকে।
বিভেদ এবং বিপ্লব ডাকা মঞ্জীর তার পায়ে।




সভ্যতার সে রোমীয় গতির হয় নি ব্যতিক্রম,
কেপুয়া হইতে আমরা চলেছি রোম।
সভ্যতার আজ রন্ধ্রে শনিগ্রহ,
চারিদিকে শুধু ক্রীতদাস বিদ্রোহ,
সারি সারি শব ঝুলিতেছে ক্রুশে, এ নহে স্বপ্ন ভ্রম।

কেপুয়া কোরিয়া কোজে কেনিয়ায় বিশেষ প্রভেদ নাই
কাজ করিতেছে একই সে সভ্যতাই।
বাড়িছে শত্রু যতই হতেছে নাশ,
নব নব রূপে আসিছে স্পার্টাকাস্
এ পথে ক্লেবল পচা কৃষ্টির আমিষ গন্ধ পাই।

বিভীষিকা আর বীভৎসতার হ'ল সবে উপাসক
কাপালিক-ব্রতে সিদ্ধি লভিতে শখ।
মানুষ তো আর নহে কল্যাণকৃৎ,
ধসিয়া গিয়াছে সাধু-সমাজের ভিত
জ্ঞানের আলোক কালাগ্নি হয়ে করিতেছে ধকধক।

নগরী যখন পুড়িত তখন নীরো বাজাতেন বীণা—
তাতে ছিল তবু সুরশিল্পীর চিনা,
বীণা না বাজায়ে বোমাই সাজায় যারা,
নীরো চেয়ে খুব বেশি ভদ্র কি তারা?
দহে হিরোসিমা, তপ ক'রে আনে ধ্বংস হিংসা ঘৃণা?

কৃষ্টি এখন পুষ্টি চাহিছে নিতে
ইতিহাসে নয়, গোয়েন্দা-কাহিনীতে
তাহার লাগিয়া অপেক্ষমান পম্পীর পরিণাম।

এই বিষ-বিজ্ঞানের রাজ্যে, এই অসভ্য-সভ্যতার যুগে কবিতার স্থান কোথায়? তাই আমাদের দেশেও 'ধুয়া' উঠিয়াছে—কবিতাকে যুগোপযোগী করিতে হইবে, তাহাকে কেবল জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলিতে হইবে। কবিতা তাহার উত্তরে সকাতরে বলে—

বটি মানুষের সুখদুঃখভাগী, বাস করি এক ঘরে,
কিন্তু আমি তো ভুগিতে পারি নে প্লীহা কি কম্পজ্বরে?
তাতে কি সার্থকতা?
হাঁপাইয়া আমি যদি তাহাদের
কাঁহ হাঁপানির কথা?
দাবানলে মৃগ-মড়কের কথা কহে না তো মৃগনাভি,
মুক্তা করে না লবণ-জলের প্রতিনিধিত্ব দাবি।
রৌদ্রও আছে, জলকণা আছে, সন্দেহ নাই অণু,
তবু মেঘ নয়, রৌদ্রও নয়, রামধনু রামধনু।

পঙ্কেতে রয় বোঁটা,
কি দোষ যদি না রহে পঙ্কজে
পঙ্কের ছিটাফোঁটা ?
বুঝিতে ক'রো না ভুল,
বাণী অর্চনা হয় নাকো দিয়ে
গোবরের বর্তুল।
হীরক রাখে না আবেষ্টনীর কয়লা-কালিমা লেশ,
অকথিত থাকে খনির আঁধার, খনি-শ্রমিকের ক্লেশ।
সাপের মাথার মানিক তাহারো আনন্দ দিতে সাধ,
সেও দেয় নাকো বিষদংষ্ট্রার গরলের সংবাদ।
শুভ শঙ্খ স্বন
শম্বুকদের শুঁড়ের কাহিনী করে না তো নিবেদন ?
এসেছে দারুণ মন্বন্তর, মানুষ করিবে কি ?
লাভ তো কিছুই হবে না করিয়া মনকে হতশ্রী ?
সুধাকর নাম না দিয়া চাঁদকে বলা হয় যদি 'খেটে'
পড়িবে কি একমুঠা বেশি ভাত তাতে ক্ষুধিতের পেটে ?
কে হবে তাহাতে ধনী ?
খুলে লও যদি ধরাগাত্রের
সুষমার আবরণী ?

কবিদিগকে অবজ্ঞা করিয়া অকর্মা বা স্বপনপসারী বলা হয়; কিন্তু তাহাদের কাজ আছে—

অধিকারী ভেদ সবেতেই আছে কি বলিবে মহাজনে
কাশ্মিরী শাল না বুনে শিল্পী গামছাই যদি বোনে ?
যারা অজন্তা মাদুরা গড়েছে, খ্যাত যারা চরাচরে,
কলালক্ষ্মীই কাঁদিবে—তাহারা যদি শুধু ঢেঁকি গড়ে।
বাড়িবে বিড়ম্বন,
সকল লেখনী লাঙল হইলে
উপবাসী রবে মন।

আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আমাকে কবিতা লিখিতে নিষেধ করেন, কারণ উহা মোটেই লাভজনক নহে। আমি তাঁহাকে বলি—

কবিতা লিখিয়া পাই নি অর্থ, পাই নাই কোন খ্যাতি,
হয়েছি স্বপ্নবিলাসী, অলস, অনুযোগ কর সাথী।
হিসাবী বন্ধু, ভুল করিয়াছ, ভুল বুঝিয়াছ আমাকে,
ধন মান লাগি কবিতা লিখি না আমি মরি সেই দেমাকে।
ফল পেতে হ'লে চাষ করিতাম, ব্যবসা চাহিলে অর্থ,
মৎস্য ধরিতে জাল ফেলা চাই, আকাশে চাওয়া যে ব্যর্থ।
অনটন দেয় আঘাত নিত্য, মচকাই না ও ভাঙি না,
সাঁঝের প্রদীপে তেল নাহি মোর ফুলে আলো করে আঙিনা।
আঁধার যখন কাটিতে চায় না একা ব'সে বড় ভাবি রে,
অরুণ আমার এসে উঁকি মারে আকাশ ভরে যে আবীরে।
বিদ্রূপ পাই, নিন্দাও পাই, নানা মুখে নানা ভাষাতে
সব শুঁয়াপোকা প্রজাপতি হবে আমি থাকি সেই আশাতে।

অনেকেই বলেন, এ যুগে কবির কাজ নাই। কিন্তু আমি দেখি কাজ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহারা যে সকলেই কবি।

আমাদের বিশাল ভারতের নব নির্মেতাগণ—Singing masons making roofs of gold. ভাবেই ভুবন সৃষ্ট, ভাবই রূপ পরিগ্রহ করে, এই ভাবুক কবিরা নব মহাভারতের রচয়িতা। তাঁহাদের মানস কবিমানস, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গি কবির দৃষ্টিভঙ্গি—তাঁহাদের বিরাট পরিকল্পনা জয়যুক্ত হউক।

কবিরা সাধক, আমাদের পূর্বাচার্যগণের সাধনা সিদ্ধি আনিয়াছে। তাঁহারা ব্যাকুলভাবে যাহা চাহিয়াছিলেন আমরা তাহা পাইয়াছি। নব-যুগের কবিগণকে কৃচ্ছ্রতপস্যা করিতে হইবে—তাঁহারাই অপরাজেয়, সমৃদ্ধ মহামহিম ভারতরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক। আসুন, আমরা যিনি কবি ও অনুশাসিতা সেই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আমাদের জাতি ও রাষ্ট্রকে

সর্ব কর্মে শ্রীবিজয়ভূতি ধ্রুবানীতি দান কর প্রভু,

আর

যা দাও কেবল পরাজয় শুধু দিও না যোগেশ্বর
মাগি এই এক বর।
বন্দে মাতরম্*

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

# সোনার বাংলা

জননী বঙ্গভূমি,
কবি বলেছেন, সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা তুমি।
মিথ্যা কেমনে বলি ?
তবে কিনা গেছে তার পরে পূরা আশিটি বছর চলি।
মালয় ব্রহ্ম হতে
আসিতেছে চাল বস্তা বস্তা পোতে।
আমেরিকা হতে লাখ লাখ টন আমদানি হয় গম।
মাদ্রাজ হতে আলু আসিতেছে খাইতেছি তারি দম।
কানপুর দেয় টিন টিন তেল, গাজিপুর দেয় চিনি,
গৌড়ের লোক আমরা, তবুও চটে-মোড়া গুড় কিনি।
বিহার হইতে আসে ছালা ছালা ডাল,
তাই ত গলায় প্রবেশ করিছে কঙ্কর-ভরা চাল ;
শুধু তাই নয়, আসিতেছে ফল আম্র পিয়ারা লিচু,
বানারস হতে কিছু।
মসলা আসিছে সমুদ্রপার থেকে,
মাখন আসিছে সিডনি হইতে টিনে আপনারে ঢেকে।
নাগপুর হতে আসে নেবু ঝুড়ি ঝুড়ি,
জাহাজে আসিছে কৌটায় ভরা শুক্‌না দুধের গুঁড়ি।

---

* ২৯ চৈত্র, সোমবার ( ১২ এপ্রিল, ১৯৫৪ ) বর্ধমান গোলাপবাগ-প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-মণ্ডপে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ।

বোম্বাই হতে কাপড় আসিছে, আসাম পাঠায় চা—
বলে, 'রে বাঙালী, ভাতের অভাবে যত চাস তত খা।'
পূবে-পশ্চিমে মরিয়াছে জ্ঞাতি-ভাই,
অশৌচান্ত হয় নি এখনো, মাছ খাওয়া নাই তাই।
নানা দেশ হতে আসিয়া দ্রব্যরাজি,
সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা তোমারে করেছে আজি।
অভাব কি তব আছে?
তেঁতুল আমড়া তাল বেল কুল ফলিছে তোমার গাছে।
ঢেঁড়স বেগুন কুমড়া কাঁকুড় ফলিছে তোমার ক্ষেতে।
কাঁচকলা ঝিঙে লাউ চিচিঙ্গে রাশি রাশি বাজারেতে।
কচু ওল মূলা বাড়িছে মাটির তলে
একুশ রকম শাক জন্মায় তোমার স্থলে ও জলে।
সজিনা গাছে, মা, ডাঁটার অভাব নাই,
কচি নিম-পাতা যত চাই তত পাই।
মসলা যদিও আমদানি করা, বরজে ফলিছে পান,
খাইবা না খাই পাই দুটি ঠোঁট রাঙাবার উপাদান।
কবি যে তোমায় সোনার বাংলা বলে,
মিথ্যা নয় মা, তোমার মাটিতে সোঁদালে সোনাই ফলে।

শ্রীকালিদাস রায়

---

## আত্মস্থ

"মোদ্দা কথা এইটা জেনো—বিলিতি খাও কিংবা ধেনো
হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অ্যাটম সবই বাজে,"
হেসে হেসে বিজ্ঞানী কয়, "ম্যাটার হয়ে রয় অক্ষয়।"
এ সব কথা শুনে আত্মা হেসেই মরে লাজে।

# ডানা

( পূর্বানুবৃত্তি )

কবিতাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল ডানা। আবার পড়ল কবিতাটা। তার অজ্ঞাতসারেই সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ফুটে উঠল মুখে, অন্তর্লীন একটা গর্ব যেন অভিব্যক্ত হতে চাইল সে হাসির রেখায়। হঠাৎ কিন্তু ভয় হ'ল তার, মনে হ'ল সে যেন অতল-স্পর্শ একটা গহ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। একটু বেসামাল হ'লেই প'ড়ে যাবে। আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। তার মনে হ'ল, ঘরের ভিতরেই বুঝি বিপদটা লুকিয়ে আছে। ঘর থেকে বেরিয়েই মুখে লাগল রোদের তাত, চোখে পড়ল কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় উদ্দাম বর্ণসমারোহ, কানে এল দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে ক্ষণকালের জন্য। মনে হ'ল, সমস্ত প্রকৃতি যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে, যেন বলছে—পালাচ্ছ কোথায়, পালাচ্ছ কেন, চারিদিকেই যে ফাঁদ! কৃষ্ণচূড়ার ফুলে, দোয়েলের গানে, স্বর্ণোজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে যে নাটক জ'মে উঠছে তাতে যোগ না দিয়ে পালাবার প্রবৃত্তি কেন তোমার! এই স্পষ্ট অথচ অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ ব'য়ে গেল। আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল। মনে হতে লাগল, তার বুকের ভিতর কাঁটার মত কি যেন একটা বিঁধে আছে যা আনন্দজনক অথচ কষ্টকর। আবার চলতে শুরু করল। সন্ন্যাসী কি আছেন এখন বাসায়? না থাকলেও খুঁজে বার করবে সে। একমাত্র ওই লোকটির কাছে গেলেই শান্তি পাওয়া যায়, মনে হয় অনেকক্ষণ রোদে হেঁটে যেন গাছের ছায়া পাওয়া গেল। বেশ দ্রুতপদে চলতে লাগল সে। চলতে চলতে হঠাৎ মনে হ'ল, কি বলবে তাঁকে গিয়ে! এই তো কিছুক্ষণ আগে আম দেওয়ার ছুতোয় গিয়েছিল তাঁর কাছে, এখন কোন্ ছুতোয় যাচ্ছে? যাওয়ার একটা সঙ্গত কারণ দিতে হবে তো! কি বলবে গিয়ে? নারীর সান্নিধ্য যিনি পছন্দ করেন না, তাঁর কাছে এমনভাবে যাওয়ার অর্থই বা কি! নিজের উপরই রাগ হ'ল, মনে মনে নিজেকেই সে বলতে লাগল—নিজের সমস্যা নিজেই সমাধান ক'রে নাও না, পরের কাছে সাহায্য চাইতে যাচ্ছ কেন? উনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী; ওঁকে

রিব্রত করার মানে হয় না। তবু কিন্তু সে থামল না, চলতে লাগল। সন্ন্যাসীর বাসার কাছে এসেই চোখে পড়ল, উনি সেই শাবলটা একটা পাথরে ঘ'ষে ঘ'ষে শান দিচ্ছেন। ডানার পায়ের শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন, তারপর একটু মুচকি হেসে শাবলটা সরিয়ে রেখে দিলেন।

আবার কি মনে ক'রে?

ডানার মুখ দিয়ে অদ্ভুত ধরনের উত্তর বেরিয়ে পড়ল একটা।

একটা কথা জানতে এলাম। প্রকৃতি বলতে কি বোঝায়? ইংরেজীতে যাকে নেচার বলে তাই কি প্রকৃতি?

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর আবার হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

বললেন, হঠাৎ এ আগ্রহ হ'ল কেন?

আগ্রহ ঠিক হয় নি, কৌতূহল হয়েছে। নানা রকম পাখি গান করছে, সঙ্গিনীকে ডাকছে, ফুল ফুটছে, ভ্রমর আসছে, আলোর পর অন্ধকার, অন্ধকারের মধ্যেও অসংখ্য আলোর বুদ্বুদ। একা একা ব'সে প্রকৃতির কত লীলা দেখি রোজ! নিজের মধ্যেও প্রকৃতির নিগূঢ় ষড়যন্ত্র টের পাই। তাই মনে হ'ল, প্রকৃতির রহস্যটা কি জেনে আসি একটু আপনার কাছে।

সন্ন্যাসী বললেন, তুমি যা বর্ণনা করলে তা প্রকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতি অব্যক্ত নিষ্ক্রিয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই ত্রিগুণের সাম্যভাব। এই সাম্যভাব বিচলিত হ'লেই সক্রিয় হয়, তখনই সৃষ্টি-লীলা আমাদের ইন্দ্রিয়লোকে ফুটে ওঠে। অব্যক্ত নিষ্ক্রিয় প্রকৃতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ও আমাদের নেই।

তা হ'লে তার অস্তিত্ব আছে তা বোঝেন কি ক'রে?

অনুমান ক'রে, ধ্যান ক'রে।

ডানা চুপ ক'রে রইল। সন্ন্যাসী একটু হেসে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ বেরুলেন না। ডানা ব'সেই রইল চুপ ক'রে। সন্ন্যাসীর কাছে এসে সে যেন লজ্জিত হ'য়ে পড়েছিল।

সাংখ্যের প্রকৃতির স্বরূপ জানতে সে সন্ন্যাসীর কাছে আসে নি। সে এসেছিল তার মনের মধ্যে যে অস্বস্তি জাগছে, বৈশাখের উন্মত্ত প্রকৃতি যে অস্বস্তিকে নানা ভাবে বাড়িয়ে তুলছে, সেই অস্বস্তির প্রতিকার কামনায়। সে ভেবেছিল, সন্ন্যাসী তার মনের কথা বুঝবেন, কিন্তু তিনি একেবারে দর্শনশাস্ত্রের অবতারণা করলেন। আনন্দবাবু কবিতার ইঙ্গিতে ক্রমাগত যা বলতে চাইছেন তা ভাল লাগছে, কিন্তু তার তাৎপর্য কিছুতেই সে বুঝতে পারছে না। আনন্দবাবু নিজেও সেটা বলতে চাইছেন না। একটু আগে যে কবিতাটা লিখেছেন তাতে স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন—"কবি বলে দুত্তোর, দেব নাকো উত্তর।" ওঁর মনের ভিতরেও সে কথাটা স্পষ্ট নেই কি? কে জানে!

সন্ন্যাসী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হঠাৎ। হেসে বললেন, দেখ, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অশান্তি আছে। ওতে ভয় পেয়ো না। ওটা জীবনের লক্ষণ। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেই হ'ল, বাকি সব তুচ্ছ। কিসের অভাবে তোমার জীবন অশান্তিময় হয়েছে, তা জানলে চেষ্টা করতাম সে অভাব পূরণ করবার। বেশ তো আছ, কিসের অভাব তোমার?

ডানা হেসে বললে, আপনার কাছে বলতে লজ্জা করছে।

কিসের লজ্জা?

আমার অভাব টাকার। যদি অনেক টাকা পেতাম তা হ'লে স্বাধীনভাবে যেখানে খুশি থাকতে পারতাম। টাকা নেই, তাই চাকরির গ্লানি বহন করতে হচ্ছে—আপনার মত লোকের কাছে এই তুচ্ছ কথাটা বলা লজ্জাকর বইকি।

সন্ন্যাসী চুপ ক'রে রইলেন ক্ষণকাল। একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। তারপর হেসে বললেন, যাদৃশীভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। ভাবনাই সিদ্ধির রূপ ধ'রে আসে। হয়তো তোমার কামনা নিষ্ফল হবে না। আমি এখন একটু বেরুচ্ছি। তুমি বসবে না কি—

না, চলুন, অমিও যাই। কোন্ দিকে যাবেন আপনি?

চরের দিকে। স্নান করব।

আপনার সেই পাখির দল আছে এখনও ?

আছে। তবে অনেক পাখি চ'লে গেছে।

আমারও যেতে ইচ্ছে করছে আপনার সঙ্গে। কিন্তু যাবার উপায় নেই। অমরবাবুর পাখিগুলোর খবর নিতে হবে।

অমরবাবুর পাখি পোষার শখ আছে না কি ?

আছে। উনি পাখি পুষেছেন পক্ষীবিজ্ঞান চর্চা করবার জন্যে।

ও।

সন্ন্যাসী চরের দিকে চ'লে গেলেন।

ডানা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দিকে চেয়ে, তারপর চ'লে গেল নিজের বাড়ির দিকে। বাড়িতে ফিরে দেখলে, আনন্দবাবু ব'সে আছেন।

কোথা গিয়েছিলে তুমি ?

একটু বেরিয়েছিলাম।

সত্য কথাটা ডানা চেপে গেল। আনন্দবাবুও আর সে বিষয়ে প্রশ্ন করলেন না, যে সংবাদটি এনেছিলেন তারই উত্তেজনায় বিহ্বল হয়ে ছিলেন তিনি।

জান, নিখিল এসেছিল একটু আগে ?

নিখিল কে ?

ম্যাজিস্ট্রেট এখানকার। সত্যিই সে আমার ছাত্র। চমৎকার ছেলে—

মোকদ্দমার কথা কি বললেন ?

বললে, ও মোকদ্দমা ডিসমিস হয়ে যাবে। কেসটা যে সাজানো তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে ও। কিন্তু আমি আর এক মুশকিলে পড়েছি যে—

আবার কি ?

অমরবাবু আমাকে কলকাতা যাবার জন্যে টেলিগ্রাম করেছেন।

তিনি কাশ্মীর যাবেন লিখেছিলেন যে !

কি জানি, কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু আপনি এখন যাবেন কি ক'রে ! আপনি জামিনে খালাস আছেন, মোকদ্দমার দিন আপনাকে তো হাজির থাকতে হবে।

দেখি, নিখিলের সঙ্গে দেখা করি। নিখিল চ'লে যাবার ঠিক পরেই টেলিগ্রামটা এল। নিখিলের সঙ্গে দেখা করি, কি বল ?

তাই করুন। তা হ'লে তো এখনই বেরুতে হয় আপনাকে। আর এক ঘণ্টা পরেই ট্রেন।

তাই না কি ? আমি উঠি তা হ'লে।

আনন্দবাবু ব্যস্ত হয়ে চ'লে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে ফিরে এলেন আবার।

আমি তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছিলাম, বলতে ভুলে গেলাম। আমি কবিতায় আবোল-তাবোল অনেক কিছু লিখে ফেলি, না লিখে পারি না, তাতে তুমি রাগ ক'রো না বা ভয় পেয়ো না। আমার কবি-সত্তা কল্পনালোকে তোমাকে নিয়ে যে উৎসব করে, আমার সামাজিক সত্তার সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। এ কথা আগেও তোমাকে বলেছি বোধ হয়। আবার বলছি, কারণ আমার মনে হচ্ছে আমার কবিতা তোমার মনে ঠিক—মানে—

ইতস্তত ক'রে কবি থেমে গেলেন।

ডানা স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। কবি থামতেই চোখ তুলে বললে, আপনার কবিতা খুব ভাল লাগে আমার। আর সেই জন্যেই বোধ হয় ভয় করে।

জ্যোৎস্না, সন্ধ্যার মেঘ, ফুল, পাখি—এদের দেখেও ভয় ক'রে না কি ?

তার মানে ?

কথাটা ভাব। পরে আলোচনা হবে। চললুম।—কবি চ'লে গেলেন।

ডানা স্টোভ জেলে চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। পাখিগুলোর তদারক করতে এখনি তাকে বেরুতে হবে। জ্বলন্ত স্টোভের দিকে চেয়ে নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল সে। আনন্দবাবু যা ব'লে গেলেন তার অর্থ কি! জ্যোৎস্না, ফুল, পাখি—এরাও তো এক-একটা সৃষ্টি, কবিতাও সৃষ্টি, আনন্দবাবুর কবিতা প'ড়ে কিন্তু ভয় হয়। যেমন ব্যাঘ্র নামক পশুটি সৃষ্টি

হিসেবে চমৎকার হ'লেও তাকে দেখলে ভয় হয়। আনন্দবাবুর কবিতার সঙ্গে বাঘের উপমা দিয়ে নিজেই মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল সে। কিন্তু এ কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না যে, আনন্দবাবুর কবিতার মধ্যে এমন একটা কি যেন আছে যা ভীতিজনক, অস্বস্তিকর। ভাবতে ভাবতে নূতন কথা মনে হ'ল একটা। মনে হ'ল, তার এই চিন্তার মধ্যে অহঙ্কার কি প্রচ্ছন্ন হয়ে নেই? সে নিজেকে এমন মোহিনী রূপসী ব'লে কেন ভাবছে? আনন্দবাবুর মত বিজ্ঞ লোক তাকে দেখে বেসামাল হয়ে পড়বেন—এই কুৎসিত চিন্তা তার মনে আসছেই বা কেন? আনন্দবাবু কবিতায় যা-ই লিখুন, তাঁর ব্যবহারে কোন অশোভনতা তো সে লক্ষ্য করে নি! কবিতায় কবিরা একটু বাড়াবাড়ি ক'রেই থাকেন। সে বাড়াবাড়িকে সত্য মনে করা হাস্যকর নয় কি? সে কি কর্পূরলতা, না, মন্দারমালা! উচ্ছলা কলকলিতা পাহাড়ী ঝরনার সঙ্গেই বা তার মিল কোথায়! এই অসম্ভব উদ্ভট ধারণা কেন তার মনে আসছে! কেন সে ওই কবিতাগুলোকে নিজের সঙ্গে জড়াচ্ছে! কেন? হঠাৎ রূপচাঁদ-বাবুর কথা মনে পড়ল। ওই লোকটির আচরণে কিন্তু প্রচ্ছন্ন কিছু নেই। ধূর্ত শিকারী। একটা কথা মনে হওয়াতে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। রূপচাঁদবাবুর অভব্যতাকে সে যদিও প্রশ্রয় দেয় নি, কিন্তু তার বর্বরতাটা মনের নিভৃতে উপভোগ করেছে সে। আশ্চর্য!

চায়ের জলটা ফুটে উঠল। (ক্রমশ)

"বনফুল"

# আঞ্চলিক ভাষার সমন্বয় সম্পর্কে একটি প্রস্তাব

সম্প্রতি চিদম্বরমে সর্বভারতীয় লেখকগণের সম্মেলন হইয়া গেল। পণ্ডিত নেহরু তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে দুইটি উপদেশ দিয়াছেন। একটি, আঞ্চলিক ভাষাসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিকটতর করা। দ্বিতীয়, সাহিত্যিকগণকে সমবেত চেষ্টায় এমন একটি ভারতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহা ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্কৃতির নিদর্শক।

কি উপায়ে এই দুইটি ব্রত সাধিত হইতে পারে, পণ্ডিতজী তাহা বলেন নাই। আমার বিবেচনায় যে যে অঞ্চলের ভাষা প্রকৃতপক্ষে মূলত এক অথবা একজাতিত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ সেই সেই অঞ্চলে কিছু কাজ করা যাইতে পারে।

বেতারের মাধ্যমে আমি মনোযোগ সহকারে অসমিয়া এবং উড়িয়া সংবাদ শুনিয়া থাকি। এই দুইটি ভাষাই বাংলা ভাষা। বাক্যগঠন প্রণালী সিন্‌ট্যাক্স এবং ইডিয়ম এই তিনটি ভাষাতে অভিন্ন। উড়িয়ার বর্ণমালা ভিন্ন হইলেও ও-ভাষা বাংলার সঙ্গে নিকটতর। কেবলমাত্র কয়েকটি ক্রিয়াপদের বিভক্তি-সংযোগ বিভিন্ন। অসমিয়ার বর্ণমালা বাংলার সঙ্গে এক। কিন্তু উচ্চারণে শব্দগুলি বিকৃত শুনায়। 'স' লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারিত হয় 'হ'। বাংলা ভাষার কেন্দ্রস্থল হইতে দূরে দুর্গম স্থানে থাকার দরুনই হয়তো উচ্চারণের বিভেদ দেখা দিয়া থাকিবে।

বাংলা ভাগ হইয়া যাইবার পরও পূর্ববঙ্গবাসীরা বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিতেছেন। উর্দু তাঁহাদের উপর চাপানোর রাষ্ট্রনৈতিক কৌশল সেখানে ব্যর্থ হইয়াছে। সেখানে এখন বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা স্বরূপ গৃহীত হইবার আন্দোলন দ্রুত সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

আমি ঢাকার বেতারে সংবাদ এবং অনুষ্ঠানাদি শুনিয়া থাকি। ঢাকা হইতে প্রচারিত রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক সঙ্গীত, পল্লীসঙ্গীত—মুসলমান ভাই-বোনদের কণ্ঠে প্রত্যহই বাংলা সাহিত্যের মাধুর্য এবং মর্যাদা ধ্বনিত হইতেছে। কয়েকটি গল্প ও নাটকও শুনিয়াছি। মহিলা-মহলের অনুষ্ঠানও শুনিয়াছি। সকলগুলিই অনবদ্য। পূর্ববঙ্গের সেই বাঁকা বুলি ও উচ্চারণ আর নাই। বলিয়া না দিলে বুঝাই যাইবে না যে, ঐ ঐ অনুষ্ঠান কলিকাতা নয়—ঢাকা রেডিও হইতেই শুনিতেছি। সেখানে সম্প্রতি নবনির্বাচিত প্রধান মন্ত্রী হক সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ হইতে সাময়িক পত্রাদির আসার উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তিত ছিল তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের প্রসারতা পূর্বেকার মতই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, আসাম, উড়িষ্যা, পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের

সাহিত্যিকগণের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হউক। আমরা প্রতি বৎসর নিখিল-ভারত বঙ্গভাষা সম্মেলন করিয়া অনেক অর্থ এবং শক্তির অপব্যয় করিয়া আসিতেছি—ইহা দ্বারা বিশেষ কোনো সুফল পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এই অঞ্চল কয়টির সাহিত্যিক-সম্মেলনে কিছু অগ্রগতি লাভ করা সম্ভব।

বাংলা ভাষার অধিকতর প্রসারতার কথাও চিন্তা করা উচিত।

পশ্চিম পাকিস্তান বাদ দিলে ভারতের লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ কোটী। এখানে একটি হিসাব দিতেছি—

| | |
|---|---|
| পশ্চিমবঙ্গ | ২,৪৮ লক্ষ |
| পূর্ববঙ্গ | ৪,২৯ |
| আসাম | ৯০ |
| উড়িষ্যা | ১,৪৬ |
| বিহারের পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বাংলা-ভাষাভাষী | ১০ |
| | ৯,২৩ |

অর্থাৎ ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক বাংলা ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা নগণ্য নহে।

আঞ্চলিক ভাষার এই প্রসারতা কি প্রকারে সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন করিতে পারে, অভিজ্ঞগণ ইহার বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

এই আঞ্চলিক সম্মেলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অথবা কলিকাতার সাময়িক-পত্রের সম্পাদকগণ আহ্বান করিতে পারেন। হয় কলিকাতায়, না হয় ঢাকাতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথম অধিবেশনের পর অবস্থা বুঝিয়া গৌহাটী এবং ভুবনেশ্বরেও এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

আমার এই প্রস্তাব সম্বন্ধে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন—ইহাই কামনা করি।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

# আমার সাহিত্য-জীবন

## নয়

শ্রীযুক্ত সতু সেনের নির্দেশমত পরের রবিবারে রাণী হেমন্তকুমারী রোড বা স্ট্রীটে বিখ্যাত চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রীযুক্ত মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় মশায়ের বাড়ি গেলাম 'দুই পুরুষে'র পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে। মুরলীবাবু চিত্র-প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং মজলিসী লোক। রবিবারে সকালে তাঁর হেমন্তকুমারী স্ট্রীটের বাড়ির বাইরের ঘরে বহুজনের সমাবেশ হ'ত। চা-পান-সিগারেট সহযোগে তাঁদের মজলিস চলত বেলা বারোটা পর্যন্ত। উচ্চ হাসিতে পথের পথিক চমকে উঠে দাঁড়িয়ে যেত। কারণ বহু-আকাঙ্ক্ষিত কয়েকটি প্রিয়মুখ তারা দেখতে পেত। অনেক অভিনেতা এসে জমায়েত হতেন। অবশ্য আজকাল অভিনেতাদের এ সমাদর অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের ফল কি না জানি না, তবে জনপ্রিয় অভিনেতা আজকাল পথে বের হ'লে মুহূর্তে তাঁকে জনতা ছেঁকে ধ'রে ফেলে, এবং টানাটানি ক'রে নাজেহাল ক'রে ছাড়ে; অভিনেতাকে পরিত্রাহি ডাক ছাড়তে হয়—এ আমি চোখে দেখেছি। সেকালে কিন্তু সাধারণের মনে প্রীতির সঙ্গে সম্ভ্রম ছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রীতিপূর্ণ অন্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে এঁদের দেখত।

কিছুদিন আগে অশোককুমার এসেছিলেন স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' অভিনয় দেখতে। সে কি সতর্কতা! খিড়কির দরজা দিয়ে স্টেজে এসে ঢুকেছিলেন, সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এই সেদিনের ঘটনা। ঠিক তার একদিন কি দুদিন আগে দক্ষিণ-কলকাতায় সিনেমা-তারকা সমাবেশে জনতা কোলাপসিবল গেট ভেঙে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটিয়েছিল। স্মরণ করতেই ভদ্রলোকের মুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠছিল। চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রের প্রতিভাবান স্বর্গীয় প্রমথেশ বড়ুয়ার স্মৃতিসভা হয়েছিল ইউনিভার্সিটি-ইনষ্টিটিউটে। বহু প্রসিদ্ধ নট উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ও তেমনি হয়েছিল। বাইরে রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক। সেখান থেকে বেরিয়ে আসছি, আমার সামনে বাংলার একজন প্রসিদ্ধ নটও আসছেন। ফটকের বাইরে আসতেই দু ধারের জনতা

চিৎকার ক'রে উঠল—এই যে! তারপর তাঁকে ধ'রে যে টানাটানি, সে প্রকৃত পক্ষে চরম নির্যাতন। ভদ্রলোক হাতজোড় ক'রে প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে গাড়িতে উঠে বাঁচেন। মধ্যে মধ্যে আজকাল কোন সিনেমার সামনে ট্র্যাফিক বন্ধ দেখা যায়। কারণ কি? না, আজ এখানে নতুন ছবি খুলবে, সেই উপলক্ষ্যে বম্বে থেকে আসছেন চিত্রের নায়িকা। সে কালে এমনটা ছিল না, তাই মুরলীবাবুর রবিবাসরীয় মজলিস জমতে পারত। একালে সে মজলিস বোধ করি আর নেই।

মুরলীবাবুর মজলিসে উপস্থিতি-পুরস্কার প্রাপ্য ছিল বোধ করি দর্শক-সমাজের সেকালের অতি প্রিয় নায়ক শ্রীযুক্ত জহর গাঙুলীর—সুলালদার, সুলালবাবুর, সুলালের। প্রিয়দর্শন সদাহাস্যময় সুলাল গাঙুলীকে আমি চিনতাম, তিনি আমাকে চিনতেন না। চেনবার কথা নয়। বাগবাজারে থাকতে তিনি ছিলেন প্রতিবেশী। দু বেলা নয়, এক বেলা তাঁকে যেতে আসতে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। কেউ 'ওই সুলাল-বাবু' বললেই মুচকি হেসে তিনি সুট ক'রে গলির মধ্যে ঢুকে যেতেন। সেদিন সুলালবাবুও ছিলেন সেখানে। বোধ করি সিনেমা-জগতের বিমল ঘোষ—খেলা-পাগল বিমল ঘোষও ছিলেন। আর ছিলেন মুরলীবাবুর ছোট ভাই হারুবাবু। মজলিস চলছিল, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। আহ্বান করলেন হারুবাবু—কি চাই? ভিতরে আসুন। বললাম, সতুবাবু আমাকে আসতে বলেছেন।

ও। আসুন আসুন। বসুন। সতুবাবু এক্ষুণি আসবেন।

মুরলীবাবুর আসরের একটি গুণ লক্ষ্য করেছিলাম। এ আসর ছিল অনেকটা অবারিতদ্বার। কেউ অপাংক্তেয় ব'লে গণ্য হতেন না। যে এল, বসল, কথা বলল বা কথা শুনল, উঠে চলে গেল। এবং আসরের আপ্যায়নের প্রাণময় পুরুষ ছিলেন হারুবাবু। সুদর্শন সুগঠিত-দেহ এই মানুষটি লোক আসবামাত্র বাড়ির ভিতরের দরজায় গিয়ে হাঁকতেন, চা। মুরলীবাবু একটি তাকিয়া বুকে নিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে বা ব'সে থাকতেন, পান খেতেন, রসিকতা উপভোগ করতেন, মধ্যে

মাঝে দু-একটা কথা বলতেন। বড় ভাল লেগেছিল এঁদের মজলিসটি। মুরলীবাবুর বাড়ির আর দিকে থাকতেন নন্তদা—নিউ থিয়েটার্সের আইন-সচিব। নন্তদা এক আলাপেই মানুষের পরমাত্মীয়। সব নিয়ে মুরলীবাবুর বাড়িতে আনন্দ-জগতের মানুষদের মিলনক্ষেত্রে একটি আনন্দ-মেলা ছিল। অন্তত আমি সেই স্মৃতিই আজও বহন ক'রে আসছি। মাত্র একদিনের স্মৃতি থেকেই বলছি না, আরও তিন-চার দিন আমি ওখানে পরে গিয়েছি; একই আস্বাদ নিয়ে ফিরেছি।

সতুবাবু এলেন বোধ করি আরও আধ ঘণ্টা পরে। এসে বসলেন। গম্ভীর মানুষটিও কিছুক্ষণের জন্য সরস হয়ে উঠলেন। হাসলেন, উচ্চকণ্ঠে কথা বললেন। স্থলালের সঙ্গে পাঞ্জা না লড়লেও হাত টানাটানি করলেন। তারপর বললেন, এইবার একটু কাজ হবে আমাদের। একখানা বই পড়া হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘর প্রায় খালি হয়ে গেল। আমাকে সতু-বাবু বললেন, আরম্ভ করুন। মুরলীবাবু ব'সে ছিলেন, তাকিয়াটা বুকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। হারুবাবুর নির্দেশে নূতন চা এল, রেকাব-ভর্তি পান এল।

আমি পড়া আরম্ভ করলাম, সতুবাবু ঘড়ি দেখে নিলেন। একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করলেন। অন্য হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

প্রথম অঙ্ক শেষ হ'ল। মুরলীবাবু উঠে বসলেন। আমি মুখের দিকে তাকালাম। মুরলীবাবু বললেন, প'ড়ে যান।

একটু ভুল হ'ল। মাঝখানে একটি ঘটনা নিয়ে একটু আলোচনা হ'ল। কথাটা মনে পড়ছে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নুটবিহারী যেখানে আশ্রয়প্রার্থিণী কল্যাণীকে এবং তার মেয়েকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, বলছে—হ্যাঁ, তোমাকে ফিরেই যেতে হবে। কল্যাণী যখন মেয়েকে নিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে অন্তরালবর্তিনী বিমলা বেরিয়ে এসে বলছে—দাঁড়াও ঠাকুরঝি, যেও না। তারপর নুটুর দিকে.

ফিরে বলছে—আমাকে দুঃখ দিতেই তুমি এদের ফিরিয়ে দিচ্ছ? না? ছি-ছি-ছি! তারপর কল্যাণীকে বলছে—এস ঠাকুরঝি, ঘরে এস। আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চ'লে যাচ্ছ? কিন্তু কেন যাচ্ছ? সত্যিই যদি ওঁকে ভাই ব'লে দাবি কর তবে এ ঘরে যে তোমার অখণ্ড অধিকার। সে অধিকার থেকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার তোমার ভাইয়েরও নেই, তোমার ভাজেরও নেই। এস, ঘরে এস। এর পর কয়েকটি কথা রহস্যচ্ছলে কল্যাণীর মেয়ে মমতাকে ব'লে সমস্ত পরিবেশটাকে লঘু ক'রে নিয়েছে।

এই জায়গাটি পড়া হতেই মুরলীবাবু বললেন, বাস্তব জগতে এটা ঘটে না, কিন্তু আপনি দর্শকদের কাছে হাততালি পারেন।

আমি থমকে গেলাম। সতুবাবু দাঁত দিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি কাটছিলেন, তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, বলুন কি বলছেন?

আমি বললাম, বাস্তবে সব জায়গায় একই ঘটনা ঘটে না। বিমলার চরিত্রের একটা দিক রয়েছে, সেটা নুটুর প্রতি কর্মে বিরোধিতা ক'রে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার দিক। নুটু ফিরিয়ে দিয়েছে, তারই বিরোধিতা করতেই সে কল্যাণীদের আশ্রয় দিলে। নুটু আশ্রয় দিলে তাকে নিজেকেই চ'লে যেতে হ'ত তার চরিত্রানুযায়ী। মুরলীবাবু এবার ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ, এটা ভাববার কথা। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ঘাড় নাড়লেন তিনি। সতুবাবু বললেন, ঠিক আছে। পড়ুন। আবার ঘড়ি দেখলেন তিনি।

এর পর প'ড়ে গেলাম এক নাগাড় চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত। মুখ তুললাম। দেখলাম, মুরলীবাবু উপরের দিকে ছাদের পানে তাকিয়ে। সতুবাবু স্তব্ধ হয়ে ব'সে। বেশ একটু অভিভূত হয়ে পড়েছেন যেন।

মিনিট খানেক পর অভিভূত কণ্ঠেই তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ বই আমরা নিলাম। তারপর মুরলীবাবুর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে কিছু বিনিময় ক'রে আমাকে বললেন, কাল চারটের সময় যাবেন রীতেন কোম্পানির আপিসে। সেখানে পাকা চিঠিপত্র দিয়ে দেব।

অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বাড়ি ফিরলাম। মনে মনে কল্পনা করলাম—নুটবিহারীর চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীকে, রাণীবালা বিমলা।

পরের দিন রীতেন কোম্পানির আপিসে গেলাম। সেখানে দেখলাম আর একজনকে। যাঁকে চিঠি লিখেছিলাম প্রথম, সেই শ্রীশিশির মল্লিককে। কালো সুশ্রী মানুষ, প্রথমেই সব থেকে চোখে পড়ে মানুষটির আকৃতির এবং প্রকৃতির কোমলতা এবং প্রসন্নতা। দেখেই বুঝতে ভুল হয় না যে, এ মানুষ রূঢ় হতে জানেন না, এঁর মধ্যে রূঢ়তা নেই; এঁর কাছ থেকে আঘাত কেউ পাবেন না। এবং নিজের অপ্রসন্নতা দিয়ে এ মানুষের স্বভাবগত প্রসন্নতাকে বড় জোর ম্লান ক'রে দেওয়া যায়, কিন্তু এঁর কাছ থেকে অপ্রসন্ন কিছু কাউকে কখনও ক্ষুব্ধ করবে না। স্বল্পভাষী, মৃদুভাষী, তেমনই বিনীত ভদ্রভাষী। জীবনে মানুষ অনেক দেখলাম, কিন্তু এমন একটি অকপট অন্তরে-বাহিরে বিনীত মধুর ভদ্র ব্যক্তি আমি দেখি নি। শিশির মল্লিক নিজের জীবনে খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাবান মানুষ নন। তাঁর পিতৃগৌরব, তাঁর জীবনের সুযোগ সুবিধা বিচার ক'রে, তাঁর কর্মজীবন বিশ্লেষণ ক'রে সত্য বলতে হ'লে বলতে হবে—কর্মজীবনে তিনি সার্থক হতে পারেন নি। কিন্তু এ কথা বলব যে, অন্তরের শুভ্রতায় স্বচ্ছতায় কোমলতায় বিনয়ে অর্থাৎ তাঁর নিজের অর্জিত শীলতায় তিনি তাঁর কুলগৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, তাঁর পিতৃমহিমাকে অম্লান রেখেছেন। তাঁর পিতা অনারেবল জাস্টিস এস. সি. মল্লিক মশায়কে আমি দেখেছি। অতি প্রাচীন বৈদ্যবংশের সন্তান; প্রাচীন বঙ্গের ভাগীরথীতটে নবদ্বীপের ভগবান শ্রীচৈতন্যের প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রসাদ-পুণ্য পুণ্যক্ষেত্রে তাঁদের বাস; তাঁদের বংশেও এ প্রসাদ ছিল; জাস্টিস মল্লিকই প্রথম ইংলণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস. হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেদেরও তিনি বিলেত পাঠিয়েছিলেন। শিশির মল্লিক বিলেতে কি পড়াশুনা ক'রে এসেছিলেন—এ কথা কোনদিন জিজ্ঞাসা করি নি। বিলেত থেকে ফিরে মল্লিক সাহেব থিয়েটার ও ফিল্ম-ব্যবসায় নিয়ে আছেন। তাতে তিনি নিজে ব্যবসায়ের দিক থেকে সাফল্য লাভ করেন নি। কিন্তু থিয়েটারের দিক থেকে তিনি

অনেক মঙ্গল করেছেন। সে কথাও আমার বক্তব্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে; তিনি কি শিখেছেন, কিসে তিনি পারদর্শী বিশেষজ্ঞ, কি তিনি করেছেন, কতটা তিনি করেছেন—এর মূল্য আমি কোনদিন যাচাই করতে চেষ্টা করি নি; কারণ তাঁর নিজের চরিত্র-মহিমার এমন একটি মহৎ মূল্য আছে যা এ সংসারে পরম দুর্লভ। এ সংসারে শান্তি যদি পরম কাম্য হয়, তবে যে মানুষ শান্ত, সে মানুষই বা দুর্লভ নয় কেন?

মল্লিক সাহেব—শিশির মল্লিক তাঁর কর্মজগতে অর্থাৎ থিয়েটার ও ফিল্ম ব্যবসায়-জগতে ওই নামেই পরিচিত; পোষাকে পরিচ্ছদে খাঁটি সাহেব—কখনও তাঁকে বাঙালী পোশাকে দেখি নি, বাড়িতেও না। সময়ানুবর্তিতায় খাঁটি সাহেব, কথায় তিনি খাঁটি সাহেব, কিন্তু বাংলা-ভাষা-সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ, সামাজিকতায় বাঙালীয়ানা, কথাবার্তায় আলাপে বাঙালী স্বভাবের বৈশিষ্ট্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য অদ্ভুত, সেখানে তিনি খাঁটি বাঙালী।

মল্লিক সাহেব সেদিন এক পাশে ব'সে ছিলেন। নীরবেই ব'সে ছিলেন। সতুবাবুই কথা বললেন, তা হ'লে আপনার বই আমরা নিচ্ছি। আপনি দিচ্ছেন তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সতুবাবু বললেন, টার্মস বলুন?

আমি বললাম, টার্মস কি বলব? আমি তো কিছুই জানি না। নাট্যনিকেতনে 'কালিন্দী' হয়েছিল, প্রবোধবাবু বলেছিলেন—একদিন বেনিফিট নাইট দেবেন। কিন্তু—

সে কথা থাক্। ও আলোচনায় লাভ নেই। মিথ্যে নিন্দে করা হবে। এখন শুনুন।

সতুবাবুর ভাষাটা অকারণে একটু রূঢ় হয়ে উঠল, অপ্রিয় সত্য বলতে গেলে যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। সতুবাবু অপ্রিয় সত্য দিয়েই আরম্ভ করলেন। বললেন, আপনাকে হয়তো আড়াই শো কি তিন শো টাকা দিলেই আপনি পারফর্ম্যান্স-রাইট দিয়ে দিবেন। তারপর

হয়তো বই ভাল চলবে, তখন আপনি বলবেন—আমাকে ঠকালে। এক্সপ্লয়টেশনের দুর্নাম রটবে আমাদের।

সতুবাবু একটু হেসে এতক্ষণে স্বচ্ছন্দ হয়েছিলেন ব'লে বেশ মনে পড়ছে। তারপর বলেছিলেন, তার থেকে এই টার্মসে নেব আমরা। পারফর্ম্যান্সের উপর রয়ালটি পাবেন আপনি। যতদিন অভিনয় হবে, তার প্রথম পঁচিশ রাত্রি দশ টাকা, তারপর প্রতি পারফর্ম্যান্সে পাঁচ টাকা।

এ ধরনের ব্যবস্থার কথা আগে শুনেছিলাম; কিন্তু দশ টাকা ও পাঁচ টাকা দু রকমের ব্যবস্থার কথা শুনি নি, আগাগোড়া দশ টাকা হারের কথাই শুনেছিলাম। সেই কারণেই একটু চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু মুহূর্তে মনস্থির ক'রে ফেললাম। আমাকে রঙ্গমঞ্চের আসরে স্থান ক'রে নিতে হবে, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, তারপর দেনা-পাওনার হিসেব। মনে পড়ল, এক শো টাকায় 'নীলকণ্ঠে'র কপিরাইট বিক্রি করেছি। 'ছলনাময়ী' এমনি ছাপতে দিয়েছি। পর-মুহূর্তেই আমি বললাম, হ্যাঁ, তাতেই আমি রাজী।

একখানা চিঠি সেই মর্মে লেখা হ'ল। বোধ করি, রীতেন কোম্পানির অনুকূলেই পত্রখানা লেখা হয়েছিল। আমি সই ক'রে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দশটি টাকা দিয়ে একখানা ভাউচারও সই করিয়ে নিলেন তাঁরা। আমি টাকাটা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ₹ 36,195

পথে নামলাম 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। সজনীকান্তকে বললাম, 'দুই পুরুষ' নাটক দিয়ে এলাম। নাট্যভারতীতে অভিনয় হবে।

সজনীকান্ত বললেন; নাটকটা একদিন পড়। শুনি।

দিন স্থির হ'ল, পরের রবিবার। রবিবারের 'শনিবারের চিঠি'র মজলিস সেকালে বিখ্যাত ছিল। অনেক আয়োজন—তেলে-ভাজা, ঘোঁদে, মুড়ি, চা, বহু আলোচনা, সমালোচনা, রস-রসিকতা। তারই মধ্যে পড়া শুরু হ'ল। প্রথমটা বহু বিঘ্ন। নাট্যরসিক বন্ধু জন-দুই উঠে চ'লে গেলেন। মনে আঘাত পেলাম।

সজনীকান্ত বললেন, পড়। ফিন পহেলেসে—

আবার নতুন ক'রে আরম্ভ করলাম। প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে আসতেই সজনীকান্ত সহসা সোজা হয়ে ব'সে বললেন, তাই তো হে, এ তো বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছ, শক্ত ব্যাপার করেছ!

মুখের দিকে চাইলাম। সজনীকান্ত বললেন, আমাদের দেশে নাটক তো বড় একটা সাহিত্য হয় না! তুমি দেখছি, তাই করেছ। এ রকম ক'রে তো শোনা চলবে না। ভাল ক'রে শুনতে হবে। পড়া প'ড়ে যাও।

পড়া শেষ হতেই খাতাখানি হাত থেকে নিয়ে বললেন, আসছে মাস থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে বেরুবে। [ ক্রমশ ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

# পঁচিশে বৈশাখের তর্পণ

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক লইয়া পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ এতাবৎ কাল রচিত হইয়াছে। শুধু সেগুলির পরিচয় দিয়া আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হইতে পারে। তাঁহার তিরোধানের পর 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র এক বিশেষ স্মরণ-সংখ্যায় ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত বইগুলির একটি অসম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হয়। কোনও উৎসাহী গবেষক উক্ত তালিকা সম্পূর্ণ করিয়া বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের তালিকা তাহার সহিত যোগ করিয়া তৎপ্রকাশে উদ্যোগী হইলে ভাল হয়। শ্রীপুলিনবিহারী সেন এই কাজ সহজেই করিতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ( ১৯৪১ ) হইতে আমরা রবীন্দ্রনাথকে লইয়া নাচ-গান-হল্লার একটু অশোভন রকম বাড়াবাড়ি করিতেছি; সত্যকার রবীন্দ্রনাথ অর্থাৎ রবীন্দ্র-কাব্য হইতে আমরা যতই দূরে সরিয়া যাইতেছি এই বাহ্য উল্লাস-উদ্বেলতা ততই বাড়িতেছে। একজন অনুপ্রাসপ্রিয় সাহিত্যিক বলিয়াছেন, মাইকেলের

শব্দ-রাইফেলের গুলি আমরা যেমন খাই না, ইদানীং রবীন্দ্রনাথকে লইয়াও তেমনি মাইফেল শুরু করিয়াছি। শুধু মাইফেল নয়, কাহারও কাহারও অনুযোগ এই যে, কালীপূজা, কোজাগরী-পূর্ণিমা ও হোলির সময় একশ্রেণীর লোভী মানুষ যেমন জুয়া ও সুরতি খেলে, পঁচিশে বৈশাখ কবির জন্মদিনকে কেন্দ্র করিয়া তেমনই এক শ্রেণীর মতলববাজ সপ্তাহ-ব্যাপী বোকা-ধরার ফাঁদ পাতিয়া জোর ব্যবসায় করিয়া থাকেন, এগুলিতে রবীন্দ্র-পূজা খ্রীষ্টীয় প্রার্থনাসঙ্গীতেরই মত গৌণ, মুখ্য ব্যাপার হইতেছে বীচাম'স পিলের অবাধ প্রচার। একজন রবীন্দ্র-গবেষক দুঃখ করিয়া এমনও লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালার তরুণদের এক বৃহৎ সমাজ আজ আদর্শভ্রষ্ট এবং সেই কারণে, পরমুখাপেক্ষী। ইদানীন্তনকালে আমাদের দেশে অনুষ্ঠিত অসংখ্য রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব যদি বাস্তবিক উদ্যোক্তাদের এক প্রকার কৌলীন্য-ভিক্ষাবৃত্তি ও বিষয়বুদ্ধিসঞ্জাত না হইত তাহা হইলে দেশের অনেক উপকার হইত। তরুণরাও কিছু শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন সেই ভারতের স্বপ্ন আজ কি তরুণ কি বৃদ্ধ কাহারও চোখেই দেখিতেছি না।"

বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে পৃথিবীর সকল দেশেই "মানে-না-মানা" শাড়ির মতন এক-একজন মহাপুরুষ-পূজা কিছুকালের জন্য ফ্যাশান হইয়া দাঁড়ায়, অন্য একজন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনিই চলিতে থাকেন। রবীন্দ্রপূজা যে ফ্যাশান নয়, তাহার প্রমাণ নেতাজী ও গান্ধীজীর তিরোভাবও রবীন্দ্র-উৎসব-প্রবাহে ভাটা আনিতে পারে নাই। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত সন্দেহবাদীদের মত আমরা মানি না। যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা আমাদেরই মত বিস্ময়ের সঙ্গে দেখিবেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভাল-মন্দ-মাঝারি আলোচনা-সম্বলিত পুস্তকের সংখ্যা প্রতি বৎসরই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শুধু ফ্যাশানই হইয়া দাঁড়ান নাই অথবা বৎসরে সপ্তাহকাল কয়েকজনের মাংস-ভক্ষণের সুযোগ দিয়াই ক্ষান্ত নন, বাংলা দেশে রবীন্দ্র-মানসিকতা বা রবীন্দ্র-

তদ্গতচিত্ততাও ক্রমবৃদ্ধির পথে। পঁচিশে বৈশাখের যথার্থ তর্পণ বিশ্বভারতীর উল্লেখযোগ্য আয়োজন ছাড়াও বেশ ভালভাবেই হইতেছে, মনোজগতের যাঁহারা সাধক বা কারবারী, তাঁহারা বাংলার রবীন্দ্রনাথকে নিজেরা ভুলিয়া তো যানই নাই, উত্তরপুরুষের স্মরণে রাখিবারও যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।

১৩০৮-১০ বঙ্গাব্দ আজ হইতে খুব বেশিদিনের কথা নয়। সে দিন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় সতীশচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা সম্পর্কে আলোচনা সবে আরম্ভ করিয়াছেন, রবীন্দ্র-কাব্যের মোহিতচন্দ্র সেন লিখিত "ভূমিকা" 'সমালোচনী' (ভাদ্র, ১৩১০) পত্রিকায় সদ্য বাহির হইয়াছে। ১৩১৯-২০ বঙ্গাব্দও বেশি দূর নয়—যে দিন অজিতকুমার চক্রবর্তী সকলের কাছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের চাবিকাঠি 'রবীন্দ্রনাথ' ও 'কাব্যপরিক্রমা' তুলিয়া ধরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রদত্ত জবাবদিহিও ( 'বঙ্গভাষার লেখক' ১৩১১, পৃ. ৯৬৪-৯৮৪ ) রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মোদ্ঘাটনে আমাদের কম সহায়তা করে নাই।

তাহার পর বৎসরে বৎসরে একটি দুইটি করিয়া রবীন্দ্র-পরিচিতি-পুস্তক-সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে তাঁহার সত্তর বৎসরের জয়ন্তীর সময় তাহা বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে। মৃত্যুর পর প্রবাহ থামে নাই—বাড়িয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, বাহিরের বহ্বাড়ম্বর দেখিয়া ভয় পাইবার কারণ নাই।

রবীন্দ্র-জীবনীর সূত্রপাত হইয়াছিল ১৩০২ বঙ্গাব্দের 'সখা ও সাথী' পত্রিকার শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায়। আজ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিপুল তিন খণ্ড পুস্তক লিখিয়াও রবীন্দ্র-জীবনী শেষ করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া সহজ মানুষ, কাছের মানুষ, দূরের মানুষ, পল্লীর মানুষ; বিদ্রোহী, বিপ্লবী অধিনায়ক; শিশু তরুণ প্রবীণ নবীন; দরদী মরমী অলোকপন্থী রিয়ালিস্ট; এখানে ওখানে সেখানে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও চরিত্রের কতদিক যে কত ভাবে আলোচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। শুধু বাংলা ভাষাতেই এই; ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায়

এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ভাষায় লিখিত পুস্তকের সংখ্যা যে বিস্তর, সে কথা বলিয়াছি। সেগুলিকে এবং ১৩৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখের পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ বাদ দিয়া ওই সালের বৈশাখ হইতে এই ১৩৬১ সালের বৈশাখ পর্যন্ত দুই বৎসরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে সকল আলোচনা-গ্রন্থ বাহির হইয়াছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির পরিচয় দিয়া পঁচিশে বৈশাখের তর্পণ করিতেছি।

১৩৫৯ সালের ১৮ বৈশাখ হইতে ৩১ বৈশাখ রবীন্দ্র-দ্বিসপ্তাহে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সঙ্কলন প্রচার করেন। প্রকাশের উপলক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি। ভাববিলাসী কবির কর্মোদ্যম ও কর্মসাফল্য বুঝিবার পক্ষে এই সঙ্কলনগুলির একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেগুলি যথাক্রমে এই :—

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা ও ভাষণ হইতে সঙ্কলিত— ১। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ'—ইহাতে শিক্ষা বিষয়ে কবির আদর্শের ব্যাখ্যান এবং শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের গোড়ার ইতিহাস আছে। ২। 'বিশ্বভারতী'—১৩২৭-১৩৪৭ কুড়ি বৎসর ধরিয়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ-সঙ্কলন। ৩। 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম'—ইহাতে আছে প্রতিষ্ঠা-দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী।

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত ৪। 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'—বিদ্যালয় স্থাপনের ইতিহাস ও মূল আদর্শ।

এতদ্ব্যতীত একই উপলক্ষ্যে 'চিত্রলিপি' দ্বিতীয় খণ্ড এবং ইংরেজীতে 'Santiniketan 1901—1951—"a Chronicle in Pictures" এবং '25 Portraits of Rabindranath Tagore' (1885-1940) এই তিনখানি চিত্রগ্রন্থও রবীন্দ্রামোদী ব্যক্তিদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়াছিল।

প্রথমে মোহিতচন্দ্র, প্রিয়নাথ, সতীশচন্দ্র ও অজিতকুমার যে আলোচনার ক্ষীণ সূত্রপাত করিয়াছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র

সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি সামান্য অসামান্য বিরোধিতার দ্বারা বিবিধ সাময়িক-পত্রে রবীন্দ্রসমর্থকদলের বিপুল প্রবন্ধবন্যা বহাইয়া তাহাকেই প্রবলভাবে পুষ্ট হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠে-কড়া' নিছক ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ ছিল বলিয়া রবীন্দ্রপৃষ্ঠপোষকেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু 'সাহিত্য' ও 'নারায়ণে'র অভিযান উপেক্ষিত হয় নাই। কথা-সাহিত্যিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সক্ষম ও কৃতী ব্যক্তিরা উত্তেজিত হইয়া বিবিধ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। সেই কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়ু'য়ের দান অবিস্মরণীয়।

পরবর্তী কালে অর্থাৎ প্রথম-যুদ্ধোত্তর বাংলায় রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া যাঁহারা কারবার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, শচীন সেন, প্রমথনাথ বিশী, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, যামিনীকান্ত সোম, বিশ্বপতি চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই কালের ঠিক প্রারম্ভে 'গৃহস্থে'র বিনয়কুমার সরকার 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী'তে এবং মৌলবী একরামদ্দীন 'রবীন্দ্র-প্রতিভা'য় সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কবিকে দেখিয়াছিলেন।

আরও পরে অর্থাৎ হাল আমলে নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়, মৈত্রেয়ী দেবী, দেবজ্যোতি বর্মণ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, জগদীশ ভট্টাচার্য, অমিয়কুমার সেন, অশোক সেন, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দিক দিয়া কবির সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ব্যতীত জীবনীর বিবিধ উপকরণ যোগাইয়াছেন খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু,

মৈত্রেয়ী দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, রাণী চন্দ, শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, সুধীরচন্দ্র কর, প্রতিমা দেবী, সীতা দেবী প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ, সঙ্গীত, নৃত্য, সুর ও মনস্তত্ত্ব লইয়া এই কালে আলোচনা করিয়াছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ, দিলীপকুমার রায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রতিমা দেবী ও সরসীলাল সরকার। ইহাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থ বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে। আমরা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে আলোচনা আবদ্ধ রাখিয়াছি বলিয়া এইগুলির পরিচয় দিলাম না।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় ও প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা এতাবৎকাল প্রসিদ্ধ ছিল। প্রমথনাথ এখনও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা চালাইয়া যাইতেছেন। 'রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ' 'রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ' দুই খণ্ড, 'রবীন্দ্র-কাব্যনির্ঝরে'রও পরে তিনি রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প লইয়া বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন। নীহাররঞ্জন ও প্রমথনাথ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া সাধারণ পাঠকের জন্য রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য বিচার করিয়াছেন। চারুচন্দ্র ও মোহিতলাল স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনা, বিশেষ করিয়া কবিতাগুলির টীকা রচনা করিয়াছেন। চারুচন্দ্রের 'রবি-রশ্মি' দুই খণ্ড ও 'রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি' মোটের উপর লেকচার-নোট্‌স, মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' দুই খণ্ডও তাহাই। মোহিতলালের 'রবি-প্রদক্ষিণ' অবশ্য স্বতন্ত্র বস্তু, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া মোহিতলালের বিচিত্র চিন্তাধারা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এইবার আমাদের আলোচ্য সময়-সীমানার মধ্যে আসা যাক—১৩৫৯ বৈশাখ হইতে ১৩৬১ বৈশাখ। এই কালে প্রকাশিত যে কয়েকটি পুস্তক আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা এই—১। 'সমবায় নীতি'—রবীন্দ্রনাথ ১৩৬০। ২। 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'—ক্ষিতিমোহন সেন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। ৩। রবীন্দ্র-মানস'—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী,

আষাঢ় ১৩৫৯। ৪। 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য' প্রথম খণ্ড —মোহিতলাল মজুমদার, ১৩৫৯। ৫। ঐ—দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৬০। ৬। 'রবি-পরিক্রমা'—কনক বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬০। ৭। 'কবিগুরুর রক্তকরবী'—তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ফাল্গুন ১৩৫৯। ৮। 'রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য'—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়, পৌষ ১৩৫৯। ৯। 'রবীন্দ্রনাথের গান'—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৫ বৈশাখ, ১৩৫৯। ১০। 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'—সুধীরচন্দ্র কর, আশ্বিন, ১৩৬০। ১১। 'রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমা'—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রাবণ, ১৩৬০ (প্রথম ওরিয়েণ্ট সংস্করণ)। ১২। 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা' —উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বৈশাখ ১৩৬১। ১৩। 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়'—ক্ষুদিরাম দাস, আশ্বিন ১৩৬০। ১৪। 'রবীন্দ্র-জীবনী' তৃতীয় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৫৯। ইহা ছাড়া আরও অনেক পুস্তক নিশ্চয়ই বাহির হইয়াছে, কিন্তু আমরা সন্ধান জানি না।

সমবায় বা কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা ও ভাষণ বিশ্বভারতীর শ্রীপুলিনবিহারী সেন সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহা বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহের শততম গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত "স্বদেশী-সমাজ" প্রবন্ধ যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানেন, তিনি বরাবর সমবেতভাবে কাজ করিবার পক্ষে; সমবায়-নীতি তাঁহার সহজাত, তাঁহাকে শিখিতে হয় নাই। দুই বৎসর তিন মাস কাল 'ভাণ্ডার' পত্রিকা সম্পাদনকালে দেশের লোককে সমবায় শিক্ষা দিবার দিকে তিনি বিশেষ ঝোঁক দিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের বর্তমান ছন্নছাড়া অবস্থায় সমবায়ই যে আমাদের বিশেষভাবে অবলম্বনীয়, তখন হইতেই সে ধারণা তাঁহার মনে ছিল। এই পুস্তকের প্রবন্ধগুলি ১৩২৫ হইতে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে রচিত অর্থাৎ তাঁহার ধারণা তখন আরও দৃঢ় হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথ আজিকার সমাজ-নায়কদের বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে, এই কারণেই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই গ্রন্থখানি অবশ্য পড়িবেন।

প্রভাতকুমার তাঁহার জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের তৃতীয় খণ্ড শেষ করিলেন, রবীন্দ্র-জীবনীর ১৯১৯-১৯৩৪ ( ১৩২৫-১৩৪১ )-এর ঘটনাপঞ্জী ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখনও পূরা সাত বৎসর বাকি রহিল। আমরা চতুর্থ বা শেষ খণ্ডের প্রতীক্ষায় আছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার পক্ষে বইখানি অপরিহার্য। রবীন্দ্র-জীবনের প্রায় প্রতিদিনের ডায়ারি দিয়া কোন্ লেখা কোথায় কবে রচিত, কোন্ প্রভাব তখন কবির মনে কাজ করিতেছিল ইত্যাদি খবর নিষ্ঠার সঙ্গে সরবরাহ করিয়া প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রস-রেফারেন্স এত আছে যে আমাদিগকে কোনও বিষয়ে হাতড়াইয়া মরিতে হয় না। ভবিষ্যতে নূতন গবেষণার আলোকে পরিশুদ্ধ হইয়া এই গ্রন্থখানিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের পঠন-পাঠনের ভিত্তি-ভূমি হইয়া দাঁড়াইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

নীহাররঞ্জন ও প্রমথনাথের সমভূমিতে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আসিয়া দাঁড়াইলেন অত্যল্পকালের মধ্যে প্রকাশিত তাঁহার দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লইয়া। যে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে কবিকে শুধু বোঝা নয়—বোঝানো যায়, উপেন্দ্রনাথের তাহা আছে। তিনি সহানুভূতিশীল এবং পরিশ্রমী, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অতি ধীরপদে অগ্রসর হইতেছেন। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রতিভা বিশ্লেষণ করিয়া নাট্য-প্রতিভা সন্ধান করিয়াছেন। "পরিক্রমা" নাম ঠিক হইয়াছে। 'কাব্য-পরিক্রমা'র গোড়ায় রবীন্দ্র-কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি 'বনফুল' হইতে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত ৫৪খানি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশে যে মননশীলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। প্রত্যেক কাব্যের উৎস ও গতিপথ নির্ণয় করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, যোগ্য উদ্ধৃতি যোগে কবি-চিত্তের একটা বাঙ্ময় ইতিহাসও খাড়া করিয়াছেন। 'নাট্য-পরিক্রমা'র পদ্ধতি একই। এখানেও "রবীন্দ্র-নাট্যের স্বরূপ" দিয়া ভূমিকা করিয়া গীতিনাট্য কাব্যনাট্য, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, রূপক সাংকেতিক নাটক, সামাজিক নাটক, কৌতুকনাট্য, ঋতুনাট্য দিয়া তিনি নৃত্যনাট্য পর্যায়ে আসিয়া

পরিক্রমা শেষ করিয়াছেন। যাঁহারা জলে নামিবেন, তাঁহারা একেবারে অবগাহন-স্নান শেষ করিয়া পবিত্র প্রসন্ন হইয়া ঘরে ফিরিবেন। রূপকনাট্য-বিশ্লেষণে লেখক যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন।

'রবীন্দ্রনাথের রেখার কাব্য'রূপ সন্ধানে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। চিত্র-নির্বাচন ও মুদ্রণ-রুচির পরিচয় বহন করিতেছে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ধারণা—রবীন্দ্রনাথের অবচেতন মনকে বুঝিবার জন্যই শুধু নয়, স্বাধীন কলাসৃষ্টি হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের রেখার কাজ সার্থক। এই ধারণার সপক্ষে বহু কৃতী শিল্পীর সাক্ষ্যও আমরা পাইয়াছি।

'রবীন্দ্রনাথের গান' লইয়া সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘকাল গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন, শুধু থিওরেটিকাল গবেষণা নয়—প্র্যাক্‌টিকাল প্রয়োগ-প্রদর্শনও তিনি ইদানীং সর্বত্র করিতেছেন এবং ধীরে ধীরে স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের গানের ক্রমবিকাশ দেখাইতে ও বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিকে একটি কাব্যের রূপ দিয়াছে। আমরা গান বুঝি না, কিন্তু কাব্য বুঝি, তাই মুগ্ধ হইয়াছি।

'কবিগুরুর রক্তকরবী' তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত সার্থক বিশ্লেষণ—যথা, ভাববস্তু, শিল্প-ভঙ্গী, নাট্য-ভঙ্গী, নাট্য-কাহিনী, প্রকাশ-ভঙ্গী, যক্ষপুরী, রাজার বিদ্রোহ, নন্দিনী-মানবী ও রক্তকরবী এবং বিশু। রাজার মনস্তত্ত্বকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আর দেখান হয় নাই।

'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা'—সুধীরচন্দ্র করের রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে পরিশিষ্টসহ ১০টি প্রবন্ধের সমষ্টি। সুধীরচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চোখে-দেখা মানুষ রবীন্দ্রনাথ। তাঁহারই ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে নিরন্তর বাস করিয়া তিনি কবি সম্বন্ধে এমন সব ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা অন্যত্র দুর্লভ। বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত

চিঠিগুলি খুবই মূল্যবান। এই বইখানি পড়িলে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে।

'পরিক্রমা' আরও দুইখানি আছে—ক্ষিতিমোহন সেনের 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' এবং কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি-পরিক্রমা'। 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' এই দিক দিয়া মূল্যবান যে, ইহাতে স্বয়ং কবির বিশ্লেষণই স্থান পাইয়াছে। ছন্দ ও অন্যান্য বিষয়ে ভূমিকা যোগাইয়াছেন ক্ষিতিমোহন সেন। সাধারণ পাঠকদের অপেক্ষা ছাত্রদের বেশি উপযোগী এই গ্রন্থ। 'রবি-পরিক্রমা' রবীন্দ্র-কাব্যপাঠে বিশেষ সহায়ক হইবে।

যেমন একান্ত সহায়ক মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য,' কারণ ইহা 'সঞ্চয়িতা'র টীকা-গ্রন্থ এবং 'সঞ্চয়িতা' কলেজ-পাঠ্য। প্রথম খণ্ডে 'ভানুসিংহের পদাবলী' 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' 'প্রভাত-সঙ্গীত' 'ছবি ও গান' 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র সঙ্কলন আলোচিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'সোনার তরী' 'চিত্রা' ও 'চৈতালী'র সঙ্কলন। মানে করিতে বসিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে, অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ ও কটূক্তি আছে।

বাকি থাকিল দুইখানি গ্রন্থ; ক্ষুদিরাম দাসের 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'রবীন্দ্র-মানস'—এই দুইটিই বিশিষ্ট দান। 'রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়' অতিশয় সুলিখিত আলোচনা-গ্রন্থ, রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশিষ্টতা পূর্বাপর ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রস্তাবনায় শুরু এবং গোধূলি-পর্যায়ে শেষ। মাঝখানে প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশ এবং পরিণাম অতি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। 'প্রস্তাবনা'য় সমগ্র গ্রন্থখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সংক্ষেপে এইভাবে দেওয়া হইয়াছে:—

"প্রাচীনই রবীন্দ্রনাথের নূতন—ভঙ্গিতে, আকারে, রূপে। এবং তা সাহিত্যের দিক থেকে ঐ যুগের আকাঙ্ক্ষিতও বটে, কারণ, একদিকে পাশ্চাত্য কাব্যসুধাপানে অতৃপ্ত আধুনিক বাঙালি বাংলা সাহিত্যে অধিকতর চমৎকার অশ্রুত রোম্যান্টিক সংগীত শ্রবণে তৃপ্তি হওয়ার

বাসনা করেছিল ; অপরদিকে কর্মবিমুখ, ভাববিমুখ, ইহ-সর্বস্ব, দুর্বল অসাড় বাঙালির চিত্ত যেন নবচৈতন্যের জন্যে আগ্রহান্বিতও ছিল। এর ফলস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ কাব্যেই জীবন্মুক্তির আনন্দ পরিবেশন করলেন। সে-কাব্যের ভাষারূপে পদাবলী ও সংস্কৃতের অপূর্ব মিশ্রণ, জীবনাদর্শে কালিদাসের তপোবন, এবং ভাবে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে দৃষ্ট অথচ অধিকতর সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত বাঙালির ভাব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন—জীবনের মধ্যেই অরূপের অনুসন্ধান। জীবন ও অরূপের সমন্বয়েই রবীন্দ্র-কাব্য বিশিষ্ট, কেবল জীবন-বিশ্লেষণে বা ব্যক্তিমানসের পার্থিব অভিলাষাদির বর্ণনাতে নয়, কামনাময় স্বার্থময় জীবনের পূর্তির বাণীতে তো নয়ই। পার্থিবতাকে আশ্রয় ক'রে অপার্থিব রসের অনুসন্ধান, বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বোপলব্ধি, গৃহগত সংকীর্ণ সংসার-জীবনের মধ্যে নয়,—মুক্তপ্রকৃতিতে পলাতকের স্বার্থ-বিলীনাবস্থায় রস-সমাহিতচিত্তে প্রকৃতি-মাধুর্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয় ভাবাবেশ—তারই চরম মুহূর্তগুলি কবির আকাঙ্ক্ষায় বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।"

'রবীন্দ্র-মানস'—কবির জীবনদর্শন, রবীন্দ্র-সাহিত্য ও উপনিষৎ, রবীন্দ্রনাথ ও বৈষ্ণব সাহিত্য, রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী, রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিসর্গ, রবীন্দ্রনাথ ও পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কবির স্বদেশপ্রেম, রবীন্দ্র-সাহিত্যে শিশু ও কিশোর এবং সাহিত্যের সামগ্রী—এই নয়টি প্রবন্ধের মালায় গ্রথিত। শুধু বাহ্য উপাদান নয়, রবীন্দ্রনাথের মনের গভীর গহনে রসের ভিয়ানে সেই উপাদান যে বিচিত্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখক দিয়াছেন। তিনি তরুণ। আশা করিতেছি, তাঁহার কাছ হইতে ভবিষ্যতে আরও গভীরের সন্ধান পাইব।

মোটের উপর, আমরা যে কেবল নাচ-গান-হল্লাই করি নাই, রবীন্দ্রনাথকে অন্তরের অন্তস্তলে আরও গভীর করিয়া গ্রহণ করিবার সাধনা করিয়াছি, উপরে তাহারই প্রমাণ দাখিল করিলাম। বাঙালীর পঁচিশে বৈশাখের গুরুতর্পণ সার্থক হইয়াছে।

# মহাস্থবির জাতক

## আঠার

আমরা ড্রয়িং-রুমে ব'সে রইলুম। দেশী ও বিলে ড্রয়িং-রুম সাজানো। দেওয়ালে অনেক ছবি টাঙানো রয়েছে, তার মধ্যে বিলিতী ছবিই বেশি—দু-চারখানা রবি বর্মার ছবিও আছে। এ ছাড়া অনেকগুলি বড় বড় ব্রোমাইড ফোটোও দেখলুম। এই ছবিগুলি সবই ইয়োরোপীয় নরনারীর। আশ্চর্যের বিষয়, এর মধ্যে একখানিও দেশী লোকের ছবি নেই। আমরা দেয়ালের কাছে গিয়ে ছবিগুলি দেখছি—এমন সময় পণ্ডিতজী ছেলের হাত ধ'রে একেবারে ভোল ফিরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। খালি গায়ে একখানা রেশমের চাদর জড়ানো, পরনে একখানা ঘরে-কাচা ধুতি, খালি পা। আমাদের কাছে ডেকে নিয়ে সস্নেহে বললেন, তোমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হয় নি—সে জন্য আশা করি কিছু মনে করবে না। এতক্ষণে আমার অবসর হ'ল। আমাকে সেই সকাল ন'টার সময় বেরুতে হয় আর বেলা দুটোর আগে আপিসের কাজ শেষ করতে পারি না। এই সময়টা এমন ব্যস্ত থাকতে হয় যে, পাশে কি হচ্ছে দেখবার সময় পাই না। এর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে মফস্বলে যেতে হয় তদারকের কাজে। কিন্তু যাক সে সব কথা—

ব'লেই একটু থেমে আবার শুরু করলেন, তোমার নাম কি?

নাম বললুম।

তারপরে সুকান্তকে বললেন, তোমার নাম?

সুকান্ত নাম বললে।

পণ্ডিতজী বললেন, আমার নাম অম্বাপ্রসাদ পণ্ডিত। তারপরে তোমাদের বাড়িতে কে আছেন?

বললুম, বাড়িতে সবাই আছেন, কিন্তু আমরা চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে, বাড়ির কারুর সাহায্য ব্যতিরেকে।

পণ্ডিতজী সেই রকম ঘর-ফাটানো উচ্চহাস্যে ঘর ফাটিয়ে চারিদিক

কাঁপিয়ে তুলে বললেন, বেশ বেশ—ভারি খুশি হলুম তোমাদের সঙ্কল্প শুনে। এই তো চাই! আচ্ছা, আর কোন প্রশ্ন ক'রে তোমাদের বিব্রত করতে চাই না। এখন আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। এই আমার ছেলে, এর নাম শঙ্করপ্রসাদ পণ্ডিত। এরা পাহাড়ে থাকে ও সেখানকার ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ে। এখানে ভাল ইস্কুল নেই, তাই সেখানে দিতে হয়েছে। আসছে বছরে এরা ভাই বোন দুজনেই ইংলণ্ডে যাবে পড়তে। সেখানকার ইস্কুলের সঙ্গে চিঠিপত্র চলছে, আমি গিয়ে ওদের ভর্তি ক'রে দিয়ে আসব।

এই অবধি ব'লে তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায়, তোমার বোন কোথায়?

ছেলে তার মাতৃভাষায় কি বললে, বুঝতে পারলুম না। পণ্ডিতজী ডাকতে লাগলেন, দেবী—দেবী—

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করবার পর নিঃশব্দে দরজার কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। আমার চোখ দুটো এতক্ষণ তৃষ্ণাতুর পাখীর মতন কোন কিশোরীর আগমন-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে ছিল, হঠাৎ সেই পথে যে এসে দাঁড়াল, প্রথম দৃষ্টিতে তাকে মনে হ'ল অপূর্ব সুন্দরী—এ দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়ে নি। একবার মনে হ'ল দেওয়ালে টাঙানো রবি বর্মার কোন ছবি প্রাণ পেয়ে বুঝি চোখের সামনে এসে দাঁড়াল।

দীর্ঘাঙ্গী কিশোরী, ভারতীয় নারীর পক্ষে অসামান্যা গৌরী। ভারতীয়ের পক্ষে ঈষৎ লালবর্ণ, সুবিন্যস্ত ঘন কেশ ঘাড় অবধি ঝুলে রয়েছে। সে অপূর্ব লাবণ্যমণ্ডিত তনুলতা দেখলে মুনিজনেরও চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। কিশোরী হ'লে কি হবে, তার দেহসৌন্দর্য দেখে অকালেই যৌবন এসে তাকে আক্রমণ করেছে। কালোর ওপরে নানা রঙের রেশমের সুতোর কাজ করা একটি মারাঠী জামা তার গায়ে, আর পরনে একখানা লাল শাড়ি মারাঠী ধরনে অর্থাৎ কাছাকোঁচা দিয়ে পরা। আমি কলকাতা, বেনারস, গোয়ালিয়র ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ইতিপূর্বে কাছাকোঁচা লাগানো মেয়ে দেখেছি। সত্যি বলতে

কি, এই রকম ক'রে শাড়ি পরা আমার চোখে অত্যন্ত অভদ্র ও অসুন্দর মনে হয়েছে। একটি মারাত্মক প্যাঁচ মেরে বিধাতা আমার সে ভুল ভেঙে দিলেন। শাড়ি যেমন ক'রেই পরা হোক না কেন, ভদ্র অভদ্র সুন্দর অসুন্দর সবই নির্ভর করে কে পরেছে তার ওপরে। যাই হোক, দিব্যাঙ্গনা তো এসে দাঁড়ালেন এই পাপচক্ষুর সম্মুখে, কিন্তু তার সমস্ত শরীরেই যেন উড়ি উড়ি ভাব। হাতে একটা পেনসিল ছিল সেটা একবার গালে ঠেকিয়েই মারাঠী ভাষায় জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, আমায় ডাকছ?

আমরা যে এই নতুন লোক দুটি বাবার পাশেই ব'সে রয়েছি, সে দিকে দৃষ্টিমাত্র না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করকে কি একটা প্রশ্ন করলে। আমি তো আগে থাকতেই অর্থাৎ দৃষ্টিপথে দেবী উদয় হবার আগেই সে দিকে তাকিয়ে ছিলুম—হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বোধ হয় ওই রকম অসভ্যের মত চেয়ে আছি দেখে তিরস্কারস্বরূপ চোখে একটা ভ্রূকুটি হেনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, ডাকছ কেন, বল?

পণ্ডিতজী হাস্যমুখে বললেন, হ্যাঁ বাবা, ডাকছিলুম তোমায়। তোমার সেই কলকাতার কথা মনে আছে? তখন তুমি খুব ছোট, তবুও একেবারে ভুলে যেতে নাও পার কলকাতা শহরের কথা। এদের বাড়ি সেই কলকাতায়। এদের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দিই এস। কলকাতায় এখন কত মজার কাণ্ড হচ্ছে—এদের কাছে শোন সেই সব কথা।

দেবী আবার দয়া ক'রে চাইলেন আমাদের ওপর। চোখে আবার সেই ভ্রূকুটি ফুটে উঠল—এই ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে ভাব করবার জন্যে আমায় ডাকা! বাবা যেন কি!

তারপর পরিষ্কার ইংরেজী সুরে ও ভাষায় বাবাকে বললে, বাবা, আমি এখন ভয়ানক ব্যস্ত আছি। একটা শক্ত অঙ্ক কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না, সেটাকে ঠিক না ক'রে কোন দিকে মন দিতে পারছি না।

স্খলিত আঁচলখানা দিয়ে কোনরকমে দেহলতাকে জড়িয়ে নেবার চেষ্টা

করতে করতে যেমন সহসা দেবীর আগমন হয়েছিল, তেমনি বেগে প্রস্থান হ'ল।

মেয়ে চ'লে যেতেই পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হো-হো ক'রে হেসে বললেন, পাগলী! ওকে প্রথমে দেখলে মনে হয়, বোধ হয় খুবই গর্বিতা, কিন্তু মোটেই তা নয়—দু-এক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারবে যে, ও অত্যন্ত সরল, তবে একটু খেয়ালী। দেখ না, এখন অঙ্ক মাথায় ঢুকেছে আর কোন দিকেই মন নেই।

একটু পরেই একজন চাকর এসে জানালে যে, খাবার তৈরি। পণ্ডিতজী শঙ্করের হাত ধ'রে উঠে বললেন, চল, যাওয়া যাক। দেখ, আমি সকালবেলা বেরুবার সময় ভাল ক'রে খেয়ে যাবার সময় পাই না। সমস্ত দিন বাদে এই একবার খাই—রাত্রে সামান্য একটু খাই—চল, যাওয়া যাক, তোমরাও নিশ্চই ক্ষুধার্ত।

আমি বললুম, আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে ভরপেট খেয়েছি, এখন খাবার কোন স্পৃহা নেই।

পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হেসে বললেন, আরে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ওখানে খেয়েছ তো কি হয়েছে? আচ্ছা, চল, না খাও তো অন্তত আমাকে সঙ্গদান করবে।

ড্রয়িং-রুম থেকে উঠে আমরা অপেক্ষাকৃত ছোট একটা ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখেই বোঝা যায়, সেটি খাবার ঘর। বড় একটা খাবার টেবিল ঘরের মাঝখানে—তার চারিদিকে চেয়ার সাজানো। দু দিকের দুই দেওয়াল ঘেঁষে দুটো বড় বড় সাইডবোর্ড রয়েছে। তার ওপরে কাচের ডিনার-সেট সাজানো রয়েছে। টেবিলের মাঝখানে বড় সুদৃশ্য কাচের ফুলদানিতে নানা রঙের ফুল সাজানো।

পণ্ডিতজী নিজে ব'সে আমাদের বললেন, ব'স।

আমরা বসলুম, শঙ্কর তার বাপের পাশেই একটা চেয়ারে ব'সে কি সব বলতে লাগল। খানসামা এসে আমাদের প্রত্যেকের সামনেই একটা ক'রে কাচের প্লেট রেখে গেল। আমার কিন্তু সেদিকে হুঁশ ছিল না।

আমি ভাবছিলুম, মানুষের ভাগ্য কি অদ্ভুত রহস্যে আবৃত! এই আমি কালই নোভাসারির পথে পথে 'ভিক্ষা দাও' ক'রে ঘুরে বেরিয়েছি—একটা লোকেরও দয়া হয় নি, কেউ সহানুভূতির সঙ্গে একবার জিজ্ঞাসাও করে নি—তোমার বাড়ি কোথায়, কি চাই, কেন তোমার এমন অবস্থা! গভীর রাত্রে জ্বরের ঘোরে অজ্ঞানপ্রায় হয়ে সেই অন্ধকারে অজানা দেশে প'ড়ে মরছিলুম,—দুর্ভাগ্যের দূত সেখানে এসেও হানা দিতে ছাড়ে নি। আর আজ ভাগ্যলক্ষ্মী এ কি খেলা শুরু করেছেন!

ঠন্ ক'রে আওয়াজ হতে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেয়ে দেখি, আমার পাতে মোটা গোল একখানা সদ্যভাজা পরোটা—যাকে কলকাতায় ঢাকাই পরোটা বলে—প'ড়ে লুটোপুটি খাচ্ছে।

পণ্ডিতজীর দিকে চাইতেই তিনি বললেন, খাও, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে খেয়েছ, ও তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ছেলেমানুষ তোমরা, ওটুকু খেলে কোন ক্ষতি হবে না।

খেতে খেতে পণ্ডিতজী গল্প করতে লাগলেন। বললেন, আমি জানি তোমরা আমিষ খাও। নিরামিষ খেতে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে তো?

বললুম, এ দেশে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।

পণ্ডিতজী বললেন, আমাদের বাড়িতে মাছ-মাংস হয়।

এই কথা ব'লে তিনি তখুনি খানসামাকে ডেকে বললেন, দেখ, আমাদের এখানে দুজন মেহমান এসেছেন, এঁদের জন্যে মাছ-মাংস করবে। বাংলা দেশের লোক এঁরা।

খানসামা চ'লে যেতেই বললেন, আমি আগে মাছ-মাংস সবই খেতুম! অনেক দিন হ'ল ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার ছেলেমেয়েরা মাছ-মাংস খায়।

বললুম, আমি কিন্তু জানতুম যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মাছ-মাংস খান না।

পণ্ডিতজী টপ ক'রে বললেন, আমরা তো মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ নই। আমাদের দেশ হচ্ছে সেই যোধপুর ও পাঞ্জাবের সীমান্তে। আমাদের

ছেড়ে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। মূলত আমরা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ। আমাদের আদি বাড়ি হচ্ছে কাশ্মীর দেশে। যাঁরা এ দেশে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মহারাষ্ট্রদের ঘরে বিবাহ ক'রে একেবারে এদেশীয় ব'নে গিয়েছেন। আমার ঠাকুরদাই তো মহারাষ্ট্রীয় বিবাহ করেছিলেন। তিনি খুব বড় উকিল ছিলেন, দু-তিন বার বিলেতেও গিয়েছিলেন। ইংরেজদের সঙ্গে খুব মেলামেশা করতেন। তিনিই আমাদের পরিবারে মাছ-মাংস খাওয়ার প্রথা চালিয়ে গিয়েছেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এ বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া, এজন্যে আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ঠাকুরমার বনিবনাও হ'ত না। আমার বাবাও মাছ-মাংস খাওয়ায় খুবই ওস্তাদ হয়ে উঠেছিলেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দের ঘরে বিবাহ করলে পাছে স্বামী-স্ত্রীতে অবনিবনা হয় সেজন্যে ঠাকুরদা মশায় বাবার বিয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাবী মেয়ের সঙ্গে। আমিও পাঞ্জাবী মেয়ে বিবাহ করেছিলাম। পাঞ্জাবীরা মাছ-মাংস খাওয়া সম্বন্ধে অনেক বেশি উদার।

আমি বললুম, মহারাষ্ট্রীয়েরা যে মাছ-মাংস খায় না সে আমি খুব ভাল ক'রেই জানি এবং এ বিষয়ে আমার খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

পণ্ডিতজী বললেন, তাই নাকি! কি রকম, কি রকম! শুনি তোমার অভিজ্ঞতা!

ইতিমধ্যে পাতে আরও পরোটা ও দু-তিন রকম নিরামিষ তরকারি এসে পড়ল। কিছু কিছু মিষ্টিও আসতে লাগল। সন্দেশ-রসগোল্লার মত সুখাদ্য না হ'লেও সেদিন তা ভালই লাগতে লাগল। খেতে খেতে আমি আমাদের গোয়ালিয়রে চাকরি করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগলুম। তারপরে আমাদের মাছ-মাংস খাওয়ার কথা শুনে সে বাড়ির বড় গিন্নী কি রকম 'দূর হ, দূর হ' বলতে বলতে ঝ্যাঁটা বার করেছিল ও তারপরে বিনায়কের মাথায় কি রকম ক'রে হাঁড়িভর্তি গোবরজল ঢেলে দিয়েছিল—এই সব শুনে পণ্ডিতজী তো ঘর ফাটিয়ে টেবিল চাপড়ে

গল।

পণ্ডিতজী সেই রকম হাসতে হাসতে চেঁচাতে লাগলেন, দেবী, দেবী—

কিন্তু দেবীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। পণ্ডিতজী বললেন, আহা, দেবী থাকলে সে তোমার এই কাহিনী খুবই উপভোগ করত।

তারপরে হাসতে হাসতে বললেন, ঠিক বলেছ, ওরা মাছ-মাংস সম্বন্ধে এই রকমই বটে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে টেবিল থেকে ওঠবার আগেই আমরা পণ্ডিতজীর বাড়ির লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে গেলুম। তিনি বললেন, এ বাড়িকে তোমাদের আপনার বাড়ি ব'লে মনে করবে। আমার এই অসহায় মাতৃহীন ছেলেমেয়েকে তোমরা নিজেদের ভাই-বোন ব'লে মনে ক'রো।

পণ্ডিতজীর কথা বলবার ধরন শুনে আমাদের চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন, এখন আমি ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করব। তারপরে সেই সাড়ে সাতটা পর্যন্ত আমি আর কারুর সঙ্গে দেখা করি না—এ সময়টা আমি আমার মালিকের সঙ্গে একত্রে কাটাই। আচ্ছা, আবার সেই সন্ধ্যের পরে দেখা হবে।

এই কথা ব'লে তিনি শঙ্করকে বললেন, এদের বাড়ির সব জায়গা দেখাও।

পণ্ডিতজী নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। শঙ্করের সঙ্গে আবার আমরা ড্রয়িং-রুমে ফিরে এলুম। ড্রয়িং-রুমের এক দিকে সুন্দর কারুকার্য করা কাঠের তাকে সব বই সাজানো ছিল—এরই মধ্যে একটা তাক মোটা মোটা অ্যালবামে ভর্তি। শঙ্কর আমাদের জিজ্ঞাসা করলে, ছবি দেখবে?

উত্তরের জন্যে আর অপেক্ষা না ক'রেই সে একটা অ্যালবাম টেনে বার ক'রে বললে, চল, ওখানে বসি।

তিনজনে একটা জায়গায় গিয়ে ব'সে ছবি দেখতে আরম্ভ করা গেল।

শঙ্কর একটা পাতা ওলটায় আর এক-একটা ফোটোগ্রাফের বিবরণ দিতে আরম্ভ করে। এক পাতার বিবরণ শেষ হতে না হতে তার সেই অদ্ভুত হিন্দী ভাষার দম ফুরিয়ে এল। মারাঠী ভাষা সে জানে—মা পাঞ্জাবী মেয়ে হ'লেও মারাঠীই ছিল তাদের মাতৃভাষা। মার কাছ থেকে পাঞ্জাবী ভাষা শেখবার আগেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। আমরা হিন্দী ভাষা কতকটা বুঝতে পারি ব'লে এতক্ষণ সে হিন্দীতেই কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু এবার আর না পেরে সে ইংরেজী ভাষায় বলতে আরম্ভ করলে। দেখলুম, সে চমৎকার ইংরেজী বলতে পারে। তখন তার তেরো বছর বয়স। ছ' বছর বয়স থেকে সে মুসুরিতে ইংরেজদের ইস্কুলে পড়ছে। তার দিদিও একই সঙ্গে ইস্কুলে ভর্তি হয়। সে সময় তার দিদির বয়স দশ বছর ছিল। তারা ইস্কুলে যাবার বছর দুই আগে তার মা মারা যান—মাকে তাদের একটু একটু মনে আছে। শঙ্কর বললে, আগামী বছর সে জুনিয়ার পরীক্ষা দেবে। তার দিদি জুনিয়ার পাস করেছে, এই বছরই সে সিনিয়ার পরীক্ষা দেবে। ছবি দেখাতে আর দেখতে দেখতে এই সব গল্প হতে লাগল।

এক-একটা পাতা পণ্ডিতজীর ছবিতেই ভর্তি। পণ্ডিতজীর বাবা ছেলেবেলাতেই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন লেখাপড়া শেখার জন্যে,—সেই ছেলেবয়সেরও অনেক ছবি অ্যালবামে ছিল। পণ্ডিতজ বিলেতে গিয়েছিলেন ছেলেবয়সে এবং দেশে ফিরেছিলেন ত্রিশ বছর বয়সে। শঙ্কর আরও বললে যে, আগামী বছর তার দিদি সিনিয়ার পরীক্ষায় পাস করলে তার বাবা তাদের দুজনকে বিলেতে নিয়ে গিয়ে স্কুল ও কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসবেন।

এমনি ক'রে গল্প ও ছবি দেখায় মশগুল হয়ে কোথা দিয়ে সময় কেটে যাচ্ছে—এমন সময় হেলতে দুলতে লীলায়িত ভঙ্গীতে দেবী ঢুকলেন ঘরের ভিতরে। আমরা যেখানে ব'সেছিলুম তারই একটু দূরে একটা সোফায় সে অঙ্গ এলিয়ে দিলে। মুখে তার প্রসন্ন হাসি—বোধ হয় যে অঙ্কগুলো

নিয়ে এতক্ষণ জানমারি চলছিল সেগুলোকে ঘায়েল করা হয়ে গেছে। দেবী আসতেই আমরা মুখ তুলে সেই আসল ছবির দিকে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু বৃথা—সে আমাদের দিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করল না। একবার এক সেকেণ্ডের জন্যে চোখাচোখি হতেই দেবী উঠে গিয়ে দূরের তাক থেকে একটা মোটা বই নিয়ে আবার সেই জায়গায় এসে মাথা নীচু ক'রে বইয়ের পাতা উল্‌টে যেতে লাগল। শঙ্কর আগের অ্যালবামখানা রেখে আবার একটা অ্যালবাম নিয়ে এল। এটাতে তার ঠাকুরমা, তার মা ও তাদের পরিবারের আরও অনেক মহিলার ফোটো ছিল। আমরা ছবি দেখছি ও শঙ্কর বক্‌বক্ ক'রে ব'কে চলেছে এমন সময় দেবী তার জায়গাতে ব'সেই তাকে যেন কি বললে। শঙ্কর মুখ তুলে দেওয়ালের ঘড়িটা দেখে আমাদের বললে, পাঁচটা বেজে গেছে, তোমরা কি চা খাও?

আমরা চা খাই জেনে সে কি বলতেই দেবী উঠে চ'লে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন চাকর এসে বললে, চা তৈরি—চলুন।

আমরা সেখান থেকে উঠে খাবার ঘরের টেবিলে গিয়ে বসলুম—দেখি, দেবী চা তৈরি করছে। তৈরি হয়ে গেলে একটা বয় মতন চাকর আমাদের সামনে কাপ এনে রাখলে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো প্লেটে ক'রে দু রকম বিস্কুট ও দুটো একটা মিষ্টি এসে পড়ল। সবার শেষে একটা চায়ের কাপে চামচ ডুবিয়ে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে দেবী এসে টেবিলের এক দিকে বসল। আমরা যেখানে ব'সে ছিলুম, দেবী তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে ব'সে আস্তে আস্তে অন্য দিকে চেয়ে কাপে চুমুক দিতে লাগল। ইত্যবসরে আমরা প্লেট থেকে বিস্কুট তুলে নিয়ে খেলুম। দেবীর সঙ্গে কি ক'রে আলাপ করা যায় ভাবছি—এমন সময় সে শঙ্করকে বললে, শঙ্কর, ওঁদের আর চা চাই কি-না জিজ্ঞাসা কর।

আমি বললুম, আমায় দয়া ক'রে আর এক কাপ চা দিন।

দেবী আমাকে কোন কথা না ব'লে বয়টাকে বললে, এক কাপ চা ওঁকে দাও।

ভাবছি, আর কি বলে আলাপ জমানো যায়, এমন সময় সুকান্তটা ব'লে উঠল, আমাদেরই খাওয়াচ্ছেন—কই, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না?

সত্যিই দেবী চা ছাড়া আর কিছুই খেলে না। কিন্তু সে সুকান্তর অমন আপ্যায়নভরা কথার কোনও জবাব না দিয়ে সামান্য একটু মাথা নাড়লে মাত্র।

সুকান্তর অবস্থা দেখে কোন রকমে হাসি সামলে নতুন কাপে চুমুক দিতে লাগলুম। যাই হোক, চায়ের পালা বেশ সমারোহের সঙ্গে শেষ হ'ল। একটুমাত্র দুঃখ রইল যে দেবী এখনও কথা বললে না। চা খাওয়ার পর শঙ্কর ও দেবী কোথায় উধাও হয়ে গেল।

আমরা সেদিন আর না বেরিয়ে বাড়িরই এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। চারিদিকে বাতি জ্বালা হতেই আমরা আবার ড্রয়িং-রুমে ফিরে এসে দেখি যে, সেই ঘরের এক কোণে একটি টেবিলে ব'সে শঙ্কর পড়াশুনো করছে। তাকে আর বিরক্ত না ক'রে তাক থেকে এক-একটা বই টেনে নিয়ে আমরাও নাড়া-চাড়া করতে আরম্ভ ক'রে দিলুম। বাড়ি একেবারে নিঃশব্দ, গোটা দুই-তিন চাকর দেখেছিলুম, কিন্তু তাদেরও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না; শুধু ড্রয়িংরুমের বড় ঘড়িটায় সময়ের পদক্ষেপ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে টক্ টক্ টক্, আর আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর সে ঘোষণা ক'রে চলেছে তার দিন-বিক্রান্তির কথা।

কি একটা ছবি তন্ময় হয়ে দেখছিলুম। এবার মুখ তুলতেই দেখি, দেবদূতের মতন পণ্ডিতজী সস্মিত মুখে আমার দিকে দেখছেন। সেদিন তাঁকে প্রায় সমস্ত দিন ধ'রেই দেখেছি—আগেই বলেছি যে, তাঁর চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে দেখলেই মনে হ'ত তিনি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ নন। কিন্তু সেই রাত্রে মুখ তুলে হঠাৎ তাঁকে দেখে সত্যি সত্যিই মনে হ'ল—মানুষ এমন সুন্দরও হয়!

তাঁর মুখের ওপর—শুধু মুখের ওপরই নয়, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে

জ্বলজ্বল করছে। দেখলুম, তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল বটে, মৃদু হাস্যে মুখখানা ঝলমল করছে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ওটা হাসি নয়—তাঁর মুখের ভাবই ওই রকম।

আমি তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে উঠতেই তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ব'স, ব'স।

তারপর তিনিও আমার পাশে ব'সে জিজ্ঞাসা করলেন, চা-টা খেয়েছ? কোন অসুবিধা হয় নি তো?

বললাম, চা খেয়েছি।

পণ্ডিতজী বললেন, দেখ, এই বিকালবেলাটা আমি সংসারের কিছুই দেখতে পারি নে। শঙ্কর ও দেবী এলে তারাই এই সময়টা সংসার চালায়। ওরা না থাকলে চাকর-বাকর চালায়। ওদেরও তো যাবার সময় হয়ে এল। তোমাদের এখানে যে কয়দিন এখন থাকতে হচ্ছে, ততদিন তোমরা নিজেরাই দেখে শুনে চালিয়ে নেবে। তোমাদের আবার বলছি যে, এ পরিবারকে তোমরা নিজের পরিবার ব'লে মনে ক'রো।

একটু পরে কোথা থেকে দেবী এল, সে বোধ হয় অন্য কোন ঘরে পড়াশুনো করছিল। দেবী এসেই জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, তোমরা কি এখন খাবে?

পণ্ডিতজী মেয়ের কথা শুনে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি বল, এখন খাবে?

এ কথার উত্তরে কি বলা উচিত তাই ভাবছিলুম, কারণ সারাদিনের খাদ্য তখনও পেটে গজ-গজ করছিল—এমন সময় আমাদের হয়ে পণ্ডিতজীই উত্তর দিয়ে দিলেন, আর একটু পরে হ'লে কি তোমাদের অসুবিধা হবে?

দেবী বললে, বেশ, আর একটু পরেই হবে।

পণ্ডিতজী কলকাতার গল্প করতে লাগলেন। কলকাতায় তিনি জীবনে বার-দুয়েক গিয়েছিলেন। সত্যি কথা বলতে কি, কলকাতার চেয়ে বোম্বাই শহর তাঁর ঢের বেশি ভাল লাগে।

জিজ্ঞাসা করলুম, বোম্বাই শহরে কি আপনার বাড়ি আছে?

পণ্ডিতজী বললেন, বোম্বাই শহরে আমাদের বাড়ি ছিল বলতে পার। আমার ঠাকুরদা ও বাবা সেখানে অনেক সম্পত্তি করেছিলেন। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর দেখলুম, চাকরি ও সেই সব সম্পত্তি—দুই রক্ষা করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না। আমি সে সব সম্পত্তি বিক্রি ক'রে দিয়েছি। তা ছাড়া আমার আর বছর পাঁচেক চাকরি আছে—এর পর আমি বাকি জ বনটা ইউরোপে গিয়ে কাটাব স্থির করেছি। ফ্রান্সে আমার জমি কেনা আছে সমুদ্রের ধারে এক জায়গায়। হয় সেখানে বাড়ি করব, নয় তো ইংলণ্ডের কোনও গ্রামে বাড়ি কিনব। কোথায় থাকব তা অনেকখানি নির্ভর করছে ছেলেমেয়েদের ওপর। ওদের যে জায়গা ভাল লাগবে সেইখানেই আমাকে থাকতে হবে। আমার ইচ্ছা ফ্রান্সেই থাকি তবে কিছুই বলা যায় না, আমাদের ইচ্ছার চেয়ে যে অনেক শক্তিশালী আর একটি ইচ্ছা এই জগতের সব কলকাঠি নাড়াচ্ছেন, তাঁর ইচ্ছাতে সবই ঘুরে যেতে পারে—

কথাটা ব'লেই সেই ঘর-ফাটানো উচ্চ হাসি তুললেন।

আমাদের কথার মধ্যে মধ্যে দেবীও দু-একটা কথা বললে বটে, কিন্তু সে তার বাপকে উদ্দেশ্য ক'রেই বললে। আমাদের উপস্থিতিকে একেবারে আমলই দিলে না। যাই হোক, একটু পরেই খেতে যাওয়া হ'ল। পণ্ডিতজী রাতে খুব কমই খান—একটি বড় কাচের গেলাসের এক গেলাস দুধ ও একখানা চাপাটি একটু জেলি দিয়ে। দেবী ও শঙ্কর পরোটা খেতে লাগল, কিন্তু আমাদের প্রথমে ভাত দেওয়া হ'ল। পণ্ডিতজী বললেন, আমি জানি তোমরা ভাতের ভক্ত। ও-বেলা তোমাদের নিশ্চয়ই খেতে কষ্ট হয়েছিল।

পণ্ডিতজীকে বললুম, খাবার কষ্ট আমরা এত ভোগ করেছি যে,

যেমনই খাবার হোক না কেন, সোনা-হেন মুখ ক'রে খেয়ে নিতে পারি। কাজেই খেতে পেলে আর কোন কষ্ট পাই না—কষ্ট হয় না-খেতে পেলে।

কথাটা পণ্ডিতজী খুবই উপভোগ করলেন। তিনি হো-হো ক'রে হেসে বললেন, তবু আমার এখানে যখন আছ তখন তোমাদের কোনও রকমের অসুবিধা না হয় তা দেখতে হবে বইকি!

পরের দিন সকালবেলা উঠে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া গেল। আমাদের হঠাৎ এই ভাগ্য-পরিবর্তনের কথা তাদের না-জানানো পর্যন্ত মনটা খুঁতখুঁত করছিল। গিয়ে দেখলুম, আমাদের জন্যে কোন মাথা-ব্যথাই তাদের নেই। আমরা শিগগিরই বোম্বাই শহরে মিলে কাজ শিখতে যাব শুনে তারা হাঁ-না কিছুই বললে না। শুনলুম, জনার্দন তার বাড়িতে টাকার জন্য চিঠি লিখেছে। টাকা নিশ্চয়ই আসবে, টাকা এলে তারা খুব ফলাও ক'রে ব্যবসা শুরু করবে। দেখলুম, আমরা তাদের দল থেকে খ'সে পড়ায় তারা বেশ আনন্দেই আছে।

তবুও জনার্দনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চ'লে এলুম। ফিরে এসে দেখি, পণ্ডিতজী আপিসে বেরিয়ে গিয়েছেন। শুনলুম, তিনি রাত থাকতে ঘুম থেকে উঠে স্নান ক'রে পূজা-অর্চনা শুরু করেন, শেষ হয় সেই বেলা আটটা আন্দাজ। তার পরে একেবারে আপিসের পোশাক প'রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চা-জলখাবার খেয়ে বেরিয়ে যান। দুপুরে বাড়ি ফিরে আহারাদি ক'রে নিজের ঘরে শুতে যান। তার পরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে বেলা পাঁচটা নাগাদ আবার পূজোয় বসেন—সাতটা, সাড়ে সাতটার আগে উঠে আসেন না। শুনলুম, পণ্ডিতজী যখন ঘুমোন তখন তাঁর ঘরের বিশেষ কয়েকটি জানলা ও দরজা খোলা থাকে এবং যখন পূজোয় বসেন তখনও বিশেষ ক'রে কয়েকটি দরজা জানলা খোলা হয় বা বন্ধ হয়। এই দরজা জানলা খোলা ও বন্ধ দেখে তাঁর ছেলেমেয়েরা ও চাকরবাকর বুঝতে পারে, তিনি কি করছেন! কারণ তিনি যখন পূজোয় বসেন তখন তাঁকে ডাকা বারণ।

পণ্ডিতজী একটা বড় ঘরে থাকতেন। ঘরের মধ্যে খানিকটা জায়গা

পূজোয় বসবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জায়গাটিতে একটি বাঘের ছাল পাতা থাকত। কোনো বিশেষ দেবতার ছবি কিংবা মূর্তি সেখানে দেখি নি। সামনে ও আশেপাশে কয়েকটি পুরুষ ও নারীর ব্রোমাইড ছবি টাঙানো ছিল, সেগুলি অধিকাংশই ইউরোপীয়ানদের, দু-একজন মাত্র ভারতবর্ষীয় লোক ছিল। পণ্ডিতজীর কাছেই শুনেছিলুম, তাঁরা সকলেই নাকি খুব উঁচুদরের সাধক—এঁদের মধ্যে কেউ কেউ দেহরক্ষা করেছেন, কেউ বা এখনও বেঁচে আছেন। এঁদের সবার নামও বলেছিলেন, কিন্তু সারা জীবন ধ'রে নিজের নাম মনে রাখতে রাখতে তাঁদের নাম ভুলে গিয়েছি। পণ্ডিতজীর ঘরের সামনেই ঠিক পূবমুখো একটু ছোট গোছের বারান্দা ছিল। তাঁর ঘরের এক পাশে ছোট একটা ঘরে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আর এক পাশে বড় একটা ঘরে শঙ্কর ও দেবী রাত্রে শুত।

একদিন সকালবেলা উঠে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখলুম। আমরা চা-পান করবার জন্যে খাবার-ঘরে যাচ্ছি, এমন সময় বারান্দার দিকে চেয়ে দেখি, পণ্ডিতজী স্থির হয়ে হাতজোড় ক'রে উদীয়মান সূর্যের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পরনে একখানা রেশমের হালকা গোলাপী রঙের ধুতি, অঙ্গেও সেই রঙেরই একখানা চাদর পৈতের মতন ক'রে পেঁচানো রয়েছে। রক্তাভ-গৌর তাঁর দেহ, তার ওপরে এসে পড়েছে উদীয়মান সূর্যের অরুণালোক—অরুণ মেঘচ্ছায়া যেন প্রতিবিম্বিত হয়েছে স্বচ্ছস্রোতে। আমার মনে হতে লাগল যেন পুরাকালের কোন এক বৈদিক ঊষার বন্দনাসূক্তের একটি ঋক্ হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে এসে পড়েছে সুরাটের মত এই আধুনিক শহরে। আমাদের চিত্তলোকে যে অদৈহিক আকৃতি ও অরূপের কান্না কাঁদছে, তারই যেন প্রত্যক্ষ রূপ ওই দীপ্ত ব্রহ্মণ্যশ্রী।

সেই দৃশ্য দেখে আমরা আর নড়তে পারলুম না। কি যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আমাদের টেনে সেইখানেই বেঁধে রেখে দিলে। পণ্ডিতজীর হাত দুটি যুক্ত, চোখ দুটি খোলা রয়েছে বটে কিন্তু স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সেই প্রদীপ্ত সূর্যের পানে। আমি যদি চিত্রকর হতুম

তো চিত্রিত ক'রে রেখে দিতুম সেই রূপ। আগ্রায় সত্যদার কাছে শুনেছিলুম বটে যে, তিনি প্রতিদিন সকালবেলা উঠে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকেন। সত্যদার সে কথা শুনে মনে হয়েছিল, কোথাও কিছু নেই, খামোখা লোকে সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে যাবে কেন? আজ এই ব্রাহ্মণকে দেখে আমাদের ভুল ভাঙল। পণ্ডিতজীর দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারি না। যত দেখি তত মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। চোখের পলক নেই, হাত-পা বা দেহের কোনো জায়গা একটু নড়ছে না, নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না—তা বোঝার উপায় নেই। ধীর স্থির নিষ্পন্দ সেই দেহযষ্টি নিষ্কম্প উজ্জ্বল দীপশিখার মতন।

আমরা প্রায় আধ ঘণ্টা ধ'রে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখে নিঃশব্দে সেখান থেকে স'রে এলুম। পরে শঙ্কর ও দেবীর কাছে শুনেছিলুম, তিনি প্রতিদিন প্রায় দু ঘণ্টা ওই রকম সূর্যের দিকে চেয়ে থেকে জপ করেন।

পণ্ডিতজীর বাড়িতে আমাদের দিনগুলি সুখেই কাটতে লাগল। শান্তির অভাবও সেখানে ছিল না, তবে আমাদের অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তা মধ্যে মধ্যে মনকে নাড়া দিত। আমাদের সম্বন্ধে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে কোনো চিঠি এল কি-না সে কথা মাঝে মাঝে পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করতুম। কিন্তু তার উত্তরে তিনি তাঁর স্বভাব-সুলভ উচ্চহাসি হেসে বলতেন, ভাবনা কি? চিঠি এলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই আমাকে বলবেন—আমাকে আর জিজ্ঞাসা করতে হবে না।

তার পরেই তিনি একটু থেমে আবার বলতেন, এখানে তোমাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? তোমাদের জামাকাপড় জুতো আছে তো?

অদ্ভুত মানুষ ছিলেন এই পণ্ডিতজী। গৃহস্থের মধ্যেও এমন লোক থাকতে পারে তা এর আগে আমার ধারণা ছিল না। সেখানে থাকতে থাকতে কিছু তাঁর মুখে, কিছু তাঁর ছেলেমেয়ের কাছে তাঁর পুণ্য জীবনকথা শুনেছিলুম। জীবনও তাঁর ছিল অদ্ভুত।

অনেক দিন আগে পণ্ডিতজীর পূর্বপুরুষের কোন লোক তীর্থ করতে এসে এই দেশেই থেকে গিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণ। তখন মারাঠারা সবেমাত্র একটু একটু ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণেরা তখন ভারতবর্ষময় নিজেদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমাদের পণ্ডিতজীর পূর্বপুরুষ মারাঠাদের রাজসরকারে সামান্য কাজে ঢুকে বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার বলে অসামান্য হয়ে উঠেছিলেন। ক্রমে তাঁদের বংশ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কেউ কেউ আর্যাবর্তে এসে নিজের জাতে বিবাহ করতেন, কেউ বা মহারাষ্ট্রীয়দের ঘরে বিবাহ করতেন। কারুর বা একাধিক স্ত্রী থাকত—তাঁদের মধ্যে কেউ বা গৌড়-সারস্বত ব্রাহ্মণের মেয়ে, কেউ বা মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের মেয়ে। এমনও হয়েছে যে কেউ বা সুন্দরী মেয়ে, কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে নয়। এমনি ক'রে চলেছিল—ইংরেজরা এ দেশ অধিকার করার পর এদেরই এক পরিবার ইংরেজী লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। এই পরিবারের বংশধর হচ্ছেন আমাদের পণ্ডিতজী। তাঁর পিতা ইংরেজ সরকারে কাজ করতেন এবং কিছু পয়সাকড়িও তিনি ক'রে গিয়েছিলেন। পণ্ডিতজী ইংলণ্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস ক'রে ফ্রান্সে চাকরি গ্রহণ করেন। ফ্রান্সে চাকরির সময়ে তিনি সেখানকার একদল স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে এসেছিলেন—যাঁরা গোপনে ভারতীয় যোগসাধনা অভ্যাস করতেন। ফরাসী দেশে ব'সে বিদেশীদের সঙ্গে মিলে যখন তিনি যোগসাধনায় মগ্ন, ঠিক সেই সময় দেশ থেকে খবর এল যে, তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতা অত্যন্ত অসুস্থ এবং অবিলম্বে এখানে না এলে তাঁদের সঙ্গে বোধ হয় আর দেখা হবে না। যোগ করলেও পিতা-মাতার প্রতি মমত্ব ও সাংসারিক কর্তব্যবোধ তাঁর একেবারে রহিত হয়ে যায় নি—তাই পত্রপাঠমাত্র তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার কাছে ফিরে এলেন।

( আগামীবারে সমাপ্য )

"মহাস্থবির"

# দিবাকর দালাল

( ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি হইতে )

চেঙ্গিস খাঁ যদি চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করত তা হ'লে তার চেহারা দেখে কেউ কি আঁচ করত, তার ওই হাত হ্যাণ্ডবিল বিলি করবার হাত নয়? তাইমুর লঙ্গ গড়ের মাঠে চিনেবাদাম বেচলে চিনেবাদাম-খাইয়েরা তাকে ল্যাংড়া দেখে হয়তো 'আহা' করত, মুখ দেখে তাইমুরী আভাস টের পেত না। নাদিরশাহ্ নাম ভাঁড়িয়ে ফারপোতে বা "চা-ভারতী"তে ব'সে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকলে তার মুখোমুখি চা-খোরও কি মুখ দেখে টের পেত, এই লোকটারই এক-টুকরো আদেশে বহু শহরের বহু বাসিন্দা বহু-টুকরো হয়েছে, পাড়ার পর পাড়া সারা হয়ে গেছে আগুনের অত্যাচারে আর অত্যাচারের আগুনে? যদি দেখা হ'ত গজনীর সুলতান মাহমুদের সঙ্গে কোনো চাঁদিনী রজনীতে তাজমহলের ধারে, মনে হ'ত কি এই লোকটাই নির্মম ক'রে সোমনাথ মন্দির তচনচ ক'রে লুণ্ঠন করেছে? মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে এক ট্রেনে এক কামরায় মুখোমুখি ব'সে হাওড়া থেকে বোলপুর গেলেও হয়তো মনে হ'ত, এক অতি সদাশয় নিরীহ ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ সহ-ভ্রমণ করা গেল। রোম যখন পুড়ছিল, তখন রোম-সম্রাট নিরো রোমান্টিক পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র বাজিয়েছিলেন ব'লে শুনি। তিনি নাকি আরও যা যা করেছিলেন, তার কাছে এও ছেলেমানুষ। কিন্তু ( আগে চেনা না থাকলে ) নিরোর পাশে ব'সে মেট্রো সিনেমায় "কুও ভ্যাডিস" বাণীচিত্র দেখবার সময় মধ্যবিরামকালে তার মুখ নিরীক্ষণ করলেও হয়তো সন্দেহ হবে না এ মুখের মালিক একজন নির্বিবেকী বীভৎস-ব্যাপার-বিশারদ। চেহারা দেখে চরিত্র আর চরিত্র থেকে চেহারা আন্দাজ করার বিদ্যেতে পৌনে ষোলো আনাই ভেজাল। চাণক্যের ভাষায় "বিশ্বাসো নৈব কর্তব্য"।

শ্রীযুত দিবাকর দালালের দোতলায় এক দখিন-বাতায়নী ঘরে তাঁর [redacted] দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, এ লোকটিকে যে ৺দি গ্রেট এশিয়াটিক

ব্যাঙ্কের লালবাতি-প্রজ্জ্বলক ব'লে মনে হচ্ছে, তা শুধু আগে জানা আছে ব'লে। আগে জানা না থাকলে হ'ত না।

পড়েছি রবি ঠাকুরের "গান-ভঙ্গ" কবিতায় দুরন্ত তরুণ কালোয়াৎ গাইয়ে কাশীনাথের কথা যে—

"আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল, আপনি কাটি দেয় তাহা।"

দিবাকর দালাল আপনি গ'ড়ে তুলেছিলেন ✓ দি গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক, তার শাখা-প্রশাখার জাল ছড়িয়েছিলেন বহুখানে, শেষে লালবাতির আগুন জেলে আপনি সে জাল কেটে দিয়েছিলেন। দমকল এসে সব আগুন নেবাতে পারে না। এ আগুনে জ'লে অনেক পরিবার পথে বসল। এ সব পরিবারের অনেকেই চোখে দেখেন নি তাঁদের পথে বসাবার মুখ্য শিল্পী দিবাকর দালালকে। দু-চারজন হয়তো দেখেছিলেন, কিন্তু জানেন নি ইনিই দিবাকর দালাল। হায় রে প্রবাদ, যাতে বলে—মুখ দেখে মন চেনা যায়!

খবরটা চটপট দিয়ে বন্ধুর কাজই করেছ ধনপতি।—বললেন দিবাকর দালাল, ছোট সর্দি থেকে হয়ে যায় বড় নিউমোনিয়া। ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জাকে ফেলে রাখলে তা থেকে টাইফয়েড হয়ে যেতে পারত।

আমি বললেম, দিবাকর-দুহিতা হোমিও-দময়ন্তীর দিকে তাকিয়ে এখন আর সে ভয় রইল না—এ অভয় অনুভব ক'রেই আমি যাচ্ছি।

দময়ন্তী বললে হাসিমুখে, অভয় আপনি অনুভব করতে পারেন, কিন্তু দোহাই আপনার, যাবেন না এখনই। যদি খুব অসুবিধে না হয় তো আজকের দিনটা অন্তত বিকেল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে নষ্ট ক'রে যান। মানে, আপনার বন্ধুটিকে নতুন জায়গার আবহাওয়াটা সইয়ে দিয়ে যান।

বললেম, রাহুলবাবু আমার নতুন বন্ধু; আপনাদের পুরাতন ভাড়াটে।

কিন্তু সময়ের ফিতে দিয়ে তো মনের সুর মাপা যায় না ধনপতিবাবু।

দময়ন্তীর কণ্ঠে যেন এক চিরন্তনী বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল। সে ধ্বনির রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই দময়ন্তী জানালে তাদের অ[illegible]

মধ্যাহ্ন-ভোজনে সহ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। স্নান ক'রেই বেরিয়েছিলেম, আর দিবাকর দালালের মুখেও দেখলেম আপত্তির সুর বাজছে না। বললেম, তা বেশ।

খুশি হলেন দময়ন্তী-জননী সৌদামিনী দেবীও। আমি যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ দময়ন্তীর ষোল আনা মনোযোগ পাবে না ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা-মগ্ন তরুণ রাহুল; অন্তত আনা ছয়েক তো নিশ্চয় আমার ভাগে মিলবে। পরম উদ্বিগ্না সৌদামিনী দেবীর ওইটুকুই পরম লাভ। এ যেন জাহাজ-ডুবির আশঙ্কার আভাস দেখে সাঁতার-আনাড়ী যাত্রিণীর লাইফবেল্ট-প্রীতি।

ভোরেই স্নান সারা হয়েছিল সৌদামিনী দেবীর আর দময়ন্তীর—আমারই মত। তাড়াতাড়ি স্নানাগারে চ'লে গেলেন দিবাকর দালাল। খাওয়ার সময় হয়ে গেছে, জঠরও ভেতর থেকে তাগিদ দিচ্ছে। তা ছাড়া নীচে বৈঠকখানায় বসিয়ে রেখেছেন দালাল অতুল চম্পটীকে। ভোজনান্তে তার সঙ্গে কাজের কথা আছে।

সৌদামিনী দালাল চ'লে গেলেন খাবার ঘরের দিকে, খাবার টেবিল সাজাবার অজুহাতে। আমার মনে হ'ল, উনি আসলে গেলেন রান্নাঘরের দিকে—চটপট চপ-টপ কিছু নতুন ক'রে ভেজে ফেলবার চেষ্টায়, নতুন অতিথির জন্যে। মনে ভাবলেম, তা বেশ।

দময়ন্তী বললে, বন্ধুর শিয়রের পাশে ব'সে মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিন, আরাম পাবেন। আমি একটু পরেই আসছি।

যাবার আগে একবার তার আপন দখিন হাতে রাহুলের ললাটের তাপ পরখ ক'রে গেল দময়ন্তী। দময়ন্তীর প্রস্থানোন্মুখ মুখ দেখে বোঝা গেল, ও-তাপে ভাবিত হবার কিছু নেই।

চোখ খুলে গেল কবি রাহুল রায়ের। দৃষ্টি তার দময়ন্তীর অনুসরণ ক'রে বাধা পেল অস্বচ্ছ দেয়ালে। দময়ন্তীর প্রস্থান অনির্বচনীয় অপরূপ—লীলায়িত নয়, সাবলীল। প্রস্থান ক'রেও যেন অবস্থানের রেশ রেখে গেছে দময়ন্তী, তার পরশ যেন ছেয়ে আছে এই ঘরের সমস্ত ফাঁকা।

রাহুল কি ভাবছিল জানি নে, এমন সময় শুনতে পেলেম, দিবাকর দালাল বাথরুমে গাইছেন :

"এমন দিন কি হবে মা তারা
যেদিন তারা তারা তারা ব'লে
দু নয়নে বইবে ধারা ?..."

আশ্চর্য ! ৺ গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক ডুবিয়ে দিয়ে যিনি অগুনতি পরিবারের নয়নে ধারা বইয়েছিলেন—যে ধারা আজও শুকোয় নি—সেই দিবাকর দালালই আপন দু নয়নে ধারা বওয়াবার জন্যে মা-তারার কাছে বাথরুমী গান গেয়ে দরখাস্ত পেশ করছেন !

যেমন দিনটি হবার জন্যে মা-তারার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন তিনি, তেমন দিনে কি কি ঘটবে তার ফিরিস্তি গাইতে লাগলেন দিবাকর দালাল—হৃদিপদ্ম ফুটে উঠবে, মনের আঁধার টুটে যাবে ইত্যাদি আরও কত কি !

রাহুল বললে, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা ট্যাবলেট খেয়ে আমার নিজের ঘরে প'ড়ে থাকলেই হ'ত। এঁরা তো আমার কেউ নন—এঁরা বড়লোক বাড়িওয়ালা, আমি গরিব ভাড়াটে, তাও এঁদের গ্যারেজের ওপর এক ছোট্ট খুপরির। এঁদের কাছে ঋণী থাকতে চাই নে ধনপতিবাবু।

আমি বললেম, আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখে নিয়ে এসেছেন দময়ন্তী ; নিজেই ওষুধ দিয়েছেন, আরও দেবেনও। অন্তত আপনার এই ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা সারাবার মত হোমিওপ্যাথি তাঁর রপ্ত আছে—এ গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। আপনি নিজে তো যেচে আসেন নি রাহুলবাবু। দায়িত্ব যা কিছু সবই দময়ন্তীর।

কিন্তু আমার দায়িত্ব ওঁকে নিতে দেব কি অধিকারে ধনপতিবাবু ? ওঁর সঙ্গে কি সম্পর্ক আমার ?

উনি হোমিওপ্যাথ, আর আপনি ওঁর পেশেণ্ট।—বললেম আমি, অন্তত এই সম্পর্কটুকু আপাতত মেনে নিতে আপনার বাধছে কোথায় ? আর ঋণের কথা যদি বলেন, তো ঋণটা দু দিকেরই। রোগীর যেমন ডাক্তার দরকার, ডাক্তারেরও যে তেমনি রোগী দরকার। আপনাকে

হাতে পেয়ে ওঁর পালসেটিলা অ্যাকোনাইটের কিছু সদ্‌গতি হয়ে গেল, ওঁরও হাত মক্‌সো হ'ল। নিজেকে একতরফা ঋণী ভেবে কেন মন খারাপ করছেন আপনি?

দময়ন্তীর কথা ভেবে আমার মন খারাপ নয় ধনপতিবাবু। ওঁর কাছে ঋণী থাকবার সুযোগ পাওয়াটাও পরম সৌভাগ্য।—রাহুল রায়ের মনের ঝরনা যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছে ছলছল বেদনায়। কিন্তু ওই যে লোকটা, জেলের অন্ধকারে যার ঘানি টানা উচিত ছিল, নারকেল-ছোবড়ার দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে যার হাতে ফোস্কা প'ড়ে যাওয়া উচিত ছিল, সে আজ নিশ্চিন্ত আরামে পরমানন্দে বাড়ি-গাড়ির মালিক। ব্যাঙ্ক ডুবিয়ে দিয়ে হাজারো পরিবারের সর্বনাশ যে করলে, তার পৌষ মাস আজও ফুরল না। তাই তো মনে হয়, দুনিয়া চালাচ্ছে শয়তান—ভগবান ফেরার।

কবি রাহুলকে যে চেনে না এমন যে কোনো ডাক্তারেরই মনে হ'ত, জ্বরের চাবুক খেয়ে প্রলাপ বকা শুরু করেছে রাহুল। কিন্তু আমি চিনি রাহুলকে।

বললেম, তা হয়তো মনে হয়। কিন্তু এক মাঘে তো শীত যায় না রাহুলবাবু।

রাহুল বললে, কিন্তু কত মাঘে যায় সেটা বলতে পারেন ধনপতিবাবু? তারপর বললে, লোকটার টাকা আছে কিন্তু সে জানোয়ার। জানোয়ার লোকটা, তবু তার টাকা আছে। ওর চেহারা কল্পনা ণায় মন ভ'রে ওঠে। জানোয়ার, জানোয়ার, জানোয়ার। াকাওয়ালা জানোয়ার।

স্নান সেরে এসে পড়েছেন দিবাকর দালাল, খেয়াল করি নি। বেশ ক'রেই বললেন, জানোয়ার শুধু ভুজঙ্গ চৌধুরীই নয় হে ।। ওর বাপ অনঙ্গ কি করেছিল তা যদি শোন তো শিরায় শিরায় ফুটবে টগবগ ক'রে। তখন বলবে, ভুজঙ্গ তো ছেলেমানুষ। নঙ্গ চৌধুরী অমন বিশ্বাসঘাতকতা না করলে আমার গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্কের জয়পতাকা আজ পত্‌পত্‌ ক'রে উড়ত, অমন অকাল্লে পটল

তুলত না। ওই একটা লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় আমার এতদিনের বুকের রক্ত দিয়ে গ'ড়ে তোলা ব্যাঙ্ক চুরমার হয়ে ধুলো হয়ে গেল, কত গরিব কত মধ্যবিত্তের মুখের গ্রাস আর মাথা গোঁজবার ভিটে উচ্ছন্ন গেল, তাদের ছন্নছাড়া হাহাকারের ছবি আমি শয়নে স্বপনে কখনো ভুলতে পারি নে। অনঙ্গ ভুজঙ্গকে আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ক্ষমা করতে পারি নে ধনপতি।

জানতে চাইলেম অনঙ্গ চৌধুরীর বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীটুকু সংক্ষেপে। গ্যাঁট হবার ভঙ্গিতে চেয়ারে ব'সে দিবাকর দালাল বললেন, কোথায় কাকপক্ষীর মুখে কে কি খবর পেল, সে খবর ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমার অনেক দিনের গ'ড়ে তোলা ব্যাঙ্কে 'রান্' শুরু হ'ল ধনপতি। যে যার সব টাকা আমার ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিয়ে অন্য ব্যাঙ্কে জমাতে চায়। তোমরা তো জান, আমানতের টাকা সব ব্যাঙ্কের সিন্দুকে পুঁজি ক'রে রাখা হয় না, বেশির ভাগ বাইরে খাটিয়ে খাটিয়ে বাড়ানো হয়, তা নইলে মোটা হারে সুদ দেব কোথা থেকে? গেলুম বুড়ো অনঙ্গ চৌধুরীর কাছে অনেক বিশ্বাস নিয়ে। লোকটা বেশি নয়, মোটে কয়েক লাখ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেই 'রান' বন্ধ ক'রে ব্যাঙ্কটাকে বাঁচিয়ে নিতে পারতুম। প্রথম চোটে কিছু টাকা মিটিয়ে দিতে পারলেই টাকা উঠিয়ে নেওয়ার হিড়িক ক'মে যেত। বেঁচে যেত গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক—বাঙালী জাতির একটা বড় গৌরব। কিন্তু আমার একান্ত বিশ্বাসের পিঠে আমূল ছুরি বসিয়ে দিলে বুড়ো অনঙ্গ। একটি আধলাও দিলে না। বুড়োর ছেলে ভুজঙ্গ তখনও বি. এ. ফেল করে নি, কালেজ কামাই করছে। নবীন যুবক। ভাবলুম, ওর সবুজ মন সাড়া দিতে পারে। আর ওর কথায় বাপ দিতেও পারে টাকা—ভুজঙ্গকে না হয় জয়েণ্ট ম্যানেজিং ডিরেক্টর ক'রে নেওয়া যাবে যথাসময়ে। কিন্তু ভুজঙ্গও হেসে উড়িয়ে দিলে আমার কথা। বাপকে রাজী করাতে রাজী হ'ল না।

তার পর?

'রান' মেটাতে পারলুম না। ব্যাঙ্ক লিকুইডেশনে চ'লে গেল।

দুঃখের ঝরনায় চক্ষের জল ঝরল না দিবাকর দালালের, জ্ব'লে উঠল আকস্মিক আগুনের ফুলকি।

শুধু চৌধুরীদের দোষ দিয়েই বা কি হবে ধনপতি?—আরও বললেন দিবাকর দালাল, আমাদের দুর্ভাগা জাতটার কথাও তো ভুলতে পারি নে। এমন একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে যে জাত অম্লানবদনে চোখের সামনে লিকুইডেশনে তলিয়ে যেতে দেয়, ভাসিয়ে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে না, সে জাতের কোন ভবিষ্যৎ আছে ভাবতে পার?

আমি বললেম, জাতের কথা যদি বলেন তো আমার মনে হয়, জাত ভাবলে—এ প্রতিষ্ঠান বার বার ভাসালেও বার বার ডুববে, তাই খামোখা আর মেহনৎ করলে না।

আরও বললেম, আপনার ৺ গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক থেকে আড়াই লাখ টাকা ধার দিয়েছিলেন ইন্‌ডো-গান্‌জেটিক ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌কে যার বড় অংশীদার আপনার বড় শালা। এক লাখ দিয়েদিলেন আপনার ভগ্নীপতিকে, তাঁর ইন্‌টারন্যাশন্যাল বাকেট ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানিতে। আরও লাখ ছ-সাত টাকা ধার দিয়েছিলেন নানা কোম্পানিতে, যাদের পরিচালনায় ছিলেন আপনার মামা, ভাগনে, দোস্ত, মাসতুতো ভাই ইত্যাদি। সে সব কোম্পানিই পটল তুলেছে আর কতক তুলি-তুলি করছে। সে টাকা ফেরত পাওয়া আপনার ব্যাঙ্কের পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। শুনেছি বাজারে এই সব কথা পাচার হবার পরই টাকা তোলার হিড়িক শুরু হয়েছিল।

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ"-ভঙ্গীতে করুণ মাথা দুলিয়ে দিবাকর দালাল বললেন, হায় রে দেশের লোক! তারা কি এইটে বোঝে না যে, দেশের শিল্পকে মূলধন যুগিয়ে সংগঠিত বিকশিত করা আর মরো-মরো শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলাই ব্যাঙ্কের বড় কাজ, আর এ ভাবে টাকা খাটিয়েই ব্যাঙ্কের আয়, যার ফলে আমানতকারীরা সুদ পায় ব্যাঙ্ক থেকে। যাদের টাকা ধার দিয়ে ব্যবসায় সহায়তা করা হবে, তাঁরা কেউই তো ভুঁইফোঁড় নয়—সবাই কারও-না-কারও ভাই, ছেলে, ভায়রা, মামা, শালা, ভাগ্নে ইত্যাদি কিছু একটা হবেই। সেটা রামা শ্যামা টম্‌ ডিক্‌

হ্যারির না হয়ে যদি হয় দিবাকর দালালের—যে আপন বুকের রক্ত দিয়ে ব্যাঙ্কটাকে গ'ড়ে তুলেছে—তা হ'লে কোন্ মহাভারতটা অশুদ্ধ হয়ে যায়? না কি আমার সঙ্গে সম্পর্ক আছে ব'লেই তারা অপাংক্তেয় অপরাধী হয়ে গেল? হায় রে দেশের লোক! এদের জন্যে অনেক ত্যাগ হাসিমুখে স্বীকার ক'রে নিয়েছি, কিন্তু সে স্যাক্রিফাইসের মর্ম এরা বুঝলে না। আমিও এদের ক্ষমা করব না ধনপতি। টিট্ ফর্ ট্যাট্। দুনিয়া আমাকে খাতির করে নি, আমিও দুনিয়াকে খাতির করব না। কাউকেই খাতির নয়—নো মার্সি, নো পরোয়া।

দময়ন্তী এল চিনেমাটির ফীডিং পট্ হাতে নিয়ে। বললে, একটু খেয়ে নিন রাহুলবাবু। না না, মাথা নাড়লে শুনব না। আপনি হয়তো টের পাচ্ছেন না, কিন্তু আমি টের পেয়েছি, ক্ষিধে আপনার পেয়েছে। আশ্চর্য হোমিওপ্যাথ দময়ন্তী দালাল! টের পাবার ক্ষমতা দেখবার মত।

রাহুল অগত্যা শুধালে, কি এনেছেন?

আমি লুক্রেশিয়া বর্জিয়া নই রাহুলবাবু।—হেসে বললে দময়ন্তী, আর যাই হোক, সুধা ব'লে গরল খাওয়াচ্ছি না আপনাকে। হাঁ করুন নির্ভয়ে, বিনা দ্বিধায়, কোন আপত্তি না ক'রে।

ফীডিং পট্ থেকে ঢেলে ঢেলে তরল খাদ্য খাইয়ে দিলে রাহুলকে দময়ন্তী চমৎকার অনায়াসে। মনে হ'ল, পূর্বজন্মে দময়ন্তী ছিল ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল। লক্ষ্য করলেম, নেপথ্য থেকে দেখে সৌদামিনী দেবীর মুখ মেঘলা হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুখোমুখি উপবিষ্ট দিবাকর দালালের মুখের সমুদ্রে ভাব-পরিবর্তনের কোন ঢেউ উঠছে না।

দময়ন্তী বললে, এইবার আমরা খেতে চলি রাহুলবাবু। কানাই রইল পাশের বারান্দায় ব'সে, আপনার ডাক শুনলেই এসে হাজির হবে। আসুন ধনপতিবাবু। এস বাবা। কোন জড়তা নেই, কোন দ্বিধা বা কুণ্ঠা নেই। প্রতিটি কথায় যেন রিহার্শাল দেওয়া পরিপক্ক নিখুঁতত্ব অথচ স্বতস্ফূর্ততার সাবলীল স্বাভাবিকতা।

খাবার টেবিলে যেমন শুনলেম অনেক, তেমনি শোনালেম অনেক।

ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ. পড়ছে দময়ন্তী দালাল। বি.এ. পড়বার সময় থেকেই হোমিওপ্যাথির শখে শৌখিনা দময়ন্তী, সে শখ ক্রমে নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। আর একটি শখ পিয়ানো বাজানো। পিয়ানো আছে দময়ন্তীর শয়নকক্ষে; সুরকার শোপাঁ, মোৎসার্ট আর বেঠোফেনের তৈরি সুর টোকা মেরে মেরে পিয়ানোর ভেতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে দেয় দময়ন্তী। আপত্তি করে না কেউ।

এককালে রোগা-মাইনেয় স্কুলমাস্টার ছিলেন দিবাকর দালাল। শেখাতেন অঙ্ক। যে কোন ত্রিভুজের ভেতরকার তিনটি কোণের যোগফল দুই সমকোণ—ইউক্লিডের এই একই কথা পঁচিশ বছর ধ'রে ছাত্রদের বার বার বোঝাতে বোঝাতে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত ত্রিভুজের ওপর ক্ষেপে উঠলেন। মাস্টারের মাইনে কম ব'লে ক্রমে ছাত্ররাও সমীহ করা ভুলে যাবার রিহার্শাল দিতে লাগল। টাকাওয়ালা মূর্খ মাতব্বরেরা পুরস্কার-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব আর প্রধান-অতিথিত্ব করতে এসে মাস্টারদের উদ্দেশেও সদুপদেশ বিতরণ করতে শুরু করলেন। ক্ষেপে উঠে একদিন উচিত কথা শুনিয়ে দিলেন অঙ্কের মাস্টার দিবাকর দালাল। হেডমাস্টার বললেন, এটা তাঁর অনুচিত হয়েছে, তাঁকে হয় লিখিত ক্ষমা-প্রার্থনা-পত্র, না হয় পদত্যাগ-পত্র পেশ করতে হবে। পরেরটাই পেশ করলেন মরিয়া ক্ষ্যাপা মাস্টার দিবাকর দালাল। আপনজনে ছি-ছি করলে, একঘরে করলে তাঁকে, নইলে পাছে টাকা ধার দিতে হয়। আত্মীয়স্বজন কোমর বেঁধে অনাত্মীয় পরজন হয়ে গেল, তিনি যেন দাগী আসামী অথবা জীবন্ত প্লেগ। দুনিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন দিবাকর দালাল, একাই লড়বেন তামাম দুনিয়ার বিপক্ষে। যে টাকার অপ্রাচুর্যের দরুন সয়েছেন নিদারুণ অসুবিধা অপমান অবহেলা, সেই টাকার অজস্রতায় অবগাহন করবেন যে উপায়ে হোক—মানবেন না ন্যায়নীতির বালাই, শুনবেন না বিবেকের নাকি কান্না, গলবেন না পরের চোখে জল কল্পনা ক'রে, দয়া মায়া কোমলতা দরদ সহানুভূতি ঝেঁটিয়ে সাফ ক'রে ফেলবেন মনের উঠোন থেকে। একাগ্র সাধনায় ঠিক একাগ্রই হতে হবে, দু-অগ্র হ'লেও চলবে না; আর সেই একাগ্রের লক্ষ্য হ'ল টাকা।

টাকা-টাকা-টাকা-টাকা-টাকা! একাগ্র তপের তাপে টাক পড়তে লাগল মাথায়। সেই তপস্যা-যুগের তাপ সয়েছেন সহধর্মিণী সৌদামিনী, কিছু কিছু আঁচ পেতে হয়েছে দময়ন্তীকেও। তারপর খুব ছোট ক'রে শুরু হ'ল ব্যাঙ্ক। ছোট শুরু থেকে বাড়তে বাড়তে বিরাট ব্যাপ্ত হ'ল গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক। গরিব মাস্টার দিবাকরকে যারা ছি-ছি ক'রে এড়িয়ে ছিল, তারা ব্যাঙ্কিং-যাদুকর দিবাকর দালালের সঙ্গে খাতির জমাতে এসে দুয়ার থেকেই তাড়া খেয়ে ফিরে গেল। পুরাতন আত্মীয়, পুরাতন বন্ধু—সব ভুলে গেলেন নতুন মানুষ দিবাকর দালাল।

দয়া আমি করি নে, খাতিরও দেখাই নে আমি কাউকে ধনপতি।—বললেন দিবাকর দালাল, যা আমি পাই নি, তা আমি দেবও না কাউকে। দময়ন্তীর স্বাধীন ইচ্ছের ওপর কোন বাধা চাপাই নে, শুধু বলি—নিজের বুকের রক্ত দেওয়া অভিজ্ঞতা থেকে বলি—মনকে নরম করিস নে মা, পাষাণ হতে শেখ্। এ দুনিয়া বড় খারাপ জায়গা মা, শয়তানের রাজধানী ; এখানে দয়া-মমতা করতে গেলেই ঠকবি।

কিন্তু নির্মম হয়ে জেতার চাইতে মমতা ক'রে ঠকা ভাল নয় কি বাবা?—শুধালে দময়ন্তী, 'ভেনিসের সওদাগর' নাটকে পোরশিয়ার মুখ দিয়ে শেক্‌স্‌পীয়ার বলিয়েছেন—

কাব্য-নাটকের সঙ্গে জীবনের কঠিন বাস্তব গুলিয়ে ফেলিস নে মা।—বললেন দিবাকর দালাল, ঠকতে না চাইলে নরম হতে ভুলে যা, কঠিন হতে শেখ্। এ আমি তোমাকেও বলি ধনপতি। দুনিয়া বড় কঠিন ঠাঁই হে ; এখানে কঠিন যে হতে পারবে না, তাকেই কোণঠাসা হতে হবে। জংলী হতে না জানলে জঙ্গলে বাঁচবে কি ক'রে?

খাবার টেবিলে কথা কইলেন না সৌদামিনী দেবী। আমাকে যত্ন ক'রে খাওয়াতেই ব্যস্ত রইলেন, যেন খাইয়ে আমায় খুশি করবার সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রতিজ্ঞা করেছেন। নারীর এই যে কল্যাণময়ী রূপ, খাওয়ার চাইতে খাওয়ানোতে বেশি আনন্দ পাওয়া—এ আমার ভারি ভাল লাগে।

আহার-পর্ব এবং আহার-পরবর্তী পর্ব শেষ ক'রে চ'লে গেলাম

রাহুলের ঘরে। দিবাকর দালাল বললেন, অতুল চম্পটীকে ওপরের বারান্দাতেই ডেকে নিয়ে আয় রে কানাই। নীচে আর যেতে মন চাইছে না এখন।

বসলেন দখিনের বারান্দায় আরাম-কেদারায়। মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে এসে বসল দালাল অতুল চম্পটী। সৌদামিনী দেবী আমায় একটু একান্তে ডেকে (দময়ন্তী তখন রোগী রাহুলকে দেখছে হোমিওপ্যাথিক চোখে) বললেন, খেয়ে-দেয়ে একটু না গড়ালে আমি বাঁচি নে বাবা ধনপতি। কিছু মনে ক'রো না যেন। আমি চলি। তোমার না জানি খাওয়ার কত কষ্টই আজ হ'ল!

আমি বললেম, কষ্ট কিছুই হয় নি। তবু আপনাদের মুখে এ সব কথা শুনতেও বড় ভাল লাগে মাসীমা। আর আজ খাইয়ে তৃপ্তি যদি না পেয়ে থাকেন তো ভাল ক'রে না হয় খাওয়াবেন আর একদিন।

সৌদামিনী মাসী বললেন, খাওয়াব বইকি, নিশ্চয় খাওয়াব। কিন্তু তার আগে রাহুলকে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তোল বাছা। পাড়ার লোকে এমনিতেই সাত কথা বলবে। বোঝ তো সব?

অভয় দিয়ে মাসীকে গড়াতে পাঠিয়ে দিলেম। বললেম, সব বুঝি মাসীমা। ভাববেন না আপনি।

গড়াতে চ'লে গেলেন সৌদামিনী দেবী—ভাবনায় না নির্ভাবনায় জানি নে। পাঠশালায় (?)-পড়া সেকেলে মাকে এম.এ.-পড়ুয়া একেলে মেয়ের মনের হেঁয়ালি বোঝানোর চেষ্টা করার চাইতে না-করা ভাল।

ওদিকে দখিনা বারান্দায় অতুল চম্পটীর সঙ্গে বৈষয়িক কথা কইছেন দিবাকর দালাল। দখিনা হাওয়ায় কথার টুকরো ভেসে এসে কানের পর্দায় দোলা দিচ্ছে। কোথায় কোথায় জলের দরে জমি, বাড়ি ইত্যাদি অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি হবে, তার ফিরিস্তি শোনাচ্ছে চম্পটী। এ সব খবর সে রাখে শকুনের ভাগাড়ের খবরের মত। কোথাও কার ঐশ্বর্য নীলেমে উঠলে পরম খুশি, একের সর্বনাশ না হ'লে আর একের পৌষ মাস হবে কি ক'রে? জলের দামে কেনা, আর বিলিতী মদের দামে বেচা—এই তো ব্যবসা হুজুর।—বলে অতুল চম্পটী। ব্যাঙ্ক ডুবনোর আগে

থেকেই এ ব্যবসায় হাত দিয়েছেন দিবাকর দালাল। দু তরফ থেকেই কায়দা ক'রে দালালি হাতাচ্ছে অতুল চম্পটী।

এদিকে আর এক মাত্রা সাদা গুঁড়ো রাহুলকে খাইয়ে দিলে দময়ন্তী ডাক্তার। কপালে হাত ছুঁইয়ে বললে, এখন অনেক ভাল বোধ করছেন আপনি। অদ্ভুত অন্তরযামিনী ডাক্তার দময়ন্তী। রাহুল বললে, হ্যাঁ।

চেয়ারে ব'সে ব'সে কেমন একটি অতীন্দ্রিয় ভাব অনুভব করলেম। মনে হ'ল, সময়ের গতি হয়েছে স্তিমিত মন্থর, তারই সঙ্গে আমিও ঝিমুচ্ছি। ঘরের কথা, বাইরের কথা একই সঙ্গে কানের দুয়ারে এসে টোকা দিয়ে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ বুঝি বা ঘুমিয়ে ছিলেম, সহসা হুঁশ ফিরে এল কবি রাহুলের ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জাচ্ছন্ন মৃদু আবৃত্তি শুনে :

"যাহাদের তুমি যাও নাই লিখে;
হে কবি, তাহারা কোথায় কাঁদিয়া ফেরে
আমি তাহাদের কাঁদন শুনিতে কান পেতে পেতে রাখি।
তুমি যাহাদের হয়তো ডাকিতে,
যাহাদের ছবি কথায় আঁকিতে
আমি তাহাদের 'আয়' 'আয়' ব'লে দু হাত বাড়ায়ে ডাকি।
তুমি তাহাদের যাও নাই ডেকে, সেই অভিমানে তারা
মোরে কি দেবে না সাড়া ?"

এ আমার রবীন্দ্রনাথের অলিখিত কবিতাদের উদ্দেশে লেখা দময়ন্তী দেবী।—শুনলেম বললে রাহুল, আমার কি মনে হয় জানেন ? যদি শুনে না হাসেন তো বলি।

বলুন।—বললে দময়ন্তী দালাল। মিঠে গজল গানের মত সজল সুরে বললে, বলুন। দময়ন্তী দালাল কবিতা লেখে না, কবিতা পড়ে, পড়তে ভালবাসে ব'লে। কোমর বেঁধে 'একেলে' হবার জন্যে যারা 'একেলে' কবিতা লেখে—একেলে হবার দুরন্ত নেশা যাদের কবিত্বকে জাঁতায় পিষে ক'রে ফেলেছে অবোধ্য কাঠখোট্টা—তাদের কবিতা-ছাপমারা রচনায় রুচি নেই দময়ন্তীর। টি. এস. এলিঅটের বেসুরো বেছন্দ কবিতাগুলো

যতনে বাছাই ক'রে ক'রে অধিক প'ড়ে আর ততোধিক না বুঝে উচ্ছ্বাস-বিগলিত হয়ে যাঁরা উচ্চৈঃস্বরে ভাবেন—কালচারের চরম চূড়ায় চড়া হ'ল, তাঁদের এড়িয়ে চলে দময়ন্তী।

একদিন স্বপ্নে দেখেছিলেম রবীন্দ্রনাথকে।—বললে প্রলাপী সুরে রাহুল রায়, তাঁর মহাপ্রয়াণের অনেক দিন পরে। যেন কবিতা লিখছি ব'সে ব'সে; হঠাৎ চোখ তুলে দেখি, সামনে টেবিলের ওপর ব'সে আছেন কবিগুরু।

এপার ওপারের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে কবিগুরুর মনে এসেছিল কবিতার মালা। কিন্তু হায়, তখন চোখের দৃষ্টি গেছে হারিয়ে, মুখের বাণী বন্ধ, দেহ নিস্পন্দ—সে কবিতাকে লেখার বন্ধনে বন্দী করার কোন উপায় নেই। নিরুপায় কবি বিফল কামনা নিয়েই চ'লে গেলেন ওপারে। তাই স্বপ্নে এসে বললেন রাহুলকে, আমার সেই অলিখিত কবিতাগুলো ব'লে যাই, তুই লিখে রাখ্ রাহুল। ৺গুরুদেব আবৃত্তি ক'রে গেলেন। দ্রুতবেগে লিখে ফেললে রাহুল। আশ্চর্য তারা, অনির্বচনীয় তারা। তুলনা মেলে না তাদের। স্বপ্নেই শুনে মুগ্ধ হ'ল রাহুল। তারপর ভেঙে গেল স্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে কবিতাগুলোও গেল হারিয়ে। একটি লাইনও আর মনে পড়ল না রাহুলের।

সেই অলিখিত কবিতাগুলোই শূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে দময়ন্তী দেবী।—বললে রাহুল রায়, তাদেরই ধরবার জন্যে কান পেতে রেখেছি আমি। হয়তো ৺গুরুদেব যেখানে ছেড়ে দিয়ে গেছেন সেখান থেকেই আমাকে খেই ধরতে হবে—এই কথাই বোঝাতে এসেছিলেন ৺গুরুদেব।

বোধ হয় তাই।—বললে দময়ন্তী দালাল খোকা-ভুলানো সুরে আর ছন্দে। যেন স্বপ্নে ৺রবি ঠাকুর তাঁর বাকি প্রতিভাটুকু উইল ক'রে দিয়ে গেছেন গ্যারেজ-শিরোবর্তী খুপরির কেরানী কবি রাহুল রায়কে।

ওদিকে বারান্দায় দিবাকর দালাল বললেন অতুল চম্পটীকে, এই যে ভুজঙ্গের খাস কেরানী ছোকরা রাহুল ঘুরে ফিরে হ'ল আমারই ভাড়াটে—এ বিধাতারই একটা ইঙ্গিত। ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা হ'ল ছোকরার, এল আমারই

বাড়ির আশ্রয়ে। এও আর এক ইঙ্গিত। আজ ভুজঙ্গের খাস কেরানী, কাল ভুজঙ্গ। এ আমি হইয়ে ছাড়ব, দেখে নিয়ো চম্পটী।

বুঝলেম না ইঙ্গিতে কি বোঝাতে চাইছেন দিবাকর দালাল। এইটুকু শুধু আন্দাজ ক'রে নিলেম, ভুজঙ্গকে তিনি একবার দেখে নেবেন আর এই দেখে নেবার ব্যাপারে হয়তো রাহুল রায়কে তাঁর প্রত্যক্ষ না হ'লেও পরোক্ষভাবে পরম প্রয়োজন।

অতুল চম্পটী বললে, আজ্ঞে, তা তো বটেই। ভুজঙ্গ চৌধুরী দেবতুল্য লোক বটে, কিন্তু দেবতাদের সোমরস পান ওর পিপে-সাবাড়ের কাছে ছেলেমানুষ। মদের চৌবাচ্চায় দিনরাত ডুবে থাকতে পারলে বেঁচে যান, নেহাত কারবারটা একটু আধটু দেখতেই হয় তাই পারেন না। আপিসে মাঝে মাঝে বোতল খালি করতেন, কিন্তু নতুন মেয়ে-সেক্রেটারিটি আসবার পর থেকে আপিসে আর বোতল আসে না। চক্ষুলজ্জা হয় বোধ করি।

চৌধুরীদের চক্ষুলজ্জা? তুমি হাসালে হে চম্পটী।

আজ্ঞে, তা হ'লে হয়তো অন্য কিছু হবে। কিন্তু পটিয়েছি ভুজঙ্গ চৌধুরীকে। আপনি হুজুর আপনার বাগান-বাড়ি দেড় লাখের কমে ছাড়বেন না—ব'লে গুম হয়ে থাকবেন। আমি ব'লে ক'য়ে আপনাকে সওয়া লাখে রাজী করাব, ওই সওয়া লাখেই ঝেড়ে দেবেন আপনি। ভুজঙ্গ চৌধুরীকে যা ভজিয়েছি সওয়া লাখ হেসে খেলে দিয়ে দিবেন উনি। দু-দশ লাখকে ওঁরা টাকা ব'লেই গেরাহ্যি করেন না হুজুর।

মন দিয়ে শুনতে পেলেম, মনে মনে হিসেব কষছেন দিবাকর দালাল। মাত্র দশ হাজার দিয়ে কিনেছিলেন দামী বাগান-বাড়ি, তারপর খুব বেশি হ'লে দু হাজার টাকা খরচা হয়েছে এর পেছনে। মোট বারো হাজার। সওয়া লাখে বেচে দিলে চম্পটীর দালালি দিয়েও লাখ টাকার ওপর থেকে যায়। বাঃ!

ডুবেছে ৺ গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ক। কিন্তু বিভিন্ন পোক্ত ব্যাঙ্কে মোটা টাকা জমেছে দিবাকর দালালের স্বনামে ও বেনামে। কেনা আছে

বিভিন্ন জায়গায় অনেক জমি আর একাধিক বাড়ি। ঘরে জমেছে প্রচুর জড়োয়া বে-জড়োয়া অলঙ্কার।

তবু সেই পুরাতন দুহাত-ফেরা অষ্টিন গাড়ি চড়েন দিবাকর দালাল, যাঁর আছে ঢের দামী নতুন গাড়ি কেনবার টাকা। পুরনো গাড়ি যেখানে দৈন্যের বিজ্ঞাপন নয়, বরং কৃপণ-কুবেরত্বের জয়ঢাক, সেখানে ঝরঝরে নড়বড়ে গাড়ি চ'ড়েও আছে এক অভিনব আভিজাত্যের লোক-দেখানো বাহাদুরী আনন্দ।

দুনিয়ায় বাঁচার মত বেঁচে যেতে হ'লে, বুঝলে চম্পটী, চরিত্তিরটি ঠিক রাখতে হবে।—বলতে লাগলেন দিবাকর দালাল, দুটি জিনিস সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার—মদ আর—

ও আর আমাকে বলতে হবে না হুজুর। হা বলতেই হাওড়া বুঝে নিয়েছি।—বললে অতুল চম্পটী, চরিত্তিরটি হুজুর বজায় রেখে এসেছি, রেখেও যাব। জাহান্নামের রাস্তা ধরাই, কিন্তু নিজে ধরি নে। পচা-সন্দেশের ময়রা কি আর নিজের পচা সন্দেশ গেলে হুজুর? তবে এও আপনাকে ব'লে রাখি, বুড়ো অনঙ্গ চৌধুরী ম'রে মাথার ওপর থেকে স'রে গেলে পর চৌধুরী-বাড়ির ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়বে ভুজঙ্গ চৌধুরী স্রেফ কাপ্তানি ক'রে। বড় চৌধুরীর অবস্থাও কাহিল—এখন যান, তখন যান। কিন্তু আসল ভয় কাকে জানেন হুজুর? ওই নতুন সেক্রেটারিটিকে। যার নাম সানন্দা সান্যাল। নামের বাহারখানা দেখুন একবার। ওই মেয়েটাকে দেখছি ভুজঙ্গ চৌধুরী বেশ একটু ভয় করেন, অথচ ভয় যে করেন সেটা বোঝেনও না, স্বীকারও করেন না।

ভয় করে, অথচ টের পায় না—এ যে হেঁয়ালির কথা বলছ হে অতুল!

আজ্ঞে, হেঁয়ালি ব'লেই তো ভাবনার কথা। ব্যাপারটা সাদাসিধে হ'লে আর ভাবছি কেন? ভুজঙ্গ চৌধুরীকে আপনার বাগান-বাড়ি দেখাবার ব্যাপারটাও গোপনে সারতে হবে—ওই সানন্দা মেয়েটা টের না পায়। টের পেলে বাগড়া দিতে পারে। বড় জাঁদরেল বেয়াড়া মেয়ে হুজুর। আমার ভাগ্নীগুলোর মত ভালমানুষ নয়।

ভাগ্নী, মানে "দূর সম্পর্কে"র (!) ভাগ্নী প্রাইভেট-সেক্রেটারি-সরবরাহ-

বিশারদ অতুল চম্পটীর। দিবাকর দালাল জানেন বোঝেন, ভান করেন না-জানা না-বোঝার।

তা হ'লে গোড়াতেই ভুজঙ্গকে বাগান-বাড়িটা দেখাবার ব্যবস্থা কর চম্পটী।—বললেন দিবাকর দালাল, ওর সানন্দা সেক্রেটারিটি যেন টের না পায়। মেয়েটা নির্ঘাত ভুজঙ্গকে বাগাবার তালে আছে, তাই তাকে চারদিক থেকে ছাড়িয়ে গুটিয়ে আনবার চেষ্টা করছে। যাক, আজ তো তোমাতে আমাতে বাগান-বাড়িটাকে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে আসা গেল, দেখে ভুজঙ্গের পছন্দ না হয়ে যায় না। কালই তাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর। দেখানোটা তুমিই সার, মালীকে তো ব'লেই দিয়েছি। তারপর ভুজঙ্গকে নিয়ে এস, এখানেই কথাবার্ত্তা হবে।

চম্পটী বললে, তা বেশ। বোঝা গেল, দিবাকর দালালের মেজাজ সে পত্রপাঠ বুঝে নিতে পেরেছে।

খুশির একটা অস্ফুট আওয়াজ করলেন দিবাকর দালাল এই ভেবে যে, চৌধুরীকেই আসতে হচ্ছে দালালের গৃহে, চৌধুরীর কাছে যাচ্ছে না দালাল। তারপর চোখ বুজে যাক চিরঘুমে অনঙ্গ চৌধুরীর, স'রে যাক ভুজঙ্গের জাহান্নামে যাবার রাস্তা থেকে এই বুড়ো বাধা। পরে একদিন এই ভুজঙ্গের কাছ থেকেই এই বাগান-বাড়ি আবার জলের দামে কিনে নেবেন দিবাকর দালাল। তারপর ঘুঘু চরবে ভুজঙ্গের পৈতৃক ভবনের ছাতে, চৌধুরী-ভবনও জলের দামে কিনে দিয়ে দালাল-ভবনে পরিণত করবেন দিবাকর দালাল।

৺গ্রেট এশিয়াটিক ব্যাঙ্ককে বাঁচাবার জন্যে মাত্র কয়েক লাখ টাকা নিয়ে এগিয়ে আসতে রাজী হয় নি অনঙ্গ আর ভুজঙ্গ চৌধুরী, দিবাকরের আপন মুখের জোরালো অনুরোধ সত্ত্বেও—বাঁকা উক্তি ক'রে বিদ্রূপের হাসি হেসেছে। চৌধুরীদের সে দম্ভ, সে অপরাধ ক্ষমা করবে না, করবে না, করবে না দিবাকর দালাল।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

# প্রক্ষিপ্ত

সবারই হয় কিনা জানি না, তবে আমার নিজের যে এমনটা ঘ'টে থাকে তা জানি—এই মনে রাখার কথা বলছি। কাজের কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা ক'রেও ভুলে যাই, আবার এমনি অনেক আজেবাজে কথা আছে, যা নাকি তুচ্ছ এবং আমার জীবনের সঙ্গে তার যোগও বিশেষ কিছু নেই, তবু কি ক'রে যে মনে র'য়ে গিয়েছে, বুঝতে পারি না।

আজকের ব্যাপারটাও তেমনি তুচ্ছ। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দূরের গলিটার দিকে চেয়ে মনে প'ড়ে গেল একটি মেয়েকে। পাশেই হেমেনবাবু, গুণ্ডিপানের আশা নিয়ে উড়িয়া পানওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ওঁকে বললাম, আপনি তো এ পাড়াতেই থাকেন, আচ্ছা, সেই মেয়েটিকে চেনেন?

উনি প্রশ্ন করলেন, অনেক মেয়েকেই চিনি। তবে আপনি কার কথা বলছেন, কি নাম?

নাম? নাম তো জানি নে।

তা হ'লে? কেমন দেখতে, কোন্ বাড়িতে থাকে—?

দেখতে কেমন তাও ঠিক মনে পড়ছে না। তবে সে গান্ধীটুপি পরত।

গান্ধীটুপি-পরা মেয়ে কি রকম ব্যাপার? না মশাই, এ পাড়াতে তেমন পাগল তো কেউ নেই।

না, না, ঠিক এ পাড়ারই যে মেয়ে তা হলপ ক'রে বলতে পারি না। তবে এই গলি দিয়েই চলা-ফেরা করত। অবিশ্যি, তার পর আর আমিও তাকে দেখি নি।

হেমেনবাবু খানিকটা চুন মুখে পুরে দিয়ে ভারী গলায় বললেন, কিসের পর?

আমিও তখন এ পাড়াতে আড্ডা দিতে আসতাম। রোজ বিকেলে গান্ধীটুপি-পরা মেয়েটি গলি দিয়ে যেত। ওকে নিয়ে অনেকেই বিস্তর গবেষণা করত। কেউ বলত, গান্ধীজীর চ্যালা। কেউ বা বলত, ওটা এক রকমের চালবাজি। রোজই বিকেলে এই মেয়েটি চ'লে যাবার পর

ওকে নিয়ে একতরফা আলোচনা হ'ত। শেষে একদিন নিমাই বললে, ওর টুপিটা লোপাট ক'রে দিতে হবে। আমাদের নাকের ডগা দিয়ে এ রকম অহিংসা প্রচার করা কিছুতেই চলবে না। নিমাইয়ের কথায় আর কাজে আদৌ ফারাক ছিল না, রায়টের সময় সে বিস্তর সাহসের পরিচয় দিয়েছে। অতএব নিমাই যে মেয়েটির টুপি কেড়ে নেবেই তা আমরা বুঝলাম। এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কোথায় কালো সর্পিল বেণী, আর কোথায় সাদা খদ্দরের খস্‌খসে টুপি! তা ব্যাপারটা মন্দও দাঁড়াবে না। মেয়েটা তো জব্দ হবে!

হেমেনবাবু পানের পিচ ফেলে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তার পর?

তার পর, নিমাই তো চিলের মত ছোঁ দিয়ে টুপিটা নিয়ে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু আমরা আর মুখ তুলতে পারলাম না।

কেন?

মেয়েটির মাথায় একগাছিও চুল নেই। কি লজ্জায়ই যে পড়েছিলাম, তা আর কি বলব মশাই!

মেয়েটা কি করলে?

মুখ তুললে না, চোখ তুলে বা ঘাড় বাঁকিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেও না। যেমন যাচ্ছিল তেমনিই চ'লে গেল। সেই শেষ, তার পর আর কোনদিন তাকে এ পথে যেতে দেখি নি। কিন্তু তার পর যতবারই এখানে এসেছি, ততবারই সেই দিনের ছবিটা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। আজও—

হেমেনবাবু বললেন একটুখানি চুপ ক'রে থেকে, অমন হয়। প্রত্যেকেরই জীবনে এ রকম প্রক্ষিপ্ত পঞ্জিকা থাকে মশাই।

একটু অবাক দৃষ্টিতে হেমেনবাবুর মুখের দিকে তাকালাম।

উনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, বললেন, একটু চা চলবে নাকি?

এই গ্রীষ্মের দুপুরে চা?

মন্দ কি! আমারও একটা কথা মনে প'ড়ে গেল আপনার কথায়—

তা আপনার গল্প তো ট্রামে ব'সেও হতে পারে।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। ট্রেনের গল্প ট্রামে বাসে জমা উচিত। অবিশ্যি

এমনটা আগে বলতে পারতাম না। মনে হয়েছিল তখন যে, এ কথাটা ভুলে যেতে হবে, স্রেফ মুছে ফেলতে হবে মন থেকে। কিন্তু পারি নি।

তবে তো সামান্য কথা নয় মশাই।

না, কথাটা সামান্য কি মহামান্য তা ওজন ক'রে দেখি নি। তবে তার আগে সবটুকু শুনিয়ে দিই, ল্যাঠা চুকে যাক,—ওজন করতে হয় আপনার মনের পাল্লায় চড়িয়ে দেখবেন।

বেশ।

আর একটা কথা। আপনি যা-ই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, তা আমাকে শোনাতে পারবেন না।

উত্তম।

আজ থেকে প্রায় আঠারো-উনিশ বছর আগের ঘটনা। আমি তখন ধানবাদ মাইনিং স্কুলে পড়ি। পূজোর ছুটি চুকিয়ে কলকাতা থেকে ধানবাদে ফিরছি। দুই বন্ধু—আমি আর শ্যামাদাস। শ্যামাদাস বেশ চট্‌পটে ফুর্তিবাজ ছেলে। গাড়িটা যতদূর মনে পড়ছে সাড়ে নটা কি দশটায় হাওড়া ছাড়ে। শ্যামাদাস খুব তাড়াহুড়ো ক'রে রাত আটটায় হাওড়াতে হাজির হ'ল। বললে, একটু হিসেবনিকেশ ক'রে পথ চলা দরকার। অর্থাৎ আমরা যাব থার্ড ক্লাসেই, আর ওরই মধ্যে জায়গাটা একটু বেছে-কুছে বসতে হবে। আমাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে শ্যামাদাস ট্রেনখানা দেখতে চ'লে গেল। মিনিট পঁচিশ পরে ফিরল। ওর মুখ-চোখ বেশ চক্‌চকে। বললে, চ, খাশা সীট রিজার্ভ করেছি। মাইরি, খুব আরামে দেখতে দেখতে যাওয়া চলবে। শ্যামাদাসকে আমি পছন্দ করি, তার কারণ আমি যা করতে চাই অথচ সঙ্কোচের জন্যে পেরে উঠি না, শ্যামাদাস বেপরোয়া তাই ক'রে বসে। আমার মত অক্ষমের চোখে শ্যামাদাস হচ্ছে নায়ক। অর্থাৎ আমি যা হতে চাই, শ্যামাদাস তা হয়ে ব'সে আছে।

আসনটা সত্যিই লোভনীয়। আমাদের সামনের সীটে আমাদের সমবয়স্ক একটি ঢ্যাঙা ছোকরা আর তার সঙ্গে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে। দেখলেই বোঝা যায় দুই ভাই বোন। মেয়েটিকে দেখে মানতে বাধ্য হলাম, শ্যামাদাসের নজরে রুচি আছে।

কিন্তু আমার দৌড় ওই পর্যন্তই। আমার কানের পাশ থেকে ঘাড়ের লতা পর্যন্ত কে সাঁড়াশি দিয়ে টিপে ধরল। গাড়িতে মেয়েটির সামনে ব'সে লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। ওই যে ওঠবার সময় একনজর দেখে নিয়েছি, বাস্, তার পর আর মেয়েটির দিকে তাকাতে ভরসা নেই। শুধুই আপন মনে সেই একবার-দেখা চেহারাটা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি। না, ঠিক তাও নয়, নতুন ক'রে দেখবার জন্যে উসখুস করছি।

ওদিকে শ্যামাদাস ঝট্ ক'রে পকেট থেকে সিগারেটের আস্ত টিন বার করলে। তারপর টিন কেটে আমার দিকে একটা ছুঁড়ে দিয়ে, সামনের বেঞ্চে ছেলেটির দিকে টিনটা এগিয়ে দিয়ে বললে, আসুন দাদা।

ছেলেটি হাতজোড় ক'রে বললে, ধন্যবাদ। আমি খাই না।

আরে, নিন না একটা। ট্রেনে উঠেছেন, এখন কি মাটির নিয়ম খাটে?

ছোকরা বিব্রতভাবে বোনের দিকে তাকিয়ে বললে, অবিশ্যি আপনি বলছেন—নইলে সত্যি আমি খাই নে।

শ্যামাদাস নিজের ঠোঁটে একটা গোল্ডফ্লেক লট্‌কে দিয়ে প্রশ্ন করলে, কতদূর যাওয়া হবে?

ছেলেটি বেশ বিনয়ী, বললে, গয়া যাচ্ছি, বাবা ওখানকার এক স্কুলের হেডমাস্টার।

তাই নাকি! খুব মজা তো!

মজাটা যে কি, আমি বুঝলাম না। এখনও ট্রেন ছাড়ে নি, এর মধ্যেই শ্যামাদাস যেন একটু বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছে।

তবে সিগারেটের মাধ্যমে এমন কিছু এগুলো না। বর্ধমানের আগেই মস্ত টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে দুই ভাই-বোনে আহারের আয়োজন শুরু করলে। লুচি, আলু-চচ্চড়ি, সন্দেশ। শ্যামাদাস বিরস মুখে জানলার বাইরে রাত্রির সৌন্দর্য দেখতে ব্যস্ত। এক ফাঁকে আমাকে বললে, মেয়েটা মহাগণ্ড রে হেমেন। কিছুতেই পাত্তা দিচ্ছে না।

আমার কি খেয়াল হ'ল, হঠাৎ বেশ জোর গলায় ব'লে ফেললাম, বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের সঙ্গে জল আছে ?

ছোকরা রীতিমত ব্যস্ত হয়ে বললে, মাপ করবেন, আপনারাও আসুন না, একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা যাক। শুধু জল কি দেওয়া যায় ?

গম্ভীরভাবে জবাব দিলাম, না না, কিছু নয়—একটু জল পেলেই হবে। আমরা খাওয়া-দাওয়া ক'রেই বেরিয়েছি।

তা হোক, সে অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ট্রেনে উঠলেই সব হজম হয়ে যায়। এই তো, দেখুন না, আমরাও মামার বাড়ি থেকে খেয়েই বেরিয়েছি। তা মামীমা শুনলেন না—এত খাবার এখন কি হবে! নিন, হাত লাগান।

আমি হাঁ-না কিছু বলবার আগেই শ্যামাদাস খেতে শুরু ক'রে দিলে। এই সুযোগে সে গল্পের কলকে আদায় ক'রে ফেললে। আমি আর কি করি, গোটা দুই সন্দেশ নিঃশব্দে শেষ ক'রে জল খেলাম। হাই উঠছে, ঘুমও পাচ্ছে। ছোকরা বেশ মিশুকে, এর মধ্যে নিজের নামটিও ব'লে দিয়েছে—বিমল চট্টোপাধ্যায়। আমার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তেমন জমল না—ঘুম পাচ্ছে কিনা!

আমার অবস্থা দেখে বিমল বললে, তাই তো, আপনাদের সঙ্গে তো বিছানাপত্র কিছু নেই। তা এক কাজ করুন, আপনি বরং এ ধারে এসে শুয়ে পড়ুন, আমার বালিশে। আমি আপনার জায়গায় ব'সে শ্যামবাবুর সঙ্গে গল্প করি—ট্রেনে উঠলে আমার ঘুম হয় না।

একটু অস্বস্তি হচ্ছে। ওদিকে ততক্ষণে মেয়েটি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে। তার ঠিক মাথার কাছে আমার মাথা রেখে শোয়াটা কেমন হবে! কিন্তু শ্যামাদাস আর বিমল দুজনে মিলে কতকটা জোর ক'রে আমাকে শুইয়ে দিলে। যখন শুলাম, তখন দু চোখ ঘুমে বুজে আসছিল। কিন্তু বলব কি মশাই, শোবার পর আর কিছুতেই ঘুম আসে না। কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। চোখ বুজে শুয়ে আছি।

সুগন্ধ-তেল-মাখা চুলের সৌরভে আমার মাথাটা ঝিম্-ঝিম্ করছে। শ্যামাদাস আর বিমলের কথার টুকরো কানে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মগজে পৌঁছচ্ছে না। আমি যেন একটা আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছি।

ওদিকে শ্যামাদাসদের অঞ্চল থেকে কথার ফুলকি আসা বন্ধ হয়েছে। মিটমিট চোখে দেখলাম, ওরা দুজনে জানলায় ঠেস দিয়ে ঘুমোচ্ছে।

আরও খানিকটা সময় কাটল। ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি। এমন সময়ে একখানি হাত এসে পড়ল আমার মাথা ছাড়িয়ে কপালের ওপর। একবার ভাবলাম, সরিয়ে দিই হাতখানা। কিন্তু নরম হাতের স্পর্শ কখনও পাই নি। ভাল লাগছে বেশ। তবু ভয় আছে, শ্যামাদাস যদি দেখতে পায়! কিংবা, বিমল! আবার মনে হ'ল, আমার ভাবনা নেই—আমি তো ঘুমুচ্ছি।

বুঝতে পারলাম, আমার মাথার ও-পাশের প্রাণীটিও ঠিক নিদ্রিত নয়। একটা চাপা জাগৃতির ছায়া, যা শুধু মন দিয়েই অনুভব করা যায় তেমনি আর কি—বেশ টের পাচ্ছি।

ভাল লাগছে। এক সময়ে আমারও একটি হাত গিয়ে পড়ল বালিশ ডিঙিয়ে ওপারের সেই চুলের অরণ্যে। বাধা আসা দূরের কথা, আমার কপালের ওপরে হাতখানা নড়াচড়া করছে। আর একবার দেখে নিলাম, নাঃ, সবাই ঘুমোচ্ছে। ও-পাশের হিন্দুস্থানী যাত্রীদের নাক ডাকছে। জেগে আছে দুখানি হাত।

তখন বয়স ছিল অল্প, চোখে রঙের মায়া-কাজল। ভাবলাম, পেয়েছি জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। আশ্চর্য, এমন অযাচিতভাবে পাব, তা কি ভেবেছিলাম! সেদিনের দুঃসাহস আমার নয়—সেটা নিশ্চয় যৌবনের, তারুণ্যের সহজাত একটা কিছু।

একটি-দুটি কথা—ঘুম আসছে না, কেন বলুন তো?

মেয়েটি হাতখানা সরিয়ে নিয়ে সটান উঠে বসল। বললে, আমারও না।

আমিও বসলাম। শ্যামাদাস বিমল দিব্যি ঘুমুচ্ছে।

পাশাপাশি দুজনে ব'সে, গায়ে গা ঠেকছে, চোখের কোণে হাসি আর

একটা থরথর কাঁপুনিতে আমার শরীরটা দুলছে। কি কথা বলছি, মেয়েটিই বা কি বলছে ঠিক যেন বুঝতে পারছি না। বাইরে জ্যোৎস্না। হু-হু বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। কতবার ওর হাত দুখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম। ও শুধু আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। ওরও হাত কাঁপছে, হয়তো আমার চেয়ে বেশি কাঁপছে। ঘন ঘন নিশ্বাস—হ্রস্ব-দীর্ঘ।

আসানসোল পেরিয়ে গেল। আমাদের জীবন যেন নিঃশেষ হয়ে আসছে। চোখে চোখ রেখে চুপ ক'রে ব'সে থাকাটা যে নেহাতই নির্বোধের কাজ, তখন কি তা জানতুম! তখন মনে হয়েছিল, এর চেয়ে বড় পাওয়া বুঝি আর নেই—জীবন সার্থক।

পাশের রেল-লাইনে চাঁদের আলো ঠিকরে প'ড়ে চকচক করছে। মেয়েটি আমার কালো রোমশ হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কোন কথাই বললে না—এক ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু উপহার দিলে। ওর দু চোখের টলটলে অশ্রুতে আমার মন যেন ডুকরে উঠল। আস্তে আস্তে মুছিয়ে দিলাম, বললাম, ছিঃ, কাঁদে না।

গাড়ির গতিবেগ ক'মে এল। ও আমার দিকে তাকিয়ে কিছু কি বললে? কি বললে! থামল গাড়ি। তাড়াতাড়ি ও উঠে প'ড়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে, মুখে হাসি টেনে আমার দিকে চাইলে। তার পরই বিমলকে ধাক্কা দিয়ে তুললে—দাদা, ও দাদা, ওঠ।

ওর ডাকাডাকিতে শ্যামাদাস চোখ রগড়ে উঠে বসল। আমি বললাম, চল, এবার নামতে হবে।

বিমল ঘুম চোখে বললে, কি চ্যাচামেচি করছিস?

ও বললে, আঃ, ওঠ না, এঁরা চ'লে যাচ্ছেন যে!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো।—ব'লে বিমল দাঁড়িয়ে দু হাত দু দিকে মেলে আলস্য কাটিয়ে নিল।—আপনাদের সঙ্গে বেশ সময়টা কেটে গেল। এখন আর ভাল লাগবে না। আমাদের এখন শাস্তি শুরু হ'ল। এবার যখন কলকাতায় আসব, তখন দেখা করব।

আমাদের সঙ্গে কিচ্ছু নেই। শুধু হাতেই গাড়ি থেকে নামলাম।

প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিয়েও এতটুকু নড়তে পারি নি। গাড়ি ছাড়ল। হাত নেড়ে রুমাল উড়িয়ে শ্যামাদাস শেষ কর্তব্য পালন করলে। আমি যেন অবশ হয়ে গেছি। গাড়িখানা ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের বাতি পেরিয়ে যাবার পর শ্যামাদাস বললে, চল্।

সেকেণ্ড-ক্লাস ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দুখানা ঈজি-চেয়ার দখল ক'রে বাকি রাতের ঘুমটা সেরে নেওয়াই আমাদের নিয়ম। সকাল হ'লে হস্টেলে যাব।

শ্যামাদাসের তো ইচ্ছা-ঘুম। আমার জাগরণে এতটুকু ক্লান্তি নেই আজ, অথচ আদৌ রাতজাগা আমার প্রকৃতি নয়।

এলোমেলো চিন্তার ছবিতে আমার বাকি রাতটা ভ'রে গেল।

হস্টেলে ফিরলাম, মনটা খুব ভার।

সেদিন মেঘলা আকাশে সূর্য ওঠে নি।

কারুর সঙ্গে কোন কথা বলতে পারলাম না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে যেন দুনিয়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাঁচলাম। খোলা জানলায় চোখের সামনে বৃষ্টি নামতে দেখে অহেতুক আনন্দ। দূরের পাহাড় বৃষ্টিধারায় ঝাপসা, অবলুপ্ত। কাছাকাছি উঁচু নীচু চষা-ক্ষেতে জল জ'মে থৈ-থৈ করছে। আমি যেন রেলের কামরাতে মেয়েটির মুখোমুখি ব'সে আছি। গাড়ি চলছে হু-হু বেগে। যে কথাটা মুখোমুখি ব'সে, চোখের পানে তাকিয়ে বলতে পারি নি, সেই কথাটাই একা-ঘরে বৃষ্টি-মুখর দিনের কানে চুপি চুপি বললাম। কতবার বললাম। নিশ্চয় ও শুনেছে। শুনতে পেয়েছে কি ও!

এক-একবার নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে—কেন সাহস হ'ল না মনের কথাটা খুলে বলতে? কেন বলতে পারলাম না যে, তুমি যা শুনতে চাইছ, তা সত্যি। সত্যি আমি—

দরজা খুলব না। দুনিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই আমার। এই একলাই বেশ আছি। যদি কখনও দরজা খুলি, তবে সোজা ট্রেনে উঠে গয়া চ'লে যাব। বাইরে বৃষ্টি ঝরছে—ঝম-ঝম-ঝম। মেঘ গর্জন করছে, গুরুগর্জনে আকাশ কি কেঁপে উঠছে!

আমি চিঠি লিখব ওকে। মনে হচ্ছে, নইলে বুঝি ভেবে ভেবেই দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাব। আগেই ওকে লিখব—না, সেটা ভাল দেখায় না। প্রথমে বিমলকেই লিখি, তার পর—

এই পর্যন্ত ব'লে হেমেনদা থেমে গেলেন।

আমি বললাম, কি হ'ল ?

এবার নামতে হবে না ?

কিন্তু আপনার কথা তো শেষ হ'ল না ?

আমি যেন একটু ক্যারেড হয়ে গিয়েছিলাম, না! কিন্তু বিশ্বাস করুন, আজ ওটা শুধু ছবি হয়েই মাঝে মাঝে মনে জাগে, কোন ফিলিং নেই ভাই।

আমি বললাম, এই দেখুন, গল্প থেকে তত্ত্বে চ'লে যাচ্ছেন। ট্রামটা নয় এস্‌প্ল্যানেডে চলুক, সেখান থেকে আবার ফিরে আসা যাবে।

হেমেনদা যেন এই কথাই শুনতে চাইছিলেন। উনি বিনা ভূমিকায় শুরু করলেন, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই মাইনিং-ইঞ্জিনিয়ারিং-পড়ুয়া গদ্য-ছেলেটি কবি হয়ে গেল। অনায়াসে দুনিয়ার সব কিছুকে 'দুত্তোর' ব'লে উড়িয়ে দিয়ে সেই দুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে সারাটা জীবন বইয়ে দেবার সংকল্প ক'রে ফেললে। কল্পনায় রোমান্সে মেজাজ মশগুল।

এমন সময় দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা। যেন টিনের চালাতে শিলাবৃষ্টি। বিরক্ত অপ্রসন্ন ভাবে চুপ ক'রে রইলাম। কিন্তু ধাক্কার প্রচণ্ড শব্দে বাড়ির দেয়াল কাঁপছে যে! আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দোর খুলে দিলাম।

এ কি! সমস্ত হস্টেলের ছেলেরা আমার ঘরের বারান্দায় ভিড় জমিয়ে কল-কল করছে!

হঠাৎ মহাদেবপ্রসাদ আমার ডান হাতখানায় ঝাঁকানি দিতে দিতে হাসি মুখে বললে, কন্‌গ্রাচুলেসন্‌স্! সাবাস ব্রাদার। তোমার বিজয়-উৎসব আজ আমাদের হস্টেলে হবে, আজ তুমি ইউ. পি. মেসের অতিথি। চল এখুনি, আমাদের ওখানে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা।

আমাদের মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত

ছিল খুব। প্রত্যেক ছাত্রের জন্যে একখানা পৃথক ঘর। আর এক-এক প্রদেশের ছাত্রদের রান্নার জন্যে এক-এক রকম ব্যবস্থা। সে সময়ে বার্মা সিলোন থেকেও এখানে ছাত্রেরা পড়তে আসত।

বলব কি ভাই, বিহারীরা ডাকছে তাদের সঙ্গে খাবার জন্যে। বর্মী সিলোনী সবাই ধন্য ধন্য করছে আমাকে। কিন্তু এর মানেটা কি! কেন ওরা আমাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ করছে! আমি কোন কথা কইবার সুযোগই পাচ্ছি না। ওরা ছেঁকে ধ'রে নাগাড়ে তারিফ বর্ষণ করছে আর আমার হাত ধ'রে ঝাঁকানি মারছে—হ্যাণ্ডশেক।

দশ মিনিট ধ'রে এইভাবে 'সাবাস-বাহবা' চলল। তার পর আমি হাতজোড় ক'রে বললাম, কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা কি! আপনারা আমাকে মাপ করবেন, কাল থেকে আমার শরীর খারাপ হয়েছে একটু।

পিছন থেকে শ্যামাদাস সবাইকে ঠেলে-ঠুলে এগিয়ে এসে বললে, ভাই সব, তোমরা আমাদের হিরোকে ডিস্টার্ব ক'রো না। তা মন তো খারাপ হতেই পারে, শরীর আর মন আলাদা কিছু নয়। অতএব আমার বন্ধুদের আমি অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন আনন্দ-উৎসবের আয়োজনটা আপাতত মুলতুবি রাখেন। তা ছাড়া, শ্রীমান হেমেন্দ্র হচ্ছে বাঙালী, বাংলা দেশের গৌরবটাই সেদিক দিয়ে বেশি। কাজেই আপনারা বাঙালী ছাত্রদের অধিকারটা আগে মেনে নিন, হেমেন্দ্র অবশ্যই আজ আমাদের হেঁসেলে খেয়ে আমাদের মুখ রক্ষা করবে।

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল শ্যামাদাস। আমি ওকে জোর ক'রে নিজের কাছে টেনে এনে বললাম, কিন্তু ব্যাপারটা কি রে?

শ্যামাদাস গোবেচারীর মত আমার দিকে তাকিয়ে বললে, সব দেখেছি ভাই। একটুও ঘুমুই নি। চোখে হাত চাপা দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

চাবুক—মনে হ'ল চারদিক থেকে অসংখ্য চাবুকের আঘাত আমাকে জর্জর ক'রে ফেলছে।

ওরা সবাই হাসছে।

আমি কাঁদতে পারছি না। মনে হচ্ছে এখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। ছি-ছি-ছি! এ আমি কি করেছি!

এতক্ষণের স্বপ্ন। গত রাত্রের ঘটনা। সব কিছুর মাধুর্য যেন নিমেষে কালিমায় কলঙ্কে বিশ্রী চেহারা নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত।

শ্যামাদাস সব কিছু দেখেছে! কেন দেখলে? মনে হচ্ছে, সব কিছু অপরাধ ওর।

তারপর অবশ্য এমন কিছুই হ'ল না। আমি একা-একাই বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়লাম। শ্যামাদাস আমার হাত ধ'রে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু ওকেই বা কি বলব! সত্যি, ওর তো কোনই দোষ নেই। শুধু দর্শকের ভূমিকা যে এত মারাত্মক হবে, তা কি ও জানত!

হেমেনবাবু এই পর্যন্ত ব'লে চুপ ক'রে গেলেন।

আমি বললাম, তার পর কি হ'ল?

কিছুই হয় নি।

মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয় নি আপনার?

না। কোন্ মুখে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াব? আমি যে চোর তা তো শ্যামাদাসই প্রমাণ ক'রে দিলে। অবিশ্যি শ্যামাদাস আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে, কিন্তু আমিই পারি নি এগোতে। সারা ভারত বর্মা সিলোনের সব মানুষের সামনে আমাকে যেন নগ্ন ক'রে নাচিয়েছে কারা—সে কথাটা ভুলতে পারি নি। নইলে হয়তো একটা মিলনমধুর কাব্য-কাহিনীর নায়ক হয়ে যেতাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার প্রশ্ন করলাম, আপনি কি সেইজন্যেই বিয়ে করলেন না আর?

হেমেনবাবু বললেন, আগেই তো ব'লে রেখেছি যে, আপনার সিদ্ধান্ত শোনাবেন না—দোহাই। তবে এখন ওটা ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়, যে ছবিটা মন থেকে মুছে ফেলতে চেষ্টা ক'রেও পারি নি। যাক, এবারে ট্রাম থেকে নেমে একটা পান খেতে হবে ভাই, অনেকক্ষণ বাজে বকেছি।

শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য

# হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

[ পলোনিয়সের পুনঃপ্রবেশ ]

পলো। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের মঙ্গল হোক।

হ্যাম। ওই যে বুড়ো খোকাটি দেখছ, ওটি এখনও কাঁথা-ঢাকা থাকে।

রোজেন। হয়তো দ্বিতীয়বার কাঁথা গ্রহণ করেছে; শুনেছি, বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব।

হ্যাম। আমি পূর্বেই বলছি, উনি আসছেন—শিল্পীরা এসেছে এই কথা আমায় বলতে···যা বলেছ তা ঠিক। সোমবারের সকালবেলাই বটে; ঠিকই বলেছ।

পলো। কুমার, আপনাকে বলবার মত খবর আছে।

হ্যাম। কুমার; আপনাকেও বলবার মত আমার একটি খবর আছে। রসায়ুধ যখন উজ্জয়িনীতে অভিনয় করতেন--

পলো। শিল্পীরা এসে পৌঁছেছেন কুমার।

হ্যাম। চুপ রহো।

পলো। সত্য বলছি কুমার—

হ্যাম। তখন প্রত্যেক শিল্পী এলেন নিজ নিজ রাসভে আরোহণ ক'রে,—

পলো। জগতের সেরা শিল্পী এরা; কি শোকনাট্যে, কি প্রহসনে, কি ঐতিহাসিকে, কি সামাজিকে, সমাজপ্রহসনে, ঐতিসামাজিকে, শোকৈতিহাসিকে, শোক-হাস্য-ঐতিসামাজিকে, এদের কাছে কালিদাসও কঠিন নয়, ভাসও হাল্কা নয়। নাট্যশাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানা হোক বা না হোক, সকল নাটকই এদের নখদর্পণে।

হ্যাম। বাহবা কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র! তোমার একটি অমূল্য সম্পদ আছে।

পলো। কি সম্পদ তাঁর ছিল কুমার?

হ্যাম। কেন?

সুন্দরী দুহিতা ছিল একমাত্র
কি ভালই বাসিত সে তাহারে।

পলো। (স্বগত) এখনও সেই আমার মেয়ের কথাই।

হ্যাম। কি গো বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, আমি ঠিক বলি নি?

পলো। কুমার যদি আমায় ধৃতরাষ্ট্র ভেবে থাকেন, তবে আমারও একটি মাত্র কন্যা আছে, এবং তাকে আমি খুবই স্নেহ করি।

হ্যাম। এর পিঠে ও-কথা আসে না।

পলো। তবে কি আসে কুমার?

হ্যাম। কেন?

'ঈশ্বর জানতেন, ভাগ্যই মানতেন,'

তার পরে বুঝলে কিনা,—

'শেষটায় শোন ভাই,
যা হবার হ'ল তাই'—

কিন্তু ছড়ার প্রথম ছত্রেই অনেক কথা ধরা পড়বে। ওদিকে দেখ, আমার আবার প্রতিবন্ধক ঘ'টে গেল।

[ চার-পাঁচজন নটের প্রবেশ ]

স্বাগত, স্বাগত, সবাই সুস্বাগত। তোমরা সুস্থ আছ দেখে সুখী হলাম। বন্ধু সব, শুভাগমন হোক। এই যে আমার সেই পুরানো বন্ধুটি, মুখে যে দেখছি পূর্বের চেয়ে কিছু কেশোদ্গম হয়েছে; ডেনমার্কের বুকে ব'সে আমারই কেশোৎপাটন করতে এলে নাকি? বাঃ, বাঃ, এই যে আমার তরুণী বান্ধবী! আগের চেয়ে বেশ কিছু মাথাচাড়া দিয়েছ দেখছি। আশা করি, কণ্ঠস্বরে অচল টাকার মত ফাট ধরে নি এখনো। এস এস, সকলে এগিয়ে এস। বিলম্বেনালম্। এখনি একটা বক্তৃতা শুনতে চাই। কেমন বলতে পার শুনিয়ে দাও; একটি বেশ আবেগপূর্ণ আবৃত্তি কর।

১ম অভি। কি আবৃত্তি করব কুমার?

হ্যাম। ট্রয়দহনে প্রায়ামের অংশটা আবৃত্তি কর না। ওটা আমার বড় ভাল লাগত। দেখি, মনে আছে কি না!

'দুর্দান্ত পাইরাস, অরণ্যের ব্যাঘ্রসম'—

নাঃ, ভুল হ'ল,—

'দুর্দান্ত পাইরাস, বাহু যার মসীকৃষ্ণ
অন্তরের অভিসন্ধি সম, ছিল শুয়ে
কুণ্ডলি পাকায়ে দারুময় হয়-গর্ভে
মহাম্বরে রজনীর প্রায়, অকস্মাৎ
হইয়া বাহির আরম্ভিলা হত্যাকাণ্ড
বীভৎস ভীষণ, পিতা মাতা পুত্র কন্যাসহ
খণ্ড খণ্ড করি সবে, আহা, রক্তস্রোতে
ভাসাল মেদিনী। তারপর, কি বলিব
হায়, নরকাগ্নি সম দুষ্ট পাইরাস,
ছুটিতে লাগিল বৃদ্ধ প্রায়ামে খুঁজিয়া।'

এইবার তুমি ব'লে যাও।

পলো। কী সুন্দর আবৃত্তি কুমারের ; যেমন কণ্ঠ তেমনি উচ্চারণ!

১ম অভি। 'অদূরে দেখিলা, বৃদ্ধ ব্যর্থ ক্ষোভভরে
শিথিল মুঠায় ধরি গুরু তরবারি
হানিছে ভূতলে ঘন গ্রীক-সৈন্য ভাবি।
চলে ছুটি পাইরাস প্রায়ামের পানে
অসম সমরে পশি হানে অসি, আহা,
শুভ্রকেশ শিরে তার। রে নিয়তি, হীনা
বারাঙ্গনা! কোথা সুরসভাতল মাঝে
দেববৃন্দ! কর তারে শক্তিহীনা আজি।
অচল করিয়া দাও রথচক্র তার,
নেমি-নাভি দণ্ড যত খণ্ড খণ্ড করি।'

পলো। এটা বড় দীর্ঘ।

হ্যাম। নাপিত-বাড়ি পাঠাতে হবে আপনার দাড়ির সঙ্গে। তুমি বল, বল, গেঁয়ো ছড়া শুনতে না পেলে ও বুড়োর ঘুম পায় ; তুমি ব'লে যাও। যেখানে রাণী হেকুবা এলেন—সেই স্থানটা বল।

১ম অভি। 'কিন্তু হায়, কেবা দেখে কেবা দেখে ওই গুণ্ঠায়িতা রাণী',

হ্যাম। গুণ্ঠায়িতা রাণী!

পলো। দোষ কি হ'ল? গুণ্ঠায়িতা রাণী তো খাসা।

১ম অভি। 'গুণ্ঠায়িতা রাণী ছুটিতেছে নগ্নপদে
নয়নের অশ্রুধারে নিবায়ে দু ধারে
লকু লক্ বহ্নিশিখা; শিরোপরি বাঁধা
ছিন্নভিন্ন বাসা, আ মরি শোভিত যেথা
হীরকমুকুট দ্যুতিময়; কটি'পরে
ছিন্ন কন্থা ছুটিয়াছে ব্যাকুলিতা রাণী!
স্বর্গ হতে দেবতারা যদ্যপি দেখিত
শোকের সে মহামূর্তি, যদ্যপি শুনিত
সতীকণ্ঠে সেই আর্তনাদ, যেই ক্ষণে
পতিদেহ খণ্ড খণ্ড করিছে পাইরাস
অসিঘায়ে, তা হ'লে তা হ'লে সুনিশ্চয়
দেবতার নিরশ্রু নয়নে বর্ষাধারা
আসিত নামিয়া, পয়স্বিনী সুরভির
ক্ষীরধারা সম।'

পলো। দেখ, পাণ্ডুগণ্ড বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়বার উপক্রম! থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না।

হ্যাম। বেশ সুন্দর হয়েছে; বাকিটা পরে শুনব। ওগো মহামান্যবর! এই শিল্পীদের সুব্যবস্থার ভারটা নিন। শুনছেন? ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবেন। ওরাই হ'ল যুগবার্তার ধারক ও বাহক। জীবিত অবস্থায় এদের কাছে দুর্নাম কিনলে মৃত্যুর পর অবস্থা আরও সঙিন হয়ে উঠবে।

পলো। কুমার, ওদের সঙ্গে যথাযোগ্য ব্যবহারই করব।

হ্যাম। কূর্মাবতার, তার চেয়ে ভাল ব্যবহার করতে হবে। যথাযোগ্য ব্যবহার করতে গেলে চাবকাতে হবে না এমন আদমি কোথায় মিলবে? নিজের সম্মান ও সম্ভ্রম অনুযায়ী ব্যবহার করবেন।

তা হ'লে তাদের যোগ্যতা যত কম হবে, আপনার বদান্যতার প্রশংসা ততই বাড়বে। ভিতরে নিয়ে যান।

পলো। আসুন আপনারা।

হ্যাম। ওঁর সঙ্গে যাও তোমরা। কাল একটা কিছু অভিনয় আমরা দেখব।

[ ১ম অভিনেতা ভিন্ন অপর সকল অভিনেতার পলোনিয়সের সহিত প্রস্থান ]

আচ্ছা 'গনজ্যাগোর হত্যা' নাটকখানা অভিনয় করতে পারবে?

১ম অভি। পারব কুমার।

হ্যাম। কাল রাত্রে সেটা শুনতে চাই। প্রয়োজনবোধে আমি যদি দশ-বারো ছত্র নিজে রচনা ক'রে দিই, তবে সেটা তোমাদের অভিনয়ের মধ্যে চালিয়ে নিতে পারবে না?

১ম অভি। পারব কুমার।

হ্যাম। বেশ; ওই বৃদ্ধের অনুসরণ কর। সাবধান, ওঁকে যেন বিদ্রূপ ক'রো না। আর তোমরা দুজন এলসিনোরে এসেছ সেজন্য বড় আনন্দ পেয়েছি ভাই। এখন তবে বিদায়।

রোঁজেন। নমস্কার কুমার।

হ্যাম। ঈশ্বর-কৃপায় তোমাদের কুশল হোক।

[ রোজেন্‌ক্রান্‌জ ও গিলডেন্‌স্টার্নের প্রস্থান ]

এখন একক।
কী পাষণ্ড নরাধমই আমি! আশ্চর্য!
ও তো মাত্র অভিনেতা;
কবির কল্পনা আর ভাবের স্বপনে
বিচলিত আত্মা তার উঠিল জাগিয়া
কোন্ কল্পলোকে? তাহারি আবেগে
পাণ্ডুগণ্ডে ঝরিল নয়নধারা,
ভগ্ন কণ্ঠে কাঁপিতে লাগিল তার
ভাবাবিষ্ট তনু,

দেহে মনে রূপায়িত করিল কল্পনা!
অথচ কিছুই নয়; হেকুবার তরে!
কে তার হেকুবা?
কাঁদিল যে, সেই বা কে হয় হেকুবার?
যে আবেগ উন্মাদনা এই বক্ষে মোর
তা যদি থাকিত তার, কী না করিত সে?
অশ্রুধারে নাট্যভূমি দিত ভাসাইয়া,
শ্রুতিবিদারণ বাক্যে স্তম্ভি বিভীষিকা
উন্মাদ করিয়া দিত অপরাধী জনে,
সজ্জনের জন্মিত সন্ত্রাস,
অজানার হ'ত বুদ্ধিভ্রম,
অবাক বিস্ময়ভরে ভাবিত সবাই
যা দেখি, যা শুনি, সে কি সত্য না মিথ্যাই?
আর আমি!
মেটেবুদ্ধি হতচ্ছাড়া গোবর-গণেশ
ভুলিয়া আপন প্রতিশ্রুতি রয়েছি নীরবে।
ঘোর অনাচারে সর্বস্ব হারাল রাজা,
হারাল জীবন; সে রাজারও প্রতি
কোনই কর্তব্য নাই মোর!
আমি কাপুরুষ?
কে যেন বলিছে—নরাধম!
কে যেন চপেটাঘাত হানে মোর শিরে,
শ্মশ্রু ছিঁড়ে ছুঁড়ে দেয় আমারই বদনে!
নাকে খৎ দিতে বলে! কহে ঘৃণাভরে—
মুখে বুকে সবই মিথ্যা তোর!
কে করিছে এত অপমান?
হা দুর্দৈব, সে যে জানে
আমি সবই সহিব নীরবে।

মজ্জাহীন মেষ আমি
অত্যাচারে বিধিৎসাবিহীন।
তা না হ'লে কোন্ কালে
সে পশুর পচা মাংসে
পুষ্ট করিতাম আমি দেশের শকুনি।
ওরে ঘৃণ্য ক্লিন্ন নরাধম!
নির্মম বিবেকহীন কৃতঘ্ন কামুক নরাধম!
প্রতিহিংসা চাই!
বাঃ, অপূর্ব গর্দভ আমি! কী মহাসাহসী!
হত্যা করিয়াছে পূজ্য পিতারে আমার,
স্বর্গ ও নরক হতে আসে বাণী সমস্বরে—
প্রতিহিংসা নাও। আর আমি, পুত্র আমি,
মুখরা কোন্দলপ্রিয়া কুপল্লীর কুচরিতা সম
নামাতে বুকের বোঝা শাপমন্যি পাড়ি!
ধিক মোরে, শত ধিক্!
জাগো বুদ্ধি মস্তিষ্কে আমার!
শুনিয়াছি,—অভিনয় দেখিতে দেখিতে
নাট্যের কৌশলে পড়ি অপরাধী জন
সহসা হইয়া মর্মাহত
স্বীকার করিয়া বসে নিজ অপরাধ।
হত্যার রসনা নাই বটে,
কিন্তু তার আত্মপ্রকাশের—
অতীন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় যে আছে।
পিতৃহত্যা যে ভাবে হয়েছে
তেমনি নাটক কোন নটেরা করিবে অভিনয়
পিতৃব্যের সম্মুখে আমার।
লক্ষ্য ক'রে যাব তার মুখ,
সন্ধানিব মর্মস্থান তার;

সে যদি শিহরি উঠে,
আমার কর্তব্যপথ হয়ে যাবে স্থির।
যে আত্মারে দেখিনু সেদিন
হয়তো সে দুরাত্মা পিশাচ।
পিশাচেও ধ'রে থাকে কান্ত মায়ারূপ;
একান্ত দুর্লভচিত্ত শোকমগ্ন আমি,
প্রতারণা সহজ বুঝিয়া, হয়তো সে
নিক্ষেপিতে চাহে মোরে দুরন্ত নিরয়ে।
অকাট্য প্রমাণ দেবে এই অভিনয়,
এ পথে রাজার পাব সত্য পরিচয়। [ প্রস্থান ]

[ ক্রমশ ]

অনুঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

# ভবানীচরণ-প্রসঙ্গে

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে ধর্মবিরোধ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পথকে প্রশস্ত করিয়াছিল, তাহার পরিণতি হিসাবে আমরা সেকালের যে কয়জন সাহিত্যসাধকের শক্তি ও কার্যকলাপের কথা ভুলিতে বসিয়াছি, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার জন্য তাঁহার কোন কোন কার্যকলাপ যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী—এ কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা চলে যে; সামাজিক অবস্থার পটভূমিকায় তাঁহার সমগ্র কার্যাবলী ও দানকে বিচার করিয়া দেখিলে এই বিস্মৃতি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। বিশেষ করিয়া সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দূরদর্শিতা ও অকপট নিষ্ঠা তাঁহার শক্তিকেই সূচিত করে এবং সেই দিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ তৎকালে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক এবং সামাজিক পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইংরেজ বণিক-গোষ্ঠী যেমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিয়া দেশীয় অর্থনৈতিক কাঠামোটিকে একটি নূতন রূপ দিতে চেষ্টা

করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনই বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকে নূতনভাবে এবং নিজের প্রয়োজনে গড়িয়া তুলিবার জন্য মিশনরিদের নেতৃত্বে আর একটি দল সাধারণ মানুষের সমাজের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহারা ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের গ্লানিগুলি উদ্‌ঘাটিত করিয়া এবং পাশাপাশি য়ুরোপীয় ভাবধারার জয়গান করিয়া জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। অর্থনৈতিক দিকের চেয়ে সামাজিক দিকের কর্তৃত্ব কষ্ট-সাধ্য, কিন্তু তাহার ফল অনেক বেশি ব্যাপক, এবং জাতীয় জীবনকে একমাত্র ইহার দ্বারাই সত্যকারের ক্ষতিগ্রস্ত করা সম্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে শুরু করিয়া এই অনুপ্রেরণার উত্তরোত্তর প্রকাশ এমনই তীব্রতা লাভ করিতে থাকে যে, একটি প্রতিক্রিয়াকে অনিবার্য করিয়া তুলে। এই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াকেই আমরা কার্যকরীরূপে দেখিতে পাই উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম-আন্দোলনরূপে, যাহার সূত্রপাত হয় রাজা রামমোহন হইতে।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ যে সকল সময়ে একটিমাত্র পথকেই অবলম্বন করিয়া চলিবে—এই ধারণা সমীচীন নয়। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব যত বিরাটই হউক না কেন, উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহার ধর্মসংস্কারের মধ্যে দুইটি বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার সাম্যস্থাপন-প্রচেষ্টায় একটা গরমিল স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রত্যেক সমন্বয়ের প্রথম পর্যায়ে এই গরমিলকে এড়াইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যে প্রয়োজনের তাগিদে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের জন্ম, তাহা হইল মূলত আত্মরক্ষা। বাঙালী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দুর্দিনে এই আত্মরক্ষার প্রেরণাই রামমোহনকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে এই অনুপ্রেরণার দিকটি অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রসঙ্গত তাঁহার জীবনীকার শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য উপস্থাপিত করা যাইতে পারে :

"...রাজা রামমোহন রায় বলিতেছেন যে ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিলে প্রথম ত্রিংশত বৎসর কাহারও ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তৎপরে তাঁহারা হিন্দু এবং মুসলমানদিগকে ধর্মচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন...ইংরেজেরা এদেশ অধিকার করিয়া ত্রিংশত বৎসর

পর এদেশীয় লোককে খ্রীষ্টিয়ান করিবার উদ্দেশ্যে তিনপ্রকার উপায় অবলম্বন করেন। প্রথম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকপ্রচার। উহা হিন্দু দেবতা ও ঋষিদিগের কুৎসা এবং মুসলমান ধর্মের নিন্দাতে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতামূলক উপদেশ দান। তৃতীয় সামান্য দুঃখী লোককে চাকুরী দিয়া ও প্রতিপালনের লোভ দেখাইয়া খ্রীষ্টিয়ান করা। এই তিন উপায় সম্বন্ধে রাজা বলিতেছেন যে নিন্দা ও তিরস্কার দ্বারা অথবা লোভ দেখাইয়া ধর্মপ্রচার করা কখনই যুক্তি ও বিচারসঙ্গত নহে।"

রামমোহনের প্রথম সংবাদপত্র-জগতে আবির্ভাব ইহারই প্রতিক্রিয়া-হিসাবে। এই সময়ে চিন্তাজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং যে সাহিত্যিক অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে তাহার মূলে ছিল সংবাদপত্র। এই সংবাদপত্রকে অবলম্বন করিয়াই নূতন দর্শনের জন্মলাভ সম্ভব হইয়াছিল। রামমোহনের হাতে নূতন চিন্তাধারার বাহন হিসাবে সংবাদপত্রের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহার পশ্চাতেও মূলত সেই আত্মরক্ষারই একটা তাগিদ অত্যন্ত স্পষ্ট:

"শ্রীরামপুর মিশনের জনৈক খ্রীষ্টান পাদ্রি বেদান্ত, ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্র এবং যোনিভ্রমণ, জন্মান্তরীণ ফলভোগ মতের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টিয়ানদিগের···পত্রে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই একখানি পত্র প্রকাশ করেন।···রামমোহন রায় উহার একটি উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পত্রিকা সম্পাদক তাহা প্রকাশ করিলেন না। সুতরাং রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উহাতে তাহার উত্তর দিলেন। উহাতে রচয়িতার জাতীয় ভাব ও জাতীয় শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়।" (জীবনচরিত)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাহিরের একটা আঘাত রাজা রামমোহনকে জাতীয় ভাব ও শাস্ত্র সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাহার পরিণতি হিসাবে তিনি পত্রিকার মাধ্যমে জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারের জন্য অগ্রসর হইতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সচেতনতার তরঙ্গ গণ্ডিবদ্ধ হইয়া ছিল না—ইহার বিস্তৃতি উনবিংশ

শতাব্দীর বাংলার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সহজভাবেই স্পর্শ করিয়াছিল, অবশ্য ক্ষেত্রহিসাবে তাহা বিভিন্ন ফলপ্রদান করিয়াছে।

এক দিকে যেমন রামমোহনের নেতৃত্বে জাতীয় ভাবধারার পুষ্টি এবং রক্ষার অঙ্গহিসাবে সামাজিক সংস্কারের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য দিকে ঠিক একই উদ্দেশ্যে রক্ষণশীলতার দুর্গ দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন ধর্মসভা। রামমোহন যুগোপযোগী সংস্কারের পথকে অবলম্বন করিয়া নূতন পাশ্চাত্য ভাবধারার সহিত সনাতন হিন্দুধর্মের একটা সমন্বয়ের পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্মসভার নেতৃত্বে আরও এক দল শক্তিশালী ব্যক্তি রক্ষাব্যূহ দৃঢ়তর করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। আজ একালে বসিয়া তাহার প্রয়োজনকে অস্বীকার করিতে পারা যায়, কারণ তাহার প্রয়োজনকে ঠিকমত বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান নাই, কিন্তু সমকালীন অবস্থার ভিত্তিতে ইহার অনিবার্যতাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মোটামুটিভাবে এই নূতন প্রতিক্রিয়ার কারণ হিসাবে আমরা যেগুলিকে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে প্রথম ও প্রধান হইল যে, বাহিরের শক্তির প্রচণ্ড চাপ এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইহা ছাড়াও সমন্বয়ের নিজের মধ্যেই এমন কতকগুলি ত্রুটি ছিল যাহার ফলস্বরূপ সমাজের বাহ্যিক অবস্থার বিকৃতি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। গৌণত ব্রাহ্মসভা সহমরণ-বিরোধী এবং ধর্মসভা সহমরণের দল হইলেও মুখ্যত ইহার মধ্যে দুইটি আদর্শের সর্বাঙ্গীণ সংঘাত অনস্বীকার্য। রামমোহন আত্মরক্ষার পথ হিসাবে যাহা বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উদারতার স্থান ছিল। কিন্তু তিনি ধর্মসংস্কার করিতে গিয়া পাশ্চাত্য ভাবধারাকে যে প্রাধান্য দিয়াছিলেন সর্বক্ষেত্রে তাহার প্রথম পদক্ষেপ সুন্দর ও সুস্থ ছিল না। এক দিকে সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, অন্য দিকে প্রগতিশীল ব্রাহ্মসভা কর্তৃক তাহার সমর্থন ও অনুকরণ— উভয়ে মিলিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার পটভূমিকায় রক্ষণশীলতার এই অনমনীয়তার অর্থ খুঁজিতে গেলে ব্যর্থ হইতে হইবে

না। 'নববাবুবিলাস' 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি পুস্তকের মধ্যে এই সমাজের একটা বাস্তব রূপকে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

আর এক দিকে সামাজিক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে অনিশ্চয়তা। অল্পদিন পরে যে ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠীর পরিচয় আমরা পাইতেছি, তাহাদের প্রাথমিক সৃজন-ক্ষেত্র হিন্দু কলেজ কিছুদিন আগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে এই সময় ভবানীচরণ প্রভৃতিরা যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, তাহার মূলে ছিল সংস্কৃতির উপর আঘাতের আশঙ্কা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ইংলণ্ডে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তনের কথা ঘোষিত হইলে উক্ত পত্রিকার প্রকাশক 'সমাচার চন্দ্রিকা'র সম্পাদকের নিকট পত্রযোগে জানিতে চাহেন :

"তিনি কি নিমিত্তে স্বদেশীয় বালকদিগকে ইংরাজী অভ্যাস না করিতে পরামর্শ দিতেছেন যেহেতু ইউরোপের বিদ্যালয়স্থেরা নিরন্তর সংস্কৃত ভাষা অভ্যাস করিতেছেন কিন্তু তাহাদের হিন্দু হওনের কিছু ভাবনা নাই অতএব তিনি কি কারণে ইহা বোধ করিয়াছেন যে হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা অভ্যাস করিলে তাহারা আপনাদের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।"

ইহার উত্তরে ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের 'চন্দ্রিকা'র সম্পাদকীয় পত্রে প্রকাশিত হয় :

"ইংরাজী ভাষাভ্যাস না করিতে আমরা স্বদেশীয় বালকদিগকে কখন পরামর্শ দিই নাই আমারদিগের অভিপ্রায় এই যে বালকেরা এমন পুস্তকাদি পাঠ না করে এবং এমত শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষিত না হয় যাহাতে হিন্দুধর্ম্ম অমান্য ও অগ্রাহ্য করে।"

তাঁহার এই আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তাহার উদাহরণ একাধিক উপস্থাপিত করা চলে। ১২৩৮ সালের ১৭ই ভাদ্র তারিখের 'চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত An European যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নরূপ :

"গত শনিবার সন্ধ্যাকালে আমি বাদামে দীঘির তীরেতে বায়ু সেবনার্থে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। শুনিতে পাইলাম কতকগুলিন

হিন্দু-বালক ইংরাজী ভাষা অনর্গল কহিতেছে তাহা শ্রবণে অত্যন্ত সুখী হইয়া তাহারদিগের নিকটবর্ত্তী হইলাম তাহার পর এক বাক্য শ্রবণে চমৎকার হইল যেহেতু তাহারা কহিতেছে : What brutes must our parents be."

বাবু উপাখ্যান এবং 'নববাবুবিলাসে'র মধ্যেও এই বিপর্যয়ের বহু চিত্র অঙ্কিত আছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখিয়াছেন, "যে সময়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল তৎকালে বর্ণিত বাবুর আদর্শ কলিকাতায় অপ্রাপ্য ছিল না ('বিবিধার্থ সংগ্রহ', ১৮৬৮)।" অনুকরণ-প্রিয়তার পরিচয় দিতে গিয়া ভবানীচরণ লিখিয়াছিলেন :

"সাহেব লোক রবিবার গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্যবার বিষয়কর্ম্ম করেন।

"বাবু এই বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যাআহ্নিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ করিয়া রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান, কখন শকের যাত্রা খেউর গীত শুনিয়া থাকেন।" (বাবু উপাখ্যান)

সমসাময়িক অবস্থার বিচারে এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের সাক্ষ্য হইতে ইহাকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

ভবানীচরণ স্বয়ং ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। ১৮২৩ সনে প্রতিষ্ঠিত 'গৌড়ীয় সমাজের'ও তিনি সভ্য ছিলেন। এই সমাজের উদ্দেশ্যের মধ্যে ছিল : (১) দেশবাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার, (২) এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ, (৩) সমাজের ব্যয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা, (৪) প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি লইয়া একটি গ্রন্থাগার গঠন করা, (৫) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, (৬) দেশবাসীদের মধ্যে নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন ও নিরোধ। ('গৌড়ীয় সমাজ'—যোগেশচন্দ্র বাগল)

এই উদ্দেশ্য হইতে সমাজের সভ্যগণের মনের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে বুঝি যে, প্রকৃতপক্ষে প্রগতিশীল সমাজহিতকর কার্যের

সহিত ভবানীচরণের বিরোধ ছিল না—বিরোধ ছিল 'নীতি ও শাস্ত্র-বিগর্হিত' কার্যের সঙ্গে, এবং এই 'নীতি ও শাস্ত্র-বিগর্হিত' কার্য যে দেশের মধ্যে বিপর্যয়ের দিকটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছিল তাহার নিদর্শন পূর্বেই উপস্থাপিত করিয়াছি।

ভবানীচরণের সহিত রামমোহনের বিরোধ আদর্শগত। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তিত যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যষ্টিকেন্দ্রিকতা পরবর্তী কালে দৃঢ়মূল হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রথম নিদর্শন রামমোহন—অপর পক্ষে ভবানীচরণ গোষ্ঠীকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বের সর্বশেষ শক্তিমান প্রতিনিধি। সুতরাং তাঁহাদের সংঘর্ষ বাহিরের দিক হইতে বিচার করা চলে না। ভবানীচরণের প্রগতিশীলতার বহু নিদর্শন এবং নানা দিক দিয়া দান রহিয়া গিয়াছে তাঁহার সাংবাদিক জীবনের ইতিহাসে। তিনি ইংরেজের আগমন ও পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই, ইহা যে কেবলমাত্র সহমরণের প্রতি সংস্কারবশতই এমন নহে—বহু যুক্তিযুক্ত কারণে তিনি বাংলা দেশে ইংরেজ-বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধতা করিয়াছেন এবং তাঁহার আশঙ্কা পরবর্তী কালে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ১৮৩১ সনের ১৬ই মে তারিখের 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন :

"এ দেশে ইংরাজ আসিয়া নগরে কি পল্লীগ্রামে তাবৎস্থানে বসতি করণ পূর্ব্বক যদ্যপি কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি করে তাহাতে অস্মদ্দেশীয়দিগের পক্ষে কোন মতেই শ্রেয় নহে তাহার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে বিস্তর লিখিয়াছি তথাচ কিঞ্চিৎ লিখি আদৌ দীন দরিদ্র কি মধ্যবর্তি লোকেরদিগের উপর অত্যন্ত বলপ্রকাশ পূর্ব্বক ইংরাজেরা দৌরাত্ম্য করিবেক তৎপ্রমাণ এই রাজধানীতে গবরনর কৌন্সল সুপ্রীম কোর্ট পোলিশ ইত্যাদিতে সিংহস্বরূপ প্রতাপান্বিত মহামহিম মহাশয়েরা জাজ্বল্যমান বসিয়া থাকাতেও এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি গোরালোকের দৌরাত্ম্য সর্ব্বদাই প্রায় শুনা যায়…"

বলা বাহুল্য, যখন ইংরেজের আগমনকে ও বসতি-স্থাপনকে সর্বক্ষেত্রে অভিনন্দন জানানো হইতেছিল, সেই সময় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এই সতর্কবাণীর মধ্যে সম্যক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি এই প্রসঙ্গে নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়ও তাঁহার পত্রিকায় স্থান দিয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৩১ সনের ৭ই জুলাই তারিখের পত্রে নীলমণি দাস, এই নামে কোনও এক ব্যক্তি পত্রযোগে লিখিয়াছিলেন :

"কতকদিন হইল এতদ্দেশে নীলের কৃষি আরম্ভ হইলে স্থানে স্থানে প্রজারদের যে ক্লেশ হইয়াছে তাহার স্থূল কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

"শুনিতে পাই যে নীলকর সাহেবেরা···বিশেষতঃ ঐ সাহেবেরদের দেওয়ান অর্থাৎ ১২ টাকা মাহিয়ানার এক২ গমস্তা এবং অন্য২ আমলা লোক ইঁহারা সাক্ষাৎ ধর্ম্মাবতার মফঃস্বলে দীন প্রজারদের প্রতি তাহারদের অকর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই তাহার কারণ ঐ ধার্ম্মিকেরদের যে নিয়মিত মাসিক আছে তাহাতে পাড়াগাঁইয়া নবাবী চলে না এ প্রযুক্ত কতক সাহেব সরকারের চুরিতে নির্ব্বাহ করেন কতক বা প্রজালোকের রক্তেতে আপন রক্ত সতেজ করেন। প্রজালোক সকলি ধনজনহীন সাহেবেরা ধনবান ও প্রত্যেক সাহেবের নিকটে ২০০।৩০০ শত লাটেল চাকর থাকে ইহাতে প্রজালোক কি প্রকারে জাতিপ্রাণ রক্ষা করিতে পারে যদ্যপি কেহ জাতিপ্রাণ ভয়ে নিতান্ত তিষ্ঠিতে না পারিয়া 'দুর্ব্বলস্য বলং রাজা' এই বলেতে জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট নালিশ করে তাহাতে তাহারদের ভাগ্যক্রমে তাহারা তাদৃশ সাক্ষী না পাওয়াতে মনোযোগ করেন না যেহেতু প্রজালোক নির্ধন···"

এই পত্রের মধ্যে সমকালীন কৃষকদের বাস্তব অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। দেশে ইংরেজ-বসতি স্থাপনের ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যে কি পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে, তাহার নিদর্শন হিসাবে নীলচাষীদের দুরবস্থার বিষয় উপস্থাপিত করিয়া ভবানীচরণ স্বয়ং পত্রমধ্যে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং দেশবাসীকে ইহা রোধ করিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ১২৩৮ সনের ১৭ই শ্রাবণ চন্দ্রিকাপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন : "যদি কলনাইজ এ দেশে হয় তবে আমরা বোধ করিব যে আমারদিগের মস্তকে

একেবারে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবেক।" পত্রিকা-মারফৎ জনমতকে সুসংবদ্ধ করিবার এই প্রয়াস তাঁহার দৃঢ়তা ও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। লক্ষ্যণীয় এই যে, তিনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেশের বাস্তব অবস্থাকে নিদর্শন-হিসাবে প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহার এই আন্দোলনের ফলে যে কিছু উপকার হইয়াছিল তাহা পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়ের নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুঝা যায়ঃ

"কলনাইজ হওয়াতে যে দোষ ঘটিবে তাহার এক দৃষ্টান্ত এতদ্দেশে ইংরাজলোকের নীলের কুঠী ইহা ঐ ঠাকুরবাবুরা স্বীকার করেন না কিন্তু এক্ষণে ঠাকুর গোষ্ঠীশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন ঠাকুর তাহার মত কলনাইজ এ দেশে না হয় এ জন্য তিনি ঐ আরজী প্রস্তুত করিতে অনেক যত্ন করিয়াছেন।"

৬১০ (?) সংখ্যা চন্দ্রিকাতে তিনি ভারতে আমদানি ও রপ্তানিকৃত বস্ত্রের উপর শুল্কের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে এবং বিশেষ করিয়া চন্দ্রিকার দান সম্পর্কে তাঁহার জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছেঃ "...ঐ পত্রে ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ক বিবিধ প্রস্তাব প্রকাশ দ্বারা স্বদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইয়াছে তাহা বিদ্বান লোকেরাই বিশেষরূপে জানিয়াছেন।"

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই ধরনের সাহসিকতাপূর্ণ আলোচনা সম্ভবত ভবানীচরণই প্রথম শুরু করেন। এই দিক দিয়া তাঁহাকে বাংলা-সাহিত্যে পথিকৃৎ বলা চলে। বিশেষ করিয়া কলনাইজেশন সম্পর্কে তিনি যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তাহাতে তাঁহার সম্যক রাজনৈতিক বুদ্ধি, দূরদর্শিতা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। যে সময় বাংলা-দেশের প্রগতিশীল চিন্তানায়কেরা ইংরেজের মহিমাধ্যানে বিভোর ছিলেন, সেই সময় তাঁহার মত ব্যক্তি যে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ক্ষেত্রে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এই সমস্ত আলোচনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইহা ছাড়াও ভবানীচরণের আরও এক দিক দিয়া দানের পরিচয় মিলে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যেমন সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে

তাল রাখিয়া আরবী, ফার্সী ভাষাকে বাংলা ভাষার মধ্যে স্থান দিয়া কথ্য ভাষার রূপটিকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা সংস্কারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। এই সময়ে বাংলা-ভাষা-শুদ্ধি-আন্দোলনের পুরোভাগে তিনি আগাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে :

"সুদীর্ঘকাল বঙ্গরাজ্য যবনাধীন প্রযুক্ত দেশীয় ভাষা যাবনিক ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় পরে চন্দ্রিকায় গৌড়ীয় সুকোমল সাধুভাষা বিন্যস্তা হওয়াতে বিদ্যানুরাগিগণের হৃদয়ে সাধু ভাষা শিক্ষার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল অতএব ঐ পত্রকে এতদ্দেশীয় ভাষা পরিবর্ত্তনের মূলসূত্র বলিতে হয়…"

এই সমস্ত বিষয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে ভবানীচরণ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার উপর আস্থা রাখা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীর এমন এক সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সময় সমাজ এক অনিশ্চয়তা এবং সন্দেহের মধ্য দিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতেছিল—সেই সময়কার বহু চিন্তাবিদের কার্যকলাপের মধ্যেই স্ব-বিরোধ দেখিতে পাওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ইহা যদি তাঁহার প্রগতিশীল দিকগুলিকেও বিস্মৃত হইতে সাহায্য করে, তবে তাহাতে বিচারবুদ্ধির দৈন্যই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

—

## বেতালের বৈঠকী

অনেকেই অপরাধী তোমার মতন,
তোমারে ধরায়ে দিল দুরারোগ্য রোগ।
ভাগ্যবানে এড়াইল ব্যাধির শাসন,
কপালে তোমারই ছিল কৃতকর্ম্ম ভোগ।
তোমার চেয়েও যারা অপরাধী হায়,
সাধু সেজে তাহারাই দূষিছে তোমায়।

বেতালভট্ট

# কবিতাগুচ্ছ

## ডেভিল

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে নয় অশুদ্ধ বাতিকে
ডিঙ মেরে পথচলা ; অদৃষ্ট গতিকে
ও-পাড়ার এ-পাড়ার ধিরিঙ্গী-মেয়ের
সইয়ের বউয়ের আর বকুল ফুলের
অনেক খয়রাতি হ'ল ফিরিঙ্গী-পাড়ায়,
কার সাধ্য তার পর ও-পথ মাড়ায় !
ট্যাঁক খালি তবু 'স্ন্যাক' চলে রেস্তোরাঁতে
রেস্তহীন গেরস্তরা ভূত দেখে রাতে।
শমন লটকিয়ে যায় নাকের উপর
চিল ডাকে প্রাণপণে—বেলা দু'পহর।
ভোজপুরী নাক ডাকে খাটিয়ার 'পরে
'মিড্-ডে'-ফেয়ারী চোর, কার সাধ্য ধরে !

আচার বিচার তার 'শুচিবাই' নাম,
চপ থেকে ডেভিলের বেশি কিছু দাম ;
নগদ মিটিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে দেখি
ভাঙটা পয়সা সব একদম মেকি।
মেকির কারবারে পোক্ত অতীব সজ্জন
খড়ের গো-বৎ রেখে করিছে দোহন
মৃতবৎসা গাভীটিরে ; অস্থিচর্মসার
মা দিতেছে খেসারতি শিশুবঞ্চনার।
উদোর পিণ্ড যে চাপে শ্রীবুধোর ঘাড়ে
বুদ্ধিমান চুপচাপ, বোকা মাথা নাড়ে।

বিউনি বাঁধে বিদেশিনী ; হে বঙ্গললনা,
এলোকেশী হয়ে তুমি ক'রো না ছলনা।

ব্লাউজের ছাঁট রাখো আঁচলে গোপন
দর্জির মর্জিতে কর্জ নহে সুশোভন।
স্যাণ্ডেল বাতিল করে হিল্-তোলা জুতো
সে কেবল ফাঁকা মাঠে বেড়াবার ছুতো।
পদ্ম ময়রাণীর ঘরে বাড়ন্ত সন্দেশ—
অতএব ছানা খাও, ধন্য হবে দেশ।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

## পথিক মানুষ

কবিতা আমি লিখি,
কিন্তু আমি জানি তা কাব্য হয় না—
ভাবের চাপে কথার ভিড়ে, আমার কবিতা বেপথুমানা
বিপথগামিনী, ব্রাত্য।
স্তোমহোমের শুদ্ধিশিখা নিভন্ত,
জ্বলন্ত নয়, দীপ্ত তপনের অরুণিমা,
দাবাগ্নির জ্বালা হয়তো আছে,
আছে ক্ষুব্ধতার দাবি,
আর লুব্ধতার, তুচ্ছতার, হীনতার
আমার মন নম্র নয়, রসমজ্জিত নয়
বারে বারে মানস-সরসে তীর্থযাত্রা হয়েছে ব্যর্থ
সারস্বত হংস-বলাকা দিগ্বলয়ে মিলিয়ে গেছে
স্তব্ধ হিমাদ্রির ছায়া মনকে শান্ত করে নি
বিশ্বরমার স্পর্শ পড়ে নি।
আমি কামায়নী কবি, শিবায়ন গান গাইতে চাই,
গড়ি বানর, নারায়ণী সেনা তারা নয়
আমার চিন্তায় ক্লীব হয় পুরুষ,
নারী হয় ক্লিন্না, বন্ধ্যা,

সন্ধ্যাদীপের শিখায় সে ধন্যা নয়,
হ্লাদিনী পণ্যা, তামসী তিমিরে।
আমার কবিতা সন্ধান দেয় না মানুষের
যে মানুষ চলে, যে মানুষ গড়ে,
সৃষ্টি করে, দৃষ্টি দেয়, রূপ দেয় ভাবকে
অর্ধনারীশ্বর যে,
অপরাজেয় শুধু নয়, পরিমাপের বাইরে,
শুধু বিদ্রোহী নয়, আত্মস্থ ;
কোমলে কঠোরে, দীক্ষায় তিতিক্ষায়
জীবননিষ্ঠ চেতনায়,
সুষ্ঠুভোগবাদে, আত্মনিবেদনে,
রবিকরোজ্জ্বলা দীপ্তিতে যার ছবি
তার সীমার সীমানা নির্দেশ করবে কোন্ কবি
আলোকবৈমুখী বিস্মৃতিতে
বিভ্রান্তিতে আত্মহারা।
জীবন কি শুধু মত ও পথ নিয়ে মাতামাতি,
ভাবগদগদ আত্মসম্মোহে অতীন্দ্রিয়ের রহস্যভেদ,
না কামিনী-কাঞ্চনের লাস্যবিলাসে গড্ডলিকা প্রবাহ,
না দল-বেদলের হলাহলে মাদলের কোলাহল,
কেবলি কি প্রশ্ন হবে, আমি পূবের না পশ্চিমের
সপ্তসিন্ধুর পণ্যে কার সিন্দুক ভরল
কে জ্ব'লে উঠল ক্ষুধানলে, বিক্ষুব্ধ হ'ল জনতার হাটে ?
চিতাভস্মের পিছনে কোথায় সে দক্ষিণপাণি উত্তরসাধক
যে সত্যবান বলবে—মানুষ মানুষই,
শব হয়ে সে চলে মৃত্যুর পিছু পিছু, শিব হয়ে ফেরে
সাবিত্রী-তেজে তার ক্ষণিক উদ্ভাসিত নিত্যে,
পথে চলাই তার মন্ত্র তার সত্য তাতেই বিধৃত
অনিকেত সে নচিকেত।

তার পরিচয় ভোগে নয়, ত্যাগে নয়
পাপে পুণ্যে, ক্ষমায় ঘৃণায়, বিশ্বাসে অবিশ্বাসে
সে মধুর, সে বিধুর, সে প্রিয়ার কণ্ঠবিলগ্ন,
তার শক্তি চলৎমতী, যৌবনবতী, মধুমতী,
সে পন্থী নয়, প্রতীক নয়, পথিক।
তার সার্থকতা রূপ থেকে রূপান্তরে
বহুর মধ্যে, বিস্তৃতিতে, ব্যাপ্তিতে
একজটার মন্দির থেকে সে চলবে সর্বজয়ার পাদপীঠে
সে শুধু নবী নয়, পুনর্নব
জৈব যাত্রায় পরমশৈব
চরম গোত্রহীন কিন্তু জারজ নয়,
বীজধাত্রী মায়ের কোলে সে জন্মেছে
হয়তো তারা-বিভাসিত রাত্রে
কিংবা প্রচণ্ড-দুপুরে
কিংবা কান্না-ভেজা বৈশাখী বিকালে
বা চুপি চুপি ভোরের বেলায় আলোর সাথী হয়ে
তির্যক সোনার রেখা যখন পড়ে,
আর দিনে দিনে জন্ম নিয়েছে নিজের মনে
ক্ষণে ক্ষণে একান্তে, এই তো আসল দ্বিজত্ব
এইখানেই সে কুলোত্তম আবার
তিলে তিলে তিলোত্তমাকে নিয়ে পুনর্গতিময়;
তার পদাবলীর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় কালের যাত্রায়
তাই তো সে মূর্ত শুধু জাগরণে
স্ফূর্ত শুধু বিচরণে।
তার সতন্দ্র স্বপ্নঘোরে ত্রিলোকে
ত্রিযাম নিয়ে তার উৎসব
ত্রিকাল-ব্যেপে তার কলরব
নিত্যতার মাঝে সে আবর্তিত

অত্যাচারে অবিচারে হয়তো অনাদৃত
তবু সে গণ্ডীর ভিতরে ও বাইরে
সীমার মধ্যে ও সীমানা পেরিয়ে
রিক্ত তবু পূর্ণ।
তার দৃষ্টির শেষ নেই
সৃষ্টির ছেদ নেই
কল্প থেকে কল্পান্তে তার কল্পনা ছুটেছে
যুগ থেকে যুগান্তে সে ধাবমান ;
এই সেদিন সে আঁচড় কেটেছে গুহাগুম্ফার গাত্রে
প্রদোষের ক্ষীণ মায়াতে
আজ সৃষ্টিছাড়া সে পৌঁছেছে অতিস্ফীত নগর-কায়াতে,
সে সাঁঝের প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় ছেঁড়া মহাভারত নিয়ে বসে
চোখের জলে সৃষ্টি করে নিজের জগৎ
আবার সভায় সমিতিতে বিচার করে, বিতণ্ডা করে, তর্ক করে,
বলে দৃপ্ত কণ্ঠে—আমি মানি না।
হয়তো রাতের গভীরে সে পথের দিশা খোঁজে
কালপুরুষ সিরিয়াস হোরাসের কাছে,
সে চঞ্চল হয় উন্মন হয়
গুরুর কাছে ছোটে, জ্ঞানীর কাছে জোটে,
সে অর্থ খোঁজে, অনর্থ বাধায়, সেতু বাঁধতে চায়
যা তার সীমার মধ্যে আর যা তার সীমার বাইরে ;
যুগ যুগ ধ'রে এই যুগলের অভিসারে
চলেছে মানুষ তার মানসীকে নিয়ে
মৃন্ময়ের মধ্যেই খুঁজেছে সে চিন্ময়ের সূত্রকে,
তার চোখে লেগেছে অঞ্জন, কণ্ঠ ভরেছে সুরে,
বুকে এসেছে মধু, হাতে নিপুণতা
সে গড়েছে, ভেঙেছে, শিল্পী হয়েছে—
সে ছুটেছে আকুল হয়ে ব্যাকুল হয়ে

মগ্ন হিমাদ্রির তুঙ্গ শিরে,
গুরুগর্জনা সাগরের গভীরে
জ্ঞানীর পাঠ-মন্দিরে, চাষীর মাঠে;
বিজ্ঞানীর বীক্ষণশালায় অণুর রহস্যসন্ধানে
পরমাণুর ষট্‌চক্র ভেদে,
তার তরে পাষাণী অহল্যারা জাগে
প্রতীক্ষায় ব'সে থাকে জরতী শবরীরা
উর্বশীর আশ্লেষ তুচ্ছ হয়।
তার কবিতা যেদিন লিখতে পারব, সেই চলন্ত মানব-মানবীর
সেই রূপকার রসদক্ষাদের
মিথ্যা অমৃতের যারা ভিখারী নয়
সত্যকার ভোগবতী যাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে
সৃষ্টি হয়েছে জায়মান নব নব রূপে
সেদিন তোমাদের সভায় আর একটিবার ডেকো—
তাদের স্মরণে আমার মদালসা কবিতাকে সবিতার মালা পরিয়ে দেব
তীক্ষ্ণ হবে সেই ঋগ্‌যুগের নগ্ন উর্বশী
রক্তিম হয়ে উঠবে তার অধর
মদিররভস আবেশে
বঙ্কিম হবে তার চাহনী
তনুতটের প্রতিটি কোণে অজানা অতনুর ধনুক টঙ্কার দেবে
ঝঙ্কার দেবে সুর
সাহানা সোহিনীতে
ছায়ানটের মায়াঘটে ভৈরোঁ হবেন উদাসী
মালকোশ মিশবে বিভাসে।
আর যে দিন চ'লে যাব, ক্লান্তপথের পান্থ, আমি,
পাথেয়হীন কবি
বরণ আমায় কেউ করে নি
জানি স্মরণও কেউ করবে না।

তবুও সেদিন আমার ব্রীড়াময়ী কবিতা
অক্ষম সুরেও যেন গান গায় সেই ক্রীড়াময় মানুষের,
সে মানুষ শাশ্বত কি বিশ্রুত
বৃহৎ কি মহৎ তা জানি না, কিন্তু নিরুপম,
সুখে দুঃখে, আশা আকাঙ্ক্ষায়
কামে কামনায় ভাবে ভালবাসায়
আনন্দের তৃপ্তিতে, ক্ষুধার আবিলতায়
মনের নিভৃত সাথী আমি যাদের
তাদের জন্য একবিন্দু নয়নের জল ফেলতে বলব না,
বলব না—এরা বড় দীন, বড় হীন, ক্ষমা কর ক্ষমা কর প্রভু,
বলব না—ভাষা নাই, ভাষা নাই, পাই নাই, পাই নাই,
আমার জীবনে তাই গভীর অন্ধকার
এত বড় অপরাধ যেন না করি, কারণ কত যে পেয়েছি
শুধু শেষ বেদননিবেদন জানিয়ে যাব
বিলুপ্তির গহিনে ডুবে যাবার আগে
তাদের যাত্রাবিচিত্র পথ গতিময় দ্যুতিময় হোক
আর রেখে যাব সেই হাসিকান্নার মাঝপথে
যাওয়া-আসার নাগরদোলায় দুলতে দুলতে
চাওয়া-পাওয়ার দোলন-কাঁপা হাতে
জীবন-দ্রাক্ষারসসিক্ত একটি রিক্ত নমস্কার
রক্ত-ক্ষরা
ঐ চৌমাথায়
আলো আর ছায়া যেথায় পাণি-গ্রহণ করছে পরস্পরের,
সবার পায়ের ধুলো যেখানে পুঞ্জীভূত,
মন ভরে ঘন করে আমার ক্ষীণ বন্দনগীতি
শেষ বারের মত
সেই অবন্ধনের বেদীতে
শত রোমাঞ্চিত গ্রন্থিতে।

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

## সন্ধ্যার সনেট

এখন গঙ্গার বুকে স্বচ্ছ অন্ধকার :
নেইকো পদ্মের আভা সে মসৃণ জলে—
মুছে গেছে জলছবি কোথায় অতলে :
দু-একটা নৌকা শুধু নিয়ে যায় ভার
কালো স্রোত কেটে কেটে। ম্লান ছায়া তার
বাঁকানো সে পাল, কাছে আসে যায় চ'লে
স্বপ্নের কুয়াশা মাঝে। কেবল বিরলে
দীর্ঘ সেতু গ'ড়ে তোলে নীল ধোঁয়াধার।

উপরে আকাশ-বৃত্ত—দৃষ্টির ওপারে
অমর নক্ষত্রগুলি হানিছে ইশারা ;
জেটির সংকেত-আলো জ্ব'লে ওঠে নীচে।

পৃথিবীর ছায়ানাট্য লুপ্ত হ'ল পিছে,
অবচেতনায় ডোবে চেতনার ধারা :
একা আমি অসহায় তরল আঁধারে।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

## তোমাকে নিয়ে

তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখি, মেয়ে,
কেন যে লিখি কেহ কি তাহা জানে ?
যখনি থাকি তোমার পানে চেয়ে,
তখনি মন ভরেছে গানে গানে।
তোমার চোখে যে আলোটুকু নাচে
সে আলো দেখি সাঁঝের তারকায়।
শেফালি হয়ে ফুটে তা সারা গাছে,
গহন-মনে স্বপন বুনে যায়।

তোমার কাছে পেলাম প্রতিদিন
অবাধ স্নেহ, অগাধ ভালবাসা।
আমার যত বাড়িয়া চলে ঋণ
তোমার তত বেড়েছে কাছে আসা।
অনেক বাধা রয়েছে হেথা জমা,
অশ্রুজলে ভিজেছে রাঙা ধূলি।
তুমিও হেথা রয়েছ, মনোরমা,
এখনো আমি সে কথা নাহি ভুলি।
চলার পথে নিজেরে ফিরে পাই,
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখি তাই।

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

# সংবাদ-সাহিত্য

আজ যদি রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দ কোনও ক্রমে একবার মাতৃভূমি বঙ্গদেশে পুনরাবতীর্ণ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহাদের বিস্ময়ের অবধি রহিত না। রামমোহন দেখিতেন, পূরা এক শত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া প্রচারিত ( ১৮১৫-১৯৫৪ ) তাঁহার বৈদান্তিক যুক্তিবাদ এমনই ফলপ্রসূ হইয়াছে যে বাঙালী সপ্তাহে সপ্তাহে দৈনিক সংবাদপত্রে রাশি-ও-লগ্নফল না দেখিয়া কোন কাজেই অগ্রসর হয় না। ভট্টাচার্যের সহিত বিচারে তাঁহার নিশ্চয়ই আর প্রবৃত্তি হইত না; কারণ তিনি দেখিতেন, এখন ঘরে ঘরেই ভট্‌চাজ; কাজেই ফিরিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না। যে বিদ্যাসাগর রামমোহনের গৃহে রামমোহনের মতবিরোধী কার্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাঁহার পুত্রকে প্রাচীরবিলম্বিত রামমোহনের চিত্রখানিকে পথের আবর্জনায় নিক্ষেপ করিতে বলিয়াছিলেন, তিনি আজ তাগাতাবিজ-মাদুলিকবচে বাঙালীর সর্বাঙ্গ অলঙ্কৃত দেখিয়া "শালারা উচ্ছন্নে যাউক" বলিয়া কাছাকোঁচার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই ঊর্ধ্বশ্বাসে এখান হইতে যে দিকে দুই চোখ যায়, সম্ভবত সাঁওতাল পরগনার

দিকেই, দৌড় দিতেন। এবং যে বিবেকানন্দ পরমহংসের শিষ্য হইয়াও গুরু-বাদকে ঘৃণা করিতেন, আজ বাংলা দেশের অলিতে-গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত গুরু গজাইতে দেখিয়া তিনি কন্যা কুমারিকায় গিয়া দ্বিতীয় বার সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ভারত মহাসাগর পার হইবার চেষ্টা করিতেন।

শুভ বর্ষারম্ভে সংবাদপত্র মারফৎ বর্ষফল জানিতে গিয়া রাশিফল, মাহুলিকবচ ও গুরুগৌরবে ঠেকিয়া স্বতই ওই তিন বাঙালীর কথা মনে হইল। এমনিতেই তো জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে, তদুপরি যদি রাশিফল দেখিয়া, তাবিজ ধারণ করিয়া এবং গুরুর পাদোদক পান করিয়া বাঙালীকে প্রত্যহ পথ চলিতে হয়, তাহা হইলে স্থাণুত্বেই বাঙালীর সিদ্ধি হইবে; মাড়বারী পাঞ্জাবী গুজরাটী মাদ্রাজী মারাঠী, এমন কি বেহারীরা পর্যন্ত তাহার মাথায় চাঁটি মারিয়া অগ্রসর হইয়া যাইবে। যাইতেছেও। বাঙালী আজ আর কোনও বিভাগে প্রধান নয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতে তাহার ইতিহাস পিছু হটিবারই ইতিহাস।

প্রতিবিধানের দায়িত্ব কাহার? কে বাঙালীকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে? সমাজ বলিতে কিছু নাই, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যক্তিগত স্বার্থ-সাধনে ব্যস্ত, দেশের সাধারণ মানুষের সহিত যোগবিরহিত হইয়া সাহিত্য আজ পঙ্গু, দেশের ছাত্রসমাজের নৈতিক চরিত্র এমনই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে সমগ্র শিক্ষা-বিভাগ শুধু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সামলাইতেই হিমসিম খাইয়া যাইতেছেন,—সবাই দাঁও মারিয়া ফোকটে কিস্তিমাৎ করিতে চায়, সমগ্র দেশ শেয়ার মার্কেট এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে পরিণত হইয়াছে, তাই এখানে পরিশ্রমের কোনও মূল্য নাই, ভাল কাজের কোনও পুরস্কার নাই। সততা সাধুতা বোকামি বলিয়া লাঞ্ছিত, দেশ জুড়িয়া মেড-ঈজির বাহার চলিতেছে; তাই গুরু, গণৎকার ও গ্রহাচার্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এখানে মানুষ নিশ্চেষ্ট থাকিবার সাধনায় রত। দেশ স্বাধীন হইয়াছে, কিন্তু দেশের মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াইবার অভ্যাস হারাইয়াছে। লোভ আছে প্রচুর, তাই বাহুতে কোমরে কবচের উপর কবচ এবং আঙুলে আংটির উপর আংটি চড়িতেছে—বগলামুখী, ধনদা,

কামদা ; নীলা, গোমেদ, পলা, ক্যাটস-আই। চাকুরি চাই—প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে তাহা অধিকার করিবার প্রয়োজন নাই, মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ ধারণ কর, রাস্, তাহা হইলেই কেল্লা ফতে। সমগ্র বাঙালী জাতির এই মনোভাব। কাজেই বাঙালীর ষাটহাজারী সত্তরহাজারী কাগজেও রাশিফল ফলিতেছে। তবে দুঃখের বিষয়, বাঙালী এই কথাটাই আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে, শিরে সর্পাঘাত হইয়াছে; তাগা বাঁধিবার আর জায়গা নাই।

* * *

অনেক চিন্তা করিয়া দেখিলাম, এখন প্রতিকারের একমাত্র উপায় স্বাধীন রাষ্ট্রের হাতে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শস্য উৎপাদন বা বন্যা নিবারণ ইত্যাদি সকলই গৌণ। বাঙালী জাতির মুখ্য প্রয়োজন এখন চরিত্র গঠন। বাঙালীর চরিত্র একেবারেই রসাতলে গিয়াছে, ধীরে ধীরে আবার তাহা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জন্য শুধু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নয়, অন্তত পঞ্চদশবার্ষিক পরিকল্পনা চাই। নিষ্ঠার সঙ্গে, ধৈর্যের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধানদের অগ্রসর হইতে হইবে। প্রথম পাঁচ বৎসর পাঠশালা বা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। নূতন বাংলার এইখানেই হইবে গোড়াপত্তন—নৈতিক চরিত্রের ইহাই হইবে ভিত্তিভূমি। যে বাঙালী একদিন কাজকে ডরাইবে না, পরীক্ষায় বা যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভয়ে অগ্রসর হইবে, ঘুষ লইবে না, আত্মীয় তোষণ করিবে না, দেশের স্বার্থকে সকলের উপরে স্থান দিবে, সক্ষম সবল মজবুত হইবে, সেই নূতন বাঙালী এইখানেই জন্মলাভ করিবে। প্রচলিত পুরাতন পচা বিষাক্ত সংস্পর্শে যদি এই নূতনের ক্ষতি হয়, তাহা হইলে সর্পদষ্ট আঙুলের মত সেই পুরাতনকে বর্জন করিতে হইবে। এই ভাবে প্রথম পাঁচ বৎসর, দ্বিতীয় পাঁচ বৎসর ও তৃতীয় পাঁচ বৎসর অত্যন্ত সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়া, সর্বপ্রকার ঘুণ বা বিনাশের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া ধীরভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পনেরো বৎসর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা যাঁহাদের হাতে থাকিবে, তাঁহাদিগকে নির্বিঘ্নে থাকিতে দিতে হইবে। নির্বাচনের দ্বারা পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনে

ছাত্র-সমাজের অবাধ নিয়োগ এখন ঘটিতে দেওয়া হইবে না। ছাত্রেরা চরিত্রে ও শিক্ষায় দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠ হইলে অন্য কথা। আমরা ইঙ্গিতমাত্র দিলাম। বর্তমান রাষ্ট্রপতিরা চিন্তা করিয়া কাজ আরম্ভ করিবেন।

* * *

স্বাধীনতার পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা একটু তাড়াহুড়ার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, তাই অনেক ক্ষেত্রে ঘোড়ার সামনে গাড়ি জুতিয়া দেওয়াতে নানা গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে। চুরি ঘুষ ও ফাঁকিবাজির পূর্বসংস্কারযুক্ত লোকেদের উপর কর্তৃত্বের ভার পড়াতে অনেক পরিকল্পনা বানচাল হইয়াছে এবং দরিদ্র দেশের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হইয়াছে। এই কলঙ্কের ইতিহাস আমরা প্রত্যহই সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি। যদি গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা হইত, তাহা হইলে এমনটি হইতে পারিত না। প্রথম পাঁচ বৎসর দেশের শিশু কিশোর ও তরুণদের সুশিক্ষার দিকে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলে দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে অন্যান্য পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য সাধু শিক্ষিত ও কর্মক্ষম কর্মীর অভাব হইলেও কাজ চালানোর মত লোক পাওয়া যাইত। তবে তৃতীয় পাঁচ বৎসরে কাজের লোকের অভাব যে একেবারেই হইবে না সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। চিত্তরঞ্জনে গোড়া বাঁধিয়া কাজ আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া চিত্তরঞ্জন যতটা ফলপ্রসূ হইতে পারিয়াছে, দামোদর উপত্যকার কাজ অব্যবস্থার জন্য ঠিক ততখানি ফলদায়ক হয় নাই; অপব্যয়ও অনেক হইয়াছে। এই দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা অবহেলিত থাকিতে দিলে অপব্যয় উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে, ঠিক জায়গায় ঠিক লোকটি পাওয়া যাইবে না; টুটা-ফুটাদের লইয়া কাজ চালাইলে আসল কাজই ফাঁসিয়া যাইবে। মাধ্যমিক শিক্ষাসংস্থার উপর শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া গবর্মেণ্ট নিশ্চিন্ত আছেন; কিন্তু এই সংস্থার বহু স্থলে তৈলহীন চাকার যে আর্তনাদ উঠিয়াছে তাহাতে অনুমান হয়, পুরাতন পাপ এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। এখানে যে সক্ষম হাতে কাজ চলিতেছে না এবং দলাদলির অন্তঃসলিলা ফল্গু যে বাহিরেও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে তাহার প্রমাণ, ছিদ্রপথে গোপনীয় প্রশ্নপত্রের

বারংবার আত্মপ্রকাশ। বেশ বুঝা যাইতেছে, একদল আর একদলকে অপ্রস্তুত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য কৌশলে এই কার্য করিতেছেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ঠিক এমনটি ঘটিয়াছিল। মুষ্টিমেয়-কয়েকজনের ব্যক্তিগত কলহ সমগ্র জাতিচরিত্রকে যে আরও হীন হইবার অবকাশ দিতেছে, ইহা উপেক্ষা করিবার মত ব্যাপার নহে।

বাংলা দেশের যে সকল স্থানে কম্যুনিটি প্রজেক্ট অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের ইতিহাসও অনুরূপ কারণে শোচনীয়। অক্ষম লোকের হাতে পড়িয়া পর্বতপ্রমাণ অপব্যয় হইয়াছে; সাধারণ গ্রামবাসীকে আকৃষ্ট করিবার মত কাজ কোথাও হয় নাই। হয় নাই, কারণ শিক্ষিত চরিত্রবান কর্মীর অভাব। যেখানে পুরাতন শিক্ষায় শিক্ষিত রাষ্ট্র-প্রধানদের মাতাল পরদারাসক্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে শাস্তি দিবার সাহস নাই, প্রকাশ্যভাবে শান্তিরক্ষীর দল ডাকাতি করিয়া ও খুন করিয়া নিষ্কৃতি পায়, সেখানে যে গোড়া ধরিয়া নূতনভাবে নূতন পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে, তাহা কি বার বার বলিয়া দিতে হইবে? ইহা আমাদের নিজেদেরই গলদ, নিজেদেরই লজ্জার কথা, পাঁচ কাহন করিয়া বলিবার ব্যাপার নহে। ইঙ্গিতে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, চরকা ও অশোকচক্রের ঝাণ্ডা তুলিয়া যে স্বাধীনতাকে আমরা জয়যুক্ত করিয়াছি, সে স্বাধীনতা স্টীলবেষ্টনীর ফাঁদে পড়িয়া এখনও আর্তনাদ করিতেছে; খদ্দরপরিহিত আমাদের শিরোমণিরা ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধুই দেখিতেছেন, কিছুই করিতে পারিতেছেন না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই অসহায় অবস্থা হইতে মুক্ত হইবার উপায় সর্বাগ্রে করিতে হইবে। জাতির জীবনে পাঁচ বৎসর খুব অধিক সময় নহে; ভুলে-ভরা প্রথম পাঁচ বৎসরকে আমরা ভুলিতে চাই, কিন্তু দ্বিতীয় পাঁচ বৎসর যেন না ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত নৃত্যনাট্য আকাদেমি স্থাপন চিত্তচমৎকারী রূপ লইয়া দেখা দিয়াছে। কেন্দ্রের শিক্ষা-বিভাগ প্রথম পাঁচ বৎসরে যে বাদশাহী খেল দেখাইয়াছেন, ইহা তাহারই রকম-ফের। হাতে মাথা কাটা যেমন বাদশাদের অধিকারভুক্ত ছিল, যে-সে

মাথায় শিরোপা তুলিয়া দেওয়াও তেমনই তাঁহাদেরই একচেটিয়া। কিন্তু স্বাধীন গণতন্ত্রে এই বাদশাহী আচরণ সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করিতে পারে। মানুষকে সাধারণ ভদ্রভাবে শিক্ষিত করিবার পয়সা যে স্টেটের নাই, সেই স্টেটে গোঁফে আতর মাখিয়া বাইজীর নৃত্যে যাঁহারা মশগুল হইতে চাহেন তাঁহারা সহৃদয় নহেন। এই কাজ প্রথম তিন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত হয় নাই। অক্ষর-পরিচয়হীন দেশকে আগে অক্ষরটাই শেখানো হউক। প্রাথমিক শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন দেওয়ার ক্ষমতাই যদি না থাকে, গুণীকে শিরোপা দেওয়ার ক্ষমতাই বা আসে কোথা হইতে? ইহাতে দেশের উপকার কবে হইবে জানি না, কিন্তু এখনই গো-মড়কে মুচির পার্বণ দেখিয়া ভীত হইয়াছি।

—

বিশ্বভারতীতে শেষ পর্যন্ত বাউল ও তান্ত্রিকের লড়াইয়ে তন্ত্রই জয়যুক্ত হইল। রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত রাজত্বে এরূপ হওয়ার কথা নয়। তবে আমরা ধনঞ্জয় বৈরাগীর চেলা, অপেক্ষা করিতে জানি। অপেক্ষা করিয়াই থাকিব।

—

ইংরেজের শয়তানী ভারতবর্ষে আড়াই শত বৎসরের শাসন-শোষণেই নিঃশেষিত হয় নাই। যে ফরাসী ও পোর্তুগীস ছিটমহলগুলি সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের নিঃশেষে হজম করিয়া লওয়া উচিত ছিল, সেগুলি কেন রহিয়া গেল—ইতিহাসের এই প্রশ্নটার এতদিন জবাব পাই নাই। এখন বুঝিতেছি, দূরদর্শী ইংরেজ আমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্যই ওইগুলিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছিল। গোপালদা বাল্যকালে মুখস্থ-করা ভূগোল আওড়াইয়া যখন আমাদিগকে বলিতেন, গোয়া দমন due অর্থাৎ গোয়াকে দমন করার সময় আসিয়াছে, তখন আমরা হাসিতাম। এখন বুঝিতেছি ইহা হাসিবার ব্যাপার নয়; স্বাধীনতা পাইবার পরেই বলিয়াছিলেন, চেড়ীটাকে রাখিও না, বাঁধা দাও—pawn the চেড়ী। আজ বুঝিতেছি, তিনি তিব্বতে আত্মগোপন করিয়া ভালই করিয়াছেন।

—

বিধানচন্দ্রের কল্যাণী এবং কল্যাণীর বিধানচন্দ্র। কল্যাণীর কল্যাণের জন্য বিধানচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সেখানে স্থানান্তরিত করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু যে হাজার হাজার দরিদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থসন্তান কলিকাতায় বাড়ির ভাত খাইয়া কোনওপ্রকারে লেখাপড়া শিখিয়া থাকে তাহাদের কথা তিনি চিন্তা করেন নাই। আরও হাজার হাজার ছাত্রের কথা জানি, যাহাদের ট্যুইশনির রোজগারে শুধু তাহাদের শিক্ষাই নির্বাহ হয় না, পরিবারও প্রতিপালিত হয়। তাহারাই বা করিবে কি? বইয়ের সমস্যাও আমাদের মুখ্যমন্ত্রী অচিরাৎ মিটাইতে পারিবেন না; আমরা জানি হাজার হাজার ছেলেমেয়ে কলিকাতার বিভিন্ন পাঠাগারে বসিয়া পাঠ্য ও পাঠ্যবহির্ভূত পুস্তক পাঠের সুযোগ গ্রহণ করে। কল্যাণীতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিতকরণই ধর্মঘট ও ছাত্র আন্দোলন নিবারণের একমাত্র উপায় নয়।

—

স্বত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এখন বিভিন্ন পালোয়ান খাঁড়ার ঘা মারিতেছেন। সেদিন 'ভারতবর্ষে' দেখিলাম তরুণ শ্রীগোপাল রায় প্রমাণই করিয়া ফেলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে রেঙ্গুনে যে মানপত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা শরৎচন্দ্রের রচনা—ব্রজেন্দ্রনাথের এই উক্তি ভ্রান্ত, কারণ ওই মানপত্রের ভাষা নাকি শরৎচন্দ্রের হইতে পারে না। ভাষা লইয়া দীর্ঘকাল কারবার করিতেছি। বহুভাষাভাষী শরৎচন্দ্রকে অধ্যয়নও কম করি নাই, কিন্তু মানপত্রটির মধ্যে এমন কিছুই অশরৎচন্দ্রীয় ভাষা নাই যাহাতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে, উহা শরৎচন্দ্রের রচনা নহে। ব্যক্তিগত সাহিত্যবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া প্রবীণ ব্রজেন্দ্রনাথকে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 'বর্ণপরিচয়ে'র গোপালোচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় পালোয়ান চতুর্থ খণ্ড প্রথম সংখ্যা 'ইতিহাস' ত্রৈমাসিক পত্রিকার লেখক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'ইতিহাস'কে একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণা পত্রিকা বলিয়াই জানিতাম। এখন দেখিতেছি, ইহা যে কোনও সাধারণ পত্রিকার ন্যায় অসতর্ক, এবং অবাধে ভুল তথ্য ইহাতে প্রচারিত হয়। পুরাতন পুস্তকের নামের বানান যথাযথ রাখিবার

কোনও প্রয়াসই ইহাতে করা হয় না। আমরা উক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথের "১৮০৫ সালের একখানি গ্রন্থ" প্রবন্ধটি প্রসঙ্গেই এই সকল কথা বলিতেছি। ইনি নিজে কাচের ঘরে বাস করিয়া ব্রজেন্দ্রনাথের পাকাপোক্ত ইমারতের দিকে লোষ্ট্রাঘাত করিয়া খ্যাতি অর্জন করিতে চাহিয়াছেন; ভুলিয়া গিয়াছেন, ফাঁকি ও চালাকির উপর মহৎ প্রতিষ্ঠা কখনই হয় না। এই প্রবন্ধটি রচনার কারণ তিনি নিজেই নির্দেশ করিয়াছেন এইভাবে—"আমরা শুধু একখানি বই নিয়ে আলোচনা করবো যার পাণ্ডুলিপিখানি সম্প্রতি আমার হাতে এসেছে। এটি রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং'।" পাণ্ডুলিপিখানি যে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এতাবৎকাল তাঁহার পিতার হেফাজতেই ছিল সে কথা উল্লেখ করিতেও তিনি ভুলেন নাই; অথচ অনুযোগ করিয়াছেন, পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে কোন লেখকই উল্লেখ করেন নাই। যাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি হইয়া আছে, তাহা অন্যের গোচরে না আসাটা অপরাধ নয়। আর এই পাণ্ডুলিপিটি যে মুদ্রিত পুস্তকেরই একটা সাধারণ নকল নয় তাহাই বা কে হলফ করিয়া বলিতে পারে? গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের নামটাই একবারও ঠিক ভাবে লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার প্রবন্ধের ছয় পাতার মধ্যে ভুলের ছয়লাপ করিয়াছেন; তাই হাসি পাইল তাঁহার ব্রজেন্দ্রনাথের ভুল দেখাইবার চেষ্টা দেখিয়া। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত ২ সংখ্যক গ্রন্থ 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং' ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩৪৩ ভাদ্রে বাহির হয়। পরে ইহার একাধিক পুনর্মুদ্রণও হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথ কোথাও বলেন নাই, তিনি প্রথম সংস্করণের বিবিধ অশুদ্ধ পাঠই সর্বত্র বজায় রাখিয়াছেন। তিনি যে ১৮০৫ হইতে ১৮৫৭ সালের মধ্যে প্রকাশিত অনেকগুলি সংস্করণ মিলাইয়া পাঠনির্ণয় করিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি। সৌম্যেন্দ্রবাবু যে পাঠের ২০ দফা ভুল দেখাইয়াছেন তাহার একটিও ভুল নহে, সব কয়টিই সৌম্যেন্দ্রবাবুর বুঝিবার ভুল। দুইটি দৃষ্টান্ত দিলেই তাঁহার ভুল প্রকট হইবে। ব্রজেন্দ্রবাবুর সংস্করণে, ১ম সংস্করণে ও পাণ্ডুলিপিতে "রেতীতে" কথাটি আছে, context এইরূপ, "রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন

মহারাজ এ স্থানের নাম বালুচর গঙ্গার রেতীতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে।" একটা ভাল অভিধান খুলিয়া দেখিলেই গোল মিটিয়া যাইত, গবেষক মহাশয় বুঝিতে পারিতেন "রেতীতে" মানে "বালুময় জমিতে"। কিন্তু মামলা এত সহজে মিটিয়া গেলে তো গবেষণা হয় না, সুতরাং তিনি অনায়াসে লিখিয়া বসিলেন, "কথাটি হবে তীরেতে" এবং সেই সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথকেও দুই ঘা মারিলেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত "বাত্যাগার", প্রথম সংস্করণে ও পাণ্ডুলিপিতে শব্দটি আছে "বাত্যোত্থম"—context এই "তৎপরে অপূর্ব্ব অট্টালিকা তৎপরে বাত্যাগার তার পরে অতি উচ্চ অট্টালিকা তাতে ঘড়ি…"। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে "বাত্যাগার"ই ঠিক পাঠ এবং প্রথম সংস্করণের পরে অনেক সংস্করণেই "বাত্যাগার" আছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'ইতিহাসে'র কৃপাকটাক্ষে "গুণ হইয়া দোষ হইল ব্রজেন্দ্র-বিদ্যায়।" রমেশবাবু আরও তালিম দিয়া বাজারে গবেষক ছাড়িলে দেখিতে শুনিতে শোভন হয়।

তৃতীয় পালোয়ান ব্রজেন্দ্রনাথের দীর্ঘকালের সহকর্মী শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। তিনি ১৩৬১ বৈশাখের 'প্রবাসী'তে "সে যুগের ধাতু-খোদাই ও কাঠ-খোদাই শিল্প" সম্বন্ধে একটি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফাঁদিয়া ভূমিকায় বলিতেছেন, "খোদাই-চিত্র সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে।…ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতির বিষয় অনুসন্ধানকালে এইরূপ আরও বহু নূতন তথ্য আমার গোচরে আসিয়াছে। পূর্ব্ব আলোচনাসমূহের পরিপূরকরূপে সেগুলি এখানে পরিবেশন করিব।" পূর্ব আলোচনা একা হতভাগ্য ব্রজেন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন 'প্রবাসী' এবং 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র পৃষ্ঠায়। কিন্তু পরিপূরক হিসাবে যোগেশচন্দ্র যে তথ্যগুলি পরিবেশন করিয়াছেন, কিঞ্চিৎ যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখিলে দেখিতে পাইতেন, তাহার প্রায় সকলগুলিই ব্রজেন্দ্রবাবু পূর্বেই পরিবেশন করিয়াছেন। যোগেশচন্দ্রের চিত্রগুলিও অধিকাংশই পূর্বপরিবেশিত। বন্ধুকর্তৃক বন্ধুকে কবর দেওয়ার দৃষ্টান্ত মহাকবি শেক্সপীয়র দেখাইয়াছেন, এ যুগেও আমরা দেখিতেছি।

হায়, হায়, পঁচিশে বৈশাখের পূর্বেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে হারাইলাম, তাঁহাকে মার্ক্সবাদীরা ধরিয়া লইয়া গেল। "রবীন্দ্রনাথের চিত্রলেখায় মার্ক্সীয় দ্বান্দ্বিকতা" আবিষ্কার করিয়া একজন বাচ্চা বাঙালী মার্ক্স লিখিতেছেন :

"রবীন্দ্রনাথ নিজে মার্ক্সবাদের পঠন-পাঠন করেন নি। তবে, সত্যসন্ধানী ঋষিকবির বুদ্ধি ও হৃদয় যে একদা মার্ক্সবাদের প্রয়োগতীর্থে আত্মনিবিষ্ট হয়ে ভক্তি-বিনত হয়েছিল,—তার প্রমাণ আছে 'রাশিয়ার চিঠি'তে।...মার্ক্স ছিলেন কবি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দার্শনিক। সচেতন-ভাবে মার্ক্সীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রস্তাবনাকে এড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ যে সচেতন না হোক, অচেতনভাবেও মার্ক্স সিদ্ধ দ্বান্দ্বিকতাকে বহুক্ষেত্রে সসম্মানে স্বীকার করেছিলেন এমন সহস্র নজির তাঁর সাহিত্যে বিদ্যমান।...মার্ক্স বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণে যে সামগ্রিক সত্যের রহস্যোন্মোচন করেছিলেন তারই অংশবিশেষের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্যে রবীন্দ্রনাথের সত্যান্বেষী কল্পনামুগ্ধ চোখদুটিও বহুবার কৃতার্থ হয়েছে।"

আমরাও কৃতার্থ হইলাম। এমন মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি যাঁহার, তাঁহাকে কিনা "পাতি বুর্জোয়া" বলিয়া "সামন্ততন্ত্রের কবি" বলিয়া "হোলসেল" বাতিল করিতে চাহিয়াছিল! যাক্, রবীন্দ্রনাথ খুব বাঁচিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরেই লেখক বলিতেছেন,

"...উদাহরণেই ব্যাপারটির একটি সুস্পষ্ট ধারণা হবে।

'একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।'—সোনার তরী।

"ছোট্ট এই এক টুকরো উদাহরণটিতে যে চিত্রের চিত্রাতিক্রান্ত ব্যঞ্জনার মধুর হৃদয়-পীড়া রয়েছে তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এখানে চিত্রী যে কৌশল অবলম্বন করেছেন তা' একটু তলিয়ে দেখা যাক। একটি চিত্রের মধ্যে এখানে দুটি বিষয়ের ঘনিষ্ঠ অবস্থিতি। এক সংগে একখানি ছোট ক্ষেত আর কবির নিজস্ব একক অস্তিত্ব, অপর দিকে একটি সামগ্রিক বিরাট পটভূমি,—তা' হচ্ছে বিস্তীর্ণ জলরাশির বংকিম লীলাশীলতা। দেখুন দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তুর অতি

নিকট সন্নিবেশ, যারা কিনা চারিত্রিক ভাবে পরস্পর বিরোধী। একটি ছোট ক্ষেত বা কবির নিঃসংগ একাকীত্ব, একটি বিশেষ সীমিত তুলিকালাঞ্ছন, অন্য দিকে চারিদিকের বাঁকা জলের ক্রীড়াচিত্রে একটা সামগ্রিক নির্বিশেষ ঔদার্যের বর্ণলিপি। এই দুই বিপরীতের অনিবার্য সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে যা জন্ম নিচ্ছে, তাই তৃতীয় প্রতিক্রিয়া, তারই আর এক নাম ব্যঞ্জনা,—যা' পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত এবং যার আংগিক মার্ক্সবাদসম্মত।"

দক্ষিণ কলিকাতায় অগাধ জমি এবং বর্ধমান জেলায় ধানকলের মালিকের নামে কলেজ যে ইহারই মধ্যে এমন সুচারু হইয়া উঠিয়াছে, তাহা কে জানিত! অধ্যাপকদের লেখা দেখিয়াই বুঝিতেছি এবং লেখার ভাষা ও 'ভংগি' দেখিয়া আরও বুঝিতেছি—

"গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা"।

—

কলেজ চুলায় যাক, রবীন্দ্রনাথকে লইয়া আমাদের কথা। তিনি যে ফাঁকি দিয়া কায়দা করিয়া কৌশল করিয়া আমাদের বাংলা সাহিত্যে এতখানি মার্ক্সবাদ ঢুকাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা থাকিলে তাঁহাকে লইয়া এতকাল এত মাতামাতি অন্তত আমরা তো করিতাম না। এই বৈশাখ মাসেই তো অনেক কাণ্ড করিয়াছি এবং করিব। আমাদের অন্ধবিশ্বাস ছিল, তিনি ঘোরতর ঈশ্বরবিশ্বাসী লোক ছিলেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপাসক আর আমরা দেখি নাই। যাহা হউক, আমাদের ধারণামতই তাঁহার আর একটি কবিতা শোনা যাক—

"খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাখি বলে—খাঁচার পাখি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।

খাঁচার পাখি বলে—বনের পাখি, আয়
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখি বলে—না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখি বলে—হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব ?"

পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক কলিকাতার গ্র্যাণ্ড হোটেলে গত ২১শে বৈশাখ মঙ্গলবার খাঁচার পাখিদের সহিত মিলিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

"আজ আমার প্রাণে আর কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। আজ আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, আমি বাংলা দেশের, বাংলা ভাষার, বাঙালীর—বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করিতে চাই।···বিশ্বাস করুন, পূর্ববঙ্গে আমি আপনাদের চৌকিদার হইয়া আছি।"

বনের পাখির এই উদার উদাত্ত ঘোষণায় খাঁচার পাখিরা কতখানি বিচলিত হইয়াছেন, সংবাদপত্রে তাহা প্রকাশ নাই।

—

রাশিফল দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, পঞ্জিকা দিয়াই শেষ করি। ১৩৬১ সালের তিনখানি পঞ্জিকা আমরা উপহার পাইয়াছি—১। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা, ২। জগজ্জ্যোতি পঞ্জিকা ও ডাইরেক্টরী ও ৩। বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং লিমিটেডের পঞ্জিকা। তিনটিই বাঙালীর ঘরে ঘরে রাখিবার উপযুক্ত—যে কোন একটি বা দুইটি রাখিলে রাষ্ট্রগত বর্ষফল দেখিয়া ভয় জন্মিতে পারে। তিনটি একত্রে কনসাল্ট করিলে ভয় কাটিয়া যাইবে।

—

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ৬৫২০

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

# আমার সাহিত্য-জীবন

## দশ

এদিকে তখন রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। কলকাতায় সোরগোল উঠেছে। দলে দলে লোকজন পালাচ্ছে। দেওঘর মধুপুর গিরিডি ঝাঁড়গ্রাম ঘাটশিলা বহরমপুর বর্ধমান সিউড়ি বোলপুর শান্তিনিকেতন—এ সব ভর্তি ক'রে পাড়াগাঁ পর্যন্ত চাপ গিয়ে পৌঁছেছে। 'ড্যাঙ্কি' শব্দটা তখন সদ্য আমদানি হয়েছে সাহিত্য-ক্ষেত্রে। ব্ল্যাক-আউটের কড়াকড়িতে সন্ধ্যের পর কলকাতা শহর থমথমে হয়ে ওঠে। আমি তারই মধ্যে শনি রবি বুধ বৃহস্পতি নাট্যভারতীতে হাজিরা দিই। তখন সেখানে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'পি. ডব্লু. ডি.' চলছে। আমার বইখানি অহীনবাবুকে দেওয়া হয়েছে, কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ শিশির মল্লিক ও সতু সেন আমাকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনি কি পরিবর্তন করতে বলেন, কি চান জানতে বলেছেন।

প্রায় মাস চারেক আমি আনাগোনা করেছি। গিয়ে অহীনবাবুর মেকআপের টেবিলের পাশে বসতাম। চুপ ক'রেই ব'সে থাকতাম। কোনদিন বই সম্পর্কে কথা হ'ত, কোনদিন হ'ত না। অহীনবাবুর কাছে লোকজনের আসা-যাওয়ার তো বিরাম থাকত না। গুণমুগ্ধ লোকেরা আসতেন, সিনেমার লোক আসতেন, অন্য অভিনেতারা আসতেন। আলাপ-আলোচনা হাস্য-পরিহাস চলত। তার মধ্যেই অহীন্দ্রবাবু আপনার কাজ ক'রে যেতেন, পেন্সিল নিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে কপালে নাকের পাশে দাগ টানতেন। পাউডার পাফ মুখে বুলিয়ে নিতেন। পোশাক বদলাতেন। এ সব অবশ্য সব বড় অভিনেতাকেই করতে হয়, করেনও। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর কাজকর্মের ধারার মধ্যে যন্ত্রে কাজ ক'রে যাওয়ার ধারার মত একটি ভঙ্গি আছে, এবং অহীন্দ্রবাবুর কথাবার্তা চলাফেরার মধ্যে একটি এমন বৈশিষ্ট্য আছে, যা একদিনেই চোখে পড়ে, কঠিন অভ্যাসে আয়ত্ত করা সংযম, কঠিন অভ্যাসের জন্যই যেন কণ্ঠস্বর বেশি শান্ত ও মৃদু, বাক্‌বিন্যাস অতি পরিচ্ছন্ন ও পরিমিত। এমন কি প্রবল

কৌতুকে কি প্রচণ্ড উত্তেজনায় যখন ধমনীতে রক্তের চাপ অন্তরের উত্তাপ স্বাভাবিকতা অতিক্রম ক'রে উচ্চতম হয়ে উঠেছে, তখনও বাইরে অহীন্দ্র-বাবু অল্প খানিকটা হেসে বা মৃদু স্বর উচ্চ না ক'রে শুধু দৃঢ় ক'রে তুলে কথা বলেন; নিজেকে স্থির রাখেন। অভিনয়ের মধ্যে অহীন্দ্রবাবুর ইমোশন দর্শকদের অভিভূত করে, কিন্তু সাধারণ সময়ে অহীন্দ্রবাবুর কথায় বার্তায় আচারে আচরণে ইমোশন আশ্চর্যভাবে পরাভূত হয়ে থাকে। এমন মানুষকে তাগিদ দিয়ে সচেতন ক'রে তোলা সহজ নয়। এর মধ্যে আর একটি পরিচয় তাঁর পেয়েছিলাম; বৈষয়িক জ্ঞান এবং হিসাবী মনের পরিচয়। সে সময় অহীনবাবুর পিতৃপুরুষের বাসভূমি, শান্তিপুর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে বাগআঁচড়া গ্রামে নতুন বাড়ি তৈরি করাচ্ছিলেন তিনি। এখান থেকে মাল মসলা সিমেণ্ট চুন লোহা কাঠ দরজা জানলা চালান যাচ্ছিল স্টীমারে বা নৌকায়। এ সব চালানের সমস্ত যোগাড়যন্ত্র ব্যবস্থা ক'রে দিতেন নাট্যভারতীর ম্যানেজার বিজয় মুখুজ্জে মশায়। এই এক বিচিত্র মানুষ! কতদূর পড়াশোনা কি সামাজিক প্রতিষ্ঠা সে আমি জানি না, কিন্তু থিয়েটার-জগতে ভদ্রলোক যেমন কার্যদক্ষ তেমনি প্রতাপশালী। আর একটা দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল। সেটা হ'ল কলকাতার পুলিস বিভাগ। পুলিস কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার, ইনস্‌পেক্টর—কার সঙ্গে আলাপ ছিল না বিজয়বাবুর! শুনতাম, টেগার্ট সাহেবের সঙ্গেও বিজয়বাবুর আলাপ ছিল। বহুজনের বহু সংকটে বিজয়বাবু দরবার নিয়ে গেছেন টেগার্টের কাছে, কার্যোদ্ধার ক'রে এসেছেন। গুণ্ডা-জগতেও বিজয়বাবুর যথেষ্ট খাতির এবং পরিচয় ছিল। তাদেরই বা কাকে না চিনতেন! যখনকার কথা বলছি, তার অনেক পরের একটি ঘটনার কথা বলছি। তখন আমার 'দুই পুরুষে'র মরসুম চলছে নাট্যভারতীতে। একজন খ্যাতনামা অভিনেতার ছোট ভাইয়ের বাইসিক্ল চুরি গেল। গেল কলাবাগান এলাকায় অর্থাৎ নাট্যভারতী মঞ্চের কাছাকাছি জায়গায়, কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের দুটো বাজারের মাঝের রাস্তায় অথবা মেছোবাজার স্ট্রীটে একটা চায়ের দোকানের নীচে বাইসিক্ল রেখে আড্ডা দিয়ে চা পানের

অবকাশে তালাবন্ধ বাইসিক্লখানি লোপাট হ'ল। ভাল বাইসিক্ল এবং নতুন জিনিস। ভাইয়ের কাছে বিবরণ শুনে অভিনেতাটি বিজয়বাবুকে বললেন, দেখুন দেখি, কিছু টাকাও দিতে আমি রাজী আছি, জিনিসটা যদি উদ্ধার হয়।

বিজয়বাবু ঢুকে গেলেন কলাবাগানের গলির মধ্যে। নাট্যভারতীর পাশ দিয়ে রাস্তা চ'লে গেছে বস্তির ভিতরে। সঙ্গে নিলেন নাট্যভারতীর গায়েই কুলুঙ্গির বিড়ির দোকানের দোকানীকে। ফিরে এসে বললেন, ও-বেলা খবর দেবে। বোধ করি পরের দিন বাইসিক্লটি ফেরত এল। মধ্যে অভিনেতাটিকে একবার যেতে হ'ল কলাবাগানের ভিতরে বাইসিক্লখানি সনাক্ত করবার জন্যে। কারণ সেদিন নাকি তিনখানি বাইসিক্ল এসে জমেছিল, তাঁকে চিনে দিতে হ'ল কোন্‌খানি তাঁর ভাইয়ের। মীনা পেশোয়ারীও তাঁর অচেনা লোক ছিল না। বিজয়বাবু থিয়েটার-জগতের পুরনো লোক, ওই ম্যানেজারী অর্থাৎ বাইরের কাজের দেখা-শোনা—সে টিকিট বিক্রি থেকে শিফ্‌টারদের কাজ পর্যন্ত। বই পছন্দ বা রঙ্গমঞ্চের অন্তরলোকের আসল কাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ছিল না। সে যোগ্যতাও ছিল না তাঁর। তবে ভিড় সামলাতে, হাঙ্গামা হ'লে হুঙ্কার ছেড়ে অকুতোভয়ে দাঁড়াতে তাঁর জুড়ি ছিল না বা নেইও বোধ হয়। এই বিজয়বাবু আসতেন এক সময় এবং ব'লে যেতেন, কি ব্যবস্থাদি হ'ল। অহীনবাবু শুনে একেবারে হিসেব করা কথা যা যা করবার তা ব'লে দিতেন। মধ্যে মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন আমাদের গ্রামের কথা। স্বর্গীয় নাট্যকার, আমার বাল্যকালের সাহিত্যজীবনের গুরু নির্মলশিব বাবুর কথা এবং আরও দু-তিন জনের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তাঁরাও নাট্যকার হিসেবে নাটক নিয়েই তাঁর কাছে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার নাটকের বিষয়ে কোন আলোচনা করতেন না। অবশেষে একদিন বললেন, আপনার নাটক পড়লাম।

আমি চুপ-ক'রে রইলাম, তাঁর মন্তব্য শোনবার জন্যে প্রতীক্ষা করলাম নীরবে।

তিনি আমাকে নীরব দেখে বললেন, জোর আছে লেখার। নাটক জোরালো।

আবার একটু স্তব্ধ থেকে বললেন, কিন্তু টেকনিক টিটমেণ্ট পুরনো। আর—

আর নাটকটি ভারী।—বেশ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হয়ে রইলেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, দর্শকদের—শ্রোতাদের রুচির দিকে লক্ষ্য আমাদের রাখতে হয়। আর রুচি অনুসারেই নাটক বলুন, গান বলুন, অন্তত আমোদ-প্রমোদের জিনিস, বিলাসের জিনিস চলে। সে দিক দিয়ে—। আবার চুপ করলেন তিনি।

আবার বললেন, লক্ষ্য করেছেন আজকালকার গানের আসরের ঝোঁক? সুরে ভাবে কোন্ দিকে তার গতি? ধ্রুপদ খেয়াল ঘরানা গানের কথা বাদ দিন; ও হ'ল সমঝদারদের শোনবার জিনিস। মুক্তাভস্ম দিয়ে সাজা পান খাবে সে-ই, যে পোলাও কালিয়া খায়, জাফরান খায়, গরমমসলা হজম করে। সাধারণে খেলে তার শরীরে সইবে না, তার জিভেও ভাল লাগবে। ধ্রুপদ খেয়াল সেই জিনিস। এখন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুলের গান, রামপ্রসাদী, টপ্পা—এ সবও চলছে না। ঝুমুর ভাটিয়ালির সুরের বাড়াবাড়ি দেখেছেন? লক্ষ্য করেছেন? গানের রচনাভঙ্গি লক্ষ্য করেছেন? আপনি নিজে গল্প-উপন্যাস লেখেন; দেখেছেন, কি জিনিস বাজারে চলে? নাটক দেখছেন তো, কি চলছে কি চলছে না?

কথাটা অন্তত গানের এবং নাটকের ক্ষেত্রের—এ কথাটা একান্তভাবে সত্য হয়ে উঠেছিল সে সময়। শচীন সেনগুপ্ত সে সময় ঠিক এই কারণেই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। সে সময়কার কয়েকখানি নাটক যদি কেউ নেড়ে-চেড়ে দেখেন, তা হ'লে অহীন্দ্রবাবুর কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। সে সময়কার গানের সুর, ভাবের বিষয় নিয়ে আলোচনায় এ গতি ও মতি আরও সত্য ব'লে প্রমাণিত হবে। সে একটা ঢেউ এসেছিল। এই ধরনের ঢেউ সকল কালেই আসে। এটা কিন্তু নিতান্তই সাময়িক। নেহাত উপরের জিনিস। মূল অন্ত-স্রোতের

সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগও নেই, সম্পর্কও নেই। মাটির বুক থেকে কয়েক হাজার ফুটের বায়ুস্তরের চাপে উত্তাপে সামান্য তারতম্য ঘটলেই সমুদ্রের তটভূমিতে ঢেউয়ের মাতামাতির পরিবর্তন ঘটে। কিছুদিন আগে বাংলা-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কাহিনীর গান আমদানি হ'ল। কোন এক গাঁয়ের মেয়ের কাহিনী শোনাই শোন। জনপ্রিয় সুকণ্ঠ গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গানটি গেয়েছিলেন, অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল গানখানি। তারপর ঢেউ উঠল। পোস্টকার্ডের কাহিনী, গ্রামের বাড়ির শূন্য কুলুঙ্গির কাহিনী, এ কাহিনী সে কাহিনী, কাহিনী-গানের ঢেউয়ে শ্রোতাদের কর্ণকুহরক্রপ তটভূমি হয় বালিয়াড়ি জ'মে রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম অথবা ধস নেমে শূন্য গহ্বরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সে ঢেউ চ'লে গেছে। এখন রানার, পাক্কীচলার, ঢেউয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে। অথচ রবীন্দ্র-সঙ্গীত অতুলপ্রসাদ-গীতিমালা, নজরুলের গান সমান বেগের চেয়েও বেশি—ক্রমবর্ধমান বেগে প্রবহমান রয়েছে। চানাচুরের রুচির চায়ের আসরে বাড়াবাড়ি হয়, কখনও তেলেভাজার হয়, কখনও কেকের হয়, কখনও সিঙাড়ার হয়; কিন্তু অন্নের চাহিদা বা রুচি কোনদিনই হ্রাস পায় না। মধ্যে মধ্যে বিকৃতরুচির আধিক্যে ওই খাদ্যগুলি অতি ভোজন করলে অগ্নিমান্দ্য ঘটে বটে, কিন্তু ঠিক দুদিন কি চারদিন পরেই ঝোল-ভাতের জন্য জিহ্বা থেকে পাকস্থলী পর্যন্ত লালায়িত হয়ে ওঠে, এবং এর জন্যে দোষ ষোল আনাটা ভোক্তাদের দিলে অন্যায় হবে। চানাচুরের ফেরিওলা সংখ্যায় বেশি জুটলে চানাচুরের রেওয়াজ বেশি হয়—এ সত্যকেও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। এ সম্পর্কে কিছুদিন আগে সাহিত্যাচার্য রাজশেখর বসু মশায় গল্পের রুচি সম্পর্কে ঠিক এই কথাই লিখেছেন। লেখক নিজের রুচি গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত ক'রে তাকে কোথাও বিকৃত করে, কোথাও সুস্থ করে।

আমি সেদিন সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাটি ব'লেই সবিনয় প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আমার 'ধাত্রী দেবতা' এবং 'কালিন্দী'র দাম ছিল তিন টাকা, সাড়ে তিন টাকা। সেকালে তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা দাম,

চড়া দাম ছিল। যুক্তিও ছিল, আকারে চার শো পৃষ্ঠার বই। দুখানি বইই পাঠক-সমাজে তখন প্রচুর সমাদর লাভ করেছে। আমার অগ্রবর্তী স্বর্গত বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' 'পথের পাঁচালী'ও তাই প্রমাণ করেছে। আমি সবিনয়ে বলেছিলাম, বিভূতির নাম ক'রেই বলেছিলাম, তা হ'লে বিভূতিভূষণের বই এত বিক্রি হ'ত না। অথচ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে ধরনের লেখার প্রাবল্য বেশি ব'লে বলছেন, সে সব বইয়ের দাম অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও আট-দশ বছরেও পাঁচশো বা হাজারখানা কাটে না। আর যদি বা কাটে, সেটা হয়তো প্রথম মোহড়ায় হু-হু ক'রে কাটে; কিন্তু তারপর বাস্, তার আর কোন সমাদর থাকে না। কিন্তু অন্নের মত প্রাণময় যা, ওই 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' সমান ধীরগতিতে কেটে চলে। রসনার স্বাদের টানে অন্ন চানাচুরের মত ক্রমাগত চেখে চেখে খাওয়া যায় না, ও বস্তুটা মানুষ গ্রহণ করে ক্ষুধার তাগিদে, শুধু রসনায় গ্রহণ করে না, দেহের অন্নময় কোষগুলি অন্ন গ্রহণের সময় অমৃতাস্বাদ উপভোগ করে। আমরা গণ্ডূষ গ্রহণের সময় বলি—"ওঁ অমৃতোপাস্তরণমসি স্বাহা"। অর্থাৎ হে জল, তুমি অমৃতরূপী এই অন্নের আস্তরণ হও। অন্নই অমৃত।

অহীন্দ্রবাবু বললেন, মিথ্যা আপনি বলেন নি। কিন্তু কথাটায় একটু অভিজ্ঞতার অভাব আছে ব'লে আমি মনে করি। সংসারে মাস্ আর ক্লাস ব'লে দুটো কথা আছে। ক্লাস হ'ল সুস্থ মানুষ, যাদের অন্নের ক্ষুধা আছে। আর মাস্ হ'ল অদ্ভুত ব্যাপার। আমাদের কারবার যে মাস্ নিয়ে। আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের এক শ্রেণীর দর্শক আছে, ওই গ্যালারির দর্শক, তাদের থিয়েটার-ওয়ার্লডে নাম কি জানেন?—নাম "গ্যালারী গড্স্"। পাঁচ টাকা চার টাকা দু টাকা খরচ ক'রে যারা থিয়েটার দেখে; তারা একবার দেখবে একখানা বই। কিন্তু ওরা কেউ দশবার দেখবে, কেউ আটবার দেখবে; বিশ-পঁচিশবার দেখে এমন লোক কম নয়। সন্ধ্যেবেলা আট গণ্ডা পয়সা পকেটে হ'লেই টিকিট কিনে ঢুকে বসবে। ওদের কথা আমাদের আগে ভাবতে হয়। ওরা নোন্তা জিনিস একটু বেশি পছন্দ করে। ভাত খায়, তার সঙ্গে

এক খামচা নুন আর দুটো কাঁচালঙ্কা নিয়ে না বসলে অর্ধেক খেয়ে 'ধেৎ' ব'লে উঠে পড়ে।

সে দিন আর কথা হয় নি।

তারপর আবার একদিন কথা পাড়লেন—টেকনিক সম্বন্ধে। শেক্‌সপীয়র থেকে ইবসেন পর্যন্ত চমৎকার বিশ্লেষণ ক'রে ব'লে গেলেন। মুগ্ধ হয়ে শুনলাম। শুধু ইংরিজী নাটক সম্পর্কেই নয়, সংস্কৃত নাটক, যাত্রা এবং নবযুগের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' থেকে শচীন সেনগুপ্ত পর্যন্ত ব'লে গেলেন। শেষে বললেন, নাটকটির শেষ অঙ্কটি যেমন, ওই টেকনিক যদি আগাগোড়া হ'ত, এবং অরুণ আর মমতার ব্যাপারটা যদি প্রাধান্য পেত, মানে বুঝতে পারছেন—ওইখানে অরুণ এবং মমতার অনুরাগ-সঞ্চারটা ওই সন্টের কাজ ক'রে যেত।

চুপ করলেন। আলোচনা আর হ'ল না।

আর একদিন আলোচনায় সেই প্রথম দিনের কথা পাড়লেন, তার সঙ্গে থিয়েটার-জগতের সমস্যার কথা। বললেন, সব দেশেই একটা নতুন ধারা আসছে। ওদের দেশে থিয়েটার চলে, ভারী নাটক অভিনয় হয়—শেক্‌সপীয়র ইবসেন বার্নার্ড শ এঁদের বই। কিন্তু এ কালে ভ্যারাইটি পারফর্মেন্সের হাউস ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। কেমন জানেন, সারাটা দিন খেটে-খুটে সন্ধ্যেবেলা ক্লাবে গেল কি হোটেলে গেল, বারে গেল মদ্যপান করলে, তারপর ভ্যারাইটি পারফর্মান্সের হাউসে ঢুকল। খানিকটা গান, খানিকটা নাচ—উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ, খানিকটা ভাঁড়ামি—এই আর কি; দেখে শুনে বাড়ি ফিরল, বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দোষ দিতে পারবেন না, সারাদিন খাটবার পর আনন্দ করতে এসে যদি সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় তবে বাঁচবে কি ক'রে? এ দেশেও ও-দেশের ঢেউ এসেছে। কলকাতা হ'ল বিগ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাউন, সারাদিন মানুষ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে, সন্ধ্যেবেলা ভারী বই তারা যদি সহ্য করতে না পারে, তাদের যদি ভাল না লাগে, তাতে তাদের অপরাধ কোথায়?

* * *

'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ মাসে। উপরে যে কথা বলেছি, সে ফাল্গুনের শেষের কথা। এর মধ্যে অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার একদিন মাত্র। চৈত্র মাসে আমাকে চ'লে যেতে হ'ল লাভপুর। বৈশাখে আমার বড় মেয়ে গঙ্গার বিয়ে। পাত্র গ্রামেরই। শুধু গ্রামের বললেই সবটা বলা হ'ল না, আমার বাড়ির পাশের প্রতিবেশী—এক খিড়কিতে ওঠা-নামা। ওই বাড়িতে আমাদের বাড়ির তিন পুরুষ কন্যাদান ক'রে আসছেন। আমার বাবার পিসীমার বিয়ে হয়েছিল। সেই সূত্রেই ওঁরা লাভপুরে এসে বাস করছেন। আমার নিজের ছোট পিসীমার বিয়ে হয়েছে—এঁদেরই অন্য শাখায়, তাঁদের বাড়িও পাশে। আবার আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল। উদ্যোগের জন্যে লাভপুর গেলাম। চৈত্র মাসের শেষে এলাম বাজার করতে। কয়েক দিন—দিন পাঁচেক ছিলাম। তার মধ্যে একদিন গেলাম নাট্যভারতীতে। তখন চালু বইখানিতে দর্শকের উৎসাহ ক'মে এসেছে। নাট্যভারতীতে মন্দার বাজার। নতুন বইয়ের তাগিদ হয়েছে। অহীন্দ্রবাবু বললেন, আমি কিন্তু একটু চিন্তিত হয়েছি তারাশঙ্করবাবু।

আবার বললেন, আপনার বইখানি নিয়েই চিন্তিত হয়েছি।

আমি উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাইলাম তাঁর দিকে। তিনি বললেন, যুদ্ধ দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে। ইংরেজ মার খাচ্ছে। বার্মা থেকে হঠেছে। যন্ত্রণাতে ক্ষোভে প্রায় ক্ষিপ্ত অবস্থা। এ দিকে কংগ্রেস যে ভাবে শক্ত হয়ে মাথা নাড়ছে, তাতে—

খানিকটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বললেন, তাতে এ বই অভিনয় হতে দেবে কি না—! তার উপর যদি কংগ্রেস মুভমেণ্ট ডিক্লেয়ার করে, তা হ'লে বন্ধ ক'রে দেবে। আপনার নাটকে খোরাক আছে, জোগাবে—খোরাক জোগাবে। অবশ্য বিজয় আছে, তার হাড়ে ভেল্কি খেলে, সে প্রথমটা পাস করিয়ে আনবে। তা সে পারবে। কিন্তু মাঝখানে যদি ব্যান করে, সেই ভাবছি আমি।

কথাটা তাঁর আদৌ ভিত্তিহীন বা অমূলক আশঙ্কার কথা ছিল না। কাল ১৯৪২ সালের এপ্রিল। আগস্ট মাস আসতে বাকি মাত্র তিন মাস।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র অন্তর্ধান হয়েছেন। সমগ্র দেশের আবহাওয়া উত্তপ্ত। দাঁতে দাঁত চেপে কঠিন সঙ্কল্প নিয়ে মানুষ প্রতীক্ষা করছে। ইউরোপে আফ্রিকায় বার্মায় ইংরেজ আঘাতের পর আঘাত খাচ্ছে, তাতে মানুষের উল্লাসের সীমা নেই। সেই সময়ের কথা। কথা শুনে আমি দ'মে গেলাম। ফেরবার সময় মল্লিক সাহেব বা সতু সেন কারুর সঙ্গেই দেখা করলাম না। তাঁরাও যদি এই কথাই বলেন, তবে আমার মন হয়তো ভেঙে যাবে। প্রায় পালিয়ে এলাম।

সেই রাত্রে, বোধ করি প্রথম রাত্রিকালে সাইরেন বাজল। অবশ্য ভুয়া সাইরেন। মহড়ার জন্য সাইরেন। সে যে কি আতঙ্ক, কি উৎকণ্ঠা এবং ওই সাইরেনের শব্দ যে কি ভয়াবহ—তা স্মরণ করলে আমার সর্বাঙ্গ ওই স্মৃতিটাকে অস্বীকার করবার জন্য 'না' 'না' ভঙ্গিতে আপনা-আপনি ন'ড়ে ওঠে। কাশীপুরের গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরির সাইরেনটা ছিল আমাদের নিকটস্থ সাইরেন। ওর আওয়াজটাও ছিল বিকট বিশ্রী। বাড়িতে আমরা তিনটি প্রাণী—আমি, আমার মেজ ভাই এবং আমার বড় ছেলে। লাভপুর থেকে বাজার করতে এসেছি তিনজনে। উঃ, সে কি রাত্রি!

পরের দিন কি তার পরের দিন আবার বিকেলবেলা সাইরেন বাজল। সে সময় আমরা তিনজনেই সবে চিৎপুর ব্রিজ পার হয়ে গালিফ স্ট্রীটে নেমেছি। এক রকম ছুটেই গিয়ে উঠলাম আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে—পুরনো বাসায়। বাসাটা তখনও খালি প'ড়ে আছে। কলকাতার অর্ধেকই প্রায় খালি তখন। এই সময়েই বোধ হয় কবি যতীন সেনগুপ্তের "ড্যাঞ্চি" কবিতা বের হয়েছিল। অল ক্লিয়ার হবার পর বের হলাম বাজারে। পথে গিরীনবাবুর দোকানে নামলাম একবার। গিরীনবাবু বললেন, ভাবছিলাম, আপনাকে পত্র লিখব।

কারণ অনুমান করতে পারলাম না। প্রশ্ন করলাম, কেন?

বললেন, 'কালিন্দী' শেষ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে? আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। এক বছর কয়েক মাস আগে 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয়েছে, এর মধ্যে

দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে? সাড়ে তিন টাকা দামের বই! এর আগে আমার কোন বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় নি। দু বছরের কিছু উপর 'ধাত্রী দেবতা' প্রকাশিত হয়েছে, বই ফুরিয়ে এসেছে, আরও মাস কয়েক লাগবে শুনেছি। 'রাইকমল,' 'চৈতালী ঘূর্ণি' ছাপা হয়েছে ছ-সাত বছর আগে। এখনও অনেক বই রয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার সতীর্থদের মধ্যে এক বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কোন লেখকের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভাগ্য হয় নি।

গিরীনবাবু আমার হাতে সাড়ে তিন শো টাকার নোট গুনে দিয়ে বললেন, প্রেসে দিয়ে দি বই?

দেবেন বইকি, নিশ্চয় দেবেন।

কিছুদূর গিয়েই দেখা হ'ল বিচিত্র মানুষ শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে। বাংলার একালের মানুষদের মধ্যে এই শিবরামের মত মানুষ—অন্তত শিবরাম যেমনটি, তেমনটি—আর দ্বিতীয় নেই। বিচিত্র মানুষটির বৈচিত্র্যের মধ্যে এতটুকু কোথাও কুৎসিত নেই। গায়ে খদ্দরের শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, মাথায় শিবরামী ফ্যাশানে ছাঁটা চুল (শিবরামী ফ্যাশানে অন্য যে কেউ চুল ছাঁটুক, কিন্তু শিবরামের মত হবে না) মুখে প্রসন্ন হাসি, চটি টানতে টানতে চ'লে আসছেন।

দেখেই বললেন, ওরে, বাপ রে! শরৎচন্দ্রের স্থলাধিকারী চলেছেন কোথায়? আপনি মশায় গ্রেট—রিয়ালি গ্রেট। আপনার 'কবি' উপন্যাস যা হচ্ছে—মারভেলাস! ওয়াণ্ডারফুল!

আগেই বলেছি, তখন 'কবি' গল্পটিকে উপন্যাসে পরিণত ক'রে লিখছি। প্রকাশিত হচ্ছে পাটনার 'প্রভাতী' পত্রিকায়।

শিবরামবাবু বললেন, ওই যে বসন ব'লে মেয়েটা কবিয়াল নিতাইকে চড় মেরেছে—উঃ, ওয়াণ্ডারফুল! এ বাংলা দেশে আর কেউ লিখতে পারত না। আমি তো বলেছি, বাংলা দেশে ঔপন্যাসিক হিসেবে আপনি গ্রেট। আজকালকার কেউ আপনার সমান নয়। ওঃ, এ বই ইংরিজীতে অনুবাদ হয়!

শিবরামবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বলব। না বললে,

শিবরামবাবুর সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ধারণার কথা স্পষ্ট করতে পারব না। এ ঘটনার বৎসর তিনেক আগে শিবরামবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল। আমি তাঁকে চিনতাম। তিনি আমাকে চিনতেন না। সে সময় শ্রীপ্রেমেন্দ্র বিশ্বাস একখানি গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। একালের কয়েকজন শক্তিশালী লেখকের কতকগুলি গল্প নিয়ে গল্পসংগ্রহ, তার ভূমিকা তিনি নিজে লিখেছিলেন। ভূমিকাটি মূল্যবান—শ্রীবিশ্বাস শক্তিশালী প্রবন্ধ-লেখক। বইটির মধ্যে আমার দুটি গল্প ছিল—"প্রতিমা" এবং "অগ্রদানী"। শিবরাম-বাবুর একটি গল্প ছিল, নাম—"দেবতার জন্ম"। এই গল্প দুটির দক্ষিণার জন্য এবং বইয়ের জন্য আমি কলেজ স্ট্রীটে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের ওখানে গিয়ে বসেছি। বোধ করি মিনিট দশেক পরেই শিবরামবাবুও এলেন—ওই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়। পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস—ইনি শিবরামবাবু। আমি বললাম, আমি ওঁকে চিনি।

বিচিত্র দৃষ্টিতে শিবরামবাবু আমার দিকে চাইলেন। প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস আমার নাম বললেন, ইনি তারাশঙ্করবাবু।

শিবরাম বললেন, আপনিই তারাশঙ্করবাবু? আমাকে চেনেন?

বললাম, হ্যাঁ, চিনি।

আমি চিনতাম না। কারণ চেনবার জন্যে কৌতূহল ছিল না। আপনি গল্প লেখেন শুনেছি, লেখার ধরন সেকেলে; তা সেকেলে ধরনের লেখাই যদি পড়তে হয় তো আপনার লেখা পড়তে যাই কেন? বঙ্কিম রয়েছেন, আরও কত পুরনো বিখ্যাত লেখক রয়েছেন। আপনার লেখা আমি পড়ি নি। সেই জন্যে পরিচয় করবারও কোন ঔৎসুক্য নেই।

অত্যন্ত সপ্রতিভ এবং সহজভাবে বললেন। কোন গ্লানি বোধ করলেন না; এতটুকু সঙ্কুচিত হলেন না। রূঢ়ও বলতে পারব না। আমি তবুও আহত হলাম, কিন্তু সংযম হারালাম না। একটু হেসে সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, আমি কিন্তু আপনার লেখা পড়ি।

পড়েন? ভাল লাগে?

লাগে ব'লেই আপনাকে চিনে রেখেছি।

চ'লে গেলেন শিবরাম।

এর প্রায় বৎসর দেড়েক কি দুয়েক পর তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন মাস ছয়েক হবে 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয়েছে। সে দিনটি ছিল রবিবার। সাহিত্য-সেবক-সমিতির একটি অধিবেশনে আমার সভাপতিত্ব করবার কথা। কিন্তু বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শিবপুর শাখার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রজেনদা এবং সজনীকান্ত প্রমুখ সঙ্গীরা। সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু। কথা ছিল, এখানে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই পৌঁছে দেবেন। কিন্তু কাজের বেলা তা সম্ভবপর হ'ল না। ফিরতে বেজে গেল সাড়ে আটটা। তবুও সেই সাড়ে আটটার সময়ই আমি নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন ওখানকার সভাও শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সরকার মশায়ের নেতৃত্বে শেষ হচ্ছে-হচ্ছে। আমি মার্জনা ভিক্ষা করার পরই সভা শেষ হ'ল। সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছি; পথটি আধো-অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলি-পথ, সেই গলিপথে দাঁড়িয়ে ছিলেন শিবরাম-বাবু। আমার পথ আগলে দাঁড়ালেন। আমি চমকে উঠবার আগেই বললেন, আমি শিবরাম চক্রবর্তী। নমস্কার।

নূতন কোন কঠিন অভিযোগ শোনবার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়েই বললাম, নমস্কার।

শিবরামবাবু কিন্তু আমার প্রতিনমস্কারের জন্যে থেমে থাকেন নি, তিনি কথা ব'লেই চলেছিলেন।—আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমার ভুল সংশোধন করতে এসেছি।

আমি সবিস্ময়েই তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। এ কথার উত্তরে কি বলব?

শিবরাম ব'লে গেলেন, আমি আপনাকে বলেছিলাম—আপনি সেকেলে লেখক, আপনার লেখা আর কি পড়ব! কিন্তু গৌরাঙ্গ—গৌরাঙ্গ বসু, চেনেন তাকে? চমৎকার ছেলে, চমৎকার লেখে। সে আমাকে জোর ক'রে আপনার 'কালিন্দী' পড়ালে। পড়তে বাধ্য করলে। অল্প খানিকটা প'ড়ে চমকে গেলাম। রুদ্ধ নিশ্বাসে প'ড়ে

গেলাম। আমার ভুল ভাঙল। করিয়াছি খাইয়াছি লিখিলেও আপনি সেকেলে নন। আপনি বাংলা দেশের একালে সবচেয়ে বড় লেখক—গ্রেট নভেলিস্ট।

ব'লেই আর দাঁড়ালেন না। চটি টানতে টানতে আধো-অন্ধকার আঁকাবাঁকা দীর্ঘ গলিপথটির বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সেদিন শিবরাম বললেন, আপনার 'কবি' গ্রেট নভেল মশাই। নোবেল প্রাইজ পাবার মত।

শিবরামের বিচার, রসবোধ নির্ভুল; কিন্তু শিবরাম শিবের মতই উদার—বর বা প্রসাদ দেবার সময় ঝুলিটা একেবারে উলটে ঝেড়ে দেন।

শিবরামের সেদিনের ওই প্রশংসার উৎসাহবাণী আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নব ১৩৬১ পর্যায়

# পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

( পাগলামির বিভিন্ন অবস্থায় রচিত )

**অনুক্রন্দিৎসা**

( পাগলামির একটা বিশেষ স্তরে না উঠিলে নিম্নলিখিত কবিতাটি লেখা হয়তো কাহারও পক্ষেই সম্ভব হইত না। সে স্তরটি কিরূপ, কেন, কবে এবং কোথায়—সে প্রশ্নের জবাব আশা করা উচিত নয় বলিয়াই এখানে দেওয়া হইল না। )

একেলা প্রদীপ জ্বলিছে আঁধার ঘরে,
উদাসী বাতাস গুমরি গুমরি মরে,
ঝ'ড়ো কাক কোথা কাঁদিছে সুদূর ঝড়ে
একা অরণ্য ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস;
সাগর-তলের তিমিরে তিমি-র ছানা
আনমনে বৃথা হেথা হোথা দেয় হানা,

ওরে কবি, তোরে কেহ করিবে না মানা
গেয়ে যা রে গান এই বেলা যত চাস।
বাহিরের সুর মিলায়ে মনের সুরে
আজের সঙ্গে ভাবীকাল জুড়ে জুড়ে
হেথা ব'সে ব'সে চ'লে যা অনেক দূরে
হাওয়াই জাহাজ আছে তো আপন হাতে।
আলোকের দান আঁধারে হারায় যদি,
বিনা অনুপানে কাঁদে যদি ঔষধি,
যদি ডোবে তট ভেসে রবে তবু নদী,
নিশিথের তারা না-ই বা হাসিল প্রাতে।

**রূপান্তর**

(রূপ হইতে অরূপে পৌঁছিবার যে পথ, অপরূপ হইতে রূপে ফিরিবার রাস্তা তাহারই বিপরীতমুখী হইলে ব্যাপারটা অনেক সহজ হইয়া যাইত। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় অন্যরূপ। নিম্নোক্ত কবিতায় ইহাই দেখাইবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে।)

কোকিলের পায়ে শিকল পরায়ে শুনিতে চাহিস গান?
হায় রে হায়!
দাঁড়কাক-লেজে ময়ূরপুচ্ছ যতনে করিয়া দান
বনছায়ায়
ভেবেছিলি বুঝি কাকারে করিবি কেকা?
ব্যর্থ আশার অর্থ খুঁজিতে
আসল হারায়ে নকল পুঁজিতে
শিশির ভেতরে শিশির ভরিলি একা
কার মায়ায়?
হায় রে হায়!
বাতাসের বুকে তুলি হেনে হেনে আঁকিতে চাহিস ছবি?
হায় রে কবি!
মধ্য-সাগরে যদি ডুবে যায় সাহারা অথবা গোবি,

কোথায় র'বি ?
মগজে কি তোর ময়দান হ'ল ফাঁকা ?
তবু তোর গান একা গেয়ে গেয়ে
পথে পথে প্রাণ যেতে চায় ধেয়ে,
পিছে যে পলায় মিছে তারে আশু ডাকা
ডাইনে বাঁয়—
হায় রে হায় !

**৺তাজমহল**

( রবীন্দ্রনাথের সম-সময়ে, আগে ও পরে তাজমহল সম্পর্কে অনেকে লিখিয়াছেন, অনেকে লেখেন নাই। তাহাতে তাজমহলের কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এই তত্ত্বটুকু মনে রাখা সকল কবির পক্ষে সর্বদা সম্ভব নয়। নিম্নোদ্ধৃত কবিতা-খণ্ডে ইহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। )

আগ্রার আকাশতলে জাগে যেথা পাথরী গম্বুজ,
হেলেনের স্বপ্ন দেখে সেথা এক ঘুমন্ত প্যারিস !
নীলামে উঠেছে যেন অর্ধদগ্ধ ট্রয়ের প্রাসাদ,
লেলিহান অগ্নিশিখা পক্ষ মেলি হয়েছে উধাও
বহুদূর সিন্ধুতীরে ; ক্লিওপেট্রা কাঁদিছে মিশরে
ভাবিয়া নিরোর কথা ; সোফোক্লিস লিখিছে কবিতা ;
আপনারে ব্যঙ্গ করি' মহাকবি অ্যারিস্টোফ্যানিস
আঁকিছে কার্টুন-চিত্র ভূর্জপত্রে একা নিরালায় ;
রামায়ণ ইলিয়াড্ ট্যাল্‌মাড্ চণ্ডী বাইবেল
এক হয়ে মিশে গেছে মহাকাল-সমুদ্রের জলে।
তবু কেন মনে রাখা ? তবু কেন এত ভুলে যাওয়া ?
অভেদ হইতে ভেদে, ভেদ হতে অভেদের পানে
কেন ভেদাভেদ-যাত্রা মর্মভেদী বেদনার মত ?
কেন হায়, হে বিধাতা, জীবনের বসন্ত বাঁশরী
রন্ধ্রহীন হ'লে তাহে নাহি বাজে বিচিত্র রাগিণী ?

চ'লে গেছে মমতাজ, কালস্রোত মমতা-বিহীন
রাখিতে পারে না মনে শৈবাল অথবা শৈবালিনী।
তবু যারা প'ড়ে থাকে চোখে মেখে সোনার স্বপন
ক্ষণিকের ক্ষীণমুখে দেখে তারা শাশ্বতের আলো।
চাঁদ-ক্ষ্যাপা কুকুরের ক্ষিপ্ত ডাকে স্বপ্ন বুঝি ভাঙে,
ভেঙে ফের জোড়া লাগে ; হায়, ওগো ঘুমন্ত প্যারিস,
আগ্রার সবুজ ঘাসে হেলেনের শোন পদধ্বনি ;
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে, গলে তার চন্দ্রহার দোলে,
কুন্দশুভ্র কান্তি তার চাঁদিমায় করিতেছে স্নান।
যামিনী অধীরা হ'ল, তুমি তবু হ'য়ো না অধীর।
যদি কোনো মহালগ্নে অকস্মাৎ দান-দণ্ড হাতে
বিধাতা শুধায় প্রশ্ন, "কহ বৎস, কি তব প্রার্থনা ?
দিব কোন্ বর ?" তবে মৃদুকণ্ঠে কহিও তাহারে,
"হেলেন চাহি না বন্ধু, হেলেনের স্বপ্ন দিও মোরে।"

**দোহাবলী** ( টীকা নিষ্প্রয়োজন )

আকাশের শুরু-শেষ কেহ তো জানে না,
তবু আকাশের সাথে সকলের চেনা ॥
কার্য যবে শুরু করে প্রচণ্ড জোলাপ
তখন লাগে না ভাল প্রকাণ্ড গোলাপ ॥
গাধারে দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবি,
"মনে মনে করে কি সে গাধাত্বের দাবি ?"
ভুবনে পকেট যদি না থাকিত, তবে
পকেটমারের দল কি করিত সবে ?
ধ্বনি যদি নিদ্রা যায় নাকে দিয়া তেল,
তবু কি হে প্রতিধ্বনি, দেখাইবে খেল ?
পাছে পায় ফুটে যায় কাঁকর বা কাঁটা
থাকিবে কি ঘরে শুয়ে বন্ধ ক'রে হাঁটা ?

**ভূমৈব সুখম্ অল্পে সুখমস্তি**

প্রতিদিন ঠেকলে পরে
শিখবি নে রে ঠেকেও।
বারে বারেই দেখিস যদি
দেখবি নে যে দেখেও।
দু বেলা রোজ মিঠাই খেলে
মিঠে স্বাদ থোড়াই মেলে,
মাছেরা জল ভুলে যায়
জলের মধ্যে থেকেও।

**নব বাথরুম-গীতিকা**

( নিম্নলিখিত নূতন গানগুলি বাথরুমে যখন খুশি গাওয়া চলিতে পারে ; তবে এ বিষয়ে কোনও বিশ্বস্ত পঞ্জিকার পরামর্শ গ্রহণ করাই ভাল। গাহিবার পূর্বে গায়ক ও গায়িকাগণ একবার লেখকের অনুমতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে অনেক ভবিষ্যৎ ঝামেলার হাত হইতে রেহাই পাইবেন। )

। রাগ ঃ চম্পট-বিহাগ ।

( আমি ) স্বপন দেখার স্বপন দেখি নয়ন মেলে,
না-চলার অচল পথে চরণ ফেলে।
সুর ভুলে হায় গানের মাঝে
গোপনে মুখ লুকাই লাজে
গোলাপ যেমন প্রলাপ ভোলায় গন্ধ ঢেলে।
যে আগুন দহন হানে, দেয় না আলো
ছন্দে তাহার দেয় না দোলা মন্দ-ভালো।
যা কিছু পরাণ মাতায়
লেখা রয় গোপন খাতায়
দেখি তাই পাতায় পাতায় সময় পেলে।

॥ রামপ্রসাদী কীর্তন ॥

জানাই কারে দুখের কথা ?
হাতে যদি ঘণ্টা এলে ,
বাঁধব গলায় বেড়াল কোথা ?
কাটাই বেলা স্বপন দেখে,
আমায় বল ঠেকাবে কে ?
( আমি ) আপন বোঝার আপনি মুটে
আপন যজ্ঞে আপনি হোতা।
নীলাকাশে সোনালী চাঁদ
সবুজ ঘাসে শিশির সাদা।
মহাকালের আঁধার-আলোয়
কে ধোপা আর কে তার গাধা ?
সহজ কথা মাঝে মাঝে
সহজে কেউ বোঝে না যে
কঠিন ক'রে তাই তো বলি
যেমন দেশে যেমন প্রথা।

॥ ভজন ( আধুনিক ) ॥

প্রভু, তোমার রাজ্যে ঘটে যত ঘটনা
তাহার চেয়েও বেশি রটে রটনা।
যত চলে হাতের পেশী
তার চেয়ে মুখ মুখর বেশি,
( হেথা ) আসল ঢেঁকির ধান মেকি যে
যতই কেন চটো না।
( হেথা ) উদোর দোষে বুধোরা পায় সাজা রে !
খাটির মাথায় চাঁটি মেরে
ভেজাল হাসে বাজারে।
তাই বলি মন, শোন বাছা,
শক্ত করে বাঁধ কাছা,

পিছুর আরো পিছু আছে
যতই পিছে হটো না।
॥ রাগ—মিয়াকী বাউল ॥
আমি যে ভুলের জালেই
জড়াতে চাই আপনারে।
( আমার ) ভুল ভাঙাতে জাল ছাড়াতে
পারবি না রে।
আপন খুশির আলো জেলে
চলিস তোরা নয়ন মেলে,
( আমি ) আপন দুখের আঁধার-প্রদীপ
জ্বালাই আলোর পারাবারে।
আঁখিতে মোর ফাঁকির নেশা,
সেই নেশাতেই স্বপন দেখি।
সুর-হারানো বাঁশীতে মোর
কিসের যাদু কেউ জানে কি ?
কখন ছাড়ি কখন ধরি
কেমনে হায় খেয়াল করি ?
আমার হিয়ার চাঁদের কাছে
আমার মনের সূর্য হারে।

অ. ক্ল. ব

# ডানা

## নয়

ট্রেন খুব ভোরে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছল। তখনও সূর্য ওঠে নি। কবি প্রত্যাশা করেন নি যে, এত ভোরে অমরবাবু স্টেশনে আসবেন তাঁকে নিতে। তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সেই ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে ধরতে হবে—এই ঠিক ক'রে রেখেছিলেন কবি। ধরতে যদি না পারেন, তা হ'লে কি অকূল পাথারে যে পড়বেন তা ভেবেও চিন্তিত ছিলেন একটু। যে লোক সিমলা থেকে হঠাৎ কলকাতা চ'লে আসতে পারে তার পক্ষে কলকাতার হোটেল

ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যাওয়া অসম্ভব নয়। অমরবাবুকে সশরীরে স্টেশনে দেখে আনন্দবাবু শুধু যে আনন্দিত হলেন তা নয়, একটু অবাকও হলেন।

জিনিসপত্র খুব বেশি আছে না কি সঙ্গে ?

না, সুটকেস আর বিছানাটা।

কবিতার খাতাখানা এনেছেন তো ?

এনেছি।

এইখানেই হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে তা হ'লে সোজা এখান থেকেই যাওয়া যাক।

কোথা যেতে হবে ?

সল্ট লেক।

কবির চোখে বিস্মিত দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললেন অমরবাবু।

আপনার খুব আশ্চর্য লাগছে, না ?

সিমলা থেকে হঠাৎ এখানে এলেন, আমাকে ডেকে পাঠালেন, তার পর দুজনে মিলে সল্ট লেকে যাচ্ছি, একটু দুর্বোধ্য বইকি।

অমরবাবু ব্যাপারটা যেন উপভোগ করলেন মনে মনে, ছোট ছেলেরা নিজেদের জানা হেঁয়ালী অপরকে সমাধান করতে ব'লে যেমন মজা উপভোগ করে অনেকটা তেমনি। কবির দিকে আড়-চোখে চেয়ে বললেন, অ্যালেকজাণ্ডার হোরেসের নাম শুনেছেন ?

না। কে তিনি ?

একজন বড় পক্ষীবিজ্ঞানী। খঞ্জন-স্পেশালিস্ট। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। হঠাৎ সিমলায় চিঠি পেলাম তিনি কলকাতায় আসছেন, দু দিনের জন্য। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াটা সৌভাগ্য। তাই কালবিলম্ব না ক'রে চ'লে এলাম। কাল আর পরশু দু দিন তাঁর সঙ্গে সল্ট লেকে ঘুরেছি, নানারকম পাখি দেখলাম, অনেক পাখি এর আগে দেখিই নি। অ্যালেকজাণ্ডার হোরেস কাল চ'লে গেছেন। আপনাকে টেলিগ্রাম করেছিলাম দুটো কারণে। প্রথম আপনাকেও পাখিগুলো দেখাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। দ্বিতীয়, আপনার আর ডাক্তার চিঠিতে খবর পেয়েছিলাম যে, আপনি কোন এক খুনের মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছেন। আমার ভয় ছিল, আপনি হয়তো আসতেই

পারবেন না। আপনাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আমার আর ও নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘামাবার মত যা কিছু অবশিষ্ট আছে তা রত্না ঘামাবে। সে এতক্ষণ ডানার কাছে পৌঁছে গেছে সম্ভবত। এবার আশা করি আর কিছু দুর্বোধ্য ঠেকছে না? চলুন, সোজা বেরিয়ে পড়া যাক এখান থেকে। আগে কিছু খেয়ে নিন।

কবি প্রশ্ন করিলেন, সল্ট লেকটা কোথা?

বেঙ্গল কেমিক্যালের পিছনে। সল্ট লেকের বাংলা নাম হচ্ছে ভাঙড়। প্রচুর পাখি আছে মশাই, স্বদেশী বিদেশী দুইই। আপনি গেছেন কখনও?

না। কখনও দরকার পড়ে নি তো।

চমৎকার জায়গা। জলের মধ্যে আল-বাঁধা জমি, তা ছাড়া জলা, ডোবা, ঝিল, হ্রদ সব একসঙ্গে পাবেন। আবার ওর ভিতর বাবলা গাছও আছে, ছোট বড় ঝোপঝাড়ও আছে, নলবন, নানাজাতের শর, হোগলা, শ্যাওলা, দেশী পানা, কচুরি পানা—হরেক রকম জিনিস দেখবেন সেখানে। আজ বিশেষ ক'রে গ্রেট মার্শ ওয়ার্ব্লার (Great Marsh Warbler) দেখাতে চাই আপনাকে। দেখতে বোধ হয় পাবেন না; ডাক শুনেই ফিরে আসতে হবে। নলবনের ভিতরে ঢুকে থাকে ওরা। চলুন, যাওয়া যাক।

স্টেশনের হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লেন দুজনে সল্ট লেকের উদ্দেশে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। খাল পেরিয়ে তবে সল্ট লেকে পৌঁছতে হবে। পারাপার করবার জন্যে খেয়া আছে। কবি আর বিজ্ঞানী খেয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

দেখুন, দেখুন—

কই, কি?

উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে হাসলেন।

কবি বললেন, শালিক অনেক দেখেছি।

কিন্তু এমন দল বেঁধে এত উঁচু দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছেন? সাধারণত সকালবেলায় ওরা এমন ক'রে উড়ে বেড়ায়। এক্সারসাইজ করে সম্ভবত। আগেও লক্ষ্য করেছি।

কবি চুপ ক'রে রইলেন।

অমরবাবু বলতে লাগলেন, পাখিদের নানাভাবে লক্ষ্য করলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। ধরুন, এই শালিকরাই সমস্ত দিন কখন কি ভাবে চলাফেরা করে তার একটা রেকর্ড যদি রাখা যায় অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে। সেদিন আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল। একটা বাগানে রোজ যেতাম। যখনই ভোরে গেছি তখনই দেখেছি, 'ফটিক জল' পাখিরা এ-গাছ থেকে ও-গাছে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। একদিন যেতে একটু বেলা হ'ল, দেখি, ফটিক জল একটিও নেই, ঘুঘুর দল এসেছে। মনে হ'ল প্রত্যেক পাখির বোধ হয় খেলা করবার নির্দিষ্ট সময় আছে এক-একটা। কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য না করলে অবশ্য ঠিক বলা যায় না। আপনাকে আইডিয়াটা দিয়ে দিলুম, ফিরে গিয়ে লক্ষ্য করবেন তো যদি সময় পান। জমিদারির ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিব্রত হতে হচ্ছে না তো? ও নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন না। আমলা-গোমস্তারা যা পারে করুক, আপনি শুধু একটু নজর রাখবেন। বাস্। বেশি গোলমাল দেখেন তো রত্নাকে খবর দিয়ে দেবেন। ও এসব ব্যাপার আমাদের চেয়ে ভাল বোঝে। চলুন এবার।

খেয়াটা এসে ভিড়ল। যাত্রীর দল নেবে গেল। ঝুড়ি-মাথায় স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি। গ্রাম থেকে তরি-তরকারি মাছ নিয়ে যাচ্ছে শহরের বাজারে। একজনের সঙ্গে একটি ছাগ-শিশুও ছিল। কবি আর বিজ্ঞানীর সঙ্গে একজন মৎস্য-শিকারীও উঠলেন। ওপারে পৌঁছে বেশ কিছুদূর হাঁটতে হ'ল আল ধ'রে।

দেখুন, দেখুন, কি বলুন তো ওগুলো? বাইনোকুলারটা নিয়ে ভাল ক'রে দেখুন।

বাইনোকুলারটা নিয়ে কবি দেখতে লাগলেন।

বক মনে হচ্ছে।

গ্রে হেরন ( Grey Heron )। ওরা খেয়ে ফিরছে সম্ভবত। ওরা খুব ভোরে একবার খায়, আর একবার খায় সন্ধ্যার দিকে। সমস্ত দিন কোনও গাছে নিঝঝুম হয়ে ব'সে থাকবে।

কবি যতক্ষণ দেখা গেল হেরনগুলিকে দেখলেন। তারপর বললেন, এখানে কোথাও যদি বসবার জায়গা পাওয়া যেত একটু, বেশ হ'ত।

হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না কি? অনেক হাঁটতে হবে এখন।

হাঁটতে পারব, আমি বসবার জায়গা খুঁজছি কবিতা লিখব ব'লে।

গুড। আছে জায়গা,—ওই দেখুন।

দূরে একটি কুটির ছিল। অমরবাবু সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

ও তো বেশ ভাল জায়গা। চেনা-শোনা আছে না কি আপনার সঙ্গে?

না, তবে চেনা-শোনা ক'রে নিতে কতক্ষণ! এটা ভারতবর্ষ—সে কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন মশাই? তা ছাড়া কবি-গুরুর সেই কবিতাটাই বা ভুলছেন কেন—কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই? আসুন।

অমরবাবু হনহন ক'রে, প্রায় ছুটে, চলতে লাগলেন। কিছু দূর গিয়ে ঘুরে বললেন, বাইনকুটা গলায় ঝুলিয়ে রাখুন।

কবির মনে যে কবিতার ভাব জেগেছিল সেইটেতে তা দিতে দিতে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন তিনি। আলের উপর দিয়ে বেশি জোরে চলা সম্ভবও ছিল না তাঁর পক্ষে। কুটিরের কাছাকাছি এসে কবি দেখলেন, কুটিরের মালিক অমরবাবুর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ গদগদ হয়ে পড়েছেন। মনে হ'ল, লোকটি দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। তাঁর কাছে সের পাঁচেক দুধ ছিল, অমরবাবু সমস্তটা কিনে নিয়েছেন। কবি শুনলেন, অমরবাবু বলছেন—দুধটা একটু গরম ক'রে দিতে হবে কিন্তু। আর গোটা দুই গেলাস, আর একটু জল চাই।

ঝোলা-গোঁফ দুগ্ধ-ব্যবসায়ী সবিনয়ে বললেন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে বাবু। আপনারা ততক্ষণ পাখি দেখুন, আমি পীতুকে ডেকে আনি। সে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে আপনাদের। এক শিকারী বাবু বন্দুক নিয়ে এসেছেন, তার পিছু পিছু ঘুরছে শালা।

পীতু তোমার চাকর বুঝি ?

আমার ছেলে বাবু। চাকর রাখবার মত পয়সা আছে কি বাবু ? নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রে নি। দুধ কেনা-বেচা ক'রে কায়ক্লেশে সংসার চালাই কোন রকমে। আপনারা এই চৌকিটাতে বসুন। আমি যাব আর আসব।

তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা হয় নি।—অমরবাবু হেসে প্রশ্ন করলেন।

আমার নাম নীলাম্বর। 'নীলু' ব'লেই ডাকবেন আমাকে। আমার ছেলের নাম পীতাম্বর, ডাক নাম পীতু।

ও।

পীতুকে ডেকে নিয়ে আসছি এক্ষুনি। আপনারা বসুন।

নীলাম্বর চ'লে যেতেই অমরবাবুর চোখে শিশুসুলভ দুষ্টুমিভরা হাসি ফুটে উঠল।

আপনি ওই চৌকিটাতে ব'সে ততক্ষণ যা মনে এসেছে লিখে ফেলুন, আমি একটু এগিয়ে দেখি, ওই যে ওই গাছের ডগায় ব'সে আছে ওটা কি ? ঠিক চিল ব'লে মনে হচ্ছে না। আর একটু এগিয়ে না গেলে ফোকাস করতে পারব না। আপনি কি বিষয়ে লিখবেন এখন ? খুব গ্র্যাণ্ড ভাব এসে গেছে নিশ্চয় ?

ওই বকগুলোর কথা শুনে দু-চার লাইন মনে এসেছে, তাই লিখে রাখব।

হেরনদের সম্বন্ধে লিখবেন ? তা হ'লে হেরনদের কোর্টশিপের ব্যাপারটা শুনে নিন। আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা একটা বইয়ে পড়েছিলাম। হেরন-যুবা প্রিয়ার সন্ধান করবার আগে ঠিক করে, কোথায় বাসা বাঁধবে। সেটা ঠিক হয়ে গেলে হেরন-যুবা সেই নির্বাচিত বৃক্ষের একটি শাখায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ ক'রে শব্দ করে 'হু' (hoo), তারপর মাথাটি নাবিয়ে পায়ের দিকে চেয়ে শব্দ করে 'উ উ উ উ'। যতক্ষণ না প্রিয়ার দেখা পায়, ততক্ষণ ক্রমাগত এই রকম শব্দ ক'রে যায় সে। আমি চললুম, এক্ষুনি আসছি।

কবি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, হেরনের বাংলা কি হবে? বক?

হেরন বড় বক। কঙ্ক বা বলাকা বলতে পারেন। আমি চললুম। দেখে আস ওটা কি! আপনি চটপট লিখে ফেলুন, অনেক ঘুরতে হবে।

অমরবাবু বাইনাকুলারটা গলায় দুলিয়ে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলেন।

কবি চারিদিকে চেয়ে পরিস্থিতিটা প্রণিধান করলেন। কবিতা লেখবার উপযুক্ত স্থান সন্দেহ নেই। কিন্তু চৌকিতে ব'সে হাঁটুর উপর খাতা রেখে লেখা যাবে না। পাশেই একটা চট প'ড়ে ছিল। সেইটে মাটিতে পেতে বসলেন, আর চৌকিটাকে করলেন টেবিল। ব্যবস্থাটা বেশ মনোমত হ'ল। বাগিয়ে বসলেন। পকেট থেকে খাতা আর কলম বেরুল। মুখ ছুঁচলো ক'রে হাঁটু দুলিয়ে ভাবলেন খানিকক্ষণ, তারপর লিখতে শুরু করলেন। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়াল তা এই—

বিজ্ঞানী কষে শুধু তথ্যের অঙ্ক
কবি বলে—পাখি নয়, মহর্ষি কঙ্ক!
কবি খোঁজে কবিতা, বিজ্ঞানী তথ্য,
কঙ্কই জানে শুধু কোথা সার সত্য।
সকালেই খাওয়া সেরে চ'লে যায় বাসাতে
সন্ধ্যায় খাবে ব'লে ব'সে থাকে আশাতে।
চিত্তে তোলে না সুর কবিতার মাধুরী
তার ধ্যান চুনোপুঁটি মৎস্য বা দাতুরী।
'হু' 'উ' ডাকে উড়ে আসে প্রিয়া নভোচারিণী
সু-অণ্ড-প্রসবিনী অতি মনোহারিণী।
বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে, বেড়ে যায় বংশ
ছানা নয়, আহা, যেন কুল-অবতংস!
এই সত্যের নীড়ে বাস করে কঙ্ক
এই কাব্যের তালে বাজে তার ডঙ্ক।
বাজিতেছে চিরকাল যুগে ও যুগান্তে
হারাইয়া গেল কত ডারবিন্ দান্তে।

কবিতাটা লিখে কবি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।

তারপর খাতার পাতা ওলটালেন। উলটেই আর একটা কবিতা চোখে পড়ল। নিজেরই ছেলের সঙ্গে অনেক দিন পরে দেখা হ'ল যেন। অদ্ভুত লাগল। ভাবটাও অদ্ভুত!

শালিক ছাতারে ঘুঘু ফিঙে বক মুরগী
চড়াই, শকুনি আর কাকেরা
বিহঙ্গ-সমাজের এই নব-শাকেরা,
এবার তুলিবে নাকি বিদ্রোহ ঝাণ্ডা
অভিজাত পাখিদের ক'রে দেবে ঠাণ্ডা!
ময়ূর, ফটিক-জল, দোয়েল হলদে পাখি
আমেরিকা যাবে ব'লে খুঁজিতেছে 'ভিসা' নাকি!
দুধরাজ-দম্পতি
কম্পিত চিত অতি,
নীলকণ্ঠের নীল হইতেছে গাঢ়তর
তিতির বটের 'হুপো' ভয়ে কাঁপে থরথর,
খঞ্জন, টিট্টিভ
ভয়ে বুক ঢিপঢিপ!
থিরথিরা ছোটপাখি
কাঁপিতেছে থাকি থাকি।
কোকিলের কুহু কুহু
মনে হয় উহু উহু
বেদনা আকাশে ফেরে কাঁপিয়া,
চোখ গেল চোখ গেল—ফুকারিছে পাপিয়া।
টুনটুনি বুলবুল
ঘামিতেছে কুলকুল।
শুধু কাঠঠোক্রার, শোনা যায় ঝঙ্কার—
বলে যেন—চোপ চোপ চোপ রও,
চুপি চুপি ডাকে—বউ কথা কও।

দরজি বাবুই আর মুনিয়া
মুচকি মুচকি হাসে শুনিয়া।

কবিতাটা নিজেরই ভাল লাগে নি ব'লে ডানাকে শোনানো হয় নি আর। আর একটা অদ্ভুত কবিতাও চোখে পড়ল। লাল কালিতে লেখা পড়তে পড়তে মুচকি হাসি ফুটল—কেন লিখেছিলেন এসব! বাবিশ যত!

বল্ দেখি ভাই—ডাব,
বলত যদি সে,
অমনি হেসে জবাব দিতাম
তোমার সঙ্গে ভাব।
ছেলেবেলায় সহজ ছিল সব
এখন সবাই 'স্নব'।
শিকড়সুদ্ধ নারকেল গাছটাও এখন যদি আসে
ফিরবে হতাশ্বাসে,
জমবে না ঘটকালি
ঘটবে না তা 'ডাব' বললেই ঘটত যাহা খালি।

কাটাকুটির ভিতর আর একটা কবিতা চোখে পড়েও মজা লাগল খুব।

কবি। [ উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যের প্রতি ] ওরে ভুতো—
পাখিগুলো তাড়া তাড়া, মার্ জুতো।
[ চড়ুই পাখির প্রতি, ভদ্রতা সহকারে ]
চড়ুই পাখি, চড়ুই পাখি,
তোমার না হয় নাই শরম।
কিন্তু তোমার বোঝা উচিত
আমি একটা ভদ্রলোক
আমার দুটো আছেও চোখ
আমার সামনে না-ই করলে
এমনধারা কাণ্ড চরম।

[ ঈষৎ ভাবিয়া এবং ইতস্তত করিয়া ]
একটা কথা হচ্ছে মনে, বলছি সেটা,
আমার ঘরের আল্‌সে জুড়ে করছ যেটা
সেটাই হবে শিল্প-সৃষ্টি
সংস্কৃতি কিংবা কৃষ্টি
সভ্য ভাষা যদি একটা শিখতে পার
করছ যা তা গল্পে যদি লিখতে পার
করতে পার বাজার গরম
পটাৎ ক'রে পক্ষী-কবি হতেও পার
কেউ তোমাকে বলবে—লরেন্স,
কেউ বা হয়তো বলবে—মম্‌।

কবি তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উলটে চলেছিলেন। অমরবাবু যে 'এক্ষুনি আসছি' ব'লে অনেকক্ষণ দেরি করছেন—এ খেয়ালই ছিল না তাঁর। তিনি পুরনো কবিতাগুলোই আবার কাটাকুটি করছিলেন। হঠাৎ অমরবাবু এসে হাজির হলেন। অত্যন্ত উত্তেজিত, ঘর্মাক্ত কলেবর, সঙ্গে চার-পাঁচটা ছোঁড়া।

লেখা হ'ল আপনার ?

হয়েছে।

উঠুন তা হ'লে। অনেক জিনিস দেখাব আপনাকে আজ। গাছের ওপর ওটা কি ব'সে আছে জানেন ? চিল নয়, কোড়াল—হোয়াইট টেল্‌ড্‌ ফিশিং ঈগ্‌ল্‌ ( White Tailed Fishing Eagle ), সংস্কৃত ভাষায় বললে বলতে হয়—মৎস্য-গরুড়। ভাঙড়ের জলচারী পাখিদের রাজা। প্রায় তেত্রিশ ইঞ্চি লম্বা। চলুন, আর দেরি করবেন না।

কবি প্রশ্ন করলেন, এ ছেলেগুলি কে ?

এদের ডেকে নিয়ে এলাম ওদিকের গাঁ থেকে। দুধ খাওয়াব এদের। পাঁচ সের দুধ না হ'লে হবে কি ? এদের সাহায্যও দরকার আমাদের। নলবনের ভেতর যে সব ওয়ার্বলার ঢুকে আছে তাদের তাড়া না দিলে-

বেরুবে না, তাড়া দিলেও বেরুবে কিনা সন্দেহ। এরা ঢিল মারবে। চলুন, বেরুনো যাক। চড়চড় ক'রে রোদ উঠছে।

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। পিছনে পিছনে ছোঁড়ার দল চলল। আলের ওপর দিয়ে কোনক্রমে হাঁটতে হাঁটতে অমরবাবু বললেন, কি কি দেখাব আপনাকে তার মোটামুটি একটা ফর্দ ক'রে ফেলেছি. এই দেখুন। মানে, এই পাখিগুলো এখনও এখানে আছে। খঞ্জন কয়েক রকমই আছে। বিদেশ থেকে এদেশে যারা শীতকালে এসেছিল, তাদের এবার নিজের দেশে ফেরবার সময় হয়েছে। সেখানে গিয়ে বাসা বেঁধে এবার ওরা ডিম পাড়বে। সেই জন্যে ওরা সবাই এবার ব্রিডিং প্লুমেজে ( Breeding Plumage ) অর্থাৎ বর-বেশে সেজেছে। এদের মধ্যে এক রকম হচ্ছে হলদে খঞ্জন। এদের মধ্যে আবার তিনটি উপজাতি আছে। নীল মাথা, ফিকে ধূসর মাথা, গাঢ় ধূসর মাথা। এ ছাড়া আর এক রকম হলদে খঞ্জন আছে যাদের মাথাটাও হলদে। এরা ভিন্ন জাত। পঞ্চম হচ্ছে, গ্রে ওয়াগ্‌টেল ( Grey Wagtail )—এও ভিন্ন জাত। সব দেখতে পাবেন আজ। খঞ্জন ছাড়া আর এক রকম নূতন পাখি দেখাব, যা আপনি দেখেন নি কখনও—ওয়ার্বলার (Warbler)। এদের বাংলা নাম দিয়েছি কলকলানি। পাঁচ রকম আছে দেখলাম—স্ট্রায়েটেড্ মার্শ ওয়ার্বলার ( Striated Marsh Warbler ), গ্রেট রীড্ ওয়ার্বলার ( Great Reed Warbler ), জাংগ্‌ল্ রেন্ ওয়ার্বলার ( Jungle Wren Warbler ), ইণ্ডিয়ান রেন ওয়ার্বলার ( Indian Wren Warbler ), প্যাডি ফিল্ড্ ওয়ার্বলার ( Paddy field Warbler )—

অমরবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

আমার নোট-বুকের কয়েকটা পাতা খুলে প'ড়ে গেছে দেখছি।

এই যে আমি কুড়িয়ে রেখেছি।—একটি ছেলে খান কয়েক পাতা ছেঁড়া কামিজের পকেট থেকে বার করলে।

বাঃ, লক্ষ্মী ছেলে! চল, খাওয়াব তোমাদের।

অমরবাবু তার হাত থেকে পাতাগুলি নিয়ে আবার চলতে শুরু করলেন। চলতে চলতে বলতে লাগলেন, এসব ছাড়া আর যা আছে তা

আপনি দেখেছেন সম্ভবত। টিট্টিভ, গাংচিল, বাজ, জলপিপি, ফেজাণ্ট টেল্‌ড্ জ্যাকানা আছে দেখলাম একটা, ওর দিশী নাম পিউয়া। পিউয়া এখন বর-বেশে সেজেছে, একটা তুতীও দেখেছি। চলুন, অনেকক্ষণ ঘুরতে হবে।

গতিরোধ করতে হ'ল আবার। দেখা গেল, নীলাম্বর পীতাম্বরকে নিয়ে ফিরছে। নীলাম্বর অবাক হয়ে গেল, একটু অপ্রস্তুতও হ'ল যেন।

আপনারা সব চ'লে যাচ্ছেন যে?

আসছি এখুনি, তুমি ততক্ষণ দুধটা গরম কর না।

কতক্ষণে ফিরবেন? দুধ জুড়িয়ে যাবে যে!

আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব। একটু পরে না হয় গরম করো।

অমরবাবু নিজের হাতঘড়িটা দেখলেন একবার।

চলুন, যাওয়া যাক।

আবার তিনি তাঁর নোট-বুক থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে থমকে গেলেন। বাইনোকুলারটা তুলে ফোকাস করলেন আকাশের দিকে, ক'রেই নাবালেন সেটা চোখ থেকে। চোখ দুটো জলজল করছিল উত্তেজনায়।

ওটা দেখুন তো, চিনতে পারেন কি না?

কবি বাইনোকুলার লাগালেন চোখে। তারপর বললেন, চিলের মত মনে হচ্ছে।

চিলের মত, কিন্তু চিল নয়। ওর পেটের তলাটা দেখুন ভাল ক'রে, আর গলার পাশটা দেখুন। পেটের তলাটা দেখেছেন?

দেখেছি, সাদা। গলার পাশে কালো মত একটা দাগ রয়েছে।

দ্যাট্'স ইট। চিলের ও-রকম থাকে কি? বরং যে হোয়াইট আইড বাজার্ড ঈগলের (White Eyed Buzzard Eagle) সঙ্গে কিছু মিল আছে। কিন্তু বাজার্ড অনেক ছোট ওর চেয়ে। অসপ্রে (Osprey) মশাই। উৎক্রোশ, কবি কালিদাস যাকে কুররী ব'লে বর্ণনা করেছেন। সেবার শীতকালে আপনাকে দেখিয়েছিলাম, মনে নেই? এরা সব শীতের অতিথি। গ্রীষ্মকালে ওরা ইউরোপে চ'লে

যায়। ইউরোপে গিয়ে এতদিন ওর বাসা বাঁধা উচিত ছিল। ভাঙড়ের মাছের লোভ ছাড়তে পারছে না বোধ হয়।

অমরবাবু আরও বোধ হয় কিছু বলতেন, কিন্তু নীলাম্বর-পুত্র পীতাম্বর ছুটে এসে বাধা দিলে। দুধটা আপনারা খেয়েই যান। বাবা বললেন, তা না হ'লে দুধ হয়তো খারাপ হয়ে যেতে পারে। রাত্রের বাসি দুধ তো।

চলুন, ঝামেলা মিটিয়েই ফেলা যাক।

অমরবাবু আবার সদলবলে ফিরলেন কুটিরের দিকে। ঘুঁটে আর কাঠ জ্বালিয়ে দুধটা গরম ক'রে ফেললে নীলাম্বর। অমরবাবু প্রত্যেকটি ছেলেকে দু-তিন গ্লাস ক'রে দুধ খাওয়ালেন। কবি বললেন, আমার মশাই খিদে নেই এখন।

যা পারেন খেয়ে নিন। সমস্ত দিন ঘুরতে হবে তো। মিল্‌ক্ ইজ এ গুড ফুড। একটু খান।

এক গ্লাস খেতে হ'ল কবিকে। অমরবাবু উবু হয়ে ব'সে ঢকঢক ক'রে প্রায় এক ঘটি দুধ খেলেন।

নীলাম্বর বললে, আরও খানিকটা দুধ পড়ে রইল যে?

রুমালে মুখ মুছে অমরবাবু হেসে বললেন, ওটুকু তোমরা দুজনে শেষ ক'রে ফেল। চলুন এবার। আহার-সমস্যার সমাধান হ'ল, নিশ্চিন্ত চিত্তে এবার পাখি দেখা যাক, চলুন।

দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

পরিশ্রান্ত কবি একটা গাছের ছায়ায় এসে বসেছেন। অমরবাবু তখনও ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঘন নলখাগড়া ঝোপের পাশে। ছেলেগুলো তখনও ঝোপের ভিতর ইট ফেলছে মাঝে মাঝে। একটিও কলকলানি পাখি দেখা যায় নি তখনও। নলখাগড়ার ভিতর থেকে কিন্তু অবিরাম শব্দ হচ্ছে, গোড়া থেকেই হচ্ছিল। চক্ চক্ চক্ চক্—কেরে কেরে ক্রেৎ ক্রেৎ—চক্ চক্—পৃৎ পৃৎ পৃতিক—ক্রেৎ ক্রেৎ ক্রেৎ। হঠাৎ মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে। সারা দুপুর এই শব্দ শুনে কবি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মনে একটা কবিতার কয়েকটা ছত্র ঘুরে-ফিরে আসা-যাওয়া করছিল অনেকক্ষণ থেকে। পকেট থেকে খাতা কলম বার ক'রে

হাঁটুর উপর খাতাটা রেখে কবিতাটা লিখে রাখলেন। এখনি না লিখে ফেললে ভুলে যাবেন পরে।

জয় জয় জীবনের জয় জয়
নলখাগড়ার বন বাঙ্ময়।
বাঙ্ময় আকাশের শূন্য
ক্ষিতি অপ্ মরুৎ যে পূর্ণ
রোদে জ্ব'লে বাণী কার পুণ্য
ক্রেৎ ক্রেৎ কেরে কেরে কিবা কয়!
জয় জয় জীবনের জয় জয়।

দেখুন, দেখুন, দেখুন—একটা বেরিয়েছে—

অমরবাবু চিৎকার ক'রে উঠলেন হঠাৎ।

ফুড়ুৎ ক'রে একটা পাখি বেরিয়েই আবার ঝোপে ঢুকে পড়ল। অমরবাবু সাগ্রহে ছুটে এলেন।

দেখেছেন পাখিটা? অলিভব্রাউন রঙ, ঠোঁটটা কালচে বাদামী?

কবি দেখতে পান নি। কিন্তু বিজ্ঞানীকে সে কথা বললে তিনি বড়ই মর্মাহত হবেন, তাই বললেন, দেখেছি, তবে ভাল ক'রে দেখি নি।

ওর চেয়ে ভাল ক'রে দেখা শক্ত। মার্শ ওয়ার্বলারটা দেখেছেন ভাল ক'রে আশা করি। অনেকটা ভরত পাখির মত উড়ল, না? গানটিও সুন্দর, হুইট্—হুইট্—টু—টু—হুইট্—হুইট্—

ছেলেগুলো নলখাগড়ার ঝোপে আবার ঢিল ছুঁড়ছিল। দুধ খাইয়ে অমরবাবু তাদের কেনা গোলাম ক'রে ফেলেছিলেন একেবারে। অমরবাবু বললেন, ওই ঝোপটার ওপর আসুন আমরা বাইনোকুলার ফোকাস ক'রে ব'সে থাকি। কখন ফট ক'রে বেরুবে বলা যায় না তো!

দুজনে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ব'সে রইলেন। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, গ্রীষ্মের এই দুপুরে কৃচ্ছ সাধন ক'রে আমরা কি খুঁজছি? পাখি, না, আর কিছু?

[ক্রমশ]

"বনফুল"

# মালবিকার ভবিষ্যৎ

সমস্ত সংসারটা অন্ধকার হয়ে যেতে মাত্র এক মুহূর্ত লাগল।

স্টিফেন কোর্টের তিনতলার ঘরে ব'সে মালবিকার মনে হ'ল, কে যেন হঠাৎ সুইচটা টিপে দিতেই ঘরটা ডুবে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকারে। মনে হ'ল, জীবনের কোথাও আর এক বিন্দু আলো রইল না। মালবিকার স্বামী সুনীল রক্ষিত এইমাত্র মারা গেল। ডাক্তার চ্যাটার্জি ঘোষণা করলেন, সুনীলকে বাঁচাতে পারলুম না। বাঁচাবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—সত্যিই যথাসাধ্য। দম-দেওয়া গ্রামোফোন থেকে যেন কথাগুলো বেরিয়ে এল। প্রফেশনাল কথা। রোগী মারা গেলে সব ডাক্তারকেই এমনি ধরনের কথা বলতে হয়। ডাক্তার চ্যাটার্জিও বললেন। বলবার পর মালবিকার ওপর কি প্রতিক্রিয়া হ'ল তা পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে ডাক্তার চ্যাটার্জি ঢুকে পড়লেন চানঘরে। চানঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। সাবান দিয়ে ভাল ক'রে হাত ধুয়ে তিনি ফিরে এসে বললেন, জন্ম এবং মৃত্যু আমাদের হাতের কৃতিত্বের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে না এমন কি পেনিসিলিনের ওপরও। অত্যন্ত দুঃখিত।···নার্স, তোমার তো এখানে কাজ ফুরিয়েছে।—হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনি পুনরায় বললেন, এখন মাত্র সন্ধ্যে ছটা। দু ঘণ্টা বিশ্রাম তুমি করতে পার অনায়াসেই। তারপর রাত আটটায় তোমাকে যেতে হবে গল্‌স্টন ম্যানসনের তেরো নম্বর কামরায়। তেরো নম্বর? ও লর্ড! নম্বরটা তো দেখছি—। সে যাক, মিস্টার জনসন বুড়ো মানুষ। আশী পেরিয়ে গেছেন। নম্বরটা যতই দুর্ভাগ্যসূচক হোক না কেন, তাঁর কোন ভবিষ্যৎ নেই। অত্যন্ত দুঃখিত মিসেস রক্ষিত···এই নিন ডেথ-সার্টিফিকেট।

ডাক্তার চ্যাটার্জি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। পেছন থেকে মালবিকা বললে, একটু দাঁড়ান। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। মালবিকার মনে হ'ল, ডাক্তার চ্যাটার্জি দাঁড়াবার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে মালবিকা বললে, এই আপনার টাকাটা। আপনি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন—আপনার টাকা।

ও, হ্যাঁ, টাকা।—পকেটে রাখতে গিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জি টাকাগুলো চকিতের মধ্যে গুনে ফেললেন। তারপর বললেন তিনি, একটা দশ টাকার নোট বেশি এসে গেছে। এই নিন।

মালবিকার হাতে সবগুলো টাকাই গুঁজে দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, সংসারে একা পড়লেন, টাকার প্রয়োজন আপনারই হবে সবচে বেশি। ইউরোপের যে-কোন ম্যানসনে যদি এমন ট্র্যাজেডি ঘ টাকা আমি অবশ্যই নিতুম। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে সুনীল মারা গে এই বয়সে ইউরোপেও লোক মারা যায়, কিন্তু আমাদের মত মেয়ের সেখানে এত অসহায় নয়। হয়তো ক ঘণ্টা শোক করবার পর, উল্টো দিকের আর এক ম্যানসনে গিয়ে সে নতুন স্বামীর সঙ্গে ঘর বেঁধে বসে। মিসেস রক্ষিত, আমি অত্যন্ত দুঃখিত—মানে আমাদের সামাজিক নিয়ম-গুলোর মধ্যে বড্ড বেশি বর্বরতা।···নার্স, ছটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে গেছে। বাই দি ওয়ে, সুনীলকে কোথায় পাঠাচ্ছেন? কেওড়াতলায়, না, ক্রিমেটরিয়ামে? আত্মীয়স্বজন কেউ নেই কলকাতায়? আই মীন সুনীলের সঙ্গে প্রায় দশ বছরের পরিচয়, কিন্তু ওর যে কেউ আত্মীয়স্বজন থাকতে পারে তা আমি কখনও ভেবে দেখি নি। মিসেস রক্ষিত, কোন ঠিকানা যদি জানেন, আমি না হয় চেম্বারে গিয়ে টেলিফোন ক'রে দিই?

আমার কোন ঠিকানা জানা নেই ডাক্তার চ্যাটার্জি। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু এই ডেথ-সার্টিফিকেট নিয়ে আমি কি করব?

শ্মশানে সরকারী লোক আছে, তাদের দিতে হবে। সঙ্গে টাকা কটাও পাঠিয়ে দেবেন। প্রাচীনকালের মত আমরা আর হিসেব ছাড়া মরতে পারি নে। সরকারী খাতায় নাম ধাম সব লেখা থাকবে। চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে আপনার কি চারজন আত্মীয়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না? সুনীলকে কাঁধে তোলবার জন্যে অন্ততপক্ষে চারজন লোকের দরকার। আপনার বয়-বাবুর্চীরা তো কাঁধে তুলতে চাইবে না।

মালবিকা এখনও এতদূর পর্যন্ত ভাবতে পারে নি। কোনও জবাব দিল না সে। ডেথ-সার্টিফিকেট আর টাকাগুলো হাতে নিয়ে

মালবিকা এসে দাঁড়াল বিছানার পাশে। সুনীল ঘুমিয়ে আছে। এ ঘুম আর কোনদিনই ভাঙবে না। আরও দু-এক মিনিট অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার চ্যাটার্জি চ'লে গেলেন সুনীল রক্ষিতের ফ্ল্যাট থেকে, চ'লে গেলেন ষ্টিফেন কোর্টের বাইরে।

মৃত স্বামীর দিকে মালবিকা চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। এমন মনোযোগ দিয়ে সে কোনদিনও চেয়ে দেখে নি। বুঝতে পারে নি মালবিকা যে, দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কেবল এই একটা মানুষই জালিয়ে রেখেছিল ওর জীবনের সবটুকু আলো। সত্যিই সবটুকু আলো। স্বামীর মৃত্যুর ঠিক পর-মুহূর্তেই অন্ধকারের স্বাদ পেল ষ্টিফেন কোর্টের মালবিকা রক্ষিত।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স কখন যে চ'লে গেছে, মালবিকা তা টের পায় নি। সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে আজ টের পেত না। অনুভূতি-রাজ্যের এ এক বিশেষ অবস্থা, বিশেষ মুহূর্ত, যখন ঘরের দেওয়াল কিংবা আসবাবগুলো পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় না। স্বর্গীয় সুনীল রক্ষিতের বয়-বাবুর্চী দুটো দরজার ও-পাশ থেকে উঁকি দিয়েছে বার কয়েক। এখন তারাও আর দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে নেই। মালবিকার মত বয়-বাবুর্চীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। ষ্টিফেন কোর্টের চার নম্বর ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটে আসবে আগামী মাসের প্রথম তারিখে। বয়-বাবুর্চীর কাজ এক রকম পাকা হয়েই আছে। এ মাসের পনেরোটা দিন হয়তো ওদের বেকার থাকতে হবে। সুনীল রক্ষিত মাসের শেষ তারিখে মরলে হিসেবের খাতায় লোকসানের কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকত না। কিন্তু ভাগ্যের হিসেবের সঙ্গে বয়-বাবুর্চীর কিংবা ডাক্তার চ্যাটার্জির হিসেব মিলল না ব'লে লোকসানের সবটুকুই প্রাপ্য কেবল মালবিকার।

কামরার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা বারান্দা। মালবিকা এসে দাঁড়াল এই বারান্দায়। সামনেই চৌরঙ্গী রোড। রাস্তা আর বাড়িটার মাঝখানে পার্কিঙের বেশ খানিকটা জায়গা রয়েছে। অনেকগুলো গাড়ি সেখানে পার্ক করাই আছে। নতুন নতুন গাড়ি অল্প আলোয় বেশ ঝকঝক করছে। ঝকঝক করছে সুনীল রক্ষিতের

প্যাকার্ড গাড়িখানাও। ড্রাইভার গুলজার আলি গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অন্য একজন ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। হয়তো বা এরই মধ্যে সে খবর পেয়েছে বেশি মাইনের স্থায়ী চাকরির। কথাটা ভাবতে গিয়ে মালবিকার ঠোঁট দুটো একটু ন'ড়ে উঠল। সে ভাবল, জীবনের কোন কিছুই স্থায়ী নয়।

রাস্তার ও-পাশে গির্জেটায় ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল। ক্যাথলিকদের আজ পাম্-সান্‌ডে। তাই বোধ হয় ওখানে আজ ভিড় জমেছে খুব। সবাই এসেছে প্রার্থনা-মন্দিরে যোগ দিতে। প্রার্থনা? মালবিকা কথাটা দু-তিনবার নিজের মনে মনেই উচ্চারণ করল। মানুষ প্রার্থনা করে কেন? কার কাছে প্রার্থনা করে? সে তো কোনদিনও কারও কাছে কোন প্রার্থনাই জানায় নি? কলেজ থেকে বেরিয়ে আসবার পর সে পেয়েছিল স্বামী—না চাইতেই পেয়েছিল। আজ আবার স্বামী তার চ'লে গেল। চব্বিশ ঘণ্টাই হাতজোড় ক'রে প্রার্থনা করলেও কেউ তার স্বামীকে ধ'রে রাখতে পারত না। ধ'রে রাখতে পারল না কলকাতার একজন সেরা চিকিৎসক ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জিও। গির্জের ঘণ্টা থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন মালবিকার মনে হ'ল যে, কেবল ডাক্তার চ্যাটার্জিকে না ডেকে সে যদি তন্ময় হয়ে অন্য কাউকে ডাকতে পারত, হাতজোড় ক'রে প্রার্থনার ভঙ্গিতেই সে ডাকত, তবে—। মালবিকা ব্যাপারটা আর তলিয়ে দেখতে চাইল না। সুযোগ থাকতে যখন সে ব্যাপারটা কোনদিনও তলিয়ে দেখে নি, আজ আর সে কথা ভেবে লাভ কি? লাভ? লাভ-লোকসানের হিসেব সে চুকিয়ে দিয়েছে—দিয়েছে চিরজন্মের মতন। সুনীল রক্ষিতের ওপর এখন প্রার্থনার প্রলেপ লাগালেও শবদেহের পচন সে আর কোনরকমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।

স্টিফেন কোর্টের বড় গেট দিয়ে একটা তেলেগু আয়া ভেতরে আসছিল। ময়দান থেকে ফিরছে সে। কোন এক নাম-না-জানা সাহেবের বাচ্চাকে সে প্র্যামে' বসিয়ে রোজই নিয়ে যায় ময়দানের দিকে। সন্ধ্যের একটু পরেই তেলেগু আয়া ফিরে আসে বাচ্চাকে নিয়ে। আজও

সে ফিরছে। মালবিকার মনে হ'ল, সে তার নিজের বাচ্চাকে কোনদিনও এমন ক'রে একজন ভাড়াটে আয়ার কাছে ছেড়ে দিত না। বিকেলের দিকে স্বামী-স্ত্রীকে ক্লাবে যেতে হয় ব'লে ওরা বাচ্চার দায়িত্ব আয়ার ওপর ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু সন্তানের জন্যে মালবিকা পারত ক্লাবের আকর্ষণ ছেড়ে দিতে অতি অনায়াসেই। বাঙালী মায়ের মর্মকথা যেন দুনিয়ার অন্য কোন মায়ের মর্মকথার সঙ্গে মেলে না। সাহেবের বাচ্চাটার দিকে চেয়ে এই মুহূর্তে মালবিকার সমস্ত দেহে কেমন একটা স্পন্দন এল। শান্ত নদীর জল ঝিরঝিরে বাতাসে যেমন ক'রে একটু হালকাভাবে হেলে দুলে ওঠে, মালবিকার দেহমনও যেন তেমনি ভাবে কোন্ এক প্রেরণা-স্পর্শে পুলকিত হয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল, সে লাফিয়ে নেমে যায় নীচে। গিয়ে তেলেগু আয়াটাকে এক বছরের আগাম মাইনে দিয়ে বিদায় ক'রে দিয়ে আসে। তারপর বাচ্চাটাকে নিজের বুকের ওপর চেপে ধ'রে সে উঠে আসে ষ্টিফেন কোর্টের তিনতলায়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মালবিকা। হঠাৎ ও চমকে উঠল। ষ্টিফেন কোর্টের বড় ফটকের দিক থেকে একটা অসহায় চিৎকার বাতাসের গায়ে ভর দিয়ে যেন উঠে এল বারান্দা পর্যন্ত। মালবিকার ভাঙা বুকের ওপর চিৎকারটা যেন হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল টুকরো টুকরো হয়ে। মালবিকা পরিষ্কার দেখতে পেল, একটা নতুন ঝকঝকে মাস্টার ব্যুইক ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ ব্রেক ক'ষে বসল। কিন্তু তার আগেই বাচ্চার চিৎকার উঠে এসেছে বারান্দা পর্যন্ত। তেলেগু আয়ার চিৎকার মালবিকা শুনতে পেল না।

মালবিকা মুহূর্তের মধ্যে ঘেমে উঠল অপরিমিতভাবে। ষ্টিফেন কোর্টের বাতাস আজ সাহারার বাতাসের চেয়েও বেশি গরম। মালবিকা ছুটে চ'লে এল কামরার মধ্যে। হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়ল শবদেহের পাশে—স্বামীর শবদেহ। সে অনুভব করল, মাদ্রাজের উপকূল থেকে একটা দমকা বাতাস ছুটে আসছে—পার হচ্ছে বঙ্গোপসাগর। পার হওয়ার পথে সে সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছে জলকণা। প্রতি মিনিটে দমকা হাওয়ার গতি বাড়ছে। মালবিকার মনে হ'ল, এই গর্জনশীল

প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা বুঝি ওর বুকের ওপর এসে ধাক্কা খাবে। ধাক্কা খেয়ে জলকণাগুলো ভেঙে পড়বে। ওর সারা অস্তিত্ব জুড়ে বুঝি আজ নামবে কান্নার মনসুন। ইচ্ছে হ'ল, মনসুন নামবার আগে সে একবার চিৎকার ক'রে উঠবে। একটা চিৎকারে ষ্টিফেন কোর্টটাকে ফাটিয়ে দিতে পারলে মালবিকা বোধ হয় আজ একটু আনন্দের আস্বাদ পেত। কিন্তু একটু পরেই মালবিকা ভাবলে, বয়-বাবুর্চীগুলো বোধ হয় আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছে মালবিকার প্রতি পদক্ষেপ। চিৎকার করতে গিয়ে ওর মনে এল লজ্জা। তারপর এল সৌজন্যবোধ। ও-পাশের ফ্ল্যাটের মানুষগুলোর জীবনযাত্রায় বিঘ্ন ঘটানো উচিত হবে না। উচিত হবে না ওর দুঃখের অংশ নেবার জন্যে অন্য পাঁচজনকে সজাগ ক'রে তোলা। শবদেহের পাশে নতজানু হয়ে মালবিকা হাত জোড় করল। চিৎকার করার চেয়ে প্রার্থনা করা অনেক সোজা। প্রার্থনার বিশেষ কোন মন্ত্র ওর জানা নেই। না থাক্, এবার সে নিজের মন্ত্র নিজেই মনে মনে ঠিক ক'রে নেবে। ঠিক ক'রে নেবার জন্যে মালবিকা মনটাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলল নিজের কামরার মধ্যে। ষ্টিফেন কোর্টের ফটকের দিকে সে আর কিছুতেই কান পাতবে না। মালবিকা ধ্যানে বসল। ধ্যানের ময়দানে তেলেগু আয়া ঘুরে বেড়াতে লাগল সাহেবের বাচ্চাটাকে নিয়ে। মালবিকা প্রার্থনা করতে লাগল, ষ্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে তেলেগু আয়া যেন আর কোনদিনই প্রবেশ না করে। স্বামী আর পরের শিশুর মধ্যে কোন ব্যবধান রইল না মালবিকার প্রথম প্রার্থনায়।

## দুই

কলকাতার এক মেয়ে-কলেজ থেকে মালবিকা গত বছর বি. এ. পাস করেছে। পরীক্ষার ফলাফল বেরুবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায় সুনীল রক্ষিতের সঙ্গে। মালবিকার বাবা নেই, বিধবা মা থাকেন শিলঙে তাঁর বড় ছেলে রমেনের কাছে। রমেন সেখানে চাকরি করে।

ওঁরা এসেছিলেন শিলং থেকে কলকাতায় মালবিকাকে বিয়ে দেবার জন্যে। তাঁদের আসতেই হয়েছিল। কন্যাপক্ষের টাকায় কলকাতার

সব আত্মীয়স্বজনেরা শিলং বেড়িয়ে আসবার সুযোগ পাবে ব'লেই সুনীল যেন কলকাতার বাইরে গিয়ে বিয়ে করতে রাজী হয় নি। তা ছাড়া বিলিতী কোম্পানির সাহেবসুবোরা সে বিয়েতে যোগ দিতে পারত না। সুনীল রক্ষিত খুবই অল্প বয়সে সাহেব কোম্পানিতে বড় চাকরি পেয়েছে। কলকাতার আত্মীয়স্বজনেরা খুবই চেষ্টা করেছিল সুনীল যেন বড় চাকরিটা না পায়। হয়তো সেই কারণেই বিয়ের রাত্রে সে কোন আত্মীয়কে ডাকে নি সঙ্গে যাবার জন্যে।

বিয়ের এক মাস আগে রমেন তার মাকে নিয়ে এসে উঠল এক হোটেলে। কলেজের হস্টেলে থাকত মালবিকা। দু-চার দিনের মধ্যেই রমেন ভাড়া ক'রে ফেলল জয়গোবিন্দ-হাই-ইস্কুলের বাড়িটা। গরমের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে। অতএব সেক্রেটারির হাতে শ পাঁচেক টাকা দিয়ে বাড়িটা এক মাসের জন্যে ভাড়া নিতে রমেনের কোন অসুবিধে হ'ল না। মা এবং দাদার সঙ্গে মালবিকাও উঠে এল জয়গোবিন্দ-হাই-ইস্কুলে। খুব হৈ-চৈ ক'রে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে লাগল রমেন। মালবিকা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। বয়স বেড়েছে তার, সেই সঙ্গে বেড়েছে বিদ্যা। তাই সে একদিন রমেনকে বললে, বড্ড লজ্জা পাচ্ছি দাদা, তোমার এই বিরাট আয়োজন দেখে। সামান্য একটা বিয়ের জন্যে এত খরচ করছ কেন?

বাবার টাকাই তো খরচ করছি। মারা যাবার আগে তিনি তোর বিয়ের জন্যে পনেরো হাজার টাকা রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু টাকা থাকলেই নষ্ট করতে হবে—সে কথা তো বাবা ব'লে যান নি? তা ছাড়া দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা এবং নাগপুর থেকে আসা-যাওয়ার ভাড়া দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনছ কেন দাদা?

সহসা জবাব দিতে পারল না রমেন।

কাটা-বাংলার ভাঙা হাটে কেবল জয়গোবিন্দ-ইস্কুলটাকে এক রাত্রের জন্যে ইলেকট্রিক আলো দিয়ে সাজিয়ে রাখবার মধ্যে আর যাই থাক্, রুচি নেই দাদা।—বেশ একটু জোর দিয়েই কথাটা বললে মালবিকা।

চুপ ক'রে থাকা আর বাঞ্ছনীয় নয় মনে ক'রেই রমেন এবার ধীরে

ধীরে বলতে লাগল, তুই একটু ভুল বুঝেছিস বোন। দু দিকের ভাড়া দিয়ে আত্মীয়স্বজনকে ডেকে আনবার মধ্যে তুই কেবল টাকার লোকসান দেখছিস, কিন্তু লাভের দিকটা দেখছিস না।

তুমি দেখিয়ে দাও দাদা।

দেখিয়ে দিলেও তোরা আর দেখতে চাইবি না। কাগজ আর ছাপাখানার রেট সস্তা হওয়ায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে চলেছে বিদ্যার প্রহসন। যার যা মনে আসছে, তাই তারা লিখে যাচ্ছে। তোরা সেই সব প'ড়ে প'ড়ে চারদিকে কেবল লোকসানই দেখতে পাচ্ছিস।

লাভটা তুমিই একটু দেখিয়ে দাও।—লাভ দেখবার জন্যে মালবিকা যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রমেন বললে, বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় দশ বছর হ'ল। তার পর থেকে আমরা কেউ কোন আত্মীয়স্বজনকে চোখে দেখি নি। তুই তো বোধ হয় জেঠামশাই কিংবা ছোট কাকার নাম পর্যন্ত জানিস না। মালবিকা, আমাদের সামাজিক জীবন ইউরোপের সঙ্গে মেলে না। তাই বিয়ে এবং পূজোপার্বণ উপলক্ষে ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজনকে আমরা ডাকি। স্নেহ এবং ভালবাসার আদান-প্রদানের মধ্যে খরচের কথাটা আমরা ভুলে যাই। কিন্তু তোদের কাছে আজ আত্মীয়তার কোন মূল্য নেই। ভালবাসার বাজারদর দেখবার জন্যে তোদের তাই খবরের কাগজের পৃষ্ঠা ওলটাতে হয়। তর্ক ক'রে কোন কথাই তোকে বোঝাতে পারব না। তোর টাকা, ইচ্ছে করলে তুই সবটাই ক্যাশ নিতে পারিস। শুনেছি, সুনীল একটা বড় গাড়ি কিনতে চায়। হয়তো এই টাকাটা তার কাজে লাগতে পারে।

সব টাকাটাই অবশ্য মালবিকা নগদ নেয় নি। প্যাকার্ড গাড়ি কেনবার জন্যে সুনীলের কম পড়ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তা সে পেয়েছে মালবিকার কাছ থেকে বিয়ের রাত্রেই। বাকি দশ হাজার টাকা খরচ হ'ল বিয়ের উৎসবে। দিল্লী-পাটনার আত্মীয়দের ভাড়ার টাকা পাঠানো হয় নি ব'লে তাঁরা কেউ এলেন না। কলকাতায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসে বরকনেকে আশীর্বাদ ক'রে গেলেন। বিয়ের সাত

দিন পরেই রমেন মাকে নিয়ে চ'লে গেল শিলং। মালবিকা এসে উঠল স্টিফেন কোর্টে।

বিয়ের রাত্রিটা মালবিকা আজও ভুলতে পারে নি। জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাটা বড় ব'লে সেখানেই ওদের বাসরঘর সাজানো হয়েছিল। জয়লক্ষ্মী ডেকোরেটার কোম্পানির লোকরাই সাজিয়ে দিয়েছিল। দিল্লী-পাটনার বোনেরা এলে হয়তো এর চেয়ে ভাল ক'রে তারা সাজাতে পারত না। পারত না তা ঠিক, কিন্তু জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারত। ভাড়াটে ডেকোরেটারের সৌন্দর্যবোধকে ছাপিয়ে যেত ওদের প্রাণের প্রাচুর্য। কোটি টাকার মধ্যেও যে অভাব থাকতে পারে, মালবিকার তা জানা ছিল না। তাই বাসরঘরে সে বিয়ের রাত্রে কোন অভাবই দেখতে পায় নি।

রাত দশটার পর মালবিকা স্বামীর সঙ্গে বাসরঘরে এসে ঢুকল। ঢুকল সে সুনীল রক্ষিতের বউ হয়ে। মালবিকা জনতা চায় নি, চেয়েছিল জন, কেবল একজন। আজ তারই সঙ্গে সে এক শয্যায় শয়ন করছে। মালবিকার স্বামীভাগ্য গণৎকারের গণনাকে ভুল প্রমাণ করেছে। ঠিকুজির ছকে সুনীল রক্ষিত ভাগ্যবান ব'লে ধরা পড়ে নি। সে সব হাস্যকর গণনা-বিজ্ঞানের কথা মালবিকার আজ মনে ছিল না। থাকবার কথাও নয়।

শুয়ে পড়েছে মালবিকা। বড্ড পরিশ্রান্ত ওরা দুজনেই। সুনীল রক্ষিত পাখার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে এল। তারপর দরজাটায় দিল খিল লাগিয়ে। নতুন খিল। জোরে চেপে ধরলে কাঁচা রঙ হয়তো হাতের সঙ্গে উঠে আসত। বাসরঘরের দরজায় খিল লাগাতে হবে—সে কথা রমেনের মনে পড়েছিল শেষ-মুহূর্তে। বউবাজার থেকে ছুতোর মিস্ত্রি ধ'রে এনেছিল সে নিজেই। বর্মা-টিকের অভাব ব'লে সে সঙ্গে ক'রে কিনে নিয়ে এল এক নম্বর সি. পি. টিক। খিলটা শক্ত হওয়া চাই। দাদার ব্যবস্থায় মালবিকা মনে মনে খুশি হয়েছে। শক্তি বেড়েছে মালবিকার। দু-চার জন চোর-ডাকাতের সাধ্য নেই

বাসরঘরের দরজা ভেঙে দানসামগ্রী চুরি করার। চুরি তবু হ'ল। হ'ল এক বছর পর। সুনীল রক্ষিতকে ধ'রে রাখতে পারল না মালবিকা। ধ'রে রাখতে পারল না ডাক্তার চ্যাটার্জিও।

জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় খিল পড়ল। শুয়ে পড়বার আগে সুনীল রক্ষিত জিজ্ঞাসা করলে, ও-পাশের জানলাটা বন্ধ করব?

আজ কি দরকার বন্ধ করবার? খোলাই থাক্।

আলো আসছে।

একটু পরেই নিবে যাবে।—বললে মালবিকা। এমনভাবে বললে যেন দুজনের মধ্যে অনেক দিন আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয়ের আগ্রহ কিংবা বিস্ময়ের সুর শোনা গেল না এদের প্রশ্ন এবং জবাবের মধ্যে।

জানলা দিয়ে কেউ উঁকি দেবে না তো?—জিজ্ঞাসা করল স্বামী সুনীল রক্ষিত।

উঁকি? উঁকি দেবার মত মেয়ে কোথায় জয়গোবিন্দ-ইস্কুলে? কলকাতার শিক্ষিত সমাজ থেকে যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল, তারা ডিনার খেয়ে বাড়ি ফিরে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। উৎসব ও আমোদপ্রিয় ছোট ছোট বোনেরা তো দিল্লী-পাটনা থেকে আসতে পারে নি। এসব কথা মালবিকার মনেই এল না। সে বললে, উঁকি দেবার মত ভাল্‌গার মনোবৃত্তি এখানে কারও নেই। মালবিকার জবাবটা মুগ্ধ করল সুনীল রক্ষিতকে। মুগ্ধ হওয়ার পর সে তার এটাচি থেকে রাত্রের পোশাক বার করল। কি মনে ক'রে মালবিকা বললে, ওটা আজ নাইবা পরলে! একটা রাত ধুতি প'রেই কাটিয়ে দাও।

আচ্ছা, তাই দিই।

প্রথম রাত থেকেই স্বামী তার অনুরোধ রাখছে দেখে মালবিকার গর্ব হ'ল খুব। সে চোখ খুলে দেখলে, গোটা সংসারটা যেন প্রথম রাত্রেই ওর একেবারে একলার সম্পত্তি হয়ে উঠেছে। কেউ সেখানে নেই।

অনাবশ্যক জনতাকে সরিয়ে দিয়েছে তার স্বামী। স্বামী ছাড়া মালবিকা আর কাউকে সেখানে দেখতে পেল না।

বাতিটা এবার নিবিয়ে দিয়ে সুনীল রক্ষিত শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়বার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল মালবিকার স্বামী। হঠাৎ যেন মালবিকার ভয় করতে লাগল। মনে হ'ল, সে একলা। সারাটা জীবন সুনীল রক্ষিত এমনি ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর শুরু হবে ওর নিঃসঙ্গ-জীবনের লম্বা লম্বা মুহূর্তগুলো। স্বামী-ভাগ্যের গর্ব যেন এরই মধ্যে গ'লে গ'লে ক্ষ'য়ে যেতে লাগল জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়।

ঘুম আসছে না মালবিকার। প্রথম পুরুষের সঙ্গে ঘর করবার উন্মাদনা ওর ঘুম কেড়ে নিতে পারে নি। ঘুম কেড়ে নিয়েছে ওর দেওয়ালে-টাঙানো ব্ল্যাক-বোর্ডটা।

ধবধবে সাদা দেওয়ালের ওপর ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে চেয়ে রইল মালবিকা। তৃতীয় শ্রেণীর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা খড়িমাটি দিয়ে আঁকা-বাঁকা লাইন টেনে রেখেছে। তার মধ্যে ছড়িয়ে আছে দু-চারটে অক্ষর। সাদা অক্ষর। বাইরের আলো এসে পড়েছে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর। মাঝে মাঝে মালবিকার মনে হতে লাগল, ওই কালো পৃথিবীর ওপর দিয়ে সারি বেঁধে চলেছে সব শিশুর দল। খড়িমাটির রেখা ওগুলো নয়।

ইস্কুলের ঘড়িতে বারোটা বাজল। রাত বারোটা। আজ আর ওর ঘুম আসবে না। এবার ওকে ঘুমুতে দিচ্ছে না ওই শিশুগুলো। মালবিকার মনে হ'ল, ওর সমস্ত দেহের মধ্যে কি রকম একটা শিহরণ এসেছে। ছেলেগুলো বুঝি ওর দেহের ওপর দিয়েই সারি বেঁধে চলেছে। মালবিকা উঠে এল বিছানা থেকে। দাঁড়াল এসে জানলার কাছে। তারপর যেন রাগ ক'রেই জানলাটা দিল বন্ধ ক'রে।

ভাগ্যের ব্ল্যাক-বোর্ড থেকে কালো রঙটা মুছে দিতে চাইল মালবিকা রক্ষিত।

## তিন

আজও রাত বারোটা বেজে গেছে। মালবিকার ঘুম আসছে না। শবদেহের পাশে নতজানু হয়ে ব'সে আছে ও। হাত জোড় ক'রে বোধ হয় প্রার্থনা করছে। শবদেহটার মূল্য আর কাণাকড়িও নেই, তা সে জানে। সারা জীবন ধ'রে প্রার্থনা করলেও সুনীল রক্ষিত আর প্যাকার্ডে চেপে অফিসে যেতে পারবে না। পারবে না একটু ন'ড়ে উঠতেও। মালবিকা ক্রমে ক্রমে ডুবে যেতে লাগল নিরাশার অন্ধকারে। চেপে ধরবার মত একটা ভাসমান কুটো পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে।

চৌরঙ্গীর রাস্তায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। মালবিকা উঠে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। কোথাও কাউকে দেখতে পেল না সে। গ্যারেজে গাড়ি তুলে দিয়ে ড্রাইভারটা বস্তিতে ফিরে গেছে। দু-এক বোতল দেশী মদ না খেয়ে লোকটা নাকি ঘুমুতে পারে না। মালবিকা জানে, আজও তার সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্সটা কাছে থাকলেও মালবিকা এতটা অসহায় বোধ করত না। কিন্তু সেও চ'লে গেছে সন্ধ্যের পরেই। গলস্টন ম্যান্‌সনের তেরো নম্বর কামরায় রাত আটটা থেকে শুরু হয়েছে তার নতুন ডিউটি। ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি? তিনিই বা কি করবেন? সমস্ত দিনটা তাঁর হাড়ভাঙা খাটুনি। তা ছাড়া প্রতিদিনই হয়তো তাঁকে দু-একটা ক'রে ডেথ-সার্টিফিকেট লিখতে হয়, কোন রকম মৃত্যুই আর তাঁকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে না। লাফিয়ে পড়বে না কি এখান থেকে?—ভাবল মালবিকা। নৈরাশ্যের হাতুড়ি ঘা মেরে মেরে ওর সমস্ত অনুভূতিকে যেন অবশ ক'রে ফেলছে। ব্ল্যাক-বোর্ডের কালো রঙটা বুঝি সমস্ত সংসারটাকে অন্ধকার ক'রে দিয়েছে। কিন্তু কোন অন্ধকারই তো চিরস্থায়ী নয়। মালবিকা একটু ঝুঁকে দাঁড়াল সামনের দিকে। চোখ দুটো যেন এগিয়ে নিয়ে গেল ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে। খড়িমাটি দিয়ে লেখা সাদা অক্ষরগুলো ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। ব্ল্যাক-বোর্ড যত কালোই হোক, ওই সাদা অক্ষরগুলো সে গিলে খেতে পারে নি। মালবিকা যেন অক্ষরগুলোর মধ্যে আশার আলো দেখতে পেল। দেখতে পেল, মৃত্যুর অন্ধকার ভেদ

ক'রে ফুটে বেরিয়ে আসছে জীবনের আলো। যেন ওর দেহের ওপর দিয়ে আজ আবার সেই জয়গোবিন্দ-ইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর বাচ্চাগুলো মার্চ ক'রে চলেছে। সাদা অক্ষরের সারি।

ষ্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জির গাড়িখানা ঢুকল। মালবিকা চ'লে এল ভেতরে। দাঁড়াল এসে মৃত সুনীল রক্ষিতের পাশে। ঘরের দরজা খোলাই ছিল। মালবিকা লক্ষ্য করলে, ডাক্তার চ্যাটার্জির পদক্ষেপে আজ আর রোগী দেখবার তাড়া নেই। ভিজিট গুনবার গোপন মনস্তত্ত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জির মন। রাত বারোটার পর আজ আর তিনি দুনিয়ার কোন ওষুধের নামই স্মরণ করবার চেষ্টা করবেন না। জীবনে বোধ হয় এই তিনি প্রথম রাত বারোটার পর বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কেবলমাত্র একজন অসহায় মহিলার খবর নেবার জন্যে। চিকিৎসা-শাস্ত্রের বাইরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি। জিজ্ঞাসা করলেন, সৎকারের কোন ব্যবস্থা করেন নি?

কেমন ক'রে কি ব্যবস্থা করতে হয়, আমি তা জানি না।—জবাব দিল মালবিকা।

ক্রিমেটরিয়ামে নেওয়াই ভাল।

আপনি যা ভাল মনে করেন করুন। ড্রয়ার থেকে দুখানা একশো টাকার নোট নিয়ে মালবিকা তুলে ধরল ডাক্তার চ্যাটার্জির দিকে।

টাকাটা আপনি রেখে দিন আপনার কাছেই। আমি সব ব্যবস্থাই ক'রে এসেছি। সৎকার-সমিতির লোকদের খবর দিয়েছি। এক্ষুনি এসে পড়বে ওরা।

মিনিট পনরো পরেই সৎকার-সমিতির লোক এসে নিয়ে গেল সুনীল রক্ষিতের শবদেহ। তাকে ধ'রে রাখবার জন্যে মালবিকা এতটুকুও চেষ্টা করল না। চোখ দিয়ে জল ফেলল না এক ফোঁটাও। সাদা অক্ষর-গুলোর মধ্যে মালবিকা বোধ হয় নতুন জীবনের আভাস পেয়েছে। মেঝের ওপর ব'সে রাত কাটাল মালবিকা। সেই সঙ্গে রাত জাগলেন ডাক্তার চ্যাটার্জিও।

সাত দিন কেটে গেল। কাটল পনরো দিনও। ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি প্রতিদিনই আসেন। আসেন সন্ধ্যের দিকেই। মালবিকাকে সঙ্গ দেন তিনি। মালবিকার ভাঙা-ভবিষ্যৎ জোড়া লাগাবার প্রেসক্রিপশন তিনি তৈরি করছেন।

সেদিন মালবিকা দুপুরবেলা বাড়ি ছিল না। ডাক্তার চ্যাটার্জি দুপুরবেলায়ই এসে উপস্থিত হলেন ষ্টিফেন কোর্টে। ঘরে ঢুকে দেখলেন, আসবাবপত্র কিচ্ছুই নেই। মালবিকার নিজের ব্যবহৃত খাটখানা পর্যন্ত উধাও হয়েছে। মেঝেতে প'ড়ে রয়েছে মালবিকার বিছানা। ডাক্তার চ্যাটার্জি বিস্মিত হলেন খুবই। মনে হ'ল, মালবিকা যেন তাঁকে ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বার ক'রে দেবার জন্যেই আসবাবগুলো সব সরিয়ে ফেলেছে। এত বড় একজন ডাক্তারের ঘাড়ে হাত দেবার মত সাহস এবং শক্তি সে পেল কোথা থেকে? তাঁর চল্লিশ বছরের জীবনে এই তিনি প্রথম ধাক্কা খেলেন। ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা আছে ব'লেই তিনি হয়তো আজও বিয়ে করেন নি। স্বর্গীয় সুনীল রক্ষিতের শূন্য ঘরে পায়চারি করতে করতে ডাক্তার চ্যাটার্জি ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। চল্লিশ লক্ষ লোকের মধ্যে বাস ক'রেও মানুষ যে কতটা অসহায় হ'তে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেদিন তিনি পেয়েছিলেন মালবিকাকে দেখে। মালবিকার ভাঙা-ভবিষ্যৎ জোড়া লাগাবার জন্যেই তিনি তাকে বিয়ে করবার জন্যে আজ মন স্থির ক'রে এসেছিলেন ষ্টিফেন কোর্টে। গত পনেরো দিনের অর্ধেকটা সময়ই তিনি কাটিয়েছেন তাঁর প্রফেশনের বাইরে—ষ্টিফেন কোর্টের এই আবদ্ধ ঘরে। আর আজ এখানে তাঁর বসবার মত এক টুকরো আসবাব পর্যন্ত নেই।

মালবিকার সঙ্গে দেখা না ক'রে তিনি যাবেন না মনে ক'রেই ব'সে রইলেন মেঝের ওপর। শূন্য মেঝে। শূন্য মেঝেতে দু ঘণ্টা ব'সে থাকবার মত এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা তিনি আজ বাড়ি গিয়ে ডায়ারিতে লিখে রাখবেন। দু ঘণ্টা কেটে গেল, কাটল তিন ঘণ্টাও। এতে কেবল সময়ের অপচয়ই হ'ল না, হয়তো দু-চারটে জীবনও নষ্ট হ'ল।

পেনিসিলিন দিতে পারলেন না ব'লে হয়তো গত তিন ঘণ্টার মধ্যে গোটা তিনেক রোগী তাঁর মারা গেছে। ডাক্তার চ্যাটার্জির লজ্জা ও ক্ষোভ বাড়তে লাগল প্রতি পলে পলে। তিনি বুঝলেন, মালবিকার ভাঙা-ভাগ্য জোড়া দিতে না এসে অন্য কোথাও পেনিসিলিন নিয়ে ছোটাছুটি করা উচিত ছিল তাঁর। তিনি ভাগ্য জোড়া দেওয়ার ডাক্তার নন, তিনি পেনিসিলিনের ডাক্তার। কিন্তু এখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। মালবিকার সঙ্গে দেখা না ক'রে গেলে হয়তো পরবর্তী জীবনে তাঁর লজ্জা ও ক্ষোভের পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। তা ছাড়া মালবিকার অসহায়ত্বের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছেন। ভালবেসেছেন মালবিকাকে। ভালবাসা পেনিসিলিনের চেয়ে যে বড় ওষুধ, সে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন। তবে কেন মালবিকা আজ তাঁকে ফিরিয়ে দিতে চায়?

সন্ধ্যে হয়ে এল। ডাক্তার চ্যাটার্জি মেঝে থেকে উঠে বারান্দায় এলেন। তিনি দেখলেন, কলকাতার আকাশ কালো হয়ে আসছে। সরু সরু গলিগুলোতেও অন্ধকার নামবে। দুনিয়ার শয়তানরা গলিগুলোতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। আর একটু পরে তারা ছড়িয়ে পড়বে সারা কলকাতায়। মালবিকা এখনও ফিরল না। সুনীল রক্ষিতের কোন আত্মীয়ের সন্ধান রাখে না মালবিকা। তবে সে গেল কোথায়? ডাক্তার চ্যাটার্জি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। লালবাজারে একবার টেলিফোন ক'রে দেখলে কেমন হয়?

ট্যাক্সি থেকে নেমে মালবিকা ভাড়া চুকিয়ে দিল। ডাক্তার চ্যাটার্জি বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখলেন ওকে। মিনিট দুয়েক বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে তিনি ঘরে ঢুকলেন। ঢুকল মালবিকাও।

সে বললে, আমি জানতুম—আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এইমাত্র দাঁড়িয়েছি। তিন ঘণ্টার ওপর ব'সে ছিলুম তোমার এই খালি মেঝেতে। তিক্ত সুর ভেসে উঠল ডাক্তার চ্যাটার্জির কণ্ঠে।

বড্ড লজ্জিত বোধ করছি ডাক্তার চ্যাটার্জি। আসবাবগুলো সব

বেচে দিয়েছি জলের দামে। গাড়িটা কিনে নিয়েছেন ওঁর অফিসের বড় সাহেব। আমাদের কেনা দামই তিনি দিয়েছেন।

গিয়েছিলে বুঝি বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে?

না। তিনি আজ সকালে নিজেই এসেছিলেন।

বসতে দিলে কোথায়?

তখনও আসবাবগুলো ছিল। ডাক্তার চ্যাটার্জি, আপনার ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না।

আমি কিছু ধার দিয়েছি ব'লে তো মনে পড়ছে না!

মালবিকা তার বিছানা থেকে চাদরটা তুলে নিয়ে ভাঁজ করতে লাগল। ডাক্তার চ্যাটার্জি জিজ্ঞাসা করলেন, চাদরটা ভাঁজ করছ কেন?

আপনার জন্যে আসন তৈরি করছি।

না, থাক্। আমি আর বসব না। মালবিকা, মনে হচ্ছে তোমার ভবিষ্যৎ আর অনিশ্চিত নয়। কোথায় কিছু একটা পেয়েছ ব'লে সন্দেহ করছি।

সন্দেহ নয়, আপনি ঠিকই ধরেছেন। আজ সমস্তটা দিন চেষ্টা ক'রে ওঁর ছোট ভাই অনিলকে খুঁজে বার করেছি। ছেলেটি বড্ড ভাল। দাদার কথা শুনে তার সে কি কান্না! কোন্ এক বড়লোকের ছেলেকে পড়ায়। মাইনে কিছু পায় না, সেখানে কেবল খায় আর থাকে। এক্ষুনি সে এসে পড়বে।

সে এসে পড়লেই কি তোমার সমস্যার সমাধান হবে মালবিকা? সমস্তটা জীবন কি নিয়ে থাকবে?

তার জবাবটা বোধ হয় আপনিই দিতে পারবেন ডাক্তার চ্যাটার্জি। আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখুন। আমার বোধ হয়—

ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জির মুখে ভেসে উঠল প্রফেশনাল হাসি।

সামনের দরজাটা তিনি নিজেই দিলেন বন্ধ ক'রে। মালবিকা শুয়ে পড়ল বিছানায়। মিনিট দশেক ধ'রে ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি পরীক্ষা করলেন মালবিকাকে। অভিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করলেন নির্ভুল ভাবে। তিনি নিজেই গিয়ে এবার দরজাটা খুলে দিয়ে

এলেন। প্রফেশনাল হাসিতে মুখ তাঁর উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি যেন অপেক্ষা করতে লাগলেন ভিজিট নেওয়ার জন্যে। ভিজিটের একটা টাকাও ছেড়ে না-দেবার ভঙ্গি লেগে রইল হাসির গায়ে।

মালবিকাও গুনে গুনে টাকা তুলে দিল ডাক্তার চ্যাটার্জির হাতে। দিয়ে বললে, কাল সকালেই অনিলকে সঙ্গে নিয়ে শিলং যেতে চাই। আমার পক্ষে শিলঙের আবহাওয়া ভাল হবে তো?

খুব ভাল হবে মিসেস রক্ষিত। সেখানকার বড় ডাক্তার সুধীন গুপ্ত আমার বিশেষ বন্ধু। আমার নাম তাঁর কাছে মেন্‌শন করবেন। সে বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখাশোনা করবে। চিয়ার ইউ—

ডাক্তার চ্যাটার্জি লিফ্‌টের জন্যে আর অপেক্ষা করলেন না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন ধীরে ধীরে। ভাবতে লাগলেন, জীবনের এই পনেরোটা দিন তিনি সরিয়ে রাখবেন একেবারে আলাদা ক'রে। তিনি মনে মনে এক রকম স্থির ক'রেই রাখলেন যে, পৃথিবী থেকে যেদিন তিনি বিদায় নেবেন, সেদিন তাঁর ঘরে আর কেউ থাকবে না। থাকবে কেবল এই পনেরোটা দিনের ভিড়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে মালবিকা দেখলে, স্টিফেন কোর্টের ফটক দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জির গাড়িখানা বেরিয়ে যাচ্ছে। উল্টো দিক থেকে নতুন একজন তেলেগু আয়া ছোট্ট একটা বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। ডাক্তার চ্যাটার্জি যেন গাড়িটাকে একটু থামিয়ে চেয়ে রইলেন বাচ্চাটার দিকে। তার পর গাড়ির গিয়ার টানলেন ডাক্তার রামতনু চ্যাটার্জি।

ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর মালবিকা আজ কেবল একটাই সাদা অক্ষর দেখতে পাচ্ছে। ছোট্ট তুলতুলে একটা মাংসপিণ্ডের মত সেই সাদা অক্ষরটার বয়েস হয়েছে চার মাস। মালবিকার ভবিষ্যৎ সৃষ্টি ক'রে গেছে সুনীল রক্ষিত নিজেই।

দীপক চৌধুরী

# মহাস্থবির জাতক

## উনিশ

পণ্ডিতজী স্থির করেছিলেন, পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি আবার ফ্রান্সে ফিরে যাবেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন, কিন্তু প্রজাপতির ব্যবস্থা ছিল অন্য রকম। তিনি যে জাহাজে ক'রে ভারতবর্ষে ফিরছিলেন, সেই জাহাজেই একটি পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র রূপসী দুহিতাকে নিয়ে ইউরোপ সফর ক'রে দেশে ফিরছিলেন। ফলে উভয়ের সাক্ষাৎ, আলাপ-পরিচয়, প্রেম এবং ভারতবর্ষে পৌঁছতে না পৌঁছতেই বিবাহ। পণ্ডিতজীর বাবা মা ইউরোপের গ্রাস থেকে ছেলে ফিরে চেয়েছিলেন কিন্তু পেয়ে গেলেন একেবারে ছেলে-বউ। পুত্রবধূ অন্য জাতের হওয়ায় মন খুঁতখুঁত প্রকাশ করবার আগেই তাঁরা ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর জায়গা-জমি বেচে দিয়ে তিনি আবার ইউরোপ যাত্রা করবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু স্ত্রী বাধা দেওয়ায় এখানেই তাঁকে চাকরি নিয়ে ব'সে যেতে হ'ল। স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পণ্ডিতজী ঠিক করেছিলেন ভারতবর্ষেই শেষ জীবন যাপন করবেন; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দুটি সন্তান রেখে স্ত্রী মারা যেতে তিনি আবার প্ল্যান বদলে ফেললেন। এবারে তিনি ঠিক করলেন, চাকরি শেষ হয়ে গেলে ছেলে ও মেয়েকে নিয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাবেন এবং শেষ জীবনটা সেখানেই বসবাস করবেন।

প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার কিছু পরে তাঁর পূজা-প্রার্থনা ইত্যাদি সেরে তিনি তাঁর ছেলে মেয়ে ও আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন। রাত্রে খাওয়ার পরেও প্রায় দেড় ঘণ্টা কি দু-ঘণ্টা ধ'রে আমাদের সেই আসর চলতে থাকত।

পণ্ডিতজী অনেক বিভূতির অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি একটু চেষ্টা করলেই লোকের মনের কথা জানতে পারতেন। হাত কিংবা কোষ্ঠী না দেখে চোখ বুজে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ প্রায় নির্ভুল ব'লে দিতে পারতেন। আমার ভবিষ্যতে কি হবে সে কথা যতবার জিজ্ঞাসা করেছি তিনি হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। সুকান্তও অনেকবার

তার নিজের ভবিষ্যতের কথা জানতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি সেই রকম মধুর হাসি হেসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন।

একদিন পণ্ডিতজী আমাদের একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়েছিলেন। সেদিন সন্ধ্যার অনেক আগেই তাঁর পূজা শেষ হয়ে যাওয়ায় আমাদের নিয়ে বাগানের দিকের একটা বারান্দায় ব'সে গল্প করছিলেন। ভারতবর্ষে কিছুদিন পূর্বেও অর্থাৎ দু-তিন্ শো বছর আগে পর্যন্ত কত বড় বড় সব যোগী ছিলেন—তারই কথা হচ্ছিল। তাঁদের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীর কথা বলতে বলতে তিনি বললেন, মানুষ জানে না যে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে জয় করবার শক্তি মানুষের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। সাধনা দ্বারা সেই শক্তির বিকাশ হয়। মানুষ শূন্যের মধ্যে দিয়ে উড়ে চ'লে যেতে পারে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে চ'লে যাওয়া তার পক্ষে কিছুই নয়। জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র প্রাণীদের বশ করা তো তার পক্ষে কিছুই নয়। পণ্ডিতজী বলতেন, আমার বিশ্বাস মানুষ একদিন সর্বশক্তিমান হবে।

সুকান্ত ফট্ ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রে ফেললে—আচ্ছা পণ্ডিতজী, আপনি যে এতদিন ধ'রে সাধনা করছেন—আপনি কোন বিভূতি পান নি? হিংস্র জানোয়ার বশ করতে পারেন?

পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসুলভ হো-হো ক'রে হেসে বললেন, আমি? না না! আমার কোন শক্তি নেই। আমি তো সামান্য একজন সাধক মাত্র, আমার এখনও ঢের দেরি—এ জন্মে বিশেষ কিছু হবে ব'লে তো মনে হয় না।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, তুমি যখন বললে তখন একটু পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, কি বল?

দেবী ও শঙ্কর দুজনেই ব'লে উঠল, হাঁ হাঁ, বাবুজী—দেখাও দেখাও।

পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, তবে স্থির হয়ে ব'স।

পণ্ডিতজী স্থির হয়ে ব'সে চোখ বুজে ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ডান চোখ, মধ্যমা আর অনামিকা দিয়ে বাঁ চোখ আর তর্জনী দিয়ে দুই ভ্রূর মাঝখানটা টিপে কিছুক্ষণ মাথা নীচু ক'রে রইলেন। মুখ তুলতেই

দেখলুম, তাঁর চোখ দুটো লাল আর অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এদিক ওদিক চেয়ে আমাদের বললেন, ওই যে দূরে দুটো পায়রা দেখছ, ওদের প্রতি লক্ষ্য রাখ।

দেখা গেল, দূরে কোন এক পুরাতন প্রাসাদ না কি—চারদিকে খুব উঁচু পাথরের প্রাচীর—তারই ওপরে দুটো বুনো পায়রা খেলা করছে। একটা চুপ ক'রে ব'সে আছে, আর একটা তাকে ঘিরে নেচে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ পায়রা দুটোই চঞ্চল হয়ে উঠল অর্থাৎ মনে হ'ল কে যেন তাদের এই খেলায় বাধা দিলে। যে পায়রাটা পায়ে পায়ে তালে তালে ঘুরছিল সে থেমে গিয়ে চঞ্চল হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। যেটা পা মুড়ে ব'সে ছিল, সে তার ডানা ঝেড়ে উঠে পড়ল। তারপরে দুটোই উড়ে এসে পণ্ডিতজীর বাড়ির হুদ্দোর মধ্যেই একটা বড় গাছের ডালে এসে বসল। একটু এদিক ওদিক ক'রে একটা পায়রা—আমরা যে ছাতে বসেছিলুম সেই ছাতের পাঁচিলের ওপর এসে বসল। পণ্ডিতজীকে দেখলুম—সেই থেকে স্থির ও সতেজ দৃষ্টিতে পায়রাটার দিকে চেয়ে রয়েছেন। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পায়রাটা ছাতের পাঁচিল থেকে নেমে গুড়গুড় ক'রে হেঁটে একেবারে পণ্ডিতজীর হাতের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। পণ্ডিতজী সেটাকে তুলে কিছুক্ষণ আদর ক'রে নামিয়ে রাখলেন। দু-এক সেকেণ্ড পরে—শিশু যেমন হঠাৎ বিপদ সম্বন্ধে চেতনা লাভ ক'রে বিপদের কারণের কাছ থেকে দূরে পালিয়ে যায়, তেমনি কথা না বললেও পায়রাটা যেন—ওরে বাবা রে! ভাব দেখিয়ে পোঁ-পোঁ ক'রে উড়ে একেবারে আমাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেল।

তার উড়ে যাওয়ার ভঙ্গি দেখে আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

আগেই বলেছি—আমরা যাওয়ার পর থেকে পণ্ডিতজীর ছেলে শঙ্কর দু-এক দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতে শুরু করেছিল। পণ্ডিতজীর মেয়ে দেবী কিন্তু প্রথম থেকেই নিজেকে বেশ দূরে রেখেছিল। ক্রমে এই দূরত্বের মাত্রা কমে গেলেও নিজের চারদিকে সে একটা কঠিন আবরণ টেনে রেখেছিল—তা সে সুন্দরী

মেয়ে ব'লেই হোক, বড়লোকের মেয়ে ব'লেই হোক—কিংবা বিলিতী ইস্কুলে পড়া বিদ্যার গর্বেই হোক।

আমরা ছিলুম তাদের বাড়ির আশ্রিত ব্যক্তি। কাজেই সেখানে থাকতে খেতে পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলুম, পণ্ডিতজী ও তাঁর ছেলেমেয়েদের সদয় ব্যবহারে ছিলুম কৃতজ্ঞ—এর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের কাম্যও ছিল না। দেবীকে তার বাবা ও ছোট ভাই শঙ্কর খাতির ক'রে দেবীজী ব'লে ডাকত। আমরা তাকে বহেনজী ব'লে ডাকতে আরম্ভ ক'রে দিলুম।

শঙ্কর একদিন বললে, কেন, তোমরাও দেবীজী বলে ডাক না?

দেবী তাতে আপত্তি ক'রে বললে, না না, বহেনজী ব'লেই ডেকো—বেশ লাগে আমার।

দেবী আমাদের সঙ্গে পারতপক্ষে কথাবার্তাই বলত না। তবে খাবার টেবিলে সে আমাদের মায়ের মত তদারক করত—শর্মা ভাই, তোমাকে আর একখানা রুটি দিক, খাও। কান্ত্ ভাই, তুমি কিছু খাচ্ছনা, ইত্যাদি। কিন্তু সে ওই পর্যন্ত। খাবার টেবিল ছাড়লেই সে একেবারে অন্য লোক হয়ে পড়ত।

কিন্তু দেবীর এই গাম্ভীর্য ও আলাদা-আলাদা ভাব বেশি দিন চলল না। একদিনের একটা সামান্য কারণে আমার সঙ্গে তার এমন ভাব হয়ে গেল যে মুখের কথা তো দূরের কথা—সে আমাকে তার মনের কথা পর্যন্ত বলতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

আগেই বলেছি যে, বিকেল বেলাটা পণ্ডিতজীর বাড়ি অত্যন্ত নির্জন হয়ে পড়ত। পণ্ডিতজী থাকতেন তাঁর ঘরে, সে সময় তিনি পূজা-অর্চনা করতেন, ভূমিকম্প হ'লেও বেরুতেন না। সারা দুপুর পড়াশুনো ক'রে শঙ্কর ও দেবী তখন চ'লে যেত নীচের বাগানে। চাকরেরা যে যার প'ড়ে ঘুম লাগাত। সেই নিস্তব্ধ বাড়ি হয়ে পড়ত অধিকতর নিস্তব্ধ।

বাগানের এক কোণে কতকগুলো খোলার ঘর ছিল। এই সব ঘরের মধ্যে অনেক জিনিসপত্র থাকত। এরই মধ্যে একখানা বড় ঘরের একটা

দিক খালি ছিল। এই খালি জায়গাটাতে দেবী ও শঙ্কর ঠাকুর-ঘর করেছিল। রোজ বিকেল বেলায় তারা ভাই বোনে এখানে পূজো করতে ঢুকত। একদিন শঙ্কর আমাকে নিয়ে গেল তাদের পূজোর ঘর দেখাতে। ঘরের মধ্যে ছেঁড়া বস্তায় তুলো, পাট, কাঠের কুচি, ঘরময় নোংরা—তারই একটা কোণে দিব্যি পরিষ্কার জায়গায় তারা পূজোর দুটো বেদী তৈরি করেছে দেখলুম। দুটো পাথরের নুড়ি দিয়ে দুজনের শিব হয়েছে। দিব্যি টাটকা লতা-পাতা দিয়ে শিবের বেদী সাজানো হয়েছে। তার মধ্যে আবার ছোট ছোট দুটি প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। জায়গাটি সত্যি আমার বড় ভাল লাগল। ফিরিঙ্গী ইস্কুলে প'ড়ে ফিরিঙ্গীভাবে চালিত শিক্ষিত হয়েও যে তারা শিবপূজো করছে—দেখে খুশি হয়ে আরও ডাল-লতা-পাতা এনে আরও ভাল ক'রে তাদের বেদী সাজিয়ে দিলুম।

ঠাকুর-ঘরের প্রশংসা করায় ও আমার শিবভক্তি দেখে দেবী আমার প্রতি খুব প্রসন্ন হয়ে দু-একটা ক'রে কথা বলতে লাগল। আমার একটা শিবস্তোত্র মুখস্থ ছিল, আমি দেবীর শিবের সামনে ব'সে হাত জোড় ক'রে চোখ বুজে দিব্যি সুর ক'রে স্তোত্র আওড়াতে শুরু ক'রে দিলুম। স্তোত্রটা শেষ হতে না হতে দেবী একেবারে উছ্‌লে পড়ল, এ যে স্যান্‌স্ক্রিট—না শর্মা ভাই, এ নিশ্চয়ই স্যান্‌স্ক্রিট! কি আশ্চর্য! শর্মা ভাই, তুমি স্যান্‌স্ক্রিট জান?

দেবী একেবারে আমার পাশে ব'সে একরকম গলা জড়িয়ে ধ'রে বললে, শর্মা ভাই, এই মন্ত্রটা আমায় শিখিয়ে দেবে?

নিশ্চয় দেব।

দেবী বলতে লাগল, ওঃ হাউ ওয়াণ্ডারফুল—তুমি স্যান্‌স্ক্রিট জান—!

ইংরেজী, ভাঙা-হিন্দী ও মারাঠী এই ত্রিবেণীধারায় প্রশংসা বর্ষিত হতে লাগল আমার ওপর। দেবী বলতে লাগল, আচ্ছা, আর একটু স্যান্‌স্ক্রিট বল তো!

শুনবে? বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে।

আরও?

আচ্ছা, উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

ওঃ হাউ ওয়াণ্ডারফুল! আমি ফাদারকে ব'লে তোমায় টিচার রাখব! শর্মা ভাই, আমাকে স্যান্‌স্‌ক্রিট শেখাবে?

এতে আর কি হয়েছে, তোমায় দু দিনেই শিখিয়ে দেব।

দেবী বললে, আমার ইস্কুল খুলতে এখনও মাস দেড়েক দেরি আছে—এর মধ্যে শিখে নিতে পারব না?

খুব, খুব। অন্তত আমি যতটুকু জানি ততটুকু শেখাতে ওর চেয়ে বেশিদিন লাগবে না। তাতে তুমি কথাবার্তা চালিয়ে নিতে পারবে।

দেবী বললে, ফাদারকে বলব, এজন্যে তোমায় মাইনে দিতে হবে।

পণ্ডিতজী বেশ ভাল সংস্কৃত জানতেন। আমার জ্ঞানের মাত্রা জানতে পারলে একটা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে বুঝতে পেরে দেবীকে বুঝিয়ে বললুম, বহেনজী, ফাদারকে জানিয়ে আর কাজ নেই। তুমি আমার বহেন হও, তোমায় শিখিয়ে টাকা নিলে আমার পাপ হবে। তোমার কোন ভাবনা নেই, আমি তোমাকে ঠিক শিখিয়ে দেব।

সেদিন থেকে দেবী আমার অনুগত বন্ধুতে পরিণত হ'ল। আমি তাকে সুর করে মোহ-মুদ্গর আবৃত্তি করতে শেখাতে লাগলুম। মোহ-মুদ্গরের মধ্যে কি আছে জানি না। শ্লোকগুলো মুখস্থ হবার পর তার শিবভক্তি যেন বেড়ে গেল। এতদিন সে বিকেলে পূজো করত, এখন থেকে দু বেলায় পূজোর ঘরে যেতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

সুরাটের আর একটা স্মৃতি আমার মনের মধ্যে বিশেষ ক'রে উজ্জ্বল হয়ে আছে, সে স্মৃতি কোন লোকের কথা নয়—একটি জায়গার কথা।

বিকেলবেলা জল খাবারের পর দেবী ও শঙ্কর নীচে নেমে যেত বাগানে—তাদের ঠাকুর-ঘরে। ঠাকুর-ঘর ঝাঁট দিয়ে বাসি ফুল-পাতা ফেলে দিয়ে তারা সত্য হোক—মিথ্যা হোক—গভীর ভক্তির সঙ্গে পূজো করত। পূজো শেষ হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যেত। এই সময়টা আমি আর সুকান্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তুম ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

দু-একদিন জনার্দনের ওখানেও গিয়েছিলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম

আমরা গেলেই তারা বিব্রত হয়ে পড়ে। মনে করে, এই বুঝি এরা আবার ফিরে এল। শেষকালে আমরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়ে সময়টা কাটিয়ে দিতে লাগলুম।

একদিন এই ভাবে নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে শহর থেকে একটু দূরে একটা জায়গায় এসে পৌঁছনো গেল। সেখানে নদী থেকে খাঁড়ির মত একটা চওড়া জলধারা জমির মধ্যে এসে প্রবেশ করেছে—নদীর প্রধান প্রবাহ থেকে প্রায় দু শো গজ পর্যন্ত ভেতর দিকে। জায়গাটা দেখেই আমার মনে হ'ল, এ যেন চেনা জায়গা। কোথায় দেখেছি, কবে দেখেছি ইত্যাদি নিয়ে মনের মধ্যে কিছুক্ষণ আন্দোলন চালিয়েও কিছুই মনে ক'রে উঠতে পারলুম না। অথচ সুরাটে আমি এর আগে কখনও আসি নি ও এবার এসেও এখানে কখনও আসি নি।

যাই হোক, জায়গাটা এত নির্জন ও এত আকর্ষণীয় যে সেখানটা ছেড়ে নড়তে ইচ্ছে হ'ল না। আমি জলের প্রায় কাছাকাছি গিয়ে ব'সে পড়লুম। সঙ্গে সুকান্তও ছিল, সেও কোন কথা না ব'লে একটু দূরে জলের ধারে গিয়ে বসল। সেখানে বসতে না বসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই মনের মধ্যে একটা অননুভূত শান্তি এসে জমা হতে লাগল। মনে হতে লাগল যেন মনের মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিধারার মত শান্তিবারি বর্ষিত হচ্ছে। সেই অনাস্বাদিতপূর্ব অনুভূতির বর্ণনা আমি কোন্ ভাষায় প্রকাশ করব! গৃহ, পরিবার, পরিবেশ, অবস্থা—সবই ভুলে গেলুম। মনে হতে লাগল, সবই সুন্দর—মনোহর—মধুময়।

জলের প্রায় কিনারায় ব'সে ছিলুম। জায়গাটা এত নিরালা যে কিনারায় এসে যে জলের ঢেউ মধ্যে মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ ক'রে লাগছিল, আমি যেন তার মধ্যেও অস্পষ্ট বাণীর আকুল আকূতি শুনতে লাগলুম। ছল-ছল কল-কল শব্দ তুলে নদী-মাতা আমায় যেন সম্ভাষণ করতে আরম্ভ ক'রে দিলে।

মনে হতে লাগল, হয়তো কোনো পূর্বজন্মে বালক আমি এই জলের ধারে খেলা করতুম। বহু জন্মজন্মান্তর বাদে সেই পরিচিত বালকটিকে দেখতে পেয়ে নদী-মাতা যেন আকুল ভাষায় আমায় স্নেহের সম্ভাষণ

জানাচ্ছে। বাল্যকাল থেকেই আমি একটু কল্পনাবিলাসী—এখানে ব'সে ব'সে আমার কল্পনার উৎস যেন খুলে গেল।

দেখলুম, দূরে এক জোড়া লম্বা ঠ্যাঙওয়ালা সারস পাখি আস্তে আস্তে চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে, ভারি ভাল লাগতে লাগল তাদের চলন-ফেরন। কিছুক্ষণ পরেই মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক বলাকা গোল হয়ে উড়ে চ'লে গেল—তারপরে আর এক ঝাঁক,—আর এক ঝাঁক। হাওয়ার বিপরীত দিকে চলল তারা, অথচ কি দ্রুত ও কি নিশ্চিত তাদের গতি! তাদের পক্ষ-তাড়নায় যে শব্দ উত্থিত হ'ল তাতে সেই নির্জনতাকে যেন আরও গম্ভীর ক'রে তুলল। ক্রমে আমার চারদিক ঘিরে অন্ধকার নেমে আসতে লাগল। সেই স্বচ্ছ অন্ধকারে দেখলুম, দূরে একটি মেয়ে দুটি কলসী নিয়ে এসে নদীর ধারে দাঁড়াল। তারপরে কলসী ধুয়ে একে একে দু-কলসী জল তুলে নিয়ে নদীর ধারে রাখলে। তারপর একটার ওপর আর একটা কলসী মাথায় তুলে নিয়ে চ'লে গেল অন্ধকারের গভীরে, যেন কালো বর্ণের পটে তুলি দিয়ে তার চেহারাখানা মুছে দেওয়া হ'ল। সন্ধ্যা হয়ে যাবার অনেক পরে আমরা সে জায়গাটা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

কিছুদূর নীরবে পথ চলার পর সুকান্ত বললে, জায়গাটা এত ভাল লাগছিল যে উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

যাই হোক, পরের দিন বিকেল হতে না হতে সেই জায়গাটা আবার আমাদের আকর্ষণ করতে লাগল। চা খাবার একটু পরেই আমরা ছুটলুম সেই নদীর ধারে। সেখানে গিয়ে আগের দিন আমি ও সুকান্ত—যে যেখানে বসেছিলুম, সেখানে গিয়ে ব'সে পড়লুম। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সেদিনও বসতে না বসতে মনের মধ্যে সেই শান্তির অবতরণ বুঝতে পারলুম। বরঞ্চ কালকের চেয়ে আজকের অবতরণ যেন আরও গভীর, পরিবেশ যেন মধুরতর হয়ে উঠল।

নদীর ধারে সেই বক চরছে। লম্বা-ঠ্যাঙওয়ালা সারস পাখি দুটো সেই রকম সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলা-ফেরা করছে। নির্দিষ্ট সময়ে মাথার ওপর দিয়ে সেই বকের পাঁতি শন্-শন্ করতে করতে উড়ে গেল—এক সার—দু সার—তিন সার। অন্ধকারে আপনাকে লুকিয়ে

একটি মেয়ে এল নদীর ধারে—বোধ হয় কাল যাকে দেখেছিলুম সেই হবে।

এমনি ক'রে প্রতিদিন বৈকালে নদী আমাদের আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায় তার তীরে। সকাল থেকে বিকেল অবধি দেবী ও শঙ্করের সঙ্গে কাটে, তারাই আমাদের ভাই-বোন হয়ে উঠেছে। বোম্বাই গিয়ে মিলে কাজ শেখার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছি। দিনের বেলা বাড়ির কথা, কাজকর্মের কথা, জীবনে উন্নতি করার কথা কখন-সখন মনে হয় বটে, কিন্তু সে চিন্তার তীব্রতা চ'লে গিয়েছে। তারপর বিকেলবেলা নদীর তীরে গেলে সব চিন্তার ওপরে শান্তির প্রলেপ প'ড়ে যায়, সমস্ত উদ্বেগ চলে যায়, মনে হয় এমনি ক'রেই জীবন কেটে যাবে।

ঠিক এই রকম শান্তির অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আর একবার হয়েছিল, সে বৃত্তান্তও এই জাতকে লেখা থাকা দরকার। সুরাটের এই সময়ের প্রায় বিশ বৎসর পরে একবার শীতের সময় মাস তিনেক জয়পুর শহরে বাস করতে হয়েছিল। শহর থেকে অনেক দূরে একটা নির্জন স্থানে ছিল আমার বাড়ি। বাড়ির সামনে পেছনে আশে-পাশে ইটের তৈরি কোন বাড়ি নেই—দূরে মাঝে মাঝে দু-চারটে খোলার চালের বস্তি, তারপরে আবার সব ফাঁকা। বাড়ির সামনে দিয়ে চওড়া রাস্তা চ'লে গিয়েছে, কোথায় কোন্ দূরের অন্য এক রাজ্যের রাজধানী পর্যন্ত। আমি শীত-কাতুরে লোক, দুপুরবেলা ঘরে থাকতে কষ্ট হ'ত ব'লে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতুম। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেই নির্জন পথ বেয়ে চলতে থাকতুম যতক্ষণ পর্যন্ত না রোদের ঝাঁজ ক'মে যায়। চারিদিক জনশূন্য—নিস্তব্ধ প্রকৃতি। থেকে থেকে পাগলা হাওয়ায় কখন বা খানিকটা ধূলো উড়িয়ে রাস্তা দিয়ে ছুটে চলল, কখনও বা চষা মাঠের মাঝখানে খানিকটা ধূলো লাট্টুর মতন ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল। কোথাও বা একপাল হরিণ চ'রে বেড়াচ্ছে—কোথাও বা ময়ূর। এরই মাঝে মাঝে কোন ধনী লোকের এক-একটি বাড়ি বা বাগান-বাড়ি আছে, কিন্তু সেও অত্যন্ত নির্জন।

বড় ভাল লাগত আমার এই দুপুরের নিরুদ্দেশ অভিযান।

একদিন দ্বিপ্রহরে এই রকম চলেছি। চলতে চলতে পথশ্রমেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিলুম—দেখলুম রাস্তা থেকে একটু দূরে একটা সমাধি রয়েছে। রাজপুতানায় মৃত ব্যক্তির স্মরণে মঠের মত ইঁট কিংবা পাথরের সমাধি করার রেওয়াজ আছে। এই রকম সব বড় বড় শ্বেতপাথরের সমাধি উদয়পুরেও আছে, কিন্তু উদয়পুরের তুলনায় জয়পুরের সমাধি-মঠগুলি কিছুই নয়। এই সমাধির মধ্যে কোথাও একজোড়া পায়ের চিহ্ন দেখেছি, কোথাও তাও নেই। যাই হোক, যে সমাধিটার কথা বলছি সেটার অবস্থা খারাপ, অযত্নে ছাদ প্রায় ভেঙে পড়েছে। সমাধির চারদিকে অনেকখানি জায়গা ঘিরে এক সময় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারের চিহ্নও এখন নেই—মাঝে মাঝে এক-একটা খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাত্র।

সমাধিটি দেখামাত্রই আমি নিজের মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা আকর্ষণ অনুভব করলুম। মনে হতে লাগল—যার স্মৃতিকে স্থায়ী করার জন্য ওই সমাধি তৈরি হয়েছিল সে যেন আজও ওই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে, আমি পদার্পণ করলেই ওই ভগ্নমন্দির ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আর যে বন্দী হ'য়ে আছে সেও মুক্তিলাভ করবে।

আমি ধীরে ধীরে ইঁট-পাটকেল সামলে সেই সমাধির ওপরে গিয়ে বসতেই কোথা থেকে এক শান্তির নির্ঝর যেন আমার ওপর বর্ষিত হতে লাগল। মনে হ'ল, মধু বাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—বাতাসে মধু—মধু নদীর জলে। ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তা কোথায় মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

প্রায় সন্ধ্যা অবধি সেখানে ব'সে থেকে আমি উঠে এলুম। পরদিন দ্বিপ্রহরে আবার গিয়ে সেখানে বসলুম।

বসার কিছু পরেই আবার সেই শান্তির নির্ঝর ঝরতে লাগল। সেই থেকে আমি প্রায় দু মাস সেখানে ছিলুম এবং কাজকর্ম না থাকলে প্রতিদিনই দুপুরবেলা সেখানে গিয়ে বসতুম। বোধ হয় দু-তিন দিন ছাড়া প্রতিবারেই আমি সেই শান্তি অনুভব করেছি। আমার এই

অভিজ্ঞতার কথা সে সময় আমি আমার বন্ধু কবি নরেন্দ্র দেবকে লিখেছিলুম। আমার সেই চিঠির উত্তরে নরেন আমাকে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিল। নরেনের চিঠিখানা এইখানে দিতে পারলে এই জাতক অলঙ্কৃত হ'ত সন্দেহ নেই, কিন্তু যে লক্ষ্মীছাড়া কোনো সঞ্চয়ই জীবনে করতে পারে নি, চিঠিপত্র জমা করা তার দ্বারা আর কি ক'রে সম্ভব হবে?

আগেই বলেছি দেবীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার আগে আমরা গল্প করছি, এমন সময়ে আমাকে ও সুকান্তকে দেবী বললে, ভাইয়া, তোমরা আমাদের বাড়িতেই থাক। তোমাদের দুজনকেই আমার খুব ভাল লাগে। কলকাতা বা বোম্বাই গিয়ে কি আর হবে—ফাদারকে বলি, তিনি তোমাদের এখানেই এক-একটা কাজে লাগিয়ে দেবেন।

দেবীকে বললুম, তুমি তো দুদিন বাদেই ইস্কুলে চ'লে যাবে।

সে বললে, তাতে কি হয়েছে! ইস্কুল খুললেই তো আমার পরীক্ষা। পাস যদি করতে পারি তো ইস্কুলে আর পড়ব না। বাড়িতে প'ড়ে বোম্বে-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা দেব। তা ছাড়া আমি আর কদিন আছি!

কদিন আছ মানে!

দেবীর মুখখানা আমার প্রশ্নে মলিন হয়ে গেল। সে বললে, জান ভাই, আমি বেশিদিন বাঁচব না। কুড়ি বছরের বেশি আমার পরমায়ু নেই। এখনি আমার সতের বছর চলছে—আর বড় জোর তিন বছর। বাবা বলেছেন, এর মধ্যে যে কোনো সময়ে ম'রে যেতে পারি।

দেবীর উল্লাসে পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যে নিটোল সেই উজ্জ্বল মুখখানা দেখতে দেখতে মলিন হয়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, জান ভাই, বাবা যা বলেন তা কখনও মিথ্যা হয় না।

দেবীর কথাগুলি শুনে বুকের মধ্যে হা-হা ক'রে উঠল। মনে হ'ল, এমন ফুল অকালে শুকিয়ে যাবে! তাই বুঝি নিয়তি তাকে সংহারের দেবতা মহেশ্বরের পায়ের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছে—তাই বুঝি সে শিবপূজার অনুরাগিণী, নিত্য শিবপূজা করে। মনে হতে লাগল,

মৃত্যুর কৃষ্ণযবনিকার ওপরে এই যে ফুল ফুটে উঠছে মুহুর্মুহু কি এর উদ্দেশ্য? কেন এই অকারণ অবারণ রূপ-সৃষ্টি, যদি অরূপেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়? কেন এই তারুণ্যের উন্মুখ পিপাসা, যদি মৃত্যুর মরুবালুকাই থাকে পথের শেষে? মানুষের মনের কোন্ আর্তবিদ্রোহ সংহারের দেবতাকে নটরাজরূপে কল্পনা করল—কঠিন ধাতবে গেঁথে দিল তার কোমল আশা? এই সব ভাবধারার অতল গহনে ডুবে গেছি, এমন সময় দেবীর কণ্ঠস্বরে আবার চেতনার স্রোতে ভেসে উঠলুম।

দেবী বলতে লাগল, মরতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। বল ভাইয়া, কে মরতে চায়! তবু মনকে আমি শক্ত করবার চেষ্টা করি। বাবা আমাকে মন ঠিক করবার মন্ত্র দিয়েছেন—সব সময় সেই মন্ত্র জপ করি। সত্যি ভাইয়া, মন্ত্র জপ করতে করতে মরবার ভয় আমার একটুও নেই। কিন্তু তবু—মরতে আমি চাই না, মরবার ইচ্ছেও আমার নেই। হায়! তবু আমায় মরতে হবে।

দেবীর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখে জল এসে গেল, ফিরে দেখলুম সুকান্তের চোখ উপচে জল পড়ছে—শঙ্কর-ভাই নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। দেবী তাকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে শুরু ক'রে দিলে।

এই বেদনার মধ্যে আমাদের বন্ধন দৃঢ়তর হয়ে উঠলেও আমাদের চারদিক ঘিরে মরণের করুণ সুর বাজতে লাগল। সেই দিনই দুপুরে খাবার সময় পণ্ডিতজীকে বললুম, বহেনজী বলছিল যে, কুড়ি বছরের বেশি ওর পরমায়ু নেই, এর মধ্যে যে কোনদিন তার মৃত্যু হতে পারে—এ কি সত্যি কথা!

আমার কথা শুনে পণ্ডিতজী তাঁর স্বভাবসুলভ উচ্চ হাসি হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, দেবী বলছিল নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর আয়ু বড় কম। তা আমি তো ওকে মন্ত্র দিয়েছি—

কথাটা বলতে বলতেই পণ্ডিতজী আবার সেই রকম হেসে খাওয়ার দিকে মন দিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পণ্ডিতজীকে আমরা এত শ্রদ্ধা করতুম ও ভালবাসতুম যে বলবার নয়। তবুও একমাত্র কন্যাসন্তানের মৃত্যুর কথা

এমন অবহেলা ও হাসির সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়াটা বড় নিষ্ঠুর ব'লে মনে হতে লাগল।

সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে এর চেয়েও বেশি ঔদাসীন্য তাঁর মধ্যে আর একদিন দেখেছিলুম। তখন অবশ্য বুঝতে পারি নি যে বিশ্ব-নিয়ন্তার ওপর কতখানি নির্ভরশীল হ'লে এবং কতখানি আত্মসমর্পণ করতে পারলে মানুষ এতটা উদাসীন হতে পারে। সেই কাহিনী বর্ণনা ক'রেই এবারের পর্ব শেষ করি।

একদিন বিকেলে চায়ের পর্ব শেষ হয়ে যাবার পর তখনও কটকটে রোদ্দুর আছে দেখে আমরা না বেরিয়ে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিচ্ছি। এমন সময় দেবীর খাস ঝির তীব্র আর্তনাদ শুনে নিজেদের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি যে, সে পণ্ডিতজীর ঘরের দরজার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মারাঠী ভাষায় চীৎকার ক'রে কি সব বলছে। এই স্ত্রীলোকটি ছিল দেবীর খাস ঝি—হিন্দী কথা একেবারেই বুঝতে পারত না বা বলতেও পারত না। দেখলুম সে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারস্বরে চীৎকার ক'রে কি বলছে।

আমরা বেরিয়ে আসতেই সে পণ্ডিতজীর ঘরের ভেজানো দরজার দিকে আঙুল দিয়ে কি দেখাতে লাগল। আমরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না দেখে সে আরও চেঁচিয়ে হাত ছুঁড়ে কি সব বলতে লাগল। কিন্তু আমরা তখনও কিছু বুঝতে পারছি না দেখে সে একরকম ছুটে গিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের ভেজানো দরজাটা দড়াম্ ক'রে খুলে ফেলেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

আমরা দেখলুম, পণ্ডিতজী পদ্মাসনে ব'সে আছেন। শরীরটা সোজা, চক্ষু মুদ্রিত—দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে তিনি সমাধিস্থ। এদিকে সেই স্ত্রীলোকটি একটু চুপ ক'রে থেকেই আবার চেল্লাতে শুরু করলে। কিন্তু পণ্ডিতজী নির্বিকার, নিস্পন্দ। শেষকালে আমরা তাকে চুপ করতে ব'লে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে এলুম। অনেক জেরা করবার পর কোন রকমে বোঝা গেল যে, বাগানের দিকে দেবী ও শঙ্করের কি হয়েছে—এক্ষুনি সেখানে যাওয়া দরকার।

কালবিলম্ব না ক'রে বাগানের দিকে ছুটলুম। পেছনে দেবীর ঝি চেঁচাতে চেঁচাতে আমাদের অনুসরণ করতে লাগল। বাগানে গিয়ে দেখি, সেখানে সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু হয়েছে। দেবী ও শঙ্করের ঠাকুর-ঘরে লেগেছে আগুন—আগুন চালা অবধি উঠে গেছে। কুণ্ডলী ক'রে ধোঁয়া উঠছে ওপরে, তার মধ্যে মাঝে মাঝে লাল আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। ঘরের একটা ছোট্ট জানলা খোলা, তার মধ্যে দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, ঘরের চওড়া দরজা দিয়ে ভেতরের খানিকটা দেখা যাচ্ছে, কুণ্ডলীকৃত অগ্নিগর্ভ ধোঁয়া মেঝেতে পাক খাচ্ছে—ঘরের মধ্যে দেবী ও শঙ্কর রয়েছে, তাদের কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। একদল চাকর বাইরে দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করছে। ছোঁড়া চাকরটা বাড়ির মধ্যে থেকে দু হাতে দু বালতি ক'রে জল এনে চালায় ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্রতিবার জল আনতে প্রায় পাঁচ মিনিট ক'রে সময় যাচ্ছে।

চাকরদের বললুম, তোমরা দাঁড়িয়ে কি মজা দেখছ! যাও, ভেতরে ঢুকে ওদের বের ক'রে নিয়ে এস। আমাদের কথায় কেউ সাড়া দিলে না। কয়েক সেকেণ্ড পরে বৃদ্ধ বাবুর্চী বললে, ওর মধ্যে কে যাবে সাহেব, ও নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে কে যাবে!

আমার মনের মধ্যে তখন আকুলতার ঝড় চলেছে। দেবীর সেই ফুলের মত মুখখানার ছবি মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, জ্ঞান হওয়া থেকে আরম্ভ ক'রে আজ পর্যন্ত আমি তো বিশ্বের নিন্দিত। পিতা মাতা আমার জন্য নিশিদিন চিন্তিত, শঙ্কিত ও মর্মাহত—লোকের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে পারেন না। খারাপ ছেলের দৃষ্টান্ত দিতে হ'লে আত্মীয় স্বজনেরা আমার দিকে আঙুল তুলে দেখায়। আমার সঙ্গে মিশতে দেখলে অভিভাবকেরা তাঁদের ছেলেদের শাসন করেন। আজ ভগবান আমাকে একটা সৎকাজ করবার সুযোগ জুটিয়ে দিয়েছেন। যদি মরি তো সংসারের একটা আবর্জনা স'রে যাবে।

ফিরে সুকান্তকে বললুম, কি রে সুকান্ত, যাবি নাকি! আর না—আর দেরি করলে যাওয়া না-যাওয়া সমান—কি রে সুকান্ত—

সুকান্ত কোন জবাব দিলে না তবে তার মুখ দেখে মনে হ'ল যে, সে

যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। আর কিছু না ব'লে, আর কিছু না ভেবে সেই ধোঁয়ার অন্ধকারে ঢুকে পড়া গেল।

ঘরের মধ্যে দৌড়ে ঢুকেই খেলুম এক আছাড়। মাটির মেঝে—তার ওপর কয়েক বালতি জল প'ড়ে খুব পেছল হয়েছে। সামলে দাঁড়ালুম বটে; কিন্তু সেই জমাট-বাঁধা ধোঁয়া—ধোঁয়ার মধ্যে আগুনের হলকা লুকিয়ে রয়েছে—মাঝে মাঝে ফুঁসিয়ে উঠছে।

নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পা ঘেঁষটে ও হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলুম শঙ্কর ও দেবীকে। কিন্তু কতক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ ক'রে থাকা যায়! নিশ্বাস নিতেই বুকটা যেন জ্ব'লে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম বুকের মধ্যে খানিকটা গরম ধোঁয়া ঢুকে পড়ল। দেহের সেই নিদারুণ কষ্টকে চেপে পা ঘষ্‌টে চলেছি, পায়ে নরম একটা কি লাগতেই বুঝতে পারলুম, দেবী প'ড়ে আছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম, বহেনজী!

কিন্তু খানিকটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরুল না—বরঞ্চ সঙ্গে সঙ্গে আর এক হলকা ধোঁয়া ঢুকল বুকে। সেই অবস্থায় ব'সে প'ড়ে দেবীকে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু আমার সাধ্য কি সেই লাশ ওঠাই! শেষকালে তার হাত দুটো ধ'রে টানতেই যেন কিসে আটকে গেল। বুঝতে পারলুম, তার চোদ্দ হাত শাড়ির আঁচল কিছুতে আটকে প'ড়ে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। জোর ক'রে টেনে তার দেহটাকে দরজার কাছে নিয়ে এলুম—শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে সেখানে আটকেই রইল। কিন্তু শাড়ি দেখবার তখন আর সময় নেই। আর যেটুকু দম অবশিষ্ট ছিল, তারই জোরে দেবীর দেহখানা হিঁচড়ে কিছুদূর টেনে নিয়ে গিয়ে ঘুরে প'ড়ে গেলুম।

মাটিতে পড়েই বাঁ হাতে একটা চোট লাগায় চেতনাটা একবার চন্‌মনিয়ে উঠল—তারই মধ্যে ছায়ার মতন চোখে পড়ল সুকান্ত শঙ্করের দেহখানা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প'ড়ে গেল। বাস্—তার পরে আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হয়ে দেখলুম, রাত্রি হয়ে গিয়েছে, আমাকে তুলে এনে ঘরের মধ্যে শোয়ানো হয়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে। অদূরে আর একজন

কে শুয়ে রয়েছে। তার শিয়রে একজন বাঁধা-পাগড়ি-পরা লোক ব'সে রয়েছে, পণ্ডিতজী পাশে দাঁড়িয়ে।

হাতখানা বেদনায় রুন্‌কন্ করতে লাগল, বুকের ভেতর একটা জ্বালা। যন্ত্রণায় একটু আওয়াজ মুখ দিয়ে বেরুতেই পণ্ডিতজী এসে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কেমন আছ?

তারপরে পাগড়ি-বাঁধা লোকটিকে ডেকে বললেন, ডাক্তার, এই দিকে, এই যে চেতনা হয়েছে—

ডাক্তার উঠে আমার কাছে আসতেই দেখলুম, অদূরে যে শুয়ে রয়েছে সে সুকান্ত—সুকান্ত তখনও অচৈতন্য।

সেই রাত্রে আমি ও সুকান্ত দুজনেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লুম। বুকে অসহ্য বেদনা, তার ওপর মুহুর্মুহু বমি। বুকে সরষের পটি ও মালিশ চলতে লাগল। দিন তিনেক বাদে তবে পথ্য পেলুম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, দেবী ও শঙ্কর পরের দিনই বেশ সুস্থ হয়ে উঠল।

আমরা পথ্য পেলুম বটে কিন্তু ডাক্তার ব'লে গেলেন, দিনরাত্রি যেন বিছানায় শুয়ে থাকি। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এসে আমাদের বুক পেট সব পরীক্ষা ক'রে যেতে লাগলেন। দেবী ও শঙ্কর সর্বদাই আমাদের কাছে থাকতে লাগল। উদ্ধারকর্তারা কাত হলেন, অথচ উদ্ধৃতেরা দিব্যি ঘোরা-ফেরা করতে লাগলেন। এই নিয়ে আমাদের হাসাহাসি হ'ত।

সন্ধ্যের পর থেকে পণ্ডিতজী আমাদের কাছে এসে বসতেন। সময়টা হাসিঠাট্টা আমোদ ও নানারকম কথাবার্তায় আনন্দে আহ্লাদে কাটতে লাগল। প্রায় দিন পনেরো বিছানায় কাটিয়ে আমরা সুস্থ হয়ে উঠলুম।

ওদিকে দেবী ও শঙ্করের ইস্কুলে ফিরে যাবার দিন এগিয়ে আসতে লাগল। দুই ভাই-বোনের কিছু কাপড়-চোপড়ের দরকার—কিন্তু সুরাটে কিছুই পাওয়া যায় না। ঠিক হয়েছে সপ্তাহখানেকের জন্যে দেবী ও শঙ্করকে নিয়ে পণ্ডিতজী কাপড়-চোপড় কিনতে বোম্বাই যাবেন।

কথাবার্তা চলছে, আলাপ-আলোচনা হচ্ছে, এই রকম একটা সময়ে একদিন দ্বিপ্রহরে খেতে ব'সে দেখলুম যে, দেবীর বাঁ চোখের কোনটা

লাল হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞাসা করলুম, বহেনজী, তোমার চোখটা লাল হয়ে উঠেছে যে?

দেবী বললে, হ্যাঁ ভাইয়া, কাল রাত থেকে মাঝে মাঝে চোখটা দপ্ দপ্ ক'রে উঠছে—বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

পণ্ডিতজী দেখে বললেন, খেয়ে উঠে চোখটায় গরম জলের শেক দিও।

সেদিন রাত্রে নদীর ধার থেকে ফিরে এসে দেখি, দেবীর সমস্ত চোখটাই রাঙা হয়ে উঠেছে—একটু ফুলেছে ব'লেও যেন মনে হ'ল।

দেবী বললে, দেখ তো ভাইয়া, আমার জ্বর এসেছে কি না?

কপালে হাত দিয়ে দেখলুম, তার বেশ জ্বর হয়েছে।

পণ্ডিতজী দেখে শুনে ডাক্তার ডাকলেন। ডাক্তারটি ওখানকার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। তিনি এসে দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন। রাতে দেবীর চোখের যন্ত্রণা অসম্ভব রকম বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও।

চিকিৎসা চলতে লাগল। চোখের ফোলাটা ক'মে গেল বটে, কিন্তু দেবী বলতে লাগল, চোখটার দৃষ্টি ক'মে আসছে। জ্বর একটু একটু র'য়েই গেল, তার ওপরে ছ্যাখ্-ছ্যাখ্ করতে করতে সে রোগা হয়ে যেতে লাগল। ডাক্তারেরা পণ্ডিতজীকে উপদেশ দিলেন বোম্বাইয়ে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাতে—সেখানে চোখের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নামও ক'রে দিলেন।

পরের দিনই পণ্ডিতজী ছুটির জন্য দরখাস্ত ক'রে দেবীকে নিয়ে বোম্বাই চ'লে গেলেন। শঙ্কর আমাদের কাছে রইল।

বোম্বাই যাবার সময় আমি ও সুকান্ত স্টেশনে গিয়েছিলুম। গাড়ি ছাড়বার একটু আগে পণ্ডিতজী আমাদের দুজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা আমার সন্তানদের বাঁচাবার জন্যে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করেছিলে—তোমাদের কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, জানি না। আমার অনুরোধ, তোমরা আরও কিছুদিন এখানে থাক—দেবীরও ইচ্ছে তাই।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি ছেড়ে দিল। অত্যন্ত ভারী মন নিয়ে স্টেশন থেকে ফিরে এলুম।

প্রায় পনেরো দিন পরে পণ্ডিতজী দেবীকে নিয়ে বোম্বাই থেকে ফিরে এলেন। আমরা স্টেশনে তো তাকে প্রথমে চিনতেই পারি নি। সেই প্রফুল্ল শতদলের মতন নিটোল স্বাস্থ্য তার এই কদিনেই যেন ভেঙে পড়েছে। তার সেই মাখন-সিঁদুরে লালচে-সোনা রঙের ওপর কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। দেখলুম, তার বাঁ চোখের পর্দাটা যেন ঝুলে পড়েছে। ভাল ক'রে হাঁটতে পারে না—কি রকম ধুঁকতে ধুঁকতে কথা বলে। তার অবস্থা দেখে চোখে জল এসে গেল।

বাড়িতে এনে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আমরা তার পাশে গিয়ে বসলুম। এরই মধ্যে থেকে থেকে সে বোম্বাইয়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে লাগল। কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলে সে একবার বললে, ভাইয়া, এই চোখটায় আর কিছুই দেখতে পাই না। জ্বর দিনরাত্রি লেগেই আছে।

পণ্ডিতজীকে কিন্তু দেখলুম সেই সদাপ্রসন্ন অবস্থাতেই আছেন। বাড়িতে এসে স্নান ক'রে তিনি কাজে বেরিয়ে গেলেন। সেদিন দুপুর-বেলা খাবার টেবিলে পণ্ডিতজীকে বললুম, কলকাতায় সণ্ডার্স সাহেব আছেন—চক্ষু-চিকিৎসায় তাঁর জোড়া নেই। তাঁকে একবার দেখালে হয় না?

পণ্ডিতজী বললেন, আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি—কি করা যেতে পারে!

পরের দিন রাত্রিবেলা আমরা যখন দেবীকে ঘিরে ব'সে গল্প করছি, এমন সময় পণ্ডিতজী এসে ঘোষণা করলেন যে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও তাঁর আপিসের আরও অনেককে সণ্ডার্স সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সকলেই বলেছেন যে, চক্ষু-চিকিৎসায় তাঁর জোড়া আর কেউ নেই। সকলেই পরামর্শ দিলেন, দেবীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সণ্ডার্সকে দেখাতে।

পণ্ডিতজী আরও বললেন যে, তাঁর আপিসের এক বন্ধু কলকাতায় তার ক'রে দিয়েছেন—তাঁদের জন্য একটা বাড়ি ঠিক করতে। বাড়ি ঠিক হয়ে গেলেই কলকাতা যাওয়া হবে।

দেবী সেই ম্লান মুখেও একটু হেসে বললে, যাক, এই ব্যারামের দৌলতে আবার কলকাতা দেখা হয়ে যাবে।

সেদিন রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর নিজেদের ঘরে এসে সুকান্তকে বললুম, আর কি বন্ধু! এবার ডেরা-ডাণ্ডা তোলো—এখানকার দেনা-পাওনা চুকে গেল ব'লেই তো মনে হচ্ছে।

সুকান্ত বললে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যে কুড়িটা টাকা দিয়েছিল, সেটা কার কাছে আছে? সেটা তো আমাদের টাকা!

বললুম, কার কাছে আছে জানি না। তবে পরহস্তগত ধন—সে থাকা না-থাকা সমান। তবু পণ্ডিতজীকে একবার জিজ্ঞাসা করা যাবে।

কাছে একটা কপর্দকও নেই—এমন অবস্থা এর আগে হয় নি। কিছুক্ষণ সেই চিন্তায় মনটা বিগড়ে রইল, তারপরে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পণ্ডিতজী আপিসে ছুটির দরখাস্ত ক'রে দিলেন। এবার দীর্ঘদিনের ছুটি চাই, কারণ দেবী কতকাল ভুগবে এবং তাকে নিয়ে কতকাল ভুগতে হবে তা জানা নেই। ঠিক হ'ল, শঙ্করও সঙ্গে যাবে, দেবীর পরিচর্যার জন্যে সেই মারাঠী পরিচারিকাও যাবে।

দিন দুই বাদে আপিসের সেই বন্ধুর কাছে তার এল যে, তাদের জন্যে বাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। হগ-মার্কেটের খুব কাছে ফিরিঙ্গী-পাড়ায় সস্তায় একখানা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া গিয়েছে। এদিককার সব বন্দোবস্ত তখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, শুধু পণ্ডিতজীর ছুটির দরখাস্তের কোন জবাব পাওয়া যায় নি। পণ্ডিতজী বললেন, ছুটি না দিলে আমি চাকরিতে জবাব দেব।

দু-তিন দিন কেটে গেল, তবুও পণ্ডিতজীর দরখাস্তের কোন জবাব এল না দেখে তিনি ঠিক করলেন, এমনিই চ'লে যাবেন—তারপরে যা হবার তাই হবে—আর ব'সে থাকা চলে না।

সেদিন দুপুরবেলা খাবার টেবিলে পণ্ডিতজীকে ব'লেই ফেললুম, আমরা কি তবে বোম্বাই চ'লে যাব?

পণ্ডিতজী বললেন, এই সব হাঙ্গামায় তোমাদের কথা একদম ভুলেই গেছি। তোমরা কি বোম্বাই যাবে, না, এখানে থাকবে?

আপনি যা বলেন তাই হবে।

পণ্ডিতজী একটু ভেবে বললেন, দেখ, আমরা কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তার পরে তোমাদের কথা চিন্তা করা যাবে। আমি বলি, ততদিন তোমরা এইখানেই থাক। শুধু চাকর-বাকরদের হাতে এতবড় বাড়ি আর এত জিনিসপত্র ফেলে রেখে যাওয়া সমীচীন নয়। কি বল ?

বললুম, তাই হবে।

পণ্ডিতজী আশ্বাসের সুরে আবার বললেন, খুব সম্ভব এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাকে বোম্বাই যেতে হবে। তা যদি হয় তো কথাই নেই।

পণ্ডিতজীর কথায় কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেও কি জানি কেন মনে শান্তি পাচ্ছিলুম না। কি জানি আবার ভাগ্যে কি আছে—এই রকম চিন্তা আমাকে আঁকড়ে রইল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে আমরা সবাই দেবীর ঘরে ব'সে গল্প করছি। কি জানি কি কথার ওপর সুকান্ত বললে, কাল এতক্ষণ তোমরা ট্রেনে চ'ড়ে চলেছ।

তার উত্তরে দেবী বললে, ভাইয়া, তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল না।

আমরা চুপ ক'রে রইলুম। ভাবতে লাগলুম, আবার কলকাতা !!!

দেবী আমার একখানা হাত ধ'রে অনুনয় করতে লাগল, চল না ভাইয়া, এখানে একলা কি তোমাদের ভাল লাগবে ?

দেবীর কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠল দেখে পণ্ডিতজী বললেন, বেশ তো, চল না। কলকাতা তোমাদের দেশ—আমি সেখানকার কিছুই জানি না। তোমাদের মতন আপনার লোক কাছে থাকলে কত সুবিধা হবে, কত ভরসা পাব।

বাপের কথা শুনে দেবী উল্লসিত হয়ে বললে, তাই চল ভাইয়া। কেমন, যাবে তো ?

দেবীর সে অনুরোধে 'না' করতে পারলুম না। কচি মেয়ের মতন আবদারের সুরে—হ্যাঁ ভাইয়া, হ্যাঁ ভাইয়া—করতে করতে বিছানায় উঠে বসতে লাগল। আমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে সে শুলো।

পরের দিন সন্ধ্যার সময় সকলে মিলে কলকাতায় রওনা হওয়া গেল। পথে পাছে দেবীর অসুবিধা হয় সেজন্য পণ্ডিতজী একটি পুরো দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করায় আমরা বেশ আরামেই এসে পৌঁছলুম। স্টেশনে পণ্ডিতজীর জন্যে তাঁর আপিসের বন্ধুর সেই বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁদের নতুন আবাসে গিয়ে বাজার ইত্যাদির ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আমরা বাড়িতে এসে উপস্থিত হলুম।

বাড়িতে কি রকম সম্বর্ধনা হ'ল, সে কথা এখন থাক্। তবে সেদিন আর দেবীকে দেখতে যাওয়া হ'ল না।

সে সময় বড়বাজারে বগলার মাড়োয়ারী হাসপাতালে সুণ্ডার্স সাহেব সপ্তাহে একদিন না দুদিন ক'রে আসতেন। শোনা গেল, তিনি চন্দননগরে থাকেন—হাসপাতাল ছাড়া বাইরের কোন লোককে চিকিৎসা করেন না। ইতিমধ্যে মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপ্যাল লিউকিস্ সাহেবকে ডেকে দেবীকে দেখানো হ'ল। তাঁর অনুরোধে সণ্ডার্স এসে তার চোখ পরীক্ষা করলেন। দুই মহারথী মিলে দেবীর চিকিৎসা শুরু ক'রে দিল—টাকা উড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে।

ওষুধের গুণেই হোক বা নতুন আবহাওয়ার গুণেই হোক—দিন দশেকের মধ্যেই দেবীর স্বাস্থ্যের আশ্চর্য উন্নতি হতে লাগল। যে রুগী পাশ ফিরতে পারত না, এক চক্ষু একেবারে দৃষ্টিহীন, অন্য চক্ষুও প্রায় সেই রকম হয়ে পড়েছিল—সে উঠে হেঁটে বেড়াতে লাগল।

লিউকিস্ সাহেব বললেন, রক্তহীনতা রোগ—কেবল বিশ্রাম ও পথ্যের ওপর রোগীর স্বাস্থ্য নির্ভর করছে।

প্রায় মাস দুয়েক এখানে কাটিয়ে বেশ সুস্থ হয়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান, মন্দির প্রভৃতি দেখে খুশি হয়ে হাসিমুখে একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা কলকাতা থেকে সুরাটের দিকে রওনা হ'ল।

সে সময়ে সুকান্ত কলকাতায় ছিল না। এখানে তার থাকবার জায়গা নেই, কাজেই বাধ্য হয়ে তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। দেবী ও শঙ্কর দুজনেই তাদের সঙ্গে আমাকেও যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছিল, কিন্তু এতদিন বাদে ঘরে ফিরে এসে আবার বেরিয়ে

পড়া সে সময় সম্ভব হ'ল না। তাদের কথা দিলুম আমি ও সুকান্ত মাস খানেকের মধ্যেই ওখানে গিয়ে জুটব। পণ্ডিতজীও আমার প্রস্তাব অনুমোদন ক'রে বললেন, এ সময়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

তার পর একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন, আমি তোমাদের জন্যে বোম্বাইতে হোক কিংবা সুরাটেই হোক—একটা কিছু ব্যবস্থা ক'রে চিঠি লিখলে তোমরা রওনা হ'য়ো।

দুই পক্ষই হাসিমুখে বিদায় নিলুম।

মাস দুয়েক কেটে গেল। প্রতিদিনই পণ্ডিতজীর কাছ থেকে চিঠি ও ভাল খবর পাবার আশায় ব'সে থাকি, কিন্তু নিত্যই নিরাশ হই। আমি যে এখানে থাকব না এবং শীগগির বোম্বাইয়ে চাকরি নিয়ে চ'লে যাব—এ কথা অন্তরঙ্গদের কাছে গোপনে প্রকাশও ক'রে ফেলেছি। কোনো কোনো বন্ধুকে প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলেছি যে, বোম্বাই শহরে গিয়ে বসবার পর তাদেরও একটা যা হোক কিছু জুটিয়ে দেব। সুকান্তর সঙ্গেও দস্তরমতন চিঠি-চালাচালি হচ্ছে গোপনে। ঠিক হয়ে আছে পণ্ডিতজীর চিঠি পেলেই তাকে জানাব। সুকান্ত কিছু টাকা-কড়ির ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছে। এই রকম উদ্বেগ, আশা ও উৎকণ্ঠায় আমাদের দিন কাটছে, এমন সময় প্রায় মাস ছয়েক বাদে আমাদের বহু প্রত্যাশিত পণ্ডিতজীর চিঠি এসে হাজির হ'ল।

বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলের কাগজে লেখা চিঠি—

প্রিয় স্থবির ও সুকান্ত,

কলকাতা থেকে এসেই তোমাদের চিঠি দেবার কথা ছিল, কিন্তু কার্যগতিকে তা সম্ভব হয় নি। আপিসের নানা গোলযোগের মধ্যে দিন কাটছিল—ভেবেছিলুম, সে সব মিটে গেলে শান্তিতে ব'সে তোমাদের চিঠি লিখব—তা আর হয়ে ওঠে নি।

ওখান থেকে যখন আসি তখন দেবীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে ডাক্তারেরা আমায় খুব সাবধান হতে ব'লে দিয়েছিলেন। কিন্তু শত সাবধানতা সত্ত্বেও মাসখানেকের মধ্যেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। প্রায় মাস-দুই কঠিন রোগযন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে চ'লে গিয়েছে।

আর আমার এ দেশে থাকবার প্রয়োজন নেই। এখানে আমার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত যে সব বিষয়সম্পত্তির মালিক আমি হয়েছিলুম তা বিক্রি ক'রে শঙ্করকে নিয়ে আমি ফিরে চললুম ফ্রান্সে—ভবিষ্যৎ ঈশ্বরের হাতে।

কাল বেলা একটার সময় আমরা জাহাজে চড়ব। তোমরা দুজনে আমার সন্তানদের রক্ষা করতে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করেছিলে সে কথা কখনও ভুলব না। সেজন্যে যতদিন বাঁচব ততদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমাদের স্মরণ করব। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

সেই থেকে পণ্ডিতজী বা শঙ্করের দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের কোনও খোঁজই পাই নি। কিন্তু দেবী আমাকে ভোলে নি। মাঝে মাঝে স্মৃতির সরণি বেয়ে এসে সে আমাকে চমকে দিয়ে চ'লে যায়।

তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত

"মহাস্থবির"

# হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

## তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ।

রাজা, রাণী, পলোনিয়স, ওফেলিয়া, রোজেনক্রান্জ ও গিলডেন্স্টার্নের প্রবেশ।

রাজা। কোন কিছু কৌশলেই গেল না কি জানা
কারণ ইহার? কেন এই বুদ্ধিবিকলতা?
কিসের সংঘর্ষে চিত্ত
সর্বক্ষণ সংক্ষুব্ধ এমন
নিদারুণ ক্ষিপ্ততার উৎকট আক্ষেপে?

রোজেন। নিজেই বুঝেন নিজ মস্তিষ্কবিকার
বলিলেন তাই; কিন্তু তার কারণ কি
কিছুতেই পারি নি বলাতে।

গিলডেন। তলাইয়া খুঁজিব কারণ
তাহারও বিরোধী তিনি।
যদি কোনক্রমে
ঘুরাইয়া আনি তাঁরে আমাদের মতে
তখনি চাতুরি খেলি উন্মাদসুলভ
মুক্ত করি লন আপনারে।

রাণী। ভাল ভাবে অভ্যর্থিল তোমাদের ?

রোজেন। খুবই ভদ্রভাবে।

গিলডেন। কিন্তু যেন অনিচ্ছায়।

রোজেন। নিজে কোন প্রশ্ন নাহি করি
মোদের সকল প্রশ্নে দিলেন উত্তর।

রাণী। আমোদ আহ্লাদ দিয়ে পরীক্ষা করেছ ?

রোজেন। আসিবার কালে পথে
দেখেছিনু এক দল আসিতেছে নট ;
সে কথা কহিতে তাঁরে
মনে হ'ল আনন্দিত হইলেন তিনি।
তাহারা এসেছে হেথা,
কথা আছে আজ রাত্রে তাঁহারই সম্মুখে
হবে কোন নাট্য-অভিনয়।

পলো। কথা ঠিক।
তাঁরই অনুরোধে আমি করি অনুরোধ
আপনারা দুইজনে উপস্থিত হয়ে
দেখিবেন নাট্যকলা।

রাজা। নিশ্চয়, নিশ্চয়। হেন মতি হয়েছে যে তার
শুনিয়া পরম শান্তি পেলাম অন্তরে।
তোমরা দুজনে, বৎস, আরও চেষ্টা রাখো,
এসব আনন্দে তারে যোগাও উৎসাহ।

রোজেন। যথা আজ্ঞা প্রভু।

[ রোজেনক্রান্জ ও গিলডেনস্টার্নের প্রস্থান ]

রাজা। প্রিয়তমে গার্ট্রুড, এবার তোমারও যেতে হয়।
গোপনে পাঠানু বার্তা হ্যামলেটের কাছে
আসিতে এখানে, দৈবক্রমে যেন
সাক্ষাৎ হইয়া যায় ওফেলিয়া সনে।
ব্যবস্থা হয়েছে, আমি আর ইনি
রহিব আড়ালে, দেখিব কি ভাবে
কথা কহে পরস্পর;
তা হ'লে হয়তো যাবে জানা—
যে রোগে সে এত ব্যথা এত কষ্ট পায়
প্রণয়ই কি তার মূলে?
ক্ষেত্র বুঝে মার্জনীয় এ চাতুর্যটুকু।

রাণী। আমি তবে যাই।
ওফেলিয়া, করি আশীর্বাদ
অপরূপ এ রূপই তোমার
হয় যেন হ্যামলেটের ব্যাধির নিদান,
তুমি যেন নিজগুণে
প্রকৃতিস্থ করিয়া বাছারে
উভয়েই চিরসুখী হও।

ওফে। মা গো, তাই যেন হয়।

[ রাণীর প্রস্থান ]

পলো। ওফেলিয়া, এস এই দিকে।
মহারাজ, অনুমতি হ'লে
আমরা দুজনে যেতে পারি ওইখানে।
ওফেলিয়া, প'ড়ে যাও এই বইখানা,
একলা রয়েছ তার অজুহাত চাই।
এ দোষে সবাই মোরা দোষী,
মনের জীবন্ত পাপ ঢেকে রাখি মোরা
ধর্মকথা পুণ্যকার্য আবরণ তলে।

রাজা। ওঃ, কত সত্য কথা!
কী তীব্র এ কশাঘাত বিবেকে আমার!
বিবিধ প্রলেপ দিয়ে রূপজীবিনীরা
প্রসাধিত করে স্বীয় কুৎসিত কপোল,
আমার মনের সাথে মুখের প্রভেদ
তা হতে অধিক ঘৃণ্যতর।
হায় কি দুর্বহ বোঝা!

পলো। কুমারের পদধ্বনি!
চলুন, সরিয়া যাই মোরা।

[ হ্যামলেটের প্রবেশ ]

হ্যাম। থাকা না-থাকা, সমস্যা তো তাই।
চিত্তমাঝে নিত্য সহা
মর্মঘাতী দুর্ভাগ্যের শর-শল্যজ্বালা,
তাই মহত্তর?—
অথবা সশস্ত্র পশি যন্ত্রণাসাগরে
শেষ ক'রে দেওয়া সব?
মৃত্যু; ঘুমাইয়া পড়া, আর কিছু নয়;
যদি বুঝি সেই ঘুমে
শেষ হয়ে যায় অন্তর্দাহ,
মরদেহে জীবনের সহস্র আঘাত,
তবে তো তাহাই প্রার্থনীয়।
মৃত্যু; ঘুমাইয়া পড়া;
ঘুমাইয়া পড়া; হয়তো স্বপন দেখা;
সেও তো সংকট;
দেহের এ জীর্ণবাস ত্যজিয়া যখন
ঘুমাইব মরণের ঘুম,
কোন্ স্বপ্ন দেবে দেখা; ভাবিবার কথা।
দুর্ভাগ্য যে দীর্ঘজীবী,—এই তার মূল।

অন্যথা, কে সহিত নীরবে
কালের অবজ্ঞা-কশা, পীড়কের উৎপীড়ন,
দাম্ভিকের ঘৃণা, ব্যর্থপ্রেমে অসহ্য যাতনা,
বিচারের শ্লথগতি,
প্রভুত্বের উদ্ধত ধৃষ্টতা,
অযোগ্যের হাত হতে যোগ্যতার নিত্য অপমান,
কে এত সাহত, যদি নিজ হাতে
শেষ করা যেত সব সামান্য ছুরিতে ?
কে বহিত এই বোঝা
স্বেদসিক্ত শ্রান্ত আর্ত ক্লান্ত জীবনের
যদি না মৃত্যুর পারে অজানার ভয়
নিরস্ত করিত আমাদের ?
সে অজানা পার হয়ে
আজও কোন পথিক ফেরে নি ;
তাই দ্বিধাহত মোরা
অজ্ঞাত যন্ত্রণা কোন না করি বরণ
স'হে যাই জ্বালা যন্ত্রণাই।
হিসাবী বুদ্ধিই নরে করে কাপুরুষ ;
এই ভাবে, সঙ্কল্পের সহজ আলোক
ঢাকা পড়ে রুগ্নতার বিজ্ঞ পাণ্ডু রঙে ;
নভোস্পর্শী বেগবান প্রচেষ্টা সকল,
এই পথে প্রতিহত-গতি,
হারাইয়া ফেলে যত কর্মের প্রেরণা।
চুপ, চুপ !
এই যে, সুন্দরী ওফেলিয়া !
মার্জনা মাগিয়ো কন্যা দেবতার পাশে
যত পাপ করিয়াছি আমি।

ওফে। দীর্ঘ দিন দেখি নি কুমার,
আছেন তো ভাল ?

হ্যাম। ধন্যবাদ ; ভাল, ভাল, খুবই ভাল।

ওফে। কুমার, বহুদিন ভাবিতেছি,
আপনার দেওয়া সেই অভিজ্ঞানগুলি
আপনারে করি প্রত্যর্পণ।
ধন্য হব গ্রহণ করিলে।

হ্যাম। না, না,
আমি তো তোমায় কিছু দিই নি কখনো।

ওফে। শ্রদ্ধেয় কুমার, দিয়েছেন জানেন তা বেশ ;
সাথে সাথে দিয়েছেন
কত না মধুর কথা মাধবী আশ্বাস,
অসামান্য করিয়া সে দান।
সে মাধুরী যখন হারাল তারা আজ
ফিরায়ে দিতেছি আপনারে।
দাতার অন্তর হতে প্রীতি যদি যায়
মূল্যহীন সে দানের মর্যাদা কোথায় ?
ফিরায়ে দিতেছি এই সব।

হ্যাম। ওঃ হোঃ! তুমি কি সৎ ?

ওফে। কুমার!

হ্যাম। তুমি কি সরলা ?

ওফে। কুমার, এ সবের অর্থ কি ?

হ্যাম। তুমি যদি সৎ আর সরলা হও, তোমার সততার সঙ্গে রূপের কোন সম্পর্ক যেন না থাকে।

ওফে। সততার সঙ্গে রূপের যেমন যোগাযোগ, এমন আর কোথায় কুমার ?

হ্যাম। তা বটে, কারণ সততার শক্তি রূপকে আত্মসাৎ করার পূর্বেই রূপ সতীকে অসতী বানিয়ে ছাড়ে। পূর্বে এটা ঠিক বোঝা যায় নি, কালে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমায় আমি একদিন ভালবাসতাম।

ওফে। তাই আমায় বুঝিয়েছিলেন বটে কুমার।

হ্যাম। আমার কথা বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি। কারণ, প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? আমি তোমায় ভালবাসি নি।

ওফে। তাতে আমারই বেশি ক্ষতি হয়েছিল।

হ্যাম। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে কোন মঠে যাও। কেন কতকগুলো পাতকীর জন্মদান করবে? আমি তো কতকটা খাঁটি লোক; তবু আমারও এত ত্রুটি যে ভাবি, মা আমায় পেটে না ধরলেই ভাল করতেন। যেমন দাম্ভিক, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ, তেমনি দুরাকাঙ্ক্ষী; ইশারা পাওয়া মাত্র যত পাপ ঘাড়ে এসে চাপে; তাদের না পারি বুদ্ধি দিয়ে সাজাতে, কল্পনা দিয়ে রাঙাতে, সময় দিয়ে খেলাতে। আমার মত যে সব হতভাগা মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে স্বর্গে ওঠবার আকাঙ্ক্ষা রাখে, তাদের জীবনে প্রয়োজনটা কি? আমরা সব পাজীর পাঝাড়া; আমাদের কাউকে বিশ্বাস ক'রো না। মঠে যাবার ব্যবস্থা কর। তোমার বাবা কোথায়?

ওফে। বাড়িতে আছেন কুমার।

হ্যাম। দরজাগুলো সব তালাবন্ধ ক'রে রেখো, যাতে তাঁর বোকামি বাড়ির মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। এখন যাই।

ওফে। ভগবান যেন ভাল করেন।

হ্যাম। যদি তুমি বিয়ে কর, এই মারাত্মক যৌতুকটি তোমায় দিচ্ছি। বরফের মত সতী, তুষারের মত নির্মল হ'লেও কুৎসা এড়াতে পারবে না। মঠে যাও, এখনি যাও। আমি চলি। হ্যাঁ, যদি বিয়ে করতেই হয় একটা বোকা দেখে বিয়ে ক'রো; বুদ্ধিমানে বেশ জানে কিনা তোমরা তাদের কি জানোয়ার বানিয়ে তোল। মঠেই যাও, দেরি ক'রো না। চললাম।

ওফে। ভগবান, এঁকে সুস্থ ক'রে দাও।

হ্যাম। তোমাদের রঞ্জনীবিদ্যার কথাও যথেষ্ট শুনেছি। মুখ, ঈশ্বর দিলেন এক, তোমরা তাকে কর আর। তোমরা খেমটা-নাচ, ঢঙ ক'রে হাঁট, আধ-আধ কথা কও, কৃষ্ণের জীবদের নিত্যি-নূতন নামে ডাক,

বেহায়াপনা ঢাকতে ন্যাকা সাজ। চ'লে যাও, ও আমি আর বরদাস্ত করব না, ওতেই আমায় পাগল করেছে। শুনছ, বিয়ে-থাওয়া এখন থেকে বন্ধ হ'ল; যাদের বিয়ে পূর্বেই হয়ে গেছে তারা সবাই বেঁচে থাকবে বইকি, একজন ছাড়া। বাকি যেমন আছে, তেমনি থাকবে। মঠে যাও, মঠে যাও।

[ প্রস্থান ]

ওফে। কি মহৎ চিত্ত হায় হয়েছে বিকল!
সভা-আলো-করা আঁখি,
রসনাগ্রে সরস্বতী,
ক্ষাত্রবীর্য অসিতে তাহার!
সমগ্র দেশের আশা, শুভ্র শতদল,
সমাজের উজ্জ্বল দর্পণ,
সকল চক্ষুর লক্ষ্য, আদর্শ সবার,
সব গেল, সবই গেল ঘুচে।
আর আজি, নারীমধ্যে সর্বাধিকা দুর্ভাগিনী আমি,
প্রাণ ভরি একদিন ভুঞ্জিলাম মধুপগুঞ্জন,
আজ দেখি,—অমন মহৎ চিত্ত
হারাইয়া বুদ্ধির শাসন,
ছিন্নসুর বীণাসম—
তারে তারে ঝঙ্কারিছে বেসুর কর্কশ;
প্রস্ফুটিত যৌবনের অনুপম সে কান্ত মূরতি
ঝ'রে গেছে উন্মাদ বাত্যায়।
হা ধিক অদৃষ্ট মম,
কি দেখিয়াছিনু, আর কি দেখি এখন!

[ রাজা ও পলোনিয়সের পুনঃপ্রবেশ ]

রাজা। প্রেম! ও-পথে মনের গতি মোটে তার নয়।
যা সব বলিল, কিছু এলোমেলো বটে,
উন্মাদের কথাও তো নয়।

কি একটা ঘটেছে অন্তরে,
বিষাদ বসিয়া তাহে করিছে লালন ;
সন্দেহ আমার—
শাবক হইতে আছে বিপদের ভয়।
তারই প্রতিকার তরে
সংকল্প করিনু স্থির—
অবিলম্বে ইংলণ্ডে সে যাবে,
অনাদায়ী রাজকর করিবে আদায়।
যে ভার একান্ত হয়ে মাথায় চড়িয়া
প্রকৃতির ঘটাল বিকৃতি,
নব দেশে জলে স্থলে নব দৃশ্য হেরি
হয়তো কাটিয়া যাবে সে হৃদয়ভার।
কি বলেন ?

পলো। এতে তো ভালই হবে।
তবু বলি, আমার বিশ্বাস
ব্যর্থ প্রেমই বিষাদের আরম্ভ ও মূল।
কি গো ওফেলিয়া !
বলিতে হবে না আর
কি বলিল হ্যামলেট,
আমরা শুনেছি সবই।
মহারাজ, করুন যা অভিপ্রায় তব ;
তবু, যদি অভিরুচি হয়, নাট্য-অভিনয়-শেষে
মহারাণী একবার একান্তে বসিয়া
অনুনয় করুন কুমারে
প্রকাশ করিতে তাঁর বিষাদের হেতু।
বেশ খোলাখুলি ভাবে কথা কওয়া ভাল ;
যদি অনুমতি পাই, অন্তরালে রহি
সব কথা শুনে যাব আমি।

ব্যর্থ হ'লে মায়ের প্রয়াস,
ইংলণ্ডেই পাঠাবেন তাঁরে ;
অথবা, আপনি যদি বুঝেন সঙ্গত,
কোনখানে রাখিবেন আবদ্ধ করিয়া।

রাজা। এই পথই গ্রহণীয় নাহিক সংশয়,
মহতের উন্মত্ততা তাচ্ছিল্যের নয়। [ প্রস্থান ]

[ ক্রমশ ]

অনুবাদ°—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

# সাত-সতের

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সপ্ত সংখ্যার সীমাহীন সমারোহ। সৌর-জগতের কেন্দ্রস্থলে যিনি বিরাজ করছেন—তিনি স্বয়ং সপ্ত-সপ্তি সূর্যদেব। তাঁর 'সাত-ঘোড়ার রথে'র কি বাহার! সূর্যের অশ্বগণের রশ্মি বা লাগামও সাত-রঙা। আকাশে যে রামধনু বা ইন্দ্রধনু ওঠে, তারই মত সাতটি রঙ এদের। বেগুনী ( Violet ), নীল ( Indigo ), আশমানী ( Blue ), সবুজ ( Green ), হলুদে ( Yellow ), কমলা ( Orange ) ও লাল ( Red )—এই সাত রঙ, সংক্ষেপে যাকে 'VIBGYOR' বলে। এই সাতটি রঙ একসঙ্গে সমান পরিমাণে মিশে আছে ব'লেই নাকি সূর্যের আলো সাদা দেখায়।

আকাশে নক্ষত্র-পুঞ্জের লীলা-খেলা। তাদের মধ্যে প্রধান—'সপ্তর্ষি-মণ্ডল'। মরীচি, বশিষ্ঠ, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু—এই সাত জন ঋষির নামে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের সাতটি নক্ষত্রের নাম। আকাশে আর আছে সপ্ত স্বর্গ—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। এ ছাড়া পাতালের সংখ্যাও সাত—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। সাতটি স্বর্গ ও সাতটি পাতাল, এদের একসঙ্গে বলা হয় চতুর্দশ ভুবন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে 'সিদ্ধান্ত-শিরোমণি' গ্রন্থে বলা হয়েছে[১] আকাশে

১। "ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্ধ্বঃ স্যাদুদ্বহস্তদনুসংবহ-সংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্বকোঽস্মাদ্ বাহঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ।"

বায়ুর স্তর আছে সাতটি। যথা—আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, সুবহ, পরিবহ ও পরাবহ। এদের মধ্যে সবচেয়ে নীচের স্তরের নাম আবহ বা ভূ-বায়ু। এই স্তর পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে। তা মেঘ ও বিদ্যুতের রাজ্য। বর্তমান কালের বিমান-বিহারীগণ এই আবহ-মার্গেই বিচরণ ক'রে থাকেন। দ্বিতীয় স্তরের নাম প্রবহ। তা সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণের অবস্থান-ভূমি। ষষ্ঠ স্তরের নাম পরিবহ। এখানে সপ্তর্ষি-মণ্ডল অবস্থিত ও স্বর্গঙ্গা মন্দাকিনী প্রবাহিতা। সপ্তম স্তরের নাম পরাবহ। ইহার পরই স্বর্গরাজ্য। সেকালে রাজা দুষ্মন্ত তাঁর পুষ্পকরথে চ'ড়ে এই সাতটি স্তর অতিক্রম ক'রে পৃথিবী থেকে স্বর্গে যাওয়া-আসা করতেন। মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের সপ্তম অঙ্কে একটি শ্লোকে[২] দেখা যায়, তিনি স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনের সময় পরিবহ-মার্গ (মতান্তরে প্রবহ-মার্গ) অতিক্রম করছেন।

আমাদের এই পৃথিবীর ওপরও সপ্ত-সংখ্যার প্রভাব কম নয়। প্রথমেই দেখা যাচ্ছে, সপ্ত-দ্বীপের সমবায়েই এই পৃথিবীর সৃষ্টি। তাই পৃথিবীর অপর নাম 'সপ্ত-দ্বীপা'। সাতটি দ্বীপের নাম—জম্বু-দ্বীপ, প্লক্ষ-দ্বীপ, শাল্মলি-দ্বীপ, কুশ-দ্বীপ, ক্রৌঞ্চ-দ্বীপ, শাক-দ্বীপ ও পুষ্কর-দ্বীপ। এদের মধ্যে জম্বু-দ্বীপই বর্তমান এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন নাম। জম্বু-দ্বীপের অন্তর্গত 'অজনাভ-বর্ষ' নামক দেশই বর্তমানে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। সপ্ত দ্বীপের অধিপতিও সাত জন। যথা—অগ্নীধ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান্, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, ভব্য ও সবন।

আমাদের বসুন্ধরা যে শুধু সপ্ত দ্বীপের সমষ্টি, তা নয়। তা সপ্ত সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সাতটি সাগর বলতে বোঝায়—লবণ-সাগর, ইক্ষু-সাগর, সুরা-সাগর, ঘৃত-সাগর, দধি-সাগর, ক্ষীর-সাগর ও জল-সাগর।[৩] এদের অপর নাম 'সপ্ত-সিন্ধু'।

---

২। "ত্রিস্রোতসং বহতি যো গগন-প্রতিষ্ঠাং জ্যোতীংষি বর্তয়তি চ প্রবিভক্তরশ্মিঃ।
তস্য দ্বিতীয়-হরিবিক্রম-নিস্তমস্কং বায়োরিমং পরিবহস্য বদন্তি মার্গম্।"
[শেষার্ধের পাঠান্তর—"তস্য ব্যপেত-রজসঃ প্রবহস্য বায়োর্মার্গো দ্বিতীয়হরিবিক্রম-পূত এষঃ।"]

৩। "লবণেক্ষু-সুরা-সর্পির্দধিদুগ্ধজলাত্মকাঃ"।

'সপ্ত-সিন্ধু' বলতে সপ্ত নদীকেও বুঝায়। ভারতের প্রধান সপ্ত নদীর নাম, যথা—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী। এই সাতটি নদীর তীর্থোদক পরম পবিত্র ব'লে হিন্দুরা মনে ক'রে থাকে।[৪]

বৈদিক যুগে 'সপ্ত সিন্ধু'র কিন্তু ভিন্ন নাম ছিল। ঋগ্‌বেদে "নদী-স্তুতি" নামক সূক্তে[৫] সপ্ত সিন্ধুর বর্ণনা আছে। এই সপ্ত সিন্ধু সম্বন্ধে "নানা মুনির নানা মত"। টীকাকার যাস্কের মতে এই সাতটি নদীর নাম, (১) গঙ্গা, (২) যমুনা, (৩) সরস্বতী, (৪) শুতুদ্রী (বা শতদ্রু) (৫) অসিক্নী-(বা চন্দ্রভাগা)-যুক্তা পরুষ্ণী (বা ইরাবতী), (৬) বিতস্তা-যুক্তা মরুদ্‌বৃধা (বা মহানদী, কিংবা ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মিলিত রূপ), (৭) সুষোমা-(বা সিন্ধু)-যুক্তা আর্জীকীয়া (বা বিপাশা)।

সপ্ত-সিন্ধু নামে তিনটি প্রদেশের কথাও বৈদিক-সাহিত্যে পাওয়া যায়। প্রদেশ তিনটির সম্পূর্ণ নাম—পূর্ব-সপ্ত-সিন্ধু, পশ্চিম-সপ্ত-সিন্ধু ও উত্তর-সপ্ত-সিন্ধু। পূর্ব-সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে পাঞ্জাব এবং পশ্চিম-সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে গান্ধার বা আফগানিস্তান অবস্থিত ছিল। তা ছাড়া উত্তর-সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের কথাও শোনা যায়। এই তিনটি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে সাত-সাতটি ক'রে সিন্ধু বা নদী প্রবাহিত ছিল। এই জন্য আর্যদিগের বাসভূমিকে "ত্রি-সপ্ত-সিন্ধু-বেষ্টিতা" বলা হ'ত।

আরও মজার কথা এই যে, রুশদেশীয় তুর্কিস্তানে একটি প্রদেশ আছে, যার নাম 'সাত নদীর দেশ' (The Land of Seven Streams)। রুশ-দেশীয় ভাষায় স্থানটির নাম, Semiretchenski-Krai—নদীগুলির নাম, Lepsa, Baskan, Aksu, Sarkan, Biyen, Kartal,

---

৪। "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু-কাবেরী জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।"

৫। ঋগ্‌বেদের শাকল-সংহিতার দশম-মণ্ডলে নয়টি ঋক্ লইয়া একটি সূক্ত আছে, তাহার নাম "নদী-সূক্ত"। উহার পঞ্চম ঋক্—

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুষ্ণ্যা।
অসিক্ন্যা মরুদ্‌বৃধে বিতস্তয়ার্জীকীয়ে শৃণুহ্যা সুষোময়া।"

Koksu। এই স্থানটিই উত্তর-সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং অনেকের মতে এটাই আর্যগণের আদি বাসভূমি।

জোরোয়াস্টার (Zoroaster) ধর্মগ্রন্থ 'আবেস্তায়(Avesta)ও দেখা যায় যে, 'হপ্ত-হিন্ধু' বা সপ্ত-সিন্ধু প্রদেশই আর্যগণের আদি বাসস্থান ছিল।

পৃথিবীতে প্রধান পর্বত বা কুল-পর্বতের সংখ্যাও সাত। পৃথিবীকে ধারণ করাই এদের কাজ। তাই পর্বতের নাম ভূভৃৎ বা ভূধর। সাতটি কুল-পর্বত, যথা—মহেন্দ্র-পর্বত, মলয়-পর্বত, সহ্য-পর্বত, শুক্তিমান্-পর্বত, ঋক্ষ-পর্বত, বিন্ধ্য-পর্বত ও পারিযাত্র-পর্বত[৬]। হিমালয় পর্বতকে সে সময় প্রধান পর্বত ব'লে স্বীকার করা হ'ত না।

সংসারে আমাদের পূজনীয়া মাতা বা মাতৃ-স্থানীয়া গুরুজন সাতজন—জননী, গুরু-পত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজ্ঞী, ধেনু, ধাত্রী ও পৃথিবী[৭]।

আমাদের পুরাণে চিরজীবী সাতজন মহাত্মার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মৃত্যু নাই। আজিও এই মহাত্মারা মরণকে জয় ক'রে অমর হয়ে আছেন। সপ্ত চিরজীবীর নাম যথা—ব্যাসদেব, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, বলি, বিভীষণ ও হনুমান্। পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য জন্মতিথি-দিবসে এই সপ্ত চিরজীবীর পূজা করতে হয়।

ধর্ম-জগতে হনুমানের প্রভাব যেমন, মনোজগতে তাঁর পিতৃদেব পবন-দেব বা বায়ু-দেবতার প্রভাবও তেমনি। ঊনপঞ্চাশ বায়ুর প্রকোপে কখনো পড়েন নি—এমন ব্যক্তিকে সত্যিই ভাগ্যবান্ পুরুষ বলা যায় না কি? এ হেন পবন-দেব বা মরুৎ-দেবতার ওপর সপ্ত-সংখ্যার প্রভাব কেমন, তার সন্ধান করা যাক। দৈত্যবধের পর দিতির গর্ভে অপরাজেয় মরুৎ-দেবতার জন্ম হ'লে দেবরাজ ইন্দ্র যোগবলে তা জানতে পারলেন। মরুৎ-দেবতার ভয়ে ইন্দ্র গর্ভস্থ শিশুকে দৈবশক্তিবলে প্রথমে সাতটি খণ্ডে কেটে ফেললেন। পরে সেই সাতটি খণ্ডের প্রত্যেকটিকে

৬। "মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শুক্তিমানৃক্ষপর্বতঃ।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুল-পর্বতাঃ।"

৭। "আত্ম-মাতা গুরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ-পত্নিকা।
ধেনুর্ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ।"

আবার সাত সাত ভাগে কাটলেন। খণ্ড-বিখণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কশ্যপের আশীর্বাদে শিশুটি জীবন-লাভ করল। এইভাবে 'সাত-সাতে উনপঞ্চাশ' বায়ুর সৃষ্টি হ'ল। অতএব মরুৎ-দেবতার জীবন সাত সাত-বার সপ্ত সংখ্যার বিজয়-কাহিনীর ইতিহাস।

অগ্নি-দেবতার জিহ্বা সাতটি। তাই অগ্নির নাম সপ্ত-জিহ্ব, সপ্তাংশু বা সপ্তার্চিঃ। কালী-করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্ব-বিরূপিণী ও লোলায়মানা—এই সপ্তশিখাই অগ্নির সপ্তজিহ্বা[৮]।

সপ্ত সংখ্যাটি বোধ হয় সকল দেবতারই প্রিয়। তাই তো দেখি, শরৎকালে দুর্গাপূজা ও বসন্তকালে বাসন্তী পূজা শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতেই শুরু হয়ে থাকে।

দুর্গোৎসবে যে চণ্ডীপাঠ করা হয়, সেই মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী সাত শত শ্লোকে রচিত। তাই তো চণ্ডীর অপর নাম সপ্তশতী। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাও সাত শত শ্লোকের সমষ্টি। তাই সপ্তশতী বলতে গীতাকেও বুঝায়।

জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম ব্রাহ্মণ হয়েও যে ক্ষত্রিয়কুলকে পৃথিবীর বক্ষ হতে একুশবার নিশ্চিহ্ন করতে পেরেছিলেন, তার মূলেও সপ্ত-সংখ্যার অদৃশ্য হস্তের ইঙ্গিত বর্তমান। একবিংশতি সংখ্যা যে সপ্ত-সংখ্যারই তিন গুণ—এ কথা ভুললে চলবে কেন?

ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্রে দেখা যায়—সপ্ত-সংখ্যাটি সর্বত্রই ওতঃপ্রোত-ভাবে বিদ্যমান। বৈদিক ছন্দঃশাস্ত্রে প্রধান ছন্দ সাতটি—গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী[৯]।

সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বর বা সুরের সংখ্যা সাত[১০]। যথা—(১) ষড়্‌জ

---

৮। "কালীকরালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বনিরূপিণী বা লোলায়মানেতি চ সপ্ত জিহ্বাঃ।"

৯। "গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুভ্ বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুভ্ জগত্যশ্ছন্দাংসি।"

১০। "নিষাদর্ষভ-গান্ধার-ষড়্‌জমধ্যম-ধৈবতাঃ।
পঞ্চমশ্চেত্যমী সপ্ত তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিতাঃ স্বরাঃ।"

( সা ), (২) ঋষভ ( ঋ ), (৩) গান্ধার ( গা ), (৪) মধ্যম ( মা ), (৫) পঞ্চম ( পা ), (৬) ধৈবত ( ধা ), (৭) নিষাদ ( নি )। এদের ইংরাজী নাম যথাক্রমে—C, D, E, F, G, A, B। এই সাতটি স্বর নিয়েই এক-একটি সপ্তক বা 'সুরের পর্দা'। এই সপ্ত স্বর সম্বন্ধেই কবি বলেছিলেন—

"কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর,
সাতটি যেন পোষা পাখী—"

এই সাতটি স্বর সাতটি প্রাণীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে নিরূপিত হয়েছে। প্রাণিগণের নাম, যথাক্রমে—(১) ময়ূর, (২) বৃষ ( বা মতান্তরে চাতক ), (৩) ছাগ, (৪) ক্রৌঞ্চ, (৫) কোকিল, (৬) অশ্ব ( বা মতান্তরে ভেক ), (৭) হস্তী।

'বৈশেষিক-দর্শন'শাস্ত্রে পদার্থকে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব[১১]। এ সম্বন্ধে শিবাদিত্য-কৃত 'সপ্ত-পদার্থী' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন ভারতের রাজনীতি-শাস্ত্রে বলা হয়েছে, রাজ্য সপ্ত-অঙ্গ-বিশিষ্ট। রাজ্যের সাতটি অঙ্গ—(১) স্বামী বা রাজা, (২) অমাত্য বা মন্ত্রী, (৩) সুহৃৎ বা মিত্রপক্ষ, (৪) কোষ বা অর্থভাণ্ডার (Tressury) (৫) রাষ্ট্র ( Government ), (৬) দুর্গ ( Fort ) (৭) বল বা সেনা-বাহিনী[১২]।

আমাদের সাহিত্যে প্রাকৃত ভাষায় হাল-কবি-কৃত "সপ্তশতী" গীতিকাব্য ও তাহার অনুকরণে সংস্কৃত ভাষায় গোবর্ধন-কবি-রচিত "সপ্ত-শতী" কাব্য, ব্যাকরণে সপ্ত বিভক্তি, সঙ্গীত-রাজ্যে 'সপ্ত-তন্ত্রী' বা সেতার যন্ত্র, উদ্ভিদ-জগতে সপ্তচ্ছদ বা সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ইতিহাসে ভারতের রাজা সাতবাহন ও ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের কথা, আমাদের

১১। "দ্রব্যং গুণাস্তথা কর্ম সামান্যং সবিশেষকম্। সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্তিতাঃ।"

১২। "স্বাম্যমাত্যসুহৃৎকোষরাষ্ট্রদুর্গবলানি চ" ইতি রাজ্যাঙ্গানি। অথবা—

"স্বাম্যমাত্যপুরং রাষ্ট্রং কোষদণ্ডৌ তথা সুহৃৎ।
সপ্তৈতানি সমস্তানি লোকেঽস্মিন্ রাজ্যমুচ্যতে।"

কাল-গণনায়—সাত দিনে এক সপ্তাহ, আমাদের বিবাহ-অনুষ্ঠানে সপ্তপদীগমন ও সাতপাকে বন্ধন, সাতপুরুষের ভিটের ওপর আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ, সাতেও নেই পাঁচেও নেই—এমন নিরীহ লোককে সাতঘাটের জল খাওয়ানো, সাত-পাঁচ ভেবে কাজ করা—এ সমস্তই সপ্ত-সংখ্যার মহিমা প্রমাণিত করে।

সপ্তকাণ্ড না হ'লে আমাদের রামায়ণ সম্পূর্ণ হয় না। মহাভারতে সপ্তরথী-পরিবেষ্টিত অভিমন্যুকে বধ করবার করুণ-কাহিনী কার হৃদয়কে না অভিভূত ক'রে তোলে?

আমাদের রূপকথায়—'সাত ভাই চম্পা জাগো রে'র কাহিনী, সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারে সাত-মহলা রাজপ্রাসাদের সপ্তম তলে সাত-নরী-হার গলায় দিয়ে যে রাজকন্যা বাস করছে, তার সন্ধানে রাজপুত্রের অভিযান, ধনপতি সদাগরের সপ্ত-ডিঙা সাজিয়ে সিংহল দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা—এমনি কত না কাহিনী আমাদের শিশু-মনকে করেছে অনুরঞ্জিত যুগ-যুগ ধ'রে।

একদা বঙ্গদেশবাসী "সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে" দেশ-জননীকে আবাহন করেছিল; তারই ছবি কবির কল্পনায় চির-সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দেশ-জননী তাঁর "সাত কোটি সন্তানেরে" "মানুষ করতে" পারলেন কিনা—ভবিষ্যতের ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে।

শ্রীদেড়কড়ি শর্মা

# বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের অবস্থা

কিছুকাল আগে বাংলার একজন সুপরিচিত লেখক 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় এক প্রবন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলা-সাহিত্যের পঠন-পাঠন মুখ্যত সাধারণ-শিক্ষিত মানুষ এবং মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সে সময় এ কথার তুমুল প্রতিবাদ হয়েছিল; উক্ত 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার চিঠিপত্র-স্তম্ভে এই নিয়ে কিছু বাদবিসম্বাদ-মূলক আলোচনাও হয়। প্রবন্ধ-লেখক বাংলা-সাহিত্যের পাঠকসম্প্রদায়ের সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি খোদ বাংলা-ভাষার

উপর আক্রমণ চালিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের মোদ্দা কথা এই যে, বাংলা-ভাষার প্রকাশরীতি অলঙ্কারবহুল অনাবশ্যক শব্দভারজর্জরিত জটিল; সেই তুলনায় ইংরেজী ভাষা, কিংবা যে কোন আধুনিক বিদেশী ভাষা, বহুগুণে সরল তির্যক অর্থবহ। নিবন্ধ-লেখক দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা বোঝাবার প্রয়াস করেন।

এ বিষয়ে বর্তমান লেখকের বক্তব্য এই যে, 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার ইংরেজীভাষী সম্পাদকমণ্ডলীকে খুশি করবার জন্যেই যদি নিবন্ধটির ভিতর ওই জাতীয় তুলনার আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে, তা হ'লে বাংলা-ভাষার প্রতি নিতান্ত অবিচার করা হয়েছে। ইংরেজী ভাষার ঐশ্বর্য সর্বস্বীকৃত, প্রভূত ও ব্যাপক চর্চায় ইংরেজী ভাষা বর্তমানে যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে বাংলা-ভাষার সে স্তরে উন্নীত হতে এখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তা ব'লে বাংলা-ভাষার কোনই বৈশিষ্ট্য নেই এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। বাংলা-ভাষার দু-একটি বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ। প্রথমত, বাংলা-কাব্যের ভাষা ইংরেজী কাব্যের ভাষার চাইতেও বোধ করি অধিক ধ্বনিমধুর ললিত স্বচ্ছন্দ— এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্বের অপেক্ষাবিহীন সাধারণ মত কতটুকু গ্রাহ্য জানি না; তবে এ কথা বোধ করি প্রতিবাদের আশঙ্কা না ক'রেই বলা যায় যে, বাংলার মত 'ম' ও 'ল'-কার বহুল এমন মিষ্টি ছাঁদের ভাষা বিশ্বসাহিত্যে খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর বাংলা-গদ্য যদি ধরি, অত্যল্প কালের মধ্যে বাংলা গদ্যের বাধাবন্ধহীন দ্রুত উন্নতিকে একটি বিস্ময়কর সংঘটন মনে করা যেতে পারে। ইংরেজী গদ্যের সঙ্গে বাংলা-গদ্যের তুলনা চলে না; তবে ইংরেজী গদ্যের পরিপুষ্টি এত দ্রুত সংসাধিত হয়েছে কি না সন্দেহ। ইংরেজী গদ্য তার বর্তমান উজ্জ্বল শাণিত রূপ দু-চার দিনের চেষ্টায় লাভ করে নি; তার পিছনে দীর্ঘকালীন অনুশীলনের অধ্যায় সুবিস্তৃত রয়েছে। তদনুপাতে বাংলা-গদ্য উন্নতির পথে অনেক বেশি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হয়েছে। তবে বাংলা-গদ্যের এই অবিশ্বাস্য দ্রুত উন্নতির মূলে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবের পোষকতা আছে, এমন কথা বলা যেতে পারে বটে। সেই দিক দিয়ে কেউ ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে চাইলে আমাদের কিছু বলার নেই।

আর শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নই বা কেন? মাতৃভাষার সঙ্গে কি আর কোন ভাষার তুলনা হয়? সকল প্রকার অসম্পূর্ণতা নিয়েই মাতৃভাষা আমাদের পরমবন্দনীয়া। মাতৃভাষা পবিত্র মাতৃস্তন্যরসের দ্বারা পরিষিক্ত ভাষা; এ ভাষায় আমাদের সহজাত অধিকার। অতি শৈশবেই এ ভাষার বোধ আমাদের সত্তার গভীর গহনে দৃঢ়প্রোথিত হয়ে যায়। অনুশীলনলব্ধ-জ্ঞান আর সংস্কারলব্ধ-জ্ঞানের মধ্যে যে তফাত, যে-কোন বিদেশী ভাষা আর মাতৃভাষার মধ্যেও সেই রকম তফাত। আমাদের প্রাণের কথা, মনের কথা যতবারই আমরা সহজ ক'রে বলতে চাইব, ততবারই ঘুরে ফিরে মাতৃভাষার দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এই যদি মাতৃভাষার স্বরূপ হয়, তেমন একান্ত ভাবে বিদেশী ভাষা কখনও কি আমাদের কাছে ধরা দিতে পারে? বিদেশী ভাষায় সহস্র কুশলতা অর্জন করলেও সে ভাষা শেষ অবধি বিদেশী ভাষাই থেকে যায়। 'স্টেটসম্যানে'র বাঙালী প্রবন্ধ-লেখক যত বড় ইংরাজীনবিসই হোন না কেন, তিনি বুকে হাত দিয়ে বলুন তো, সহজ সুরে সহজ কথা তিনি ইংরেজীর চাইতে বাংলায় বলতে বেশি আরাম পান কি না! যদি না পান, স্বীকার করতেই হবে যে তিনি একজন অ-সাধারণ ব্যক্তি এবং সে ক্ষেত্রে আমরা আমাদের অভিমত পাল্টাতে দ্বিধা করব না।

তবে বাংলা দেশের সাধারণ পাঠক-সম্প্রদায় সম্পর্কে লেখক যে কটি মন্তব্য করেছেন, তার ভিতর চিন্তার খোরাক কিঞ্চিৎ আছে বটে। বাস্তবিক বাংলা-সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায়ের একটা মোটা অংশই হ'ল সাধারণ-শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পুরুষ, কলেজ-পড়ুয়া ছেলে-ছোকরার দল এবং বালক বালিকা। বিশেষ ক'রে মেয়েরা বাংলা-সাহিত্যের সব চাইতে বড় পেট্রন। গ্রন্থাগারগুলির হিসাব নিলে দেখা যাবে, গল্পোপন্যাসের চাহিদা মেয়েদের মধ্যেই সব চাইতে বেশি। প্রকাশকেরা যত গল্প-উপন্যাসের বই বিক্রি করেন, খোঁজ নিলে দেখা যাবে তার প্রায় বারো-আনা অংশই প্রচুর-অবসরভোগিনী বা বিশ্রামসুখ-প্রয়াসিনী বা নিদ্রাবিলাসিনীর বালিশের তলায় গিয়ে আশ্রয় লাভ করে। অধিকাংশ উপহারের বইয়েরও শেষ পর্যন্ত ওই একই পরিণাম। এ

দিকে যে সমস্ত 'বেস্ট-সেলার' নিয়ে সোরগোলের অন্ত নেই, কাগজে কাগজে আলোচনা-সমালোচনার হিড়িক প'ড়ে যায়, অবধারিত ভাবে তাদের প্রধান ভোক্তা হ'ল কলেজ-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীর দল। তরুণদের সোরগোলের ক্ষমতা বেশি, পছন্দ-অপছন্দকে জোর গলায় জাহির করতে এমন আর কেউ পারে না, কাজেই তথাকথিত 'বেস্ট-সেলার'গুলি নিয়ে অনুচিত উত্তেজনা ও মুখরতা। প্রকাশকেরা বইয়ের কারবারী হ'লেও শেষ অবধি বইয়ের ভাগ্যের নিয়ন্তা হ'ল সাধারণের রুচি। পাঠক-সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশের রুচি যদি তরল হয়, সে ক্ষেত্রে সমগ্র সাহিত্যের আবহাওয়াই তরলতার দ্বারা বিগলিত হয়ে ওঠে। প্রকাশকের নিকট সেই গ্রন্থই সমধিক গ্রাহ্য, যে গ্রন্থ পোকায় না কেটে বাজারে কাটে এবং হু-হু ক'রে কাটে। তাঁর চোখে রচনা অর্থবহ হওয়া বড় কথা নয়, অর্থকরী হওয়া আসল কথা। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অর্থকরী মনোবৃত্তির আধিপত্য ঘটতে বাধ্য, আর অর্থকরী মনোবৃত্তি যে প্রায় ক্ষেত্রেই তরল মনোভাবের জনয়িত্রী—সে কথা না বললেও চলে।

বিষয়টি তুচ্ছ করবার মত নয়। কেন এমন হয় যে, আধুনিক বাংলা-বই মাতৃভাষার গৌরব দ্বারা পুষ্ট হওয়া সত্ত্বে সুশিক্ষিত ধীর স্থির ব্যক্তিদের মনোযোগ তেমন ভাবে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয় না! কি সেই ত্রুটি যার দরুন বাংলা বই কেবলমাত্র লঘুমনস্ক মহলে আলোড়ন জাগিয়েই ক্ষান্ত হয়, গভীরত্বপ্রয়াসী বা সূক্ষ্ম-অনুসন্ধান-তৎপর মানুষের মনের তীরে সেই আলোড়নের ঢেউ গিয়ে পৌঁছয় না? যাঁরা বাংলা-বইয়ের তুলনায় বিদেশী বই সমধিক পছন্দ করেন, মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের আপেক্ষিক ঔদাসীন্য ও অবহেলা এর একটা কারণ হতে পারে বটে; তবে মনে হয়, সেইটেই সবটুকু কারণ নয়। গলদের মূল আরও অনেক গভীরে নিহিত, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। এই অনুমানের ঝুঁকি নেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে।

প্রায় চার বৎসর আগে সমকালীন সাহিত্য-কেন্দ্রের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য-বৈঠকে বাংলার একজন প্রবীণ কথাসাহিত্যিক এইরূপ

অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, অন্যান্য বৃত্তির তুলনায় সাহিত্যসেবা কম অর্থকরী হওয়ায় বাংলার যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সত্যিকার মেধাবী ও ক্ষমতাবান তাঁরা সাহিত্যের প্রতি তেমন আকর্ষণ বোধ করেন না। যে শক্তি সাহিত্যে নিয়োজিত হ'লে সাহিত্যের সবিশেষ পরিপুষ্টি হতে পারত, সেই শক্তি প্রায়শ অন্যত্র প্রযুক্ত হওয়ায় সাহিত্যের ভাগ্যে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধি ঘটে না। ফলে বাংলা-সাহিত্যকে সাধারণ বা মামুলী রচনার মান নিয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার নিরাকরণ করতে হ'লে শ্রেষ্ঠ মেধা ও শক্তির অধিকারী বাঙালী যুবক-যুবতীরা যাতে বাংলা-সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় সে ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করণীয়।

কথাটা ভাববার মত। বাংলার লেখক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সাধারণ শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক পুঁজির হিসাব নিলে এ কথার সত্যতা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বাস্তবিক আমরা অধিকাংশ সাহিত্যসেবীই হলাম মাঝারী স্তরের ক্ষমতাসম্পন্ন লোক। বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মেধা ও সৃষ্টিশক্তি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পর বাংলা-সাহিত্যে আর নিয়োজিত হয় নি। ঠিক সমস্তরের প্রতিভা হয়তো সাহিত্যের ইতিহাসে দু দিন বাদে বাদে কখনও আবির্ভূত হয় না, তবে সমপ্রকৃতির প্রতিভার আবির্ভাবে কোন বাধা নাই। প্রভূত মেধা ও সৃষ্টিশক্তির অধিকারী একাধিক ব্যক্তি বাংলা দেশে আজও আছেন ব'লে আমাদের বিশ্বাস; তবে আক্ষেপ এই যে, তাঁদের কেউ সাহিত্যসেবী নন। খুব সম্ভব নানা বিচিত্র অবস্থার যোগাযোগে যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁরা সাহিত্যেতর জীবিকার আকর্ষণে সাড়া দিতে গিয়ে সাহিত্যকে চিরকালের মত খুইয়েছেন। অন্য জীবিকার বেলায় যা লাভ, সাহিত্যের পক্ষে তাই ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান লেখকশ্রেণীর সৃষ্টিক্ষমতাকে খাটো করবার উদ্দেশ্যে এ কথা বলা নয়। কিংবা, সাহিত্যেতর জীবিকায় নিয়োজিত মানুষের ভিতর যে

গুণ নেই, কল্পনার দ্বারা সে গুণ তথায় অযথা আরোপ ক'রে তুলনায় লেখকগোষ্ঠীকে অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করতেও চাই না। একটি স্থির প্রতীতি থেকে উপরি-উক্ত মন্তব্যের উদ্ভব এবং সে প্রতীতিটি এখানে বিবৃতিযোগ্য। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, সাহিত্যবুদ্ধি ব'লে এমন বিশেষ কোন গুণ নেই, যা শুধু লেখকদেরই একচেটিয়া। এ গুণ অন্য অনেক মানুষের মধ্যেও সমান বিদ্যমান থাকা সম্ভব; শুধু চর্চার অভাবে তার স্ফুরণ হয় না—এইমাত্র প্রভেদ। সংসারজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যাঁরা স্বকীয় প্রতিভা ও মেধার বলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তাঁদের কারও কারও ভিতর স্বাভাবিক সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা ছিল না—এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁদের কেউ সাহিত্যকে জীবনকর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন নি; ভাগ্যের ষড়যন্ত্র তাঁদের অন্য বৃত্তির দিকে টেনে নিয়েছে। জীবনে কে কোন্ কর্ম গ্রহণ করবে, সেটা সব সময় প্রবণতার দ্বারা নির্ণীত হয় না, এর ভিতর ভাগ্যের হাতও অনেকখানি আছে। হয়তো ভাগ্যের বিধান অন্যরূপ হ'লে আজ যিনি শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বা অঙ্কবিদ বা উচ্চদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত সরকারী কর্মচারী রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হ'লেও হতে পারতেন। তবে যে হন নি এতে বোঝায় এই কথা যে, তাঁর শক্তি দ্বিধা বা ত্রিধা-বিভক্ত এবং তাঁর সহজ প্রতিভা ও প্রবণতা ওই দুই বা তিন দিকের যে কোন এক দিককে অবলম্বন ক'রেই স্ফূর্তিলাভে সক্ষম। শক্তির এই বহুধা বিকাশের ঝোঁক শক্তির অপ্রতুলতার চিহ্ন নয়, শক্তির প্রাচুর্যের লক্ষণ। এইরূপ বহুমুখী শক্তিকেই কার্যত প্রতিভা বলে। শক্তির এই বহুমুখিনতাকে একবর্ত্মাভিমুখী ক'রে যদি তাকে সম্পূর্ণ সাহিত্যে নিয়োগ করা যেত, সাহিত্য বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ হ'ত। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য, তা হয় নি। সাহিত্যেতর বৃত্তিগুলির আর্থিক ও অন্যবিধ আকর্ষণ এক্ষাধিক সাহিত্য-প্রতিভাযুক্ত শক্তিশালী ব্যক্তিকে সাহিত্য থেকে চিরতরে নিবৃত্ত ক'রে রেখেছে। আত্মোন্নতিকামীর পক্ষে বাংলা-সাহিত্যকে আশ্রয় ক'রে ব্যক্তিত্ববিকাশের অপরিমিত সুযোগ থাকলে এমন ঘটতে পারত কি না সন্দেহ।

এখানে আরও একটা কথা আছে। বাংলায় আজ যাঁরা সাহিত্যিক-রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত, তাঁরাই একমাত্র স্বাভাবিক সাহিত্যবুদ্ধির অধিকারী, আর কারও মধ্যে এ গুণ থাকা সম্ভব নয়—এ কথা মানতে গেলে বর্তমান বাংলার সাহিত্যবুদ্ধির মান সম্পর্কে বিশেষ উল্লসিত হওয়া চলে না। বরং এইরূপ মনে করাই যুক্তিযুক্ত যে, একালীন লেখকগোষ্ঠী ছাড়াও অন্য অনেকের মধ্যে সাহিত্যবুদ্ধি সমান বর্তমান, তবে লেখকদের মত তা সক্রিয় নয়—এই যা প্রভেদ। বাংলা দেশ সহজাত শিল্প ও কাব্য-প্রবণতার দেশরূপে খ্যাত। সুতরাং এ দেশে লেখনীসঞ্চালনকারীরাই একমাত্র শিল্পবুদ্ধির অধিকারী, আর কেউ এ জাতীয় বুদ্ধি দাবি করতে পারে না—এমন কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। দেশের সর্বত্র ও সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর সাহিত্য-বুদ্ধির পোষকতা বিদ্যমান; আমাদের জাতীয় শিল্পানুরাগের সঞ্চয়ের পরিমাণ নিতান্ত কম হবে না এবং তা ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত। তা যদি হয়, কেবলমাত্র শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যেই সাহিত্যবুদ্ধি সীমাবদ্ধ থাকবার যুক্তি গ্রাহ্য নয়। বাংলা দেশের শক্তির পুঁজি এখনও এতটা নিঃশেষ হয় নি যাতে মুষ্টিমেয়সংখ্যক লেখনীসঞ্চালনকারী ব্যক্তিদের সাহিত্য-বুদ্ধি সম্বল ক'রেই তাকে সাহিত্যের পথে অগ্রাভিযান করতে হবে। লেখক-পাঠক একত্র মিলিত হ'লে তবেই যেমন সাহিত্য-উপভোগের বৃত্ত পূর্ণ হয়, তেমনি সাহিত্যবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্ম অগোচর মানসিক আবহাওয়া দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত আছে ব'লেই কিছুসংখ্যক সাহিত্যবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে লেখনী সঞ্চালন সম্ভব এবং তদ্দ্বারা খ্যাতি অর্জনও সম্ভব। লেখককুলের বাইরে দেশে সাহিত্যশক্তি বর্তমান নেই—এ কথা মানলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মানতে হয় যে, দেশের ঘোরতর সাংস্কৃতিক দুর্দিন উপস্থিত।

উপরের যুক্তির প্রতিবাদে কেউ কেউ বলতে পারেন যে, বর্তমান বাংলা দেশে সত্যি সত্যি যাঁরা সাহিত্যকে জীবনকর্মরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁদের শক্তিমত্তা ও আন্তরিকতার ওইটেই সব চাইতে বড় প্রমাণ। তাঁদের ভিতর সাহিত্যসেবার আকাঙ্ক্ষা সুতীব্র না হ'লে তাঁরা কখনও

সাহিত্যকে মুখ্য জীবনকর্মরূপে বরণ করতেন না। সহজাত সাহিত্যবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা কর্মজীবনে সাহিত্যেতর জীবিকা গ্রহণ করেছেন, বুঝতে হবে তাঁদের ভিতর সাহিত্যবুদ্ধি যথেষ্ট প্রবল নয়। তাঁরা যে সাহিত্য ছেড়ে অন্য বৃত্তি অবলম্বন করেছেন তাতেই প্রমাণ, তাঁদের স্বভাবে সাহিত্যবুদ্ধির উপর অন্যবিধ মানসিকতার জিত। তাঁরা সব জেনে শুনেই বৈষয়িকতার দ্বারা তাঁদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুভূতিকে আচ্ছন্ন হতে দিয়েছেন। এটি আর যাই হোক, আন্তরিক সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক নয়। আর সাহিত্যানুরাগ না থাকলে যে সাহিত্য-সৃষ্টিও সম্ভব নয়—এ তো অতি স্বতঃসিদ্ধ।

প্রতিবাদীদের আর একটি বক্তব্য এই হতে পারে যে, নীরব কবি কথাটা যেমন অর্থহীন তেমনি নীরব লেখক কথাটাও অর্থহীন। যে ব্যক্তির স্বাভাবিক লিখন-কুশলতা আছে, তাঁর পক্ষে না লিখে স্থির থাকা অসম্ভব। জীবিকার তাগিদে তিনি বিজ্ঞান-সাধনাই করুন আর ব্যবসায়-বৃত্তিই অবলম্বন করুন, তাঁর সাহিত্যানুরাগ যদি যথেষ্ট পরিমাণ আন্তরিক হয় তাঁকে সব-কিছুর মায়া ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সাহিত্যের দ্বারস্থ হতেই হবে। সাহিত্যের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তিনি স্বীয় অধিকার বিষয়ে বড়ই সচেতন। সাহিত্যকর্মীকে তিনি আর কিছু করতে দিতে নারাজ। সাহিত্যভক্ত তাঁর ভক্তির নৈবেদ্যের ডালা বিনিঃশেষে দেবীকে নিবেদন করলে তবে দেবী তৃপ্ত; ভক্তের সপত্নীপ্রেম তিনি স্বীকার করেন না। স্বাভাবিক রচনানৈপুণ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা বৈষয়িকতার তাগিদে অন্য কর্মে লিপ্ত, শিল্প-সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চক্ষে তাঁরা অগ্রাহ্য। কে কী হতে পারত তাই দিয়ে মানুষের বিচার নয়, কে কী হয়েছে বা হতে পেরেছে সেইটেই আসল বিচার্য।

এই বক্তব্য সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারা যায় না। সত্য বটে আন্তরিক সাহিত্যানুরাগই বর্তমান সাহিত্যকর্মীদের সাহিত্যক্ষেত্রে টেনে এনেছে, তা ব'লে তাঁদের বাইরে আর কারও ভিতর সাহিত্যানুরাগ নেই এমন কথা বলা যায় না। ভিন্ন কর্মে লিপ্ত এমন একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারেন, যাঁরা গোড়া থেকে সাহিত্যসাধনায় নিয়োজিত থাকলে আজ

হয়তো খ্যাতিমান অনেক লেখকের খ্যাতিকেই ছাড়িয়ে যেতে পারতেন। আমরা যে প্রায়শ বাংলা-সাহিত্যের বর্তমান রচনার মানের অপকর্ষ নিয়ে অভিযোগ জানাই, সে কি মুখ্যত এইজন্যই নয় যে, বর্তমান বাংলা-সাহিত্য যথেষ্ট পরিমাণ গুণপনা নিজের দিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হচ্ছে না? মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকতাকার্যে যাঁরা নিযুক্ত আছেন, তাঁরা যেমন সে কার্যের যোগ্যতম প্রতিনিধি নন—মেজাজ ও মানসিকতার বৈশিষ্ট্যের দরুন স্বতই যাঁরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হতে পারতেন তাঁদের অনেকেই আজ অধিকতর লোভনীয় জীবিকার টানে কর্মান্তরে নিয়োজিত—তেমনি শ্রেষ্ঠ লেখক হবার সম্ভাবনাযুক্ত একাধিক ব্যক্তিই হয়তো আজ সাহিত্যেতর জীবিকায় ব্যাপৃত থেকে স্বকীয় উদ্যম তৎসংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় ও ক্ষয় করছেন। তাঁদের সেবার দ্বারা অন্যান্য জীবিকা লাভবান হয়েছে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির অভাবে বর্তমান বাংলা-সাহিত্যকে আজ নিতান্তই দ্বিতীয় শ্রেণীর গুণপনাসম্পন্ন কতকগুলি ব্যক্তিকে নিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। অধিকাংশ সাহিত্যকর্মীরই না আছে যেমন আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যার পুঁজি, তেমনি না আছে শ্রীমধুসূদন-রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বদৃষ্টি (world vision)। তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় বুঁদ হয়ে থাকার ছলে এঁরা জগৎ-সংসারের প্রাথমিক জ্ঞাতব্যগুলির সম্পর্কেও সংবাদ রাখবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন না। এঁদের ভিতর সকলেই আন্তরিক প্রাণের টানে সাহিত্যে এসেছেন—এ কথা সত্য নাও হতে পারে। হাতের কাছে আর কোন জীবিকা না পেলে লোক যেমন উপায়ান্তর না দেখে হোমিওপ্যাথির চর্চা শুরু করে, তেমনি তথাকথিত সাহিত্যকর্মী একাধিক ব্যক্তির নিকট সাহিত্য হ'ল অগতির গতি। এই দিক দিয়ে হোমিওপ্যাথ এবং শিক্ষকের সঙ্গে একালীন বাঙালী লেখক এক পর্যায়ে পড়েন।

কথাটা আপ্তবাক্য নয়। আধুনিক বাঙালী লেখকগোষ্ঠীর অধিকাংশের রচনা পড়লে ভুলেও মনে হয় না যে, বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কের শ্রেষ্ঠ দানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম—উল্টো, বার বাঁর

কেবলই মনে হতে থাকে যে, বর্তমানকালীন অবস্থায় যে ধরনের মনীষী উপজাত হওয়া সম্ভব তার শ্রেষ্ঠ নমুনাগুলি বাংলা-সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত নেই ; সাহিত্যেতর জীবিকাগুলি তাঁদের বিনিঃশেষে আপনার কুক্ষিগত ক'রে নিয়েছে। পূর্বে যে কথা একবার বলা হয়েছে সে কথা পুনরায় বলি, বর্তমান বাঙালী লেখকশ্রেণীর গুণপনা দিয়ে যদি বাংলার সৃষ্টিশীল প্রতিভার মানের পরিমাপ করতে হয়, নিরুৎসাহ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। শুধু কতকগুলি গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-নামধেয় হাল্কা জাতের প্রবন্ধ এবং কিছু দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা—এই কি আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সাকুল্য পুঁজি? চিন্তা ও কল্পনার যে বিভিন্নমুখী স্ফুরণ আমরা শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করেছি, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের সমগ্র পরিধির ভিতর কোথায় সেই দৃষ্টান্ত? মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মত নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টিশীল প্রতিভার অভ্যুদয় হয়তো দু দিন বাদে বাদে সম্ভব নয়, কিন্তু যে মনস্বিতা ও চিন্তার দ্যুতি উক্ত ত্রয়ী প্রতিভার মানসিকতার একটি বিশিষ্ট লক্ষণ, তার সমধর্মী গুণ কেন সারা আধুনিক বাংলা-সাহিত্য চুঁড়লেও খুঁজে পাই না? আধুনিক বাংলা-সাহিত্য চিন্তার দিক দিয়ে শোচনীয় ভাবে দরিদ্র। তথাকথিত সৃষ্টধর্মী রচনার আর্ট অতিরিক্ত মাত্রায় কচলাতে গিয়ে বাংলা-সাহিত্য তার সমৃদ্ধ মনস্বিতার ঐতিহ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে। সাহিত্যিক বলতে আজ এক শ্রেণীর কিম্ভূত জীবকে বোঝায়, জগৎসংসার সম্পর্কে যাঁদের ধারণা নৈরাশ্যকর ভাবে সীমাবদ্ধ, যাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি প্রায় ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক-ফেল-করা ছাত্রকেও হার মানায়, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীর পোষকতা দূরে থাক্, বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজও যাঁরা সর্বপ্রকার কুসংস্কার দ্বারা সমাচ্ছন্ন। তথাকথিত সৃষ্টিশীল গল্প উপন্যাস কবিতা রচনার ছলে এই সব সাহিত্যিক নামধেয় ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্যত মামুলী মধ্যবিত্ত বা গ্রামজীবনের ক্লেদ চটকান। এঁদের রচিত পল্লী-সাহিত্য পড়লে মনে হয় জলাডোবা খানাখন্দ গাছগাছালির বিবরণ, নাগরিক সাহিত্য পড়লে মনে হয় নিম্নমধ্যবিত্ত বউয়ের সংরক্ষিত মুদিখানা বা ধোপার হিসাব। দৃষ্টির যে

ব্যাপকতা ও ঔদার্য থাকলে সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্য হয় এঁদের অধিকাংশেরই রচনায় তার একান্ত অসদ্ভাব। সাহিত্যের এই যেখানে অবস্থা, সেখানে কেউ যদি সে অবস্থা চিন্তা ক'রে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবার মত যথেষ্ট মানসিক উদ্দীপনা নিজের ভিতর খুঁজে না পান, তা হ'লে তাঁকে তেমন দোষ দেওয়া যায় না।

আমরা কথঞ্চিৎ বিস্তারিত ভাবেই বাংলা-সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করেছি। সেটি আর কোন কারণে নয়, এই শুধু দেখাতে যে, যেখানে লেখকদেরই এই অবস্থা সে স্থলে পাঠকদের মান আর কত উন্নত হবে? কাজেই 'স্টেটসম্যানে'র প্রবন্ধ-লেখকের সংশ্লিষ্ট উক্তি অপ্রিয় হ'লেও অসত্য বলতে পারি না। সত্যই তো বাংলা-সাহিত্যের প্রধান ভোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক হ'ল অর্ধশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের দল। মেয়েরা বাংলা-উপন্যাস পড়েন না, গেলেন; আর আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার মান কতখানি উন্নত তা তো সকলেই জানেন।

বাংলা-সাহিত্যের লেখক-পাঠক সম্পর্কের বেলায় এ রকম না হয়ে বুঝি যায় না। প্রথমত, লেখকসম্প্রদায় তাঁদের অনগ্রসরতার দ্বারা পাঠকসম্প্রদায়কে পিছনে টেনে রাখছেন; দ্বিতীয়ত, পাঠকসম্প্রদায়ও তাঁদের অনগ্রসর রুচির দ্বারা লেখকসম্প্রদায়কে পিছনে ধ'রে রাখছেন। মার্ক্স-কথিত ব্যক্তি ও পরিপার্শ্বের সম্পর্কের মত এ ক্ষেত্রে একে অপরের দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। লেখকের শিক্ষা দীক্ষা রুচির দ্বারা পাঠকের শিক্ষা দীক্ষা রুচি নিরূপিত হচ্ছে; পাঠকের রুচিও তেমনি কঠোরভাবে লেখকের রুচিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করছে। ফলে কলেজ স্ট্রীটের বই-পাড়ায় আর মুগীহাটায় সত্যই কোন তফাত থাকছে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-কবিতার দুটি পংক্তি স্বতই মনে পড়ে: "যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।" বর্তমান বাংলা-সাহিত্যের লেখক-পাঠক সম্পর্ক নিরূপণে ও ব্যাখ্যায় এই বর্ণনা যে সর্বাংশে প্রযোজ্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

নারায়ণ চৌধুরী

# রজনী ঘনায় ঘন অরণ্য-তিমিরে

একদা হেরিনু আমি দুইটি নয়ন
গোপন রহস্যে ভরা যেন বা তারকা
গগনে জ্বলিছে কৃষ্ণ গভীর নিশীথে।
পলে পলে অনুপলে পোহায় প্রহর,
রজনী ঘনায় ঘন অরণ্য-তিমিরে।
পত্রে পত্রে মর্মরিয়া বহিছে পবন,
লক্ষ কোটি নৈশ জীব পতঙ্গ আকুল,
দুলিছে তরুর শাখা কুঞ্জে কুঞ্জে নত,
মুকুল ঝরিছে তলে শিশির সজল।
নবীন দুর্বার দল ঊর্ধ্ববাহু শ্যাম
লতারে ঘিরিয়া নাচে শিশিরে শিহরি,
লতিকা অধীরা কাঁপে থরথর হিয়া
অটবীবৃক্ষের মূলে অবশ পুলকে।
চাহিছে কিবা সে জানে প্রণয়িনী প্রাণ
দেহের মিলন মধু অথবা কোরক
পুষ্পিতা কোমল বক্ষে সৃজন মোহিনী?
তমাল তিমিরাবৃত মেঘগৃহ পিছে
রচিয়া বিলাসশয্যা মৃগচর্মে তনু
শায়িত বাহুর 'পর রাখি শির তার
আহ্বানে আমারে নারী অস্ফুট ভাষণে?
ধরার অনাদি রূপ সহসা ঝলকে
পলকে চিনিনু তারে প্রথমা প্রেয়সী।

—দেবাচার্য

## অর্থ ও ভাব

অর্থে ও ভাবে চলেছে লড়াই সারাটা দুনিয়া জুড়ে,
অর্থের সাথে যত অনর্থ আসিছে বিমানে উড়ে।
ভাবের খরচ ছাপায় কাগজে,
চড়ে আর বাড়ে মগজে মগজে;
অর্থ থাকে না বারুদে বোমায় ধোঁয়া হয় পুড়ে পুড়ে।
ব্যর্থ হতেছে অর্থ—ভাবই বাড়িছে দুনিয়া জুড়ে।

# সংবাদ-সাহিত্য

হলওয়েল-পরিকল্পিত কলিকাতার "অন্ধকূপ হত্যা"র অলীক কাহিনীর উপর বঙ্গদেশে যে রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, সম্ভবত ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আদমজী-পাটকল-হত্যার মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিবৃতির দ্বারাই বঙ্গদেশে সেই শাসনের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটিতে যাইতেছে। ১৯৩৫ সনের ভারত-সংবিধানের ৯২(ক) ধারার প্রবর্তন যে ইংরেজ কর্তৃত্বেরই জের, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ভয়ের কথা এই যে, ইংরেজ-জীবনসন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকান-জীবনপ্রভাতের রক্তরাঙা আভাসই হয়তো পূর্বদিগন্তে ফুটিয়া উঠিতেছে—ফজলুলহক-সুরাবর্দী-মহম্মদআলী-গোলামমহম্মদ ইঁহারা অসহায় নিমিত্তমাত্র; হৃদিস্থিত যে হৃষীকেশের যথানিয়োগমত কাজ হইতেছে, তাঁহার বর্তমান অবস্থান জানিতে হইলে আধুনিক পক্ষীরাজে চড়িয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইতে হইবে; বিশ্বপুতুল-নাচের যাবতীয় দড়ির প্রান্ত সেই এক হৃদয়ে জড়াজড়ি করিয়া জট পাকাইবার তালে আছে।

* * *

পাকিস্তান-মুখ্যমন্ত্রী বেতারে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা সংবাদ পাইয়াছেন মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানকে লেলাইয়া দিয়া পাকিস্তানের একতা বিনষ্ট করিবার জন্য শত্রুর চরেরা পূর্ববঙ্গে অতিশয় তৎপর আছে, তাহারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রদেশকে উস্কাইয়া দিয়া সর্বনাশ ঘটাইবার মতলব করিয়াছে; এই সকল গোপনচক্রীদের হীন চক্রান্তের ফলেই পূর্ববঙ্গে এই সকল শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

মহম্মদ আলী সাহেব স্পষ্টত নাম না করিলেও ওই "প্রদেশ" শব্দের প্রয়োগে তাঁহার ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরের গোলযোগ প্রবল হইলেই পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করা পাকিস্তান-রাজনীতির একটা স্থূল কৌশল। এই কৌশল কয়েকবারই সফল হইয়াছে, এবারও যে হইবে না—কে বলিতে পারে?

আনাতোল ফ্রান্সের সুবিখ্যাত 'পেঙ্গুইন দ্বীপে'র ভূমিকাটি আমাদের মনে পড়িতেছে। পেঙ্গুইনিয়ার প্রসিদ্ধ দার্শনিক জ্যাক্‌কট্‌-লিখিত

যে নীতিমূলক কাহিনীটি ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা শুনিবার মত। জ্যাক্‌কট্‌ বলিতেছেন ঃ

"পরবর্তী ড্র্যাকনাইডদের সময়ে দার্শনিক গ্র্যাটিয়েন পেঙ্গুইনিয়া পরিভ্রমণ করেন। একদিন তিনি একটি মনোরম উপত্যকা অতিক্রম করিতেছেন, বিশুদ্ধ বাতাসে গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে —তিনি একটি কুটিরসন্নিহিত ওকবৃক্ষের তলদেশস্থিত বেঞ্চিতে বসিলেন। কুটিরের দ্বারদেশে একটি নারী শিশুপরিচর্যায় রত, একটি ক্ষুদ্র বালক একটি বৃহৎ কুকুরের সঙ্গে ক্রীড়ারত, এক বৃদ্ধ অন্ধ রোদে বসিয়া অর্ধেক মুখ খুলিয়া দিনের আলো সেবননিরত।

কুটিরের মালিক এক তাগড়া জোয়ান, গ্র্যাটিয়েনকে রুটি ও দুধ ইচ্ছা করিতে অনুরোধ করিল।

পরপয়েজ দেশের দার্শনিক এই গ্রাম্য খাদ্য ভক্ষণান্তে বলিলেন, হে সুন্দর দেশের সুন্দর অধিবাসী, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এখানে সর্বত্র দেখিতেছি আনন্দ, মিলন ও শান্তির নিশ্বাস প্রবহমান।

তিনি এই কথা বলিতেছেন, এমন সময় একজন রাখাল বাঁশীতে যুদ্ধাভিযান-সঙ্গীত বাজাইয়া যাইতেছে দেখিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, ওই জীবন্ত সুরের তাৎপর্য কি ?

চাষী গৃহস্থ উত্তর দিল, ইহা পরপয়েজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধসঙ্গীত। এখানে সবাই উহা গাহিয়া থাকে। বাক্যস্ফূর্তি হইবার পূর্বে শিশুরাও এই সুর শেখে। আমরা যে সবাই খাঁটি পেঙ্গুইন।

তাহা হইলে তোমরা পরপয়েজদের পছন্দ কর না ?

আমরা তাহাদের ঘৃণা করি।

কি কারণে তাহাদের ঘৃণা কর ?

ইহা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? পরপয়েজরা কি পেঙ্গুইনদের প্রতিবেশী নয় ?

তাহাই বটে।

তবেই, পরপয়েজদের ঘৃণা করার ওই তো কারণ।

এইটি কি একটি কারণ হইতে পরে?

নিশ্চয়ই পারে। যে প্রতিবেশী, সেই শত্রু। আমার ক্ষেতের পাশেই ওই ক্ষেতটা দেখুন। উহার মালিককে আমি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা ঘৃণা করি। তাহার পরেই আমার ঘৃণার পাত্র হইতেছে এই উৎরাইয়ের ওপারে বার্চবনের পাদদেশের উপত্যকার গ্রামের মানুষগুলা। এই উপত্যকার দুই ভাগ, এক ভাগে আমাদের গ্রাম, এক ভাগে উহাদের, কাজেই উহারা শত্রু। আমাদের ছেলেদের সঙ্গে উহাদের ছেলেদের মুখামুখি হইলেই গালাগালি শুরু হয়, শেষ পর্যন্ত ঘুষাঘুষি। এই অবস্থায় আপনি কি চান পেঙ্গুইনরা পরপয়েজদের শত্রু থাকিবে না? স্বদেশপ্রেম কাহাকে বলে আপনি কি জানেন না? আমার ওষ্ঠে মাত্র দুইটি ধ্বনি—'পেঙ্গুইনদের জয় হউক' আর 'পরপয়েজরা নিপাত যা'ক।"

* * *

বৃদ্ধ জনাব ফজলুল হকের কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছি। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের কথা মনে পড়িতেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সপ্তদশ অশ্বারোহীর অধিনায়ক বক্তিয়ার খিলিজি বিংশ শতাব্দীর সমর-বিমান-বাহিত ইস্কান্দার মির্জা অপেক্ষা হয়তো ভয়ঙ্কর ছিলেন; কিন্তু লক্ষ্মণসেনের পলাইবার উপায় ছিল, ইচ্ছাও ছিল। বীর ফজলুল হক পলাইবেন না। তাঁহার অন্তরের বাণী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের জবানীতে আমরা শুনিতে পাইতেছি—

"আমি চন্দ্র দিবাকরকে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে, আমি ওই মুক্তির সমাচার প্রাণে প্রাণে শুনিয়াছি। মলয়পবন-স্পর্শে যেমন শীতার্ত তরুণ প্রাণে নবরাগের সঞ্চার হয়—প্রিয়জনসমাগমে যেমন বিরহীর প্রাণে আনন্দ-লহরী উথলিয়া উঠে—রণভেরী শুনিলে যেমন বীরহৃদয় তালে তালে নাচিয়া উঠে—ঐ স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আমারও প্রাণে তেমনি কি এক নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম। মাদৃশ হীন জনের নিকট এত বড় কথার অবতারণা কেন হইল? কিন্তু যখন দেখিলাম যে, আমি একেলা নই—আরও আমার মত পাগল আছে—তখন বুঝিলাম, আর এড়াইবার

উপায় নাই—এখন দল বাঁধিয়া মুক্তির রোল তুলিতে হইবে—যাহা গোপনে শুনিয়াছি, তাহা ভেরী বাজাইয়া বলিতে হইবে। আরও যখন দেখিলাম, স্বাধীনতার সংবাদ শুনিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা ক্ষেপিয়া উঠিতেছে—মুক্তির সমাচারে শত শত নরনারী সর্বস্ব ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছে, তখন বুঝিলাম—উদ্ধারের দিন সন্নিকট। আবার যখন দেখিলাম ফিরিঙ্গীভাবমুগ্ধ বাবুদের দল মুক্তির সংবাদ সহিতে না পারিয়া আমাদের কত কুৎসা রটাইতে লাগিল—নূতন ভাবের ভাবুকদের কার্যক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখনই রঙ্গ বাধিল—রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। ওরা যতই নিন্দা করে—তাড়না করে—ততই প্রাণে প্রাণে সিংহবল জাগিয়া উঠে—প্রাণ যায় সেও স্বীকার—স্বাধীনতার ধ্বজা আকাশে উড়াইবই উড়াইব। এ কি বাতুলের কথা! তোমরা আসিয়া দেখ—আমার মর্মস্থল চিরিয়া দেখ—মর্মে মর্মে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঐ কথাটি লেখা রহিয়াছে—স্বাধীনতা—মুক্তি—স্বরাজ।"

তাই বলিতেছিলাম, পূর্ব-পাকিস্তানে বৈদেশিক শাসনের অবসানের সূচনা দেখা গিয়াছে। অন্ধকূপ হত্যা দিয়া যাহা আরম্ভ হইয়াছিল, আদমজী পাটকল হত্যা দিয়া তাহার সমাপ্তি ঘটিতে চলিয়াছে। এখন আবার নূতন করিয়া নূতন বৈদেশিক শৃঙ্খলে না বাঁধা পড়ে, প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের সেই বিষয়েই সচেষ্ট হওয়া উচিত। নিরীহ উট নাক ঢুকাইবার অনুমতি মাত্র চাহিয়াছে, কিন্তু সে যে কত বড় নাক, সেই নাকের বদলে গোটা জানোয়ারটাই ঢুকিয়া যাইতে পারে—সে বিষয়ে গৃহস্থের পূর্বাহ্ণেই সজাগ হওয়া প্রয়োজন। নানা বিভ্রান্তকারী গোলযোগে এই আসল কথাটা ভুলিয়া গেলেই গৃহস্থের সর্বনাশ।

—

এই অর্ধ-শতাব্দীরও ঊর্ধ্বকালের জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া এই জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে, সংস্রব ত্যাগ করিলেই মানুষ পর হইয়া যায়, তা সে যত নিকট আত্মীয় বা বন্ধুই হউক। এমনও দেখিয়াছি, পুত্রের জন্য পিতার ভাবনার অন্ত নাই, অহরহ তাহার কল্যাণ কামনায়

পিতা দিনের আরাম ও রাত্রির নিদ্রায় বঞ্চিত হইতেছেন, অথচ পত্র বা মনিঅর্ডার যোগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকাতে পুত্র বেয়াড়া বিবাহ করিয়া পর হইয়া গিয়াছে, মধ্যবর্তী অভিমানের সমুদ্রে আর খেয়া চলে না। আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষও যে কার্যকরীভাবে এই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, ছাত্র শিক্ষক অধ্যাপক ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁহার ঘন ঘন মিলন-মুলাকাতের দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। দীর্ঘকাল এই যোগাযোগ না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সহজ সুন্দর সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল, তাঁহারা পরস্পর পর হইয়া প্রত্যক্ষত না হউক, পরোক্ষত শত্রুতা সাধন করিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে-ছাত্রে স্নায়ুযুদ্ধও চলিতেছিল। ঘোষ মহাশয় আসিয়া সহানুভূতির সহিত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া অতি অল্পকালেই একটা সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপন করিয়া দেখাইতে সক্ষম হইতেছেন যে, মধুর সহযোগিতার সম্বন্ধই স্বাভাবিক। যে বিপদ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া ঘন ঘন বাংলা দেশের উপর দিয়া আবর্তিত হইতেছিল এবং যাহার ফলে জাতিগতভাবে অকারণে আমাদের শক্তিক্ষয় হইতেছিল, আশা করি, অতঃপর সে বিপদ আর আসিবে না, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের শেষ বেয়াড়াপনার সঙ্গেই তাহার অবসান ঘটিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় অবনতি ঘটিয়াছে, প্রতিযোগিতা-মূলক কোন পরীক্ষাতেই ( সর্বভারতীয় ) তাহারা দাঁড়াইতে পারিতেছে না, শিক্ষার মান এত নামিয়া গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস শুনিলেই কর্তারা ঠোঁট উল্টাইয়া উপহাস করেন। ইহা যে শুধু ছাত্রদের নিজেদের অবহেলার জন্যই ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক শিক্ষাও রাহুগ্রস্ত; শিক্ষা সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠিয়াছে, ব্যক্তিগত দরদ দিয়া অধ্যাপকেরা অধ্যাপনা করেন না; শিক্ষা হাটের মাঝে নিলাম-ডাকে পর্যবসিত হইয়াছে। গুরুরা সর্বদাই টু-পাইসের তালে আছেন এবং ছাত্ররা "চলবে না, চলবে না" চিৎকার করিয়া নিজেদের সর্বনাশকেও ঠেকাইতে পারিতেছে না। বাঙালী ছেলেদের "জেনারেল নলেজ" বা সাধারণ জ্ঞানের শোচনীয় অভাবের দৃষ্টান্ত

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কর্তারা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু ছাত্রে-অধ্যাপকে সম্পূর্ণ অসহযোগ ঘটিলে সাধারণ জ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? দেখিয়া আশান্বিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রস্তুত করিবার দায়িত্বও গ্রহণ করিতেছেন। অবাঞ্ছিত মতলববাজদের হাতে কোমলমতি ছাত্রদের সম্পূর্ণ ডালি না দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় অধ্যাপকেরা যদি ছুটির পর ছাত্রদের লইয়া কিছু সময় যাপন করেন, তাহা হইলে আজকালকার বিপজ্জনক পলিটিক্স-শিক্ষাই কল্যাণপ্রসূ হইতে পারে। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের প্রাথমিক কাজেই আমরা এই কল্যাণের সূচনা দেখিতেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা তাঁহার সহযোগিতা করিলে অদূরভবিষ্যতে আধুনিক হীনতা ও দুর্দশার পঙ্ক হইতে বাংলা দেশের তরুণেরা নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে।

* * *

এই অসহযোগজনিত দুর্দশা বাংলা দেশের কংগ্রেসের কার্যক্ষেত্রেও লজ্জাকরভাবে প্রকট হইয়াছিল। ফলে কর্মীর একান্ত অভাবে কংগ্রেস পীড়িত হইতেছিল। দেখিতেছি, এদিকেও কর্তাদের কিঞ্চিৎ দৃষ্টি পড়িয়াছে। কর্মীদের সহিত এবং তাঁহাদের মধ্য দিয়া দেশের জনসাধারণের সহিত নষ্ট সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে আমরা লজ্জা ও ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ সভায় সমিতিতে সাধারণ মানুষের মুখামুখি দাঁড়াইবার সাহস হারাইয়াছেন। সে সাহস ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে, এবং ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়াই ঘন ঘন পরাজয় বরণ করিতে হইতেছে না। সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া পৃথিবীর জার জারিনা কাইজার সীজার কেহই শেষ পর্যন্ত টিকিতে পারে নাই—ইতিহাসের এই মহাশিক্ষা অতি সাধারণ কর্মীরাও যদি ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে দেশের সমূহ বিপদ। আবুহোসেনীর অবকাশ অবশ্য সর্বত্রই আছে, কিন্তু তাহা মাত্র একরাত্রির জন্য।

—

গত সংখ্যায় পঞ্চবার্ষিক-পরিকল্পনা আলোচনা করিতে গিয়া পঞ্চদশবার্ষিক শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বলিয়াছিলাম। সিঁড়ি নির্মাণ না করিয়া ছাতে বাগান রচনা করিলে পরিচর্যার অভাবে বাগান শুকাইয়া যাইতে বাধ্য। বহু বৎসরের বহু চেষ্টার ফলেও যে দেশের লোক নিজের কল্যাণে এখনও বসন্তের টীকা লইতে শিখিল না, সে দেশে বাঁধের বা ক্যানেলের জল লওয়াইতেও যে শিক্ষার প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ তাহা স্মরণে রাখেন নাই বলিয়াই বীরভূমে বিপদে পড়িয়াছেন। টীকায় তবু পয়সা লাগে না, কারণ টীকার বীজের দাম যৎসামান্য। কিন্তু বাঁধ বা ক্যানেল বজায় রাখিতে হইলে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন, প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে দীর্ঘকাল জল খয়রাতি করা সম্ভব নয়। এক বৎসর তাঁহারা তাই করিয়াছেন এবং জল লওয়ার ফল যে শুভ হইয়াছে চাষীরা তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেও, তবু এই দুই বৎসর সামান্য ট্যাক্স দিয়া তাহারা জল লইতেছে না। "এলোমেলো ক'রে দে মা"র দল ইহাদের শিখাইতেছে, পয়সা দিয়া জল লইও না; জল জমিয়া গেলেই কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হইয়া জল ছাড়িতে হইবে, যাহা আপ্‌সে পাইবে তাহার জন্য খরচ করিবে কেন? এই সর্বনাশা শিক্ষার প্রতিবিধান করিতে হইলে চাষীদের সর্বপ্রথম বর্ণ-পরিচয়, বোধোদয়, কথামালার শিক্ষাই প্রয়োজন। মাত্র পাঁচ বৎসর তাহারা এই শিক্ষা পাইলে যে নিজেদের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিবে—এ কথা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। যাহারা তাহাদিগকে এখন নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিতে শিখাইতেছে, তাহাদিগকে তখন ইহারাই বলিতে পারিবে, ইহা নিজের নাক কাটিয়া নিজেরই যাত্রাভঙ্গ, এই কাজ আমরা কিছুতেই করিব না। পর্বতপ্রমাণ অশিক্ষার মাঝখানে মতলববাজেরা আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছে। তাহাদিগকে দূর করিতে হইলে ওই অশিক্ষার ভূতটাকে আগে তাড়াইতে হইবে। তাই বলিয়াছিলাম, বিদ্যুৎ, জলসঞ্চয়, জলসেচন প্রভৃতি বড় বড় পরিকল্পনা মুলতুবি রাখিয়া গোড়ার পনের বৎসর সাধারণ অ-আ-ক-খ শিক্ষার পরিকল্পনাই কাজে লাগানো হউক। দেশের হালচাল আমাদের বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্বাপেক্ষা ভাল বুঝিতেন, তাই 'আখ্যানমঞ্জরী'র অধিক

তিনি অগ্রসর হন নাই। আমাদের সরকার ঘোড়ার আগে গাড়ি জুতিয়া বসিয়াছেন, তাই বীরভূমের ক্যানেল-পথে জল প্রবাহিত হইতেছে না।

—

উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ ও আসামের ভাষা মূলত এক, রেডিওতে যাঁহারা বাংলা আসামী ও ওড়িয়া সংবাদ শুনিয়া থাকেন তাঁহারাই এ কথা প্রত্যহ অনুভব করিয়া থাকেন। আসামী ও বাংলার অক্ষরও প্রায় এক; ওড়িয়া বর্ণের কিছু তারতম্য ঘটিয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও উড়িষ্যার জননায়ক শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব বিশেষ বিবেচনার সহিত তিন ভাষার অক্ষরের একত্ব বিধান করা যায় কি না তাহার চেষ্টা করিতেছেন। সর্বসম্মতিক্রমে ইঁহাদের প্রস্তাব কার্যকরী হইলে এই তিন ভাষার সাহিত্যও পরস্পর সহযোগিতায় দ্রুত পুষ্টিলাভ করিবে এবং প্রত্যেক গ্রন্থের পাঠকের সংখ্যা একেবারে প্রায় তিনগুণ বাড়িয়া যাইবে। সংস্কৃত বা দেবনাগরী ভাঙিয়াই তিন ভাষারই অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছে। দেবনাগরীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অক্ষরের সামান্য সামান্য পরিবর্তনে যে শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় একত্ব সম্পাদন সম্ভব, বাংলা আসামী ওড়িয়া এই তিন ভাষার লিখনপদ্ধতি এক হইলে সেই সত্যটাও প্রমাণিত হইবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত বিশেষ যত্নের সহিত এই অক্ষর-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এই চেষ্টা সফল হইলে ভারতের পূর্বাচল-সাহিত্য পূর্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধ হইবার অবকাশ পাইবে।

—

পঁচিশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে 'শনিবারের চিঠি'তে যখন "নকুড় ঠাকুরের আশ্রম" নামক উপন্যাস বাহির হইতেছিল, তখন পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রম 'ঋত্বিক' বাহির করিয়া 'শনিবারের চিঠি'র শ্রাদ্ধাধিকারী হইয়াছিলেন। দেখিতেছি, দীর্ঘ শতাব্দীপাদের গভীর সাধনার পরও সৎসঙ্গের রুচি পরিবর্তিত হয় নাই। ১৩৬১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ হইতে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদপূত 'ঋত্বিক' বহু বহু বৎসর পরে পুনরায় সৎসঙ্গ আশ্রম হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অলৌকিকের মোহে ইঁহারা

লৌকিক বা পার্থিব বস্তুকে বিস্মৃত হন না। ইহাই ইঁহাদের বিশেষত্ব। মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা করিতে গিয়া 'ঋত্বিক' একটি প্রশ্নচিহ্ন অর্থাৎ "?" শিরোনামায় 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

"?

আরেকটি নাম উল্লেখ করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বৎসরের প্রথম দিনটিতে ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হইতেছে না।

এতকাল পরে আবার বালখিল্যের নর্ত্তন কুর্দ্দন দেখিয়া কিছুটা কৌতুক বোধ করিতেছি।

চৈত্রের প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সজনে ফুল ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। এখন রস শুকাইয়া তার ডাঁটা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। রোগক্ষত গো-বীজের অনুরূপ সত্যফলোদায়ী এই রসকসহীন সজনের ডাঁটাও রোগাতঙ্কদের কাছে সমাদর লাভ করিতেছে। ঋতুকালীন বিশ্রী ক্ষতসৃষ্টিকারী কুৎসিৎ ব্যাধি যাহারা এড়াইতে চান তাহারা হয় টীকা না হয় সজনের আশ্রয় লইতেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে শনিও কুপিত হইয়া উঠিয়াছে। এতকাল নীচস্থ থাকিয়া আবার স্বস্থানে যাইয়া স্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহাই নাকি স্বাভাবিক! কাঁকের রিপোর্টে প্রকাশ, 'ভাদ্র এবং চৈত্রের কিস্তি দুইটি নাকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একটু সামলাইয়া লইতে হয়, তা না হইলে বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে'।

এখন তুষারাধিকৃত একমাত্র উমানাথই যা ভরসা।"

আমাদের অপরাধ, আমরা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বিষয়ক কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়াছিলাম, তুষারকান্তির অপরাধ তিনি আমাদের মন্তব্যে কিঞ্চিৎ সজাগ হইয়াছিলেন এবং উমানাথ-[ উমাপ্রসাদ ]-এর অপরাধ তিনি একটি পত্রযোগে সৎসঙ্গ-প্রচারিত সংবাদের ভ্রান্তি উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। এই সামান্য ব্যাপারে সৎসঙ্গই যদি এতখানি উদ্বেজিত হন, তাহা হইলে অসৎসঙ্গীরা না জানি কি করিবে! ঠাকুর ইঁহাদের সুমতি দিন।

—

অনেকগুলি ভাল বইয়ের খবর অনেকদিন ধরিয়া শুনাইব শুনাইব করিয়াও শুনানো হয় নাই, এ দিকে বইগুলি পুরাতন হইয়া আসিল। 'উপনিষৎ' দিয়া প্রায়শ্চিত্ত শুরু করি। সাময়িক পত্রে চিত্রিতা দেবীর উপনিষদের কাব্যানুবাদ অনেক দিন হইতেই লক্ষ্য করিতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, মাঝে মাঝে বাংলা ছন্দে কিছু কিছু উপনিষৎ পরিবেশন আমাদের "বনফুলে"র মত তাঁহারও একটা খেয়াল। দু-দশ মাস অন্তর "বনফুল" 'ঈশ কেন কঠ'র এক-আধ কিস্তি ছাড়েন, সম্পূর্ণ কোনও উপনিষৎ তাঁহার সক্ষম হাত হইতে এখনও আমরা পাই নাই। এখন দেখিতেছি চিত্রিতা দেবীর খেয়াল নয়, সাধনা। তিনি ঈশ, কেন, কঠ উপনিষদের অনুবাদ সম্পূর্ণ করিয়া পণ্ডিত ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের "প্রাক্ কথন", নিজের ভূমিকা ও সমগ্র মূল সহ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পরিবেশক এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ। সাতকড়িবাবু আসল বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন—"মূলের অর্থ যথাসম্ভব প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।" ছন্দ এবং মিল সর্বত্র নিখুঁত হয় নাই, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ সুরটা ঠিক আসিয়াছে। উপনিষৎ বলিতেই যাঁহারা চোখ উল্টাইয়া শিবনেত্র হন, তাঁহারা এই 'উপনিষৎ'খানি নাড়িলে-চাড়িলে অনেকটা আশ্বস্ত হইবেন; একাদশ উপনিষদের বাকি আটও ছন্দোবদ্ধ বাংলায় চিত্রিতা দেবীর নিকট আশা করিতেছি।

'ধম্মপদং'এর যে বুদ্ধঘোষ-ভাষ্য সমেত অনুবাদ সম্প্রতি কলিকাতা প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এতাবৎকাল এই মহাগ্রন্থের যত বাংলারূপ দেখিয়াছি তন্মধ্যে তাহা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। আচার্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী এই সুন্দর সংস্করণটি অনুবাদ ও সম্পাদন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি পদের মূল, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিচিতি দেওয়া হইয়াছে। পালির সংস্কৃত রূপ সঙ্গে সঙ্গে দিলে সংস্করণটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইত।

সি. সি. বসাক এণ্ড সন্স আর দুইটি অনুবাদ-কাব্য আমাদিগকে উপহার দিয়াছেন, কালিদাসের 'মেঘদূত' এবং ফিট্‌জেরাল্ডী 'ওমর

খৈয়াম'। কাব্যানুবাদক "স্পর্শমণি"; স্পর্শমণির স্পর্শে সকল পদ সোনা না হইলেও সোনার রঙ ধরিয়াছে। রুবাইগুলিতে পূর্বাপর ছন্দসমতা বজায় না রাখাটা দোষের হইয়াছে। 'মেঘদূত' ও 'ওমর খৈয়াম'-এর অসংখ্য অনুবাদ বাংলায় হইয়াছে। এই দুইটিও সচিত্র উপহারোপযোগী সংযোজন।

দামোদর গুপ্তের 'কুট্টনীমতম্' বাহির করিয়াছেন বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির। সটীক অনুবাদ যোজনা করিয়াছেন অধ্যাপক ত্রিদিবনাথ রায়। কামসূত্র, অনঙ্গরঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় এই পুস্তকখানিও আমাদের দেশের প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে মহামূল্যবান। ত্রিদিববাবু নিষ্ঠা ও যত্নসহকারে মাতৃভাষায় ইহার দুরূহ রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাঁহার অনুবাদ পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ প্রাঞ্জল। শ্লোকগুলির ছন্দানুবাদে তিনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য আরও একটু যত্নের সহিত করা উচিত ছিল এবং সাধারণে ইহা পরিবেশন ব্যাপারেও কিছু সতর্কতা প্রয়োজন।

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড 'গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দি বিরচিত রাম চরিত'-এর ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাককৃত সটীক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আট শত বৎসর পূর্বের রাজা রামপালের এই চরিতকাব্যখানি বাংলা দেশের ইতিহাস বিষয়ে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ। ঐতিহাসিক জীবনচরিত-বিষয়ক এরূপ কাব্য আর নাই। এই পুস্তকের কয়েকটি সংস্করণ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ডক্টর বসাক সকলগুলির সুযোগ গ্রহণ করিয়া এতদিনে একটি নির্ভুল নির্ভরযোগ্য সংস্করণ বাহির করিলেন। মূল শ্লোকের সঙ্গে অন্বয়, শব্দার্থ, অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। "অবতরণিকা"য় বহু কাজের কথা আছে।

জীবনালেখ্য ও চরিতকথা বিভাগেও বাংলা-সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। তিনটি একান্ত প্রয়োজনীয় জীবনচরিত বাজারে পাওয়া যাইতেছিল না; প্রকাশকেরা সেগুলির পুনর্মুদ্রণ করিয়া নিষ্ঠা ও সহৃদয়তা দেখাইয়াছেন। সিগনেট প্রেস প্রকাশ করিয়াছেন আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'—এই প্রসিদ্ধ বইখানি

এতদিনে ভদ্র সুষ্ঠু চেহারা পাইয়াছে। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 'আত্মচরিত' পুনর্মুদ্রিত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বসুর পরিচয় লিখিয়াছেন শ্রীহরিহর শেঠ। আধুনিক বাংলা দেশ তথা ভারতের রচনা ও গঠনে এই তিন মনীষীর দান অবিস্মরণীয়। ইঁহাদের কথা ইঁহাদের নিজেদের মুখেই যে শুনিতে পাইতেছি, ইহা আমাদের সৌভাগ্য।

শ্রীসুশীল রায়ের 'মনীষী-জীবনকথা' দুই খণ্ড ও ঋষি দাস কৃত রমা রলাঁর 'বিবেকানন্দ-জীবনে'র অনুবাদও ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি বাহির করিয়াছেন। বাংলা দেশের আধুনিক মনীষীদের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ স্পর্শ আমরা 'আনন্দ-বাজার-পত্রিকা'র মারফত কিছুদিন হইতে পাইয়া আসিতেছিলাম, সেইগুলিকেই দুই খণ্ডে একত্র দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। কুড়ি জন জীবিত ( ইতিমধ্যেই তিন জন গতাসু হইয়াছেন ) বাঙালী প্রধানের মোটামুটি পরিচয় দিয়া সুশীলবাবু দেশপ্রেমিকের কাজ করিয়াছেন। তাঁহার রচনা চমৎকার—একটু বস্তু-বিরল ও ভঙ্গিপ্রধান হইলেও অন্তর্নিহিত মানুষটির সন্ধান দেয়। মনীষীদের নাম করিবার প্রয়োজন নাই। বাঙালীর সৌভাগ্যগুণে যাঁহারা এখনও টিকিয়া আছেন, তাঁহারা প্রায় সবাই আছেন। ঋষি দাসের অনুবাদের উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত, তাঁহার রলাঁর রামকৃষ্ণ মৌলিক রচনার মত সুখপাঠ্য হইয়াছিল, এটিও তাহাই হইয়াছে।

সিগনেট-প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' একখানি মনোরম জীবনী-কাব্য, ইতিমধ্যেই এত প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে যে এ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, বাহিরের রূপ অতিশয় রুচিসম্মত।

"'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" প্রসঙ্গে' শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অচিন্ত্যকুমারের পুস্তকের কয়েকটি তথ্যের ভুল নির্দেশ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক প্রভাতবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তথ্য বা সত্য কবি অচিন্ত্য-কুমারের উপজীব্য নয়, তাঁহার কৃতিত্ব কাব্যে ও তত্ত্বে।

'বাঙলা দেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ' স্বামী বেদানন্দ লিখিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ

বেদান্ত আশ্রম দার্জিলিং হইতে প্রকাশিত। বইখানি আসলে বাংলা দেশের আধুনিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার পরিকরদের পটভূমিকায় এই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইলেও বইখানিতে অনেক খবর আছে।

'বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন' রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ( ভাস্কর )—ইহা তাঁহার পিতৃদেব গোপালচন্দ্র ঘোষের পুণ্যস্মৃতি অবলম্বনে লিখিত। গোপালচন্দ্র যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তাহার প্রমাণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি সংস্কৃত শ্লোকে গ্রের এলিজির সম্পূর্ণ অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। এলিজির বাংলা অনুবাদও করিয়াছিলেন, যাহার ১০নং স্তবক তাঁহারই উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হইতে পারে।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত রচিত ও প্রকাশিত 'শ্রীনিত্য-গোপাল দর্শনে ও জীবনে'—নিত্যগোপালের জীবনের গূঢ়তত্ত্বকথায় সমৃদ্ধ, ভক্তজনের সমাদর লাভ করিবে।

নিছক সাহিত্য, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা ও সমালোচনা-সাহিত্য যাহা আমরা পাইয়াছি তাহার সংখ্যা অনেক; কাব্য ও কথা-সাহিত্যেরই আয়তন বিপুল। সেগুলির এবং প্রবন্ধ পর্যায়ের যাহা বাকি রহিল তাহার পরিচয় আগামীবারের জন্য মুলতুবি রাখিয়া ক্লাসিক্স্ পর্যায়ভুক্ত "বঙ্কিম রচনাবলী" দিয়া শুরু করি। সাহিত্য-সংসদ প্রথম খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস—জীবনী ও উপন্যাসের পরিচয়সহ প্রকাশ করিয়াছেন। স্বল্পপরিসরে এমন চমৎকার কাগজে ছাপাই বাঁধাই দিয়া এমন করিয়া বঙ্কিমকে আগে কেহ ছাপেন নাই। মূল্যও যথাসম্ভব কম, অবশ্য এই বাজারের পক্ষে। ইহারা অচিরাৎ ২য় খণ্ড প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমকে সম্পূর্ণ করিবেন—এই আশায় রহিলাম।

ডক্টর সুশীলকুমার দের 'নানা নিবন্ধ' ( মিত্র ও ঘোষ ) সাহিত্যের অতি প্রয়োজনীয় ইতিহাস ও বিশ্লেষণ গ্রন্থ। মূলত ইহার দুই ভাগ, সংস্কৃত-সাহিত্য ও বাংলা-সাহিত্য। সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে যে কয়টি বিষয় বাছা হইয়াছে তাহাদের প্রভাব বাংলা-সাহিত্যের উপর

খুবই বেশি, সুতরাং বইখানি বাংলা-সাহিত্য-অনুশীলনকারীদের পক্ষে অপরিহার্য। বৈদিক সাহিত্য হইতে অক্ষয় বড়াল পর্যন্ত আলোচিত হইয়াছে; অর্থাৎ বিষয়বস্তু শুধু নানা নয়, বহুব্যাপক। এই বইখানি প্রকাশে ডক্টর দের মত রসিক পণ্ডিতের গভীর চিন্তাধারা সাহিত্যের সকল ছাত্রের সহায়ক হইবার অবকাশ পাইল।

বাংলা-সাহিত্যের তিনখানি ইতিহাসও আমরা পাইয়াছি—তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্য' (দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিমিটেড), অনিল বিশ্বাসের 'বিংশ শতকের বাংলাসাহিত্য' প্রথম খণ্ড উপন্যাস (জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স লিমিটেড) এবং ভূদেব চৌধুরীর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' (বুকল্যাণ্ড লিমিটেড)। অনিল বিশ্বাসের বইখানির উপকরণ সম্পূর্ণ আধুনিক এবং তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গিও প্রশংসনীয়, কিন্তু তাঁহার কাজ এখন পর্যন্ত সমিধ-সংগ্রহ পর্যায়েই আছে। যাহা চলিতেছে তাহার সম্বন্ধে পাকা কথা বলিতে হইলে আরও অপেক্ষা করিতে হইবে। তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বাংলা-সাহিত্যের অনুবাদ শাখা, মঙ্গলকাব্য শাখা, পদাবলী শাখা ও বৈষ্ণব জীবনচরিত শাখা আলোচনা করিয়াছেন। বইখানি সুলিখিত, ছাত্র-সমাজের বিশেষ কাজে আসিবে। ভূদেব চৌধুরীর প্রয়াস ব্যাপকতর,—তিনি একেবারে আদি চর্যাপদের যুগ হইতে বিংশ শতাব্দীর লোক-সঙ্গীত পর্যন্ত আসিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি আদিযুগ ও মধ্যযুগের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়াছেন, চণ্ডীদাসকে লইয়া পুরা তিন অধ্যায় লিখিয়াছেন। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে যেখানে যেখানে সঙ্কট ও সন্দেহ, সেখানে সেখানে তিনি দাঁড়াইয়া পড়িয়া বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন, এড়াইয়া যান নাই। তাঁহার বইখানিও বিশেষভাবে ছাত্রসহায় হইবে।

---

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন: বড়বাজার ৬৫২০

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৯

# আনার-কলি

[ আনার-কলি বাদ্‌শাজাদার মন কাড়িল ব'লে
পায় যে সাজা জিন্দাকবর ইন্দারারই জলে।
মুখটি তাহার বন্ধ করে পাথর গেঁথে দিয়া,—
কি কুক্ষণেই প্রথম দেখা হায় সেলিমের প্রিয়া!
সুয়োরাণী করবে ব'লে আনার-কলিকে
দিয়াছে তায়, বুকের রক্তে প্রতিশ্রুতি লিখে।
মারা গেলে আনার-কলি পৌঁছিল খবর,
কসুর দোঁহার মাফ করেছেন দিল্লীর ঈশ্বর। ]

কেন আনার বাদশাজাদায় বাড়িয়েছিলে পাণি?
বাদশাহী মস্‌নদে তোমার লোভ ছিল না জানি।
কিন্তু তোমায় আকবর শা করেন অপছন্দ,—
অভিশপ্ত হ'ল গুপ্ত প্রণয়-সনন্দ।
কেন সেলিম রূপের ভোজে হারিয়েছিলে দিল্?
বুঝতে তুমি ভুল করিলে কোন্ ঠাঁই গরমিল।

কে আসে ঐ অশ্বারোহী? শাহজাদাই বটে,
যোদ্ধার সাঁজোয়া প'রে খবর নিয়ে ছোটে।
আচম্বিতে বাহনটি তার পথের মাঝে লোটে,
খবর দিতে দেরি হ'লে কলির মৃত্যু ঘটে।
কলির শোকে রোষে-ক্ষোভে বিদ্রোহী উন্মাদ,
গর্জে সেলিম,—"জল্‌দি তোড়ো ইন্দারার ছাদ।
আনার-হারা শাহজাদার জীবন যে বরবাদ,
কলিজাতে কলির ভালবাসার বুনিয়াদ,
কবর খুঁড়ে উঠছে গো তার শেষের ফরিয়াদ,
জীবিত, না, মৃত কলি, কোথায় রে জল্লাদ?"

[ গোরের ছাদে ফুটো করে সহস্র কর্ণিক,
সেলিম-হৃদে বিষ বিঁধিছে আশঙ্কা-বৃশ্চিক। ]
"আছে আনার বেঁচেই আছে, শোনাও সুখবর
মোদের কসুর মাফ করেছেন বাদশাহ আকবর।
শাহজাদার প্রেমে প'ড়ে আর এক কিশোরী
ভাবছে ব'সে কলি হবে দিল্লীর ঈশ্বরী।
কলির বাহু আলিঙ্গিবে সেলিমকে আমার!
পরাবে মোর প্রাণেশ্বরে বরণ-ফুল-হার!
যার সাথে মোর চলত কথা রাতের স্বপনে,
দুপুর-রোদে লুকোচুরি কুঞ্জ-গোপনে।···
খাওয়াবে সে বিষের লাড়ু সতীন হ'লে আনার,
দাঁতে অধর চেপে ধরে মুখের কী বিকার!
ঈর্ষায় তার বুক জ্ব'লে যায়, কাঁদে গো ডুকরিয়া
'লাউ-ডগা' সাপ লেলিয়ে দেব, চোখ নেবে খুব্‌লিয়া।
আমি যারে বাসি ভাল তাহার পরে আর
নাইকো কারো দাবি-দাওয়া সাদির অধিকার।
সেনাপতির বেটী আমি 'কুল্‌দীপ' নাম মোর,
টুকরো টুকরো কেটে দেব গোপন রাখী-ডোর।
সেলিম-সোহাগিনী হবে কলি আমায় ঠেলে?
পাগ্‌লা হয়ে যাবে সেলিম কলি মারা গেলে।···

আজো আনার বেড়ায় ঘুরে রাবীর সে সৈকতে,
গাহে আশাবরীর সুরে ফুলবাগিচার পথে।
হঠাৎ কেহ পায় দেখা তার, কাঁদে আঁখি মুদে'
অঙ্গ মাজে রাবীর জলে কৌমুদী-বুদ্‌বুদে।
তেমনি ক'রে আজও হাওয়া কয় গো কানে-কানে,—
"কই পেলে তায় যাহার সাথে মিশলে প্রাণে প্রাণে!

মাতায় যাহার ভালবাসার 'বসন্ত-বাহার',
মনে রেখো অতিবড় শত্রু সে তোমার।
তারই হাতে ছিল তোমার জীবন-মরণ-কাঠি,
আস্‌রফিতে ভালবাসার সোনাটুকুন খাঁটি।
মুঘল আদালতের বিচার—বংশ না-মঞ্জুর।
কলির দাবি নাই পশিতে শাহী-অন্তঃপুর।
ভাঙতে সে চায় অভিজাত-রক্তের কৌলিন্য,
অবৈধ প্রেম অপরাধে নাই ক্ষমা-দাক্ষিণ্য।
হাতে-নাতে ধরা প'লে নাই কারও রেহাই,
এই কাল-রাক্ষসের গ্রাসে অব্যাহতি নাই।
বিচারকের নিক্তি কাঁপে উচিত সাজা দিতে,
চোর খোলা পায় খিড়কি-দুয়োর চৌরীর ইঙ্গিতে।
প্রাণদণ্ডের আদেশ হ'ল, দেবেন পুত্র-বলি,
রুদ্ধশ্বাসে জিন্দাকবর সইবে আনার-কলি।
রে জল্লাদ, জল্‌দি এস, কাটো যুবরাজে,—
সে কহে—"মাফ করুন হুজুর পাঁজরে শূল বাজে।"
বাদশা আসেন খাঁড়া হাতে দেখেন গো পুত্রকে,
হাতের খাঁড়া পড়ল খ'সে হঠাৎ মুহূর্তেকে।
'সোরাব ও রুস্তমে'র যুদ্ধ পড়ল মনে তাঁর,
পুত্রবধে আত্মহত্যা,—গলে স্নেহের ধার।
কেন সেলিম ভালবাসা করিলে স্বীকার?
জানতে সাজা জিন্দা-কবর মৃত্যু চমৎকার।
নেক্‌-নজরে দেখতে তারে রাবীর সৈকতে,
একত্তরে সাঁতার দিতে উজিয়ে জলস্রোতে।
দুষ্টু রাবী জল ঝারিতে করত পরিহাস,
ভাসত দুটি দেহের তরী, দুরন্ত উল্লাস।
আনার-কলির বয়স তখন হয়তো বারো-তেরো
তখন তুমি সবেমাত্র পেরিয়েছ সতেরো।

হাসি মুখে সইত আনার দৌরাত্ম্য তোমার,
দিয়াছ তায় একটি সাদা ময়ূর উপহার।
জানত সেলিম কলির সাথে হবে না তার সাদী,
নাকচ হবে মালাবদল—বাদ্‌শা প্রতিবাদী।
জানত সেলিম মাতুল তাঁহার স্নেহের দুলালী—
'কুল্‌দীপে'র সঙ্গে করেন বিয়ের ঘটকালি।
ব্যর্থ হয়ে হলেন তিনি ঘোরতর শত্রু,
যুবরাজে যুদ্ধে পাঠান পারায়ে 'শতদ্রু'।
অপমানের তাপে তপ্ত দেহমনটি মামার,
ভীষণ ষড়যন্ত্র করেন শেষ প্রতিশোধ নেবার।···
সৈন্য-শিবির তাঁবুর মাঝে ঘুমন্ত সেলিম
স্বপ্ন দেখেন—জলছে আগুন, ঐ বাজে ডিম্ ডিম্।
ভাবেন সেলিম, অচৈতন্য ছিলেন যখন জ্বরে
ঔষধেরই কাজ করেছে কলির কণ্ঠস্বরে।
বাদশা এসে কলির প্রতি হলেন মেহেরবান্
দেখাশোনায় আস্‌কারা দেন, হন নিকো বেইমান।
স্বপ্নে দেখে তার সুমুখে দাঁড়ায় কলি এসে,
টোল খায় গাল ওঠে যখন খিলখিলিয়ে হেসে।
আকবর শা ছেলেকে তাঁর নাচ দেখাবে ব'লে
মাইনে দিয়ে রাখেন তারে নর্তকীদের দলে।
রঙ্‌মহলে নাচে কলি তোড়া বাজে পায়,
সেই কলি আজ তাঁবুর ধারে ঐ এসে দাঁড়ায়।
কলির গানের সুরের কলি ঝরে তাঁবুর দোরে
মাছের মত ডুব দিত চোখ রূপের সরোবরে।
বনের পথে যেদিন কলি দস্যু-কবলিতা,
মুদ্রামূল্যে উদ্ধারি' তায় করেন দাসী ক্রীতা।
ছদ্মবেশে মৃদু হেসে ধরেন তাঁহার পাণি,
কলির যেন চেনা-চেনা লাগল সে হাতখানি।

শিউরে ওঠে সারা দেহ—এ পরদেশী কে ?
চিবুক ধ'রে আদর করে আনার-কলিকে।
বসত সেলিম আনার-কলির গরিবখানায় গিয়ে
বলত হেসে ছদ্মবেশে, "চিনতে পার প্রিয়ে ?"
দুই চোখে তার রুমাল বেঁধে খেলত কানামাছি,
দেখত চেখে কলির হাতের তৈরী ক্ষীরের চাঁচি।
শাহী ভোগে শাহজাদার অরুচি জন্মিল,
কলির হাতের কোর্মা-কাবাব মুখটি জুড়াইল।
মন যোগায়ে চলত সেলিম, হয় নি কভু আড়ি,
পরতে দিত জাফ্‌রানেরই ফুলরঙা নীল শাড়ি।
বসত কলি তাহার পাশে 'বাদশা-বেগম' খেলায়,
ঘোমটা খুলে দিত সেলিম রোজই সন্ধ্যেবেলায়।
চোখে দুটি সাদাবিন্দু আনন্দাশ্রু ভরা—
উপুড় ক'রে ঢেলেছে পায় পূজার সে পসরা।
নিঙ্‌ড়ে আনার দিত আনার বঁধুর পেয়ালায়
আড়াল থেকে সুর দিত কে মধুর বেয়ালায়।
সাদা পেঁজা তুলোর মত কোয়াশারই মাঝে
পাশাপাশি বসত গিয়ে কত সকাল-সাঁঝে।
বুঝত না কেউ নিয়তির কি নিঠুর পরিহাস
প্রণয় যেন পুরুভুজের কঠিন ভুজপাশ।...

আনারকে জল-কবর থেকে উদ্ধারিয়া আনে,
ভাবছে সেলিম তখনও সে বেঁচে আছে প্রাণে।
বোরখা-ঢাকা চোখের তারা ভিতর পানে চায়,
মৃতার সাথে শুভদৃষ্টি হ'ল পুনরায়।
তখনও জল ঝুরছে উজল কলির খোঁপা থেকে,
তখনও বুক তপ্ত আছে, দেখে হাতটি রেখে।

কাঁদছে সেলিম ; এমনিতরোই আগ্রহে সে কবে
বাঁচায় তারে যেদিন কলি রাবীর জলে ডোবে।
উপহৃত হীরের আংটি হারিয়ে বালির তলে,
কবে আনার সামনে দাঁড়ায় চোখ দুটি ছল্‌ছলে !
চেয়ে দেখে কলির চোখে এ কি নখের ক্ষত,
কান্নাহাসি যায় না বোঝা 'মোনালিজা'র মত।
কত কথাই ভাবছে সেলিম কত সুখের ছবি,
প্রাণ-প্রেয়সীর মৃত্যু দেখে সেলিম হ'ল কবি।
আনার বুঝি নেইকো বেঁচে ! সেলিম হতভম্ব,
'কুল্‌দীপ' সে আসতে খবর ঘটালে বিলম্ব।
জিন্দা কবর সাজার আগেই পৌঁছে খবর পাছে,
কুল্‌দীপই ঘোড়াটিকে ঘায়েল করিয়াছে।
পণ করেছে যুবরাজেও রেহাই দেবে না সে,
কেন মানুষ চোখের নেশায় এমন ভালবাসে ?

তাকায় সেলিম কলির পানে অবাক নিষ্পলক,
তাকে ছেড়ে 'আনার' আজি কোথায় পলাতক।
হায় রে আনার, আজকে তোমার পাব না আর দেখা !
তোমায় ছেড়ে কেমন ক'রে রইব একা একা !
ভালবাসার জালে ঘেরা এই মানুষের বস্‌তি,
বন্দী হ'লেই দুঃখ দরদ নাই কারো সুখ-স্বস্তি।
কী নৃশংস বর্বরতার অদ্ভুত নজির
হারিয়ে গেছে গুপ্ত অশ্রু সেলিম ও কলির।
শুষ্ক কূপে না ভরে ঘট, তবুও পিয়াসীরা
মাথা কুটে' মরে, পড়ে কপালে কালশিরা।
বুকের মাঝে চাকা-চাকা 'জল-বিচুটি' জ্বালা,
সেলিম গলে শুকিয়ে গেল কলির গাঁথা মালা।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

# আমার সাহিত্য-জীবন

## এগারো

১৩৪৮ বাংলা সাল গত হ'ল। ইংরিজী ১৯৪২ সালের এপ্রিলে ১৩৪৯ সাল। ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ইতিহাসের মাইল-পোস্ট। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাংলা দেশের ইতিহাসে ১৯৪২-১৩৪৯ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আগস্ট-বিপ্লব, সাইক্লোন—দুটো একসঙ্গে। ১৯৪২-১৩৪৯ আমার জীবনেরও মাইল-পোস্ট।

বৎসরের প্রথম থেকেই তার সূচনা অনুভব করেছিলাম। বৈশাখে আমার মেয়ের বিয়ে হ'ল। ২৪শে বৈশাখ। এরই মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নলহাটিতে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করলেন। আমাকে সমাদর ক'রে জানালেন, আপনাকে সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করতে হবে। মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়।

সে সাদর নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছিলাম ১লা বৈশাখ তারিখেই। আমার সেদিনের মনের অবস্থা আজও মনে আছে। সে এক বিচিত্র অবস্থা! এক দিকে শ্রীকুমারবাবুর মত বিরাট পণ্ডিত মানুষের সস্নেহ সমাদরের আনন্দ; অন্য দিকে একটা বড় আশঙ্কা—একটা ভয়।

শ্রীকুমারবাবু আমার দেশের লোক। এর আগেও তাঁকে দেখেছি। স্বল্প পরিচয়ও হয়েছে। সে শুধু পরিচয়ই। দূর থেকে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখেছি। আমার স্কুলে ছাত্রজীবনে তাঁকে আমি প্রথম দেখি। শ্রীকুমারবাবুরও তখন ছাত্রজীবন। বি. এ. পাস করেছেন অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে। শুনেছিলাম বি. এ.তে ইংরিজীতে ফার্স্ট হয়েছেন। আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। আমাদের গ্রামে তাঁর পিতামহী ছিলেন। আমাদেরই গ্রামের মেয়ে, শ্রীকুমারবাবুর পিতার বিমাতা। সেকালের কুলীন-কন্যা ছিলেন তিনি। শ্রীকুমারবাবুর নিজের মাতুলালয় আমাদের গ্রামের মাইল পাঁচেক উত্তর-পশ্চিমে। বি. এ. পাস ক'রে তিনি বোধ করি গুরুজনদের প্রণাম করতে বেরিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম—ধনসম্পদের, ভূসম্পত্তির অহঙ্কারে অহঙ্কৃত উদ্ধত ছিল আমাদের গ্রাম। হাল ফ্যাশনের চতুরঙ্গবাহিনীর অভিযান দিকে দিকে। আগেকার কালের ব্রহ্মণ্য দৃপ্ততা, নবাবী-আমলের সামন্ততান্ত্রিক বনেদিয়ানার কালের সীমানা, কুইকমার্চের পদক্ষেপে অতিক্রম-

ক'রে ইংরিজী আমলের অ্যারিস্টোক্রেসির গাম্ভীর্যে থমথম করছে, আবার কয়লাকুঠির মালিকানির ও কয়লা-ব্যবসার মধ্যস্বত্বাধিকারীর অর্থাৎ middle man-এর সাফল্যে কর্মগৌরবে গৌরবান্বিত; অর্থাৎ আভিজাত্য-গৌরব বংশগত এবং ব্যক্তিগত জীবনসাধনার সিদ্ধি-লক্ষ্মীর কৃপাসাপেক্ষ; এবং লক্ষ্মীর ঘরের চাবি কয়লার ব্যবসাজগতে বিশেষ স্থান অধিকারহেতু তাঁদের করতলগত। গ্রামে নয়নমনোহর প্রাসাদতুল্য বিদ্যালয়ে মা সরস্বতীর পীঠে মা অধিষ্ঠিত থেকেও কোণ-ঠাসা। শখের থিয়েটারে সমারোহে এবং নাট্যকলা ও নাটকচর্চার মধ্যে আমাদের অগ্রবর্তীরা বিদ্যার ক্ষীর সংগ্রহ ক'রে উচ্চনাসা। সেকালের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঘৃণার পাত্র এবং একালের বি. এ., এম. এ মাস্টারেরা নিরীহ জীব—করুণার পাত্র। একমাত্র রাজকর্মচারীরা, তাও গেজেটেড অফিসারেরা সম্মানের পাত্র, বি. এ., এম. এ. ব'লে নয়, রাজকর্মচারী ব'লে—ইংরেজের মত রাজার রাজকর্মচারী ব'লে। আমার মনে আছে, আমাদের এক আত্মীয় বলতেন, এবং যখন আমার গৃহশিক্ষক পড়াতে বসতেন তখন চা খেতে এসে ক্রমাগত ঘুরতেন ফিরতেন আর বলতেন, লেখাপড়া শিখে কি হয়? আমাদের গ্রামের সর্বাপেক্ষা ধনী বংশটির ছেলেদের পড়ার ইচ্ছা সত্ত্বেও এই মনোভাবহেতু তাঁদের অভিভাবক কলেজে পড়তে দেন নি। ম্যাট্রিক পাসের পরই ছেলেদের স্যুট পরিয়ে টাই এঁটে আপিসে একটি স্বতন্ত্র কামরার সৃষ্টি ক'রে, নতুন সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছেন। এ হেন গ্রামটিও এই অসাধারণ কৃতী ছাত্রটির আগমনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। লোকে তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। আমাদের হেড-মাস্টার শ্রীকুমারবাবুকে নিমন্ত্রণ ক'রে স্কুল দেখিয়েছিলেন। ক্লাসে ক্লাসে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, দেখ, তোমরা দেখ। এঁকে দেখ। বীরভূমের গৌরব ইনি। শ্রীকুমারবাবু সম্পর্কে আমার হেডমাস্টার মশায়ের সেই কথা ক'টি আমার জীবনে একটি অসাধারণ শ্রদ্ধার বেদীর ভিত্তি রচনা ক'রে রেখেছে। আমার জীবনে সে টলবে না। পরবর্তী কালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় গাঢ় হয়েছে। অনেক আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেছি। তাতে আমার সে শ্রদ্ধার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। তার কারণ, ইংরেজীতে অসাধারণ এই পণ্ডিতটি ভারতীয় সংস্কৃতিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জেনেছেন।

তাই তাঁর নিমন্ত্রণে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম, তেমনি শঙ্কিত হয়েছিলাম। সেই শঙ্কা দ্বিগুণিত বা আরও বহুগুণে গুণিত হয়ে উঠল অতুল গুপ্ত মহাশয়ের নাম শুনে।

তখনও পর্যন্ত গুপ্ত মশায়কে চোখে দেখি নি। নাম শুনেছি। শুনেছি নানা কথা। এত বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমালোচক, এবং এমন সূক্ষ্ম রস-রসিক ব্যক্তি আর নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন নেই। আরও শুনেছি, অতি বড় আধুনিক তিনি। কেউ কেউ বলেছেন—দাম্ভিক ব্যক্তি তিনি। এও শুনেছি, এত বড় মুক্তহস্ত দাতা বিশেষ ক'রে সাহিত্য শিল্প এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বিরল। আইন-ব্যবসায়ে তাঁর উপার্জন বিপুল। সাহিত্যিক শিল্পী রাজনৈতিক কর্মী বিপন্ন হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি মুক্তহস্তে সাহায্য ক'রে থাকেন। অর্থাৎ বিরাট ব্যক্তি একটি। সব দিক দিয়ে। সাহিত্য-বুদ্ধিতে, বোধে, ব্যক্তিত্বে, জ্ঞানে। তার উপর এ মানুষ দাম্ভিক হ'লে এ মানুষ বিন্ধ্যপর্বত।

এই দুই মানুষের সম্মুখে তাঁদের সঙ্গে এক সারিতে ব'সে কি বলব আমি? বলবই বা কোন্ অধিকারে? তা ছাড়া আমার বক্তব্য শুনে তাঁরা যদি বক্র-হাস্য করেন?

আমি উত্তরে শ্রীকুমারবাবুকে লিখলাম—এমন সমাবেশে সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করিবার যোগ্যতা আমার নাই বলিয়াই মনে হয়। আপনার নিমন্ত্রণে অবশ্যই যাইব। এক প্রান্তে বসিয়া সম্মেলনের ভাষণ শুনিয়া আসিব। আপনারা যোগ্যতর ব্যক্তিকে সাহিত্য-শাখায় সম্মানিত করুন। শৈলজানন্দ আছেন, সজনীকান্ত আছেন, তাঁহারা বীরভূমের সন্তান।

অত্যন্ত দ্রুত উত্তর এল—আপনার কুণ্ঠা কিসের? সম্মান আপনার প্রাপ্য হইয়াছে; আমরা বিচার করিয়াই আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

এ সম্মান দিবার মূলে কে কে ছিলেন সঠিক জানি না, তবে আমার পরম-শ্রদ্ধেয় ভক্ত পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন ছিলেন, এবং গুপ্ত মহাশয়ও সাগ্রহে সম্মতি দিয়েছিলেন ব'লে পরে শুনেছি।

সম্মেলনের দিন ছিল জ্যৈষ্ঠের দোসরা তেসরা। সেবার প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। ১৯৪২ সালের উত্তাপ নিয়ে আজকালের মত প্রচারবাহুল্য ছিল না। যুদ্ধ তখন মাথার ওপর, ওদিকে আগস্ট মাস মিনিটে মিনিটে এগিয়ে আসছে। খবরের কাগজে

স্থানও ছিল না, মন দেবারও অবকাশ ছিল না। টেলিপ্রিণ্টারে ইউরোপ আফ্রিকা প্রশান্তমহাসাগর চীন থেকে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত সম্প্রসারিত—মিনিটে মিনিটে পতন-অভ্যুদয়ের অজস্র সংবাদ। অন্য দিকে রেঙ্গুন পতনের পর আমরা দেশের লোক, মফস্বল শহরে উদ্বাস্তুর মত আশ্রয় খুঁজতে ব্যস্ত; আশ্রয় পেলে হাট-বাজারে 'ডাঙ্কী' 'ডাঙ্কী' ক'রে পুলকিত কোলাহলে আত্মহারা। টেম্পারেচারের খবর কে রাখে, তাকে পরোয়াই বা কে করে! ইংরেজ হারছে, তার আনন্দও টেম্পারেচার গ্রাহ্য না করার একটা কারণ।

আমার পক্ষে এই কঠোর গ্রীষ্ম নিদারুণ ক্লেশের কারণ হয়েছিল, এবং সেই কারণেই মনে আছে। মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই আমি অসুস্থ ছিলাম। তার ওপর কোমরের নীচে এক কুইনিন ইনজেকশন নিয়ে ক'দিনের জন্যে পায়ের শিরা এমন টেনে গেল যে, খোঁড়া হয়ে গেলাম। বিয়ের পর হঠাৎ দেখা দিল অর্শ। রক্তক্ষয়ী অর্শ নয়; কিন্তু নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। নুন-মাখানো কাটা ঘায়ের মত জ্বালা ও যন্ত্রণা দুইই। সেই অবস্থাতেই যেতে হ'ল নলহাটি। সময় বেশি থাকলে কি করতাম জানি না, হয়তো অসুস্থতার কথা জানিয়ে অক্ষমতা জানাতাম, কিন্তু সময়ই ছিল না। নলহাটি যাবার আগের দিন বোধ করি প্রথম যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল।

নলহাটি গেলাম।

সন্ধ্যার সময় শ্রীকুমারবাবু নিয়ে গেলেন গুপ্ত মশায়ের সান্নিধ্যে।—এই তারাশঙ্কর।

অতুলবাবু স্মিতমুখে সকৌতূহল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, বসুন, বসুন।

আমি নমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলাম। সচকিত হয়ে নমস্কার ক'রে বসলাম। বলতে পারলাম না কিছুই। আমি গুপ্ত মশায়কে দেখছিলাম। অত্যন্ত সাদাসিধে পরিচ্ছন্ন প্রসন্ন একটি মানুষ। আকারে আকৃতিতে কোথাও কোন আতিশয্য নেই। পরনে খদ্দরের কাপড় এবং খদ্দরের ফতুয়া। স্বল্পবাক্ ব্যক্তি, কণ্ঠস্বর কোমল-অনুচ্চ; বাক্‌ভঙ্গি সরল স্পষ্ট; ধীরে ধীরে কথা বলেন, গম্ভীর ঠিক নন, কিন্তু অসাধারণ সংযম মানুষটির; বার দুয়েক কথা-প্রসঙ্গে হাসলেন—দেখলাম সে হাসি সুপ্রসন্ন।

কথাবার্তার মধ্যে আমি সাহিত্য-প্রসঙ্গ তুলতে সাহস করি নি। তিনিও তোলেন নি। শুধু আমার 'জলসাঘর,' 'ধাত্রী দেবতা,' 'কালিন্দী' বই কখানির উল্লেখ ক'রে বললেন, আমি পড়েছি।

আমি জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলাম না, কেমন লেগেছে আপনার? কাছে ব'সে ছিলেন পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন। কথা তিনিই বললেন বেশি। সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে থেকে উঠে এলাম। মানুষটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না। দম্ভ আছে কি না বুঝলাম না, কিন্তু অসাধারণ ভদ্রতাবোধ, নিখুঁত ভদ্র মানুষ। জীবনব্যাপী সাধনা আছে এর পিছনে। তবে একটা জিনিসের স্পর্শ পেলাম। মানুষটির কথার মিষ্টতা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, ব্যঞ্জনের মিষ্টতা লবণে আর মনের মিষ্টতা কথায়; তাই দুনিয়ার সেরা মিষ্টতা কথা। যা মনের মিষ্টতা, তাই মানুষের কাছে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মিষ্টতা। এ দুনিয়ায় নাকি মনের মানুষ মেলে না। সুতরাং মানুষ—মানুষ খুঁজে বেড়ায় না, খুঁজে বেড়ায় মানুষের মন। কোন্ মন? যে মন কটু নয়, তিক্ত নয়, যে মন মিষ্ট, যাতে নাকি মধুর স্বাদ আছে সেই মন। মধু থাকে কোথায়? থাকে ফুলে। সুতরাং যে মানুষের মনে মধুভরা ফুল ফোটে সেই মানুষের মন খোঁজে মানুষ। কথার মিষ্টতা সেই মধুর বার্তা অর্থাৎ গন্ধ বহন করে।

অতুলবাবুর কথায় মধুর বার্তা আছে। তার সন্ধান পেয়েছিলাম সেই সন্ধ্যায়।

পরের দিন সভায় গেলাম। আমার অভিভাষণ আমি লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম। অতুলবাবুও লিখিত ভাষণ পাঠ করেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে। ঠিক স্মরণ নেই। অতুলবাবুর ভাষণের সর্বাপেক্ষা মাধুর্য তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতায়, যা বলতে চান তা জলের মত স্বচ্ছ; মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম হয়। তত্ত্ব নিয়ে তিনি জট পাকান না, জটিল তত্ত্বকে তিনি সহজ সরল ক'রে প্রকাশ করেন; তার পিছনে থাকে যুক্তি। তা ব'লে সে সহজ করাটা চিরে চিরে বিশ্লেষণ করা নয়; ফুলকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার স্বরূপকে ব্যক্ত করেন না, কুঁড়ি-ফুলটিকে যুক্তির আলো ও উত্তাপে দলে দলে বিকশিত ক'রে ফোটা-ফুলে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর ভাষণে মাধুর্য এইখানেই। শ্রীযুক্ত গুপ্ত একদা 'সবুজপত্রে'র গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন ব'লে অনেকে বলেন, তিনি বীরবল অর্থাৎ ৺প্রমথ চৌধুরী

মহাশয়ের অনুবর্তী। আদৌ তা নয়। চৌধুরী মহাশয়ের পরবর্তী তিনি নিশ্চয়, কিন্তু তিনি বীরবলী অভিব্যক্তির বক্রতা ও বক্রোক্তির আধিক্যকে কোথাও গ্রহণ করেন নি।

সাহিত্য কি? জীবনে সাহিত্য বিলাস, অথবা জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় অপরিহার্য উপকরণ—এই নিয়েই তাঁর ভাষণটি রচিত হয়েছিল। নাতিদীর্ঘ প্রাঞ্জল বাহুল্যবর্জিত সুপরিচ্ছন্ন একটি ভাষণ। ভাষণের শেষের কথা কটির মধ্যে আমার নাম উল্লেখ করেছিলেন। কথা কটি আমার মনে গেঁথে রয়েছে। তাঁর কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেয়েছিল গাঢ় স্নেহের অভিব্যক্তি; বলেছিলেন, আজকের কালের সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বা তার প্রকৃষ্ট গতিপথ নির্ণয় সম্পর্কে আমি কোন কথা বলব না। এখানে বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের মণ্ডল প্রজা শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত রয়েছেন; তিনিই এ কথা বলবার অধিকারী; তিনিই বলবেন, আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনব।

আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ ব'য়ে গিয়েছিল।

অতুলবাবু অকপট কণ্ঠস্বরে বললেন, আমি 'বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের প্রজা'! রামপ্রসাদের মত সিদ্ধ ভক্ত যমকে ধমক দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, আমি মায়ের খাসতালুকের প্রজা। এই 'খাসতালুকের প্রজা' কথাটা বাংলার খাঁটি মানুষের কাছে বড় দামী কথা। অতুলবাবুর মত ব্যক্তি আমাকে 'বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের প্রজা' ব'লে অসাধারণ সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন, এর অর্থ—আমি শুধু সাহিত্যিকই নই; ভক্ত সাহিত্যিক! আমার সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। আমার রচনাবলী সম্পর্কে গুপ্ত মশায়ের সাহিত্যিক মতামত বা ধারণা কি তা স্পষ্টভাবে তিনি কোনদিন ব্যক্ত করেন নি; আমি তা অবগত নই। কিন্তু সে দিনের কথাটি আমার কাছে তাঁর অকপট উক্তি ব'লেই মনে হয়েছিল, এবং সে উক্তিকে আমি প্রশংসাবাক্য ব'লে গ্রহণ করি নি—জ্যেষ্ঠের অকপট আশীর্বাদ হিসেবে শুদ্ধচিত্তেই গ্রহণ করেছিলাম। অথবা তীর্থযাত্রী যেমন ভাবে তীর্থগুরুর কাছে সুফল গ্রহণ করে, তেমনি ভাবেই গ্রহণ করেছিলাম।

তিনি আসন গ্রহণ করলেন। আমি আমার অভিভাষণ পড়লাম। আমার অভিভাষণে তদানীন্তন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কোন কথা আমি

বলি নি। কারণ আমার নিজের সাহিত্যের মধ্যে আমি যা বলেছি, তা সুস্পষ্টভাবে সেকালের সাহিত্যের বক্তব্য থেকে পৃথক। তাঁরা দৃষ্টির যে কোণ থেকে এ দেশের মানুষের অন্তরের অশান্তি অসন্তোষ দেখেছিলেন এবং কারণ নির্ণয় করেছিলেন, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এ নিয়ে মতভেদের অবকাশ নেই বা কোন তর্ক নেই, কারণ এ তথ্য ঐতিহাসিক। সেকালের গ্রন্থগুলির পাতা ওলটালেই তা প্রমাণিত হবে। এক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন স্বতন্ত্র। তা ছাড়া সকলেরই সুর ছিল প্রায় এক। তার অধিকাংশ স্থলেই—যারে চাই তারে কেন পাই না, এই অতৃপ্তির সুর ছিল উগ্র এবং সমাজের বিরুদ্ধে তার এই সম্পর্কিত সকল বিধির বিরুদ্ধে আক্রোশ, ক্ষেত্রবিশেষে ছিল বিদ্রোহ। এ উগ্রতা এবং এ আক্রোশ-বিদ্রোহ নিয়ে সীমানা বিচারের কথা বাংলা-সাহিত্যে ঐতিহাসিক তথ্য।

১৯৩১ সনে রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য-সেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি সাহিত্যক্ষেত্রে এসেছিলাম, স্বাভাবিক ভাবে আলাদা দৃষ্টিকোণ নিয়ে, অন্তরের স্বতন্ত্র উপলব্ধি নিয়ে। 'চৈতালী ঘূর্ণি'তে আমি তা প্রথম বলতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমার বক্তব্য কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। ১৯৪২ সনে আমার 'ধাত্রী দেবতা' ও 'কালিন্দী'তে নূতন ক'রে সেই কথা ব'লে তখন আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতিতে তাতে বেগ সঞ্চার করেছে। সুতরাং এ সম্পর্কে কোন কথা বলা আমার পক্ষে সহজ ও শোভন ছিল না। আমি বলেছিলাম আগামী দিক নির্ণয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা। রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তির আকাঙ্ক্ষার যে দুর্নিবার আবেগ আমি জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রকাশিত হতে দেখেছিলাম, তারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছিলাম মানুষের সনাতন জীবন-মুক্তির সাধনা। জীবন-মুক্তি বলতে দেহ-মুক্তি বা পরলোক-সাধনা নয়। জীবন-মুক্তি বলতে জীবনের চারিপাশে সকলপ্রকার ভয়ের বন্ধন, সকলপ্রকার ক্ষুদ্রতার বন্ধন অর্থাৎ গণ্ডি, সকল অভাবের পীড়ন, জীবনে জোর ক'রে চাপানো সকলপ্রকার প্রভাবের নির্যাতন থেকে মানুষ সংগ্রাম ক'রে চলেছে অবিরাম। সেই তার অভিযান। সেই মুখেই মানবদেহের মধ্যে প্রকৃতির গতি। নিজের ক্ষুদ্রতাকে নিজের

অনাচারকে সে নিজেই সংহার করে; আবার অতি আত্মনির্যাতন আত্মবঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেই বিদ্রোহ করে। সে সময়ের রাজনৈতিক পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার আবেগের মধ্যে সেই চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামকেই অনুভব করেছিলাম আমি। মানবীয় মহিমার সনাতন লীলা ওই পটভূমিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং দিনে দিনে তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছিল। আমার কল্পনায় ছিল, এই দেশের মানুষের একদিন অভ্যুদয় হবে। উঠবে বিপুল মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে, আত্মপ্রকাশ করবে বিরাট অভ্যুত্থানে। সে অভ্যুত্থান হবে অহিংস অভ্যুত্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। সর্বপ্রথম। বুদ্ধের আবির্ভাব তপস্যা—বীজ, গান্ধীজীর কর্মসাধনায় তা পরিণত হবে ফলবান বৃক্ষে। সে অমৃতফলের আস্বাদে মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হবে মানুষের ইতিহাসের ভাবী অধ্যায়গুলি। মানুষের ইতিহাস পুনরাবৃত্তির পাকচক্রে নূতন গতির সৃষ্টি হবে।

এ কথা এখানে অকপটেই বলেছি যে, এই চিন্তার ধারা তখন আমার অস্পষ্ট ছিল, তখন তার শৈশব; কিন্তু শিশুর মধ্যেই যেমন ভাবী মানুষ প্রচ্ছন্ন থাকে তেমনি ভাবেই ছিল সেদিন আজকের চিন্তাধারার রূপ। সেদিন শুধু অহিংস সংগ্রামে অভ্যুত্থিত ভারতবর্ষকে কল্পনা করতাম। এবং ১৯৪২ সনে ওই মহাযুদ্ধের মধ্যেই এই মহাসংগ্রাম আরম্ভ হবে ও সার্থক হবে ব'লে দৃঢ় সিদ্ধান্ত না হোক, কামনা করতাম। তাই ১৯৪১ সনে রেঙ্গুনের পতনকাল থেকে যখনই কলকাতা থেকে মানুষদের দলে দলে প্রাণভয়ে পালাতে দেখলাম, তখন এক দিকে হতাশ হয়েছিলাম, অন্য দিকে হয়েছিলাম ক্ষুব্ধ। চারিদিকে শাসন তখন কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর। বাংলা দেশের সংবাদপত্রের স্বদেশীযুগের নির্ভীকতাও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে; তার চারিদিকে কঠোর বন্ধন। তাই আমি সাহিত্যের মধ্যে চেয়েছিলাম তার প্রকাশ। অন্তত মানুষকে এই শৃগালপনার ভীরুতা জয় করতে শক্তি দিক সাহিত্য। অভয় দিক, সাহস দিক। মানুষ সাহস ক'রে ঘুরে দাঁড়াক। তারপর কালের বেগ অনিবার্য গতিতে নিয়ে যাবে তাঁকে তার পথে। ভারতের সাধনার পথে চ'লে এসে ভারতবর্ষের মানুষ আজ প্রাণের ভয়ে গর্ত খুঁড়ে শেয়ালের মত তার মধ্যে আত্মগোপন ক'রে যদি গতিহীন না হয়, মানুষের মত পথ ধ'রে চলে তবে তাকে ওই অহিংস সংগ্রামের পথেই যেতে হবে।

সে দিনের অভিভাষণের মধ্যে এই কথাগুলিই অস্পষ্ট ভাবে বলেছিলাম। অস্পষ্ট ব'লেই বোধ করি অভিভাষণ খুব সাড়া জাগায় নি। গুপ্ত মশায় সভার শেষে আমাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নগুলি মনে নেই; তিনি আমার অস্পষ্ট কথাগুলি স্পষ্ট ক'রে জানবার চেষ্টা করেছিলেন। সেই দিন রাত্রেই গুপ্ত মশায় চ'লে এলেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল, সেগুলি দূর হ'ল। মানুষটিকে শ্রদ্ধা হ'ল, ভয় কমলো। সব থেকে ভাল লাগল তাঁর কথার মিষ্টতা। সম্ভ্রম বাড়ল তাঁর সংযমবোধের পরিচয়ে। গুপ্ত মশায় সম্পর্কে দম্ভের অভিযোগ আমার সত্য ব'লে মনে হ'ল না। অনেক ভেবেছিলাম। সত্য বলতে কি, এই মানুষটির ঠিক কাছে যাওয়া যায় না। অথবা একই সমতল ভূমিতে ব'সেও মনে হয়, লোকটি উপরে ব'সে আছেন। এইটেই তাঁর এ অপবাদের কারণ। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধই এর কারণ। ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিরর্থক; উজ্জ্বল আলোর কাছে ক্ষীণদীপ্তি প্রদীপের নিষ্প্রভ হওয়ার ক্ষোভে অভিযোগ করার মতই নিরর্থক। মর্যাদাবোধেরও উৎপত্তি ব্যক্তিত্ব থেকে। এবং তাঁর মত জীবনের দিকে দিকে দিক্‌পালের মত গৌরব অর্জন করেছে যে মানুষ, মর্যাদাবোধ তাঁর থাকবে না তো থাকবে কার! ঠিক এই কারণেই লিখলাম, ভয় কমলো; সঙ্কোচ গেল—এটা লিখলাম না।

* * *

নলহাটি থেকে বাড়ি এসেই দেখলাম, দুখানি পত্র আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। দুখানিই কলকাতার পত্র। প্রথম সংবাদ নাট্যভারতীতে 'দুই পুরুষ' নাটকের অভিনয়ের উদ্যম আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মহলা শুরু হয়েছে। আমাকে আসবার জন্য অনুরোধ করেছেন কর্তৃপক্ষ। দ্বিতীয় পত্র লিখেছেন, শ্রী য ম দত্ত—যতীন্দ্রমোহন দত্ত। লিখেছেন, বরানগরে কাশীনাথ দত্ত রোডে আমার বাড়ির তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল। চুরি হয়েছে। কি চুরি গিয়েছে, দেখবার জন্যে আমাকে যেতে লিখেছেন। বোধ করি এর পরদিন কাশীপুর থানা থেকেও পত্র পেলাম এবং খবরের কাগজে 'দুই পুরুষে'র সংবাদ দেখলাম। কাগজেই দেখলাম, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী সদলবলে নাট্যভারতী ছেড়ে চ'লে গেছেন। রাণীবালা চ'লে গেছেন, ৺রথীন বন্দ্যো, সন্তোষ সিংহ

প্রভৃতি সকলেই চ'লে গেছেন। নাট্যভারতীর সংগঠন নূতন। শ্রীনরেশ মিত্র, ৺যোগেশ চৌধুরী, জহর গাঙুলী, ছবি বিশ্বাস এসেছেন; অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম দেখলাম ৺প্রভার। মনটা আমার সত্যি বলতে কি দ'মে গেল। আমার একান্ত কামনা ছিল, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী নুটবিহারীর পার্ট করবেন। রাণীবালা বিমলা করবেন কল্পনা করেছিলাম এবং তিনি ভালই করবেন জানতাম, কিন্তু প্রভা দেবীর নাম দেখে রাণীবালার অভাব অনুভব করি নি। তবে অহীন্দ্রবাবুর স্থানে আর কাউকে দেখার কল্পনায় আমি স্বস্তিবোধ করি নি, খুশি হই নি।

প্রচণ্ড গ্রীষ্ম তখন, আগেই বলেছি। তার উপর অর্শের যন্ত্রণা। রাত্রে রওনা হলাম কলকাতা। সঙ্গে নিলাম মেজ ভাইকে। বাড়িতে তখনও মেয়ের বিয়ের জের চলছে, মেয়েরা লাভপুরেই রইলেন। রাত্রে স্টেশনে এসে মনে হ'ল, অর্শের যন্ত্রণা বাড়ছে। ট্রেনে চড়লাম; আসছি কাটোয়া হয়ে। ভোর রাত্রি চারটার সময় কাটোয়ায় লোকাল ট্রেন ধ'রে কলকাতায় পৌছুব ভোরে। যন্ত্রণার মধ্যেও একবার ঘুম এসেছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল নিদারুণ যন্ত্রণায়। সে যে কি যন্ত্রণা! চলন্ত ট্রেনের মধ্যে যাত্রীরা ঘুমন্ত, তার মধ্যে আমি যন্ত্রণায় অধীর হয়ে পায়চারি ক'রে বেড়ালাম। কাটোয়ার আগের স্টেশনে ঠিক করলাম, কলকাতা যাব না। এ যন্ত্রণা নিয়ে কলকাতায় কোথায় যাব? গিয়েই বা করব কি? আমাকে দেখবে কে?

কাটোয়ায় গাড়ি থামল। আমার মেজ ভাইকে বললাম, তুই যা। যতীন-বাবুকে নিয়ে পুলিসের তদন্তের যা হয় করিস। আর—

ট্রেনেই দাঁড়িয়ে (তখন বসতে পারা অসম্ভব হয়ে উঠেছে প্রায়) নাট্য-ভারতীর কর্তৃপক্ষ শ্রীযুক্ত মল্লিক সাহেবকে একখানি পত্র লিখে দিলাম—আমি অসুস্থ, কাটোয়া পর্যন্ত এসেও ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। বললাম, দেখা ক'রে তাঁর হাতে দিবি। বলবি সব কথা। অভিনয় দেখে তবে আসবি।

মেজ ভাইকে ট্রেনে চড়িয়ে আমি আবার আমদপুরের লাইনের ছোট গাড়িতে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে ক্ষোভের সীমা ছিল না। 'দুই পুরুষ' অভিনয় হবে, আমি থাকব না! কে করবে নুটুর ভূমিকা? কেমন করবে, কে জানে! হঠাৎ এক সময় মনের মধ্যে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা যেন সজোরে

ঠেলা দিয়ে আমাকে চাঙ্গা ক'রে তুললে। একটা বাঁকা পথে সে আমাকে ভরসা দিয়ে কলকাতার ট্রেনের দিকে এগিয়ে দিলে। মনে যা হয়েছিল—যেটাকে বলছি বাঁকা পথের ভরসা—সেটা এই, হঠাৎ মনে হ'ল, আঃ, আমি তো আশ্চর্য ভীতু ঘরকুনো লোক। অসুখ হয়েছে ব'লে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি? বাড়িতে গেলেই কি আমার অসুখ সেরে যাবে? অসুখ হ'লে ভাল চিকিৎসার জন্যে লোকে কলকাতায় যায়। আর আমি কলকাতার অর্ধেক পথ থেকে ফিরে যাচ্ছি? অথচ রঙ্গালয়ে আমার ভাগ্য নির্ভর করছে এই বইখানির উপর। 'শনিবারের চিঠি'তে তখন 'দুই পুরুষ' "পিতাপুত্র" শিরোনামায় শেষ হয়েছে। পাঠক মহলে, সাহিত্যিক মহলে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। প্রথম দিন নাটক শুনে সজনীকান্ত যে মত প্রকাশ করেছিলেন, সেই মত বহু জনে প্রকাশ করেছেন, নাটক এবং সাহিত্য—দুই হিসেবেই সার্থক হয়েছে রচনাটি, বাংলা-সাহিত্যে যা কদাচিৎ হয়। এ নাটক অভিনয়ে অসার্থক হ'লে আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ উত্তম ব্যর্থ হয়ে যাবে। 'কালিন্দী' দৈবচক্রেই হোক আর ঘটনাচক্রেই হোক, একটা চক্রের চক্রান্তে নষ্ট হয়েছে। আমাকে যেতেই হবে। যাব আমি।

ফিরে এসে কলকাতার ট্রেনে চ'ড়ে শুয়ে পড়লাম। মেজ ভাইকে বললাম, আমি যাব।

হাওড়ায় নেমে থমকে দাঁড়ালাম। ভাই প্রশ্ন করলে, দাঁড়ালে যে?

বললাম, ভাবছি।

কি?

ভাবছি কোথায় যাব? কোথায় উঠব? বরানগরের বাড়িতে? কিন্তু এই অবস্থায় আমাকে থিয়েটারে যাতায়াত করতে হবে। বরানগর অনেকটা দূর হবে। রাত্রে ফিরতে হবে। তারপর তুই একলা। রান্নাবান্না আছে, এর ওপর যদি অসুস্থ হই তবে অন্তত মেয়েরা না আসা পর্যন্ত সেবা আছে আমার। আরও আছে ডাক্তার-সমস্যা। আমরা বরানগরে গেলেও ডাক্তার আমাদের বাগবাজারে আর টানায়।

তা হ'লে যাবে কোথায়?

বাগবাজার। পুরনো বাসায়। দিদি আছেন, পারুল আছে, ওরা কদিন দুটো রাঁধা ভাত দিতে আর থাকতে দিতে বিরক্ত হবেন না। চল্, ওখানেই যাব।

এলাম বাগবাজার। প্রসন্ন হাসিমুখে সহোদরার মতই আমাকে গ্রহণ করলেন ওঁরা। এতটুকু সঙ্কোচ রইল না ওঁদের আহ্বানের আগ্রহে। মনে হ'ল, পৃথিবীটাই স্বর্গ।

স্নান করবার পর ভাই বললে, ডাক্তারের কাছে চল।

ডাক্তার যা বলবে আমি জানতাম। ওঁদের হেডেন্সা ব্যবহার করেছি। কোন ফল হয় নি। এর পর ডাক্তারদের ব্যবস্থা ছুরি-কাঁচি। সে হবে না এখন। এখন সামনে 'দুই পুরুষে'র অভিনয়। ভাইকে বললাম, তুই অ্যাসপিরিন কিনে আন্।

অ্যাসপিরিন একালের এক আশ্চর্য ওষুধ। আধ ঘণ্টার মধ্যে মনে হ'ল, কোন যন্ত্রণা নেই আমার। শুধু চেপে বসতে একটু লাগে। বাস্, আমি তখন বিশল্যকরণী ভেষজের গুণে শেলাহত যোদ্ধার মত শুধু সঞ্জীবিতই নই, ধনুর্বাণ দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে ধ'রে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম সেরে বেলা আড়াইটেয় উঠে চা সহযোগে আর একটি অ্যাসপিরিন গলাধঃকরণ ক'রে সবল পদক্ষেপে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এসে ট্রাম ধ'রে নাট্যভারতীর দেউড়িতে উপস্থিত হলাম।

সতু সেন ছিলেন সামনে, বললেন, কি ব্যাপার মশাই? যথাসময়ে নিরুদ্দেশ?

সতুবাবুদের রসিকতার উত্তরে তখন রসিকতা করি না, তখনও রঙ্গালয়ে আমি নবাগত, অনেকটা অনুগ্রহভাজনের মত অবস্থা। সবিনয়ে বললাম, মেয়ের বিয়ে ছিল।

এ দিকে আপনার বই নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছ।

হিমসিম খাচ্ছেন! চমকে উঠলাম। সতুবাবু বললেন, অহীন্দ্রবাবুরা সব চ'লে গেলেন। নতুন স্টাফ। নুটুর পার্ট নিয়ে সমস্যা। প্রথমে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্জ মশায়কে দিয়েছিলাম; উনি নিজে জেল-টেল খেটেছেন, এককালে দেশকর্মী ছিলেন। কিন্তু সুবিধে হ'ল না। ঠিক এ পার্টের লোক উনি নন, তার ওপর কিছুদিন হ'ল ফেসাল প্যারালিসিস থেকে উঠেছেন, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।

তা হ'লে?

ছবি বিশ্বাসকে দিয়েছি। ছবি করছিল সুশোভন, ভাগ্যক্রমে জহর এসে গেছে। সে করছে সুশোভন।

মনটা সত্যিই দ'মে গেল। ছবি বিশ্বাস তখন এ ছবি বিশ্বাস ছিলেন না। নাট্যনিকেতনে গুটিকয়েক পার্ট করেছেন। শচীনদার 'ভারতবর্ষ' নাটকে নায়কের ভূমিকায় আমি তাঁর অভিনয় দেখেছি। সে অভিনয়ে এমন কোন [redacted] দেখি নি, যাতে প্রত্যাশা করা যায়, ছবি বিশ্বাস নুটুর ভূমিকায় দীপ্তিমান হয়ে উঠবেন। কিন্তু কি বলব! প্রতিবাদ বা মনের সন্দেহের কথা জানাবার মত জোর আমার তখন ছিল না।

ভূমিকালিপি শুনলাম, নুটু—ছবি বিশ্বাস, বড়বাবু—৺যোগেশ চৌধুরী; গোপীনাথ—নরেশ মিত্র, সুশোভন—জহর গাঙুলী, মহাভারত—রবি রায়, অরুণ—মিহির ভট্টাচার্য, সুরেন উকিল—মনোরঞ্জন ভটচাজ। বিমলা—৺প্রভা দেবী, কল্যাণী—অঞ্জলি রায়, মমতা—পূর্ণিমা, শ্যামা—ছায়া।

আরও শুনলাম, গান লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, নাচ শেখাচ্ছেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র রায়। হেমেন্দ্রবাবুকে সেই আমি প্রথম দেখলাম।

রিহারশাল আরম্ভ হ'ল। সন্ধ্যে হ'ল, সাতটা বাজল, আটটা বাজল। আবার যন্ত্রণা অনুভব করলাম। অ্যাসপিরিনের ক্রিয়ার কাল শেষ হয়ে আসছে। বেরিয়ে গেলাম, চায়ের দোকানে চা-সহযোগে আর একটি বটিকা চালালাম এবং ফিরে এসে অডিটোরিয়ামে একান্তে একখানি চেয়ারে ঈষৎ কাত হয়ে বসলাম। সহজভাবে চেপে বসতে পারি না। অ্যাসপিরিন খাওয়া সত্ত্বেও না। নটা বাজে, দশটা বাজে, সাড়ে দশটা। রিহারশাল শেষ হয়। বাড়ি ফিরি। তখন আর হাঁটবার শক্তি থাকে না। নাটকের নেশা শেষ হয়েছে, ক্লান্তি চেপে ধরেছে নাগপাশের মত—পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে। ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে পারি না, রিক্‌শ করি। একটু কাত হয়ে হেলে আধশোয়ার মত অবস্থায় আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে ফিরি। ভাই ব'সে থাকে অপেক্ষা ক'রে। দিদি উপরে উনুনের ওপর খাবার রেখে ব'সে থাকেন, না হ'লে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খাই, শুয়ে পড়ি। [redacted]রাত্রে যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙে। অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু এ সময়টুকুর জন্যে অ্যাসপিরিন খাই না। সকালে ঘণ্টা কয়েক যন্ত্রণা কম থাকে। আরম্ভ হয় দুপুরের পর থেকে। দুপুর হতেই আমিও আরম্ভ করি অ্যাসপিরিন। নাট্যভারতী যাই। ফিরি সাড়ে দশটায়, বাগবাজারে এগারটা—সেই রিক্‌শয় চেপে কাত হয়ে।

হঠাৎ পথে একদিন শিবরামবাবুর সঙ্গে দেখা। 'ভারতবর্ষ'-আপিসের কাছাকাছি। সেই প্রাণখোলা উচ্চ আহ্বান।

আরে বাপ রে! কি ব্যাপার মশাই? কি লিখছেন? 'কবি' আপনার ওয়াণ্ডারফুল! নাট্যভারতীতে আপনার নাটক হচ্ছে! আপনি গ্রে[redacted] রিয়ালি গ্রেট। একালের কেউ গল্প উপন্যাস নাটক তিন রকম লিখতে পারে না। প্রেমেন গ্রেট স্টোরি-রাইটার। কিন্তু উপন্যাস হয় নি ওর। 'পাঁকে' পসিবিলিটি ছিল। কিন্তু তারপর আর না। নাটক লেখেই নি।

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা। আমি হাসলাম প্রীতির হাসি, মুগ্ধজনের হাসি।

এতক্ষণে শিবরামবাবু বললেন, শরীর তো ভাল ঠেকছে না? কি ব্যাপার?

বললাম, অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি। অর্শে কষ্ট পাচ্ছি—অসহ্য যন্ত্রণা। ড্রাই পাইল্‌স্।

অর্শ!—শিবরামবাবু একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।—অর্শ! রবীন্দ্রনাথের ছিল, শরৎচন্দ্রের ছিল। আপনারও অর্শ! অদ্ভুত! আসুন আমার সঙ্গে।

টেনে নিয়ে গেলেন এক চাঁদসী চিকিৎসকের কাছে।—ডাক্তারে কি[redacted] করতে পারবে না। এঁরা ভাল ক'রে দেবেন। কিছু উপকার হ'ল চাঁদসীর ওষুধে। কিন্তু সে এমন কিছু নয়। 'দুই পুরুষে'র প্রথম অভিনয়-রাত্রি পর্যন্ত সমানে চালালাম অ্যাসপিরিন। 'দুই পুরুষে'র প্রথম অভিনয়-রাত্রিতে চমকে গেলাম। শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস যে অভিনয় করলেন, সে আমার কল্পনাতীত। বিমলা চরিত্রে ৺প্রভা দেবীর অভিনয় কল্পনার বাইরের জিনিস নয়। তেমনি অভিনয় ৺যোগেশ চৌধুরীর। আজ এ কথা উচ্চ কণ্ঠে বলব, নুটবিহারীর চরিত্র, সুশোভনের চরিত্র, গোপীনাথের চরিত্র নতুন প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাবে নতুন ব্যঞ্জনায় নতুন রূপ পাবে। হয়তো বা অধিকতর মনোজ্ঞ হবে। কিন্তু বড়বাবুর চরিত্রে যোগেশবাবু যে অভিনয় ক'রে গেছেন, সে আর হবে না, হবার নয়। প্রথম রাত্রিতেই মল্লিক সাহেব বললেন, এই বই আপনার হিট বই হ'ল। অনেক দিন চলবে এ বই। পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে ফিরে এলাম বাগবাজারে। সেই রিক্‌শয়। আমি জানি না, তখন বাগবাজারে র'টে গে[redacted] কানাকানি চলছে—থিয়েটারে বই হ'ল তারাশঙ্করের, তারাশঙ্করের খতম। এরই মধ্যে দুর্দান্ত মাতাল হয়ে গেছে। [ ক্রমশ ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

# সোমনাথ সান্যাল

( ধনপতি পাগ্‌লার ডায়েরি হইতে )

লছমিপ্রসাদের দোকানের বেতার-যন্ত্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের মজদুর-মণ্ডলীর আসর। ভারতের স্থাপত্যশিল্পের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গভীর তথ্য-গর্ভ বক্তৃতা বেতারী বাতাসে ছড়াচ্ছে বাংলার মজদুরদের জন্যে। বিড়ি বানাচ্ছে লছমিপ্রসাদ আর তার সহকারী ছেলেটা। কাল সন্ধ্যা। রাত্রি আসন্ন। আকাশে ঝিক্‌মিক্ করছে নক্ষত্রদল।

সানন্দা সান্যালের ফ্ল্যাট যে ছ-ফ্ল্যাটী বাড়িতে, তার কিঞ্চিৎ পূব-দক্ষিণে লছমিপ্রসাদের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান। তার আদি নিবাস দ্বারবঙ্গে; সেখানকার পিতৃদত্ত নাম বঙ্গদেশে সত্য ক'রে না তুলে সে ছাড়বে ব'লে মনে হয় না। গরমের দিনে ডাব আর ঠাণ্ডা শরবৎও মেলে তার দোকানে; সোডা-ওয়াটার আর লিমনেড মেলে বারো মাস। চুরুটের বাঁধা খদ্দের আছে ডজন আধেক, তাদের পছন্দ-চাহিদা-মাফিক চুরুট থাকে দোকানে। আর থাকে দিয়াশলাই। দোকানের দক্ষিণ সীমান্তে ঝুলন্ত একগাছা দড়ির নিচু ডগায় ভূষানলের মত ধিকিধিকি ঘুমন্তপ্রায় আগুন ধীরে ধীরে জ্বলে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শামুকগতিতে ওঠে ওপর দিকে; তাই থেকে বিড়ি সিগারেট চুরুট ধরিয়ে নেয় লছমিপ্রসাদের অনেক খদ্দের আর অনেক অখদ্দের—এ ব্যাপারে তার দোকান অবারিতদ্বার। এই দ্বারপথেই তার অনেক অখদ্দের ক্রমে ক্রমে ঢুকে পড়ে তার খদ্দের-মহলে।

এ পথ আমায় চেনে। কতবার এর পিচ-ঢালা বক্ষ মৃদুমুখর হয়ে উঠেছে আমার পদক্ষেপে, মহাকাল ছাড়া আর কেউ তার হিসেব রাখে না। লছমি-প্রসাদের দোকান যখন ছিল না এখানে, তখনও এ পথে করেছি অনেক যাওয়া-আসা। ওই ছ-ফ্ল্যাট-ওয়ালা তেতলা বাড়িটা তো এক রকম আমার চোখের সামনেই ফাঁকা জায়গার ওপর একটু একটু ক'রে ওপর দিকে গ'ড়ে উঠল। কত ইট, কত চুন, কত সুরকি, কত লোহা আর কত কাঠ! সবাই মিলে-মিশে হয়ে উঠল এক বাড়ি। এই এক বাড়ির তিনটি তলা; প্রত্যেকটি তলায় দুটি ফ্ল্যাট, আর প্রত্যেক ফ্ল্যাটে তিনটি ঘর। তিনতলার দক্ষিণী ফ্ল্যাটে থাকে সানন্দা সান্যাল—এ তথ্য আমায় দিয়েছে রাহুল রায়, আর জানিয়েছে ওই ফ্ল্যাটেরই মুখোমুখি উত্তরী ফ্ল্যাটে থাকেন বাড়িওয়ালা চন্দ্রকুমার সামন্ত আর

তাঁর সহধর্মিণী উত্তরা দেবী, যাঁর নাম থেকে বাড়িটির নাম করা হয়েছে উত্তরায়ণ। নামটা সিংহদ্বার-পথে সাদা পাথরের বুকে কালো হরফে ফুটে আছে। অনেকেরই চোখে পড়ে পথে যেতে যেতে, কিন্তু এ নামের পেছনের এই ইতিহাসটুকু অনেকেই জানে না। ভাবে, নামটা শান্তিনিকেতনী, রবি ঠাকুরের নকল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম তেতলায়। দক্ষিণী ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। বাইরে অতিথি-আগমন সংবাদ ভেতরে পাঠাবার জন্যে নেই কোন বিজলী ঘণ্টার বোতাম, যেমন আছে দময়ন্তী দালালের বাড়িতে। টোকা দিয়ে জানানি পাঠাতে হবে। ভালই হ'ল। পয়সাওয়ালা দিবাকর দালালের বাড়িতে বিজলী ঘণ্টা টিপেছি, নিষ্কপর্দক সোমনাথ সান্যালের বাড়িতে না হয় টোকা দিয়েই প্রবেশপথ পরিষ্কার করব। বিজলী ঘণ্টায় বিজ্ঞান আছে, কাব্য নেই; টোকায় বিজ্ঞান নেই, কাব্য আছে। মনে মনে বললেম, ঠিকই করেছ তুমি কলিং বেল না রেখে সানন্দা। ধন্য তুমি, এই পরম লোভ সংবরণ করেছ। চৌধুরী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সেক্রেটারি তুমি, অফিসে তো তোমার টেবিলে নিশ্চয় কলিং বেল আছে। ওইটে বাজিয়েই তো ডাকো বেয়ারাকে। আশ্চর্য! অফিসে এত কলিং বেল বাজিয়েও আপন ফ্ল্যাটে কলিং বেল আনাবার লোভ তোমার অদম্য হয়ে ওঠে নি! আবার বলি, ভালই করেছ সানন্দা। টোকা-ই আমাদের ভাল। কলিং বেল আমাদের মানায় না।

চিঠির বাক্স আছে দরজার পাশে। সে বাক্সের তালুতে সরু লম্বা ফাঁক, আর বুকে তালা লাগানো। নামও লেখা আছে: শ্রীসোমনাথ সান্যাল। লেখা নেই সানন্দা সান্যালের নাম। কিন্তু জানতেম, সানন্দার বাবার নামই সোমনাথ এবং আর বছর ত্রিশেক বাঁচলেই তিনি শতায়ু হবেন।

দরজার মাঝামাঝি দুটো কড়া আছে, কিন্তু মন আমার কড়া নাড়তে রাজী হ'ল না। তালা লাগাবার জন্যেই কড়া, নাড়িয়ে খটখট করবার জন্যে নয়। কড়া নাড়াটা এক রকমের আধুনিক বর্বরতা, টোকার ভেতর আছে যে কারু যে রহস্য, তা নেই কড়া নাড়ায় বা কলিং বেলের বোতাম টেপায়।

টোকা দিলেম দরজার বুকে—টক্, টক্, টক্। মৃদু, মৃদু, মৃদু। যেন ভেতর থেকে শোনা যায়, অথচ বিরক্ত করে না সানন্দাকে। এসেছে অফিস থেকে হয়তো

শ্রান্ত হয়ে। হয়তো এসে স্নানও করেছে সুরভিত সাবান গায়ে মেখে, তার সৌরভ জড়িয়ে আছে তার সারা দেহে। টোকার বেগ আর আবেগ বাড়াতে লাগলেম ধীরে, অতি ধীরে, সইয়ে সইয়ে। ক্রমে ক্রমে টোকার ধ্বনি কৌতূহল জাগাবে সানন্দার মনে। সে ধীরে ধীরে মৃদু পদক্ষেপে এসে দরজা খুলে বলবে—

কিন্তু দরজা যিনি খুললেন, আর ত্রিশ বছর বেঁচে থাকলে শতায়ু হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়। মনে হ'ল, তিনিই সোমনাথ, আমায় কিছু বলবেন ব'লে তিনি ভাষা খুঁজছেন। মনটাকে সংশয়ের দোলায় দুলিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই, সোজাসুজি প্রশ্ন ক'রে খোলাখুলি জেনে নেওয়াই ভাল। শুধালেম, চিঠির বাক্সের ওপর কি আপনারই নাম লেখা?

বৃদ্ধ বললেন, আমারই নাম। লিখিয়েছে সানন্দা। এ ওর একটা শখ ছাড়া আর কিছুই নয়। চিঠিপত্র বলতে তো মাসে একবার ক'রে ইলেক্‌ট্রিক বিল, তার জন্যে আবার একটা চিঠির বাক্স, তার ওপর আবার নাম লেখা! কি নাম বাবা তোমার? তোমায় যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না? অথচ কোথায়ই বা দেখব?

বললেম, আমার নাম ধনপতি। সানন্দা দেবীর অফিসে তাঁর সহকর্মী যে রাহুল রায়, আমি সেই রাহুলের বন্ধু। এসেছি সানন্দা দেবীর কাছে বিশেষ একটা প্রয়োজনে, রাহুলেরই তরফ থেকে। আমার নিজের তরফ থেকেও। অর্থাৎ রাহুল সম্বন্ধে যেমন জানাতে এসেছি, তেমনি জানতেও এসেছি।

সোমনাথ সান্যাল বললেন, আমি তো রাহুলকে কবি ব'লেই জানি। বিধাতার বিধানে রাহুল কেরানী আর অনুরোধে কবি। কিন্তু সানন্দা তো এখনও ফেরে নি ধনপতি। এই বুড়োর সঙ্গে ব'সে কিছুক্ষণ কথোপকথন করতে পার। বসবে?

প্রশ্ন নয়, আদেশ। অথবা আদেশও নয়, অনুরোধ। এমন আন্তরিক, এমন অন্তরস্পর্শী যে, প্রত্যাখ্যান অসম্ভব। দরজা বন্ধ ক'রে সোমনাথবাবু নিয়ে গেলেন তাঁর দক্ষিণ সীমান্তের ঘরে। খোলা জানলার ধারে লাল মোলায়েম মেঝের ওপর পাতলা মাদুর বিছানো, তারই এক দিকে বিছানা গোটানো রয়েছে। ঘুমের সময় হ'লে এই বিছানাই মাদুরের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে

তার ওপর দেহ ছড়ান সোমনাথ সান্যাল। ঘরের ভেতরটা একবার ডিটেকটিভী কায়দায় চোখ বুলিয়ে দেখে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। হয়তো আসবাব পছন্দ করেন না সোমনাথ, অথবা আসবাব পোষাতে পারেন না, তাই শয়ন করেন না পালঙ্কে। আর তক্তপোশ হয়তো তাঁর রুচির অনেক তলায়। তার চেয়ে মেঝে ভাল। একখানাও ক্যালেণ্ডার নেই তাঁর ঘরের কোন দেয়ালে। হয়তো ক্যালেণ্ডারের চেহারা সইতে পারেন না সোমনাথবাবু —ভুলে থাকতে চান জীবনের ক্যালেণ্ডার থেকে একটি একটি ক'রে দিন রোজ ঝ'রে যাচ্ছে। টিক্ টিক্ ক'রে মুহূর্তের পর মুহূর্তে মৃত্যু ঘোষণা করছে না কোন ঘড়ি। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে চান না সোমনাথ সান্যাল। ভুলে থাকতে চান যে, একদিন এই মাদুর আর এই বিছানা হয়তো থাকবে, কিন্তু তিনি থাকবেন না।

কিন্তু দিন-রাত্রির চাকা যে ঘুরে চলবেই, তাকে তুমি থামাবে কি ক'রে সোমনাথ? জানি, এত বছর বেঁচে থেকে থেকে বেঁচে থাকার অভ্যেসটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে; বেঁচে না-থাকার কল্পনাতে ও শিউরে ওঠে। কিন্তু বেঁচে যখন আর থাকবে না সোমনাথ, তখন দেখবে—থাকার চাইতে না-থাকাটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। চূড়ান্ত না-থাকার মহাসমুদ্রের পানে অগুনতি জীবনের নদী প্রতি মুহূর্তে ছুটে চলেছে; সে এক মহা পাইকারী ঘুম ছাড়া আর কি? রোজ রাত্তিরে তো খুচরো ঘুম ঘুমোও, ঘুম না হ'লে ঘুমের ট্যাবলেট খেতেও হয়তো কসুর কর না। আর তাতেও ঘুম না হ'লে হায় হায় কর। খুচরো ঘুমের হে খুচরো আরামী, পাইকারী ঘুমের পাইকারী আরামকে অত ভয় কেন?

খোলা জানলার পাশে পাতলা মাদুরের ওপর বসলেন সোমনাথ সান্যাল। পাশে বসলেম আমি।

সানন্দার চোখ দিয়ে আমি রাহুল রায়কে অনেক দেখেছি ধনপতি।— বললেন সোমনাথ, রাহুলের অনেক কবিতা আমায় আবৃত্তি ক'রেও শুনিয়েছে সানন্দা। জান তো আমি কবিতা বড় ভালবাসি? কতবার ইচ্ছে হয়েছে সানন্দাকে বলি—রাহুলকে একটিবার নিয়ে আয়। কিন্তু একটিবারও বলি নি। হ্যাঁ, রাহুল সম্বন্ধে কি জানতে এসেছ বলছিলে না?

বললেম, রাহুলের ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা। তাই—

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা!—আর্তস্বরে ব'লে উঠলেন সোমনাথ, বড় মারাত্মক। সানন্দা এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাতেই মাতৃহারা হ'ল। এইখানে, এই ঘরেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে গেছে সানন্দার মা। বেশি দিনের কথা নয় ধনপতি। ভেবেছিলুম, এক সঙ্গেই সাগর পাড়ি দেব; কিন্তু আমায় রেখে সে-ই আগে চ'লে গেল ভগবানের ছেলের কাছে।

ভগবানের ছেলে?

যীশুখ্রীষ্ট। ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট। খ্রীষ্টানের মেয়ে ছিল সানন্দার মা।—বললেন সোমনাথ সান্যাল, ওকে বিয়ে ক'রে আমি হিন্দু বাবার ত্যাজ্যপুত্র হয়েছিলুম। আমার আপনজন সবাই আমাকে একঘরে করেছিল। আর আমাকে বিয়ে ক'রে খ্রীষ্টান বাবার ত্যাজ্যা কন্যা হয়েছিল মাধবী; তার আপনজনেও সবাই একসঙ্গে তাকে ত্যাগ করেছিল। কবিগুরু ব'লে গেছেন 'আপনজনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।' আমাদেরও ভাবনা করা চলল না ধনপতি। আমরা দুজনে দুজনার হাত ধ'রে নির্ভাবনায় এগিয়ে চললুম জীবনের পথে। পর-হয়ে-যাওয়া আপনজনেরা পরে আবার আপন হবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু সে হাত আমরা আর গ্রহণ করি নি। সবিনয়ে তাদের বাড়ানো হাত ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিলেম, যে বাঁধন নিজে থেকেই একদিন তোমরা ভেঙে দিয়েছিলে তা আর জোড়া লাগবার নয়। আমার মন যদি বা নরম হ'ত, মাধবী তা কিছুতেই হতে দিত না। অভিমানে, আত্মমর্যাদায় কি আশ্চর্য কঠোর হতে পেরেছিল সে, অথচ কি কোমলই না ছিল তার হৃদয়! অনেক ভাগ্যে অমন মা পেয়েছিল সানন্দা। সোমনাথের মত বাবা রাস্তায় ঘাটে ঢের ফ্যা-ফ্যা ক'রে বেড়ায় ধনপতি, কিন্তু মাধবীর মত মা? আজ পর্যন্ত আমার চোখে আর একটি পড়ল না। অথচ জেনে রাখ, অনেক মা দেখেছি আমার এই দুটি চোখে।

সোমনাথ সান্যালের অনেক-মা-দেখা চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল তাঁর দুহিতা সানন্দার মাতৃভাগ্যের কথা ভেবে।

কিছুতেই যখন ছাড়বে না ধনপতি, তখন গোড়া থেকেই বলি। তারপর সানন্দা এলে তো আর কিছুই বলা যাবে না।—বললেন সোমনাথ সান্যাল,

মেয়েটা অনেক দুঃখ, অনেক ব্যথা পেয়েছে, অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়েছে জীবনে। এখনও যে সইছে না তাও নয়। তবে ভাল, এই ভাল ধনপতি। আমাদের মেয়েরা ললিতলবঙ্গলতা না হয়ে জীবনের ঝড়-ঝাপটা স'য়ে স'য়ে শক্ত মানুষ হয়ে উঠুক। তাহ'লেই ছেলেগুলোও মানুষ হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম ?

গোড়া থেকে খুলে বলবেন বলছিলেন।

হ্যাঁ, গোড়া থেকেই বলি শোন। তোমরা এখন হয়তো একে প্রেম বলবে। আমরা বলতুম অনুরাগ। বাবা যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করেছিলেন, সে মেয়েটি গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের। শুনেছিলুম দেখতে শুনতে ভালই, বাপও পয়সা-ওয়ালা আর পয়সা-দেনেওয়ালা। বিশেষ ক'রে তখনকার দিনে বি. এ. পাস করেছি, সঙ্গে সঙ্গে একরকম ঘর থেকে টেনে নিয়েই চাকরি দিয়েছে, পাত্র হিসেবে মেয়ের বাপের কাছে পরম লোভনীয়। সুতরাং দরাজ গলায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, দেবেন-থোবেনও ভাল। ইংরিজী শিক্ষার কুফল তখন আমার ভেতর ফলেছে, ইংরিজী কাব্যের নায়িকাদের জীবন্ত ছবি জ্বল্‌জ্বল্ করছে সবুজ মনে।

শুনলুম, আমার ভাবী বধূ পরম সুশীলা, পরম অশিক্ষিতা, পরম লজ্জাবতী, নাম তার ক্ষেমঙ্করী। এমনি সময় এক রবিবারের ভোরবেলা দেখলুম মাধবীকে, সে চলেছে গির্জায় প্রার্থনাদলে যোগ দিতে। তার এক বান্ধবীর মুখের ডাকে জানলুম, তার নাম মাধবী। ক্ষেমঙ্করী নাম শুনে ক্ষেপে ওঠা মনে মাধবী নামটুকু যে কি মধু ঝরাল ধনপতি, তা তোমাকে বোঝাতে গেলে রাত ভোর হয়ে যাবে। আমি চ'লে গেলুম মাধবীর সঙ্গে গির্জায়। এই গির্জার পাশ দিয়ে গেছি অনেকবার। দেখেছি গির্জার বাইরের দেয়ালে ত্রাণকর্তা যীশুর বিজ্ঞাপন, বড় বড় হরফে ভুল বাংলায়। শুনেছি অনেক আহ্বান। কোনও টানেই যাই নি গির্জার ভেতরে। সেদিন মাধবীর টানে যেতে হ'ল; গেলুম সানন্দে। গির্জার অর্গ্যান বেজে উঠল মধুর গম্ভীর আওয়াজে, বড় হল সুদ্ধ সবাই একসঙ্গে গেয়ে উঠল প্রার্থনা-গান। এক বর্ণও বোধগম্য হ'ল না আমার অনভ্যস্ত কানে, কিন্তু কানে যেন ঝরল মধু আর প্রাণ ভ'রে উঠল নতুন আনন্দে। তারপর মাধবীর সঙ্গে আলাপ, আলাপ মাধবীর বাবা-মার সঙ্গে। ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'এমনি করিয়া প্রেম

জন্মিল'। মাধবীর বাবা খ্রীষ্টধর্মের একজন প্রচারক, গোঁড়া খ্রীষ্টান। সনাতন হিন্দুধর্মের পুরাতন অন্ধকার থেকে জনৈক গ্র্যাডুয়েট যুবককে ত্রাণকর্তা যীশুর কৃপার আলোতে আনবার সুযোগের সম্ভাবনায় তিনি পুলকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে যীশুর চরণে আত্মসমর্পণ না করলে মাধবীকে তিনি আমার হাতে সম্প্রদান করবেন না—এ কথাটা প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। তারপর কি হ'ল তা তোমায় আগেই বলেছি ধনপতি।

আপনাকে বিয়ে ক'রে সানন্দা দেবীর ভাবী মা কি খ্রীষ্টকে ছেড়েছিলেন?

না। ওঁকে বিয়ে ক'রে কৃষ্ণভক্ত আমিও কৃষ্ণকে ছাড়ি নি।—বললেন সোমনাথ সান্যাল, ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে যার যার কল্পনা। ব্যক্তিগত ব্যাপার। ও নিয়ে এত কষাকষি, এত রেষারেষি—এ বড় দুঃখের কথা ধনপতি। এ ওর ধর্মে কুসংস্কারের গন্ধ পাচ্ছে। অথচ তলিয়ে দেখতে গেলে প্রত্যেক ধর্মের গোড়াতেই কুসংস্কার; অন্ধ বিশ্বাস। আর শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, বিজ্ঞান-বিরোধী অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী, যা ধোপে টেকে না। ভেবে দেখ ধনপতি, সেই সুদূর প্রাচীনকালে যখন এখনকার চালু ধর্মগুলোর প্রথম উৎপত্তি হয়েছিল তখন, সাধারণ মানুষ এখনকার সাধারণ মানুষের চাইতেও কত বেশি মূর্খ, অবৈজ্ঞানিকবুদ্ধি আর সহজবিশ্বাসপরায়ণ ছিল। অতি সাধারণ ঘটনার সাধারণত্বটুকুও মাঝে মাঝে তাদের চোখ এড়িয়ে গিয়ে নিতান্ত লৌকিক ব্যাপারও তাদের কাছে প্রতীয়মান হ'ত অলৌকিক ব'লে।

এবারে সোজা প্রশ্ন ক'রে বসলুম, খ্রীষ্টধর্মে কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

সোমনাথ সান্যাল বললেন, এর জবাব নির্ভর করবে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বাস করা বলতে তুমি কি বোঝ, তার ওপর। যে প্রশ্ন করেছ, সে প্রশ্নের মানে নিজেই হয়তো জান না। মানুষকে বৃহত্তর মহত্তরের দিকে নিয়ে যাওয়াতেই ধর্মের সার্থকতা, সেই তো তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে দেখছি, চিরদিনই ধর্ম দাঁড়িয়েছে দলে-ভেড়ানো আর দলে-ভেড়ার ব্যাপারে। ধর্মের নামে দুনিয়ায় যত মাথা ফেটেছে আর খসেছে, আরও নানা জাতের জঘন্য অপকর্ম সাধিত হয়েছে, তার আদমসুমারী দেখতে পেলে ক্ষেপে উঠবে। দুনিয়ার মানুষকে ধর্ম কত দিয়েছে লাভ আর কত দিয়েছে লোকসান; তার একটা ডেবিট-ক্রেডিটের হিসেব কষা বোধ হয় দরকার হয়ে পড়েছে।

আমি বললেম, ও বড় শক্ত হিসেব সোমনাথবাবু। যে-সে হিসেবজ্ঞের কর্ম নয়। ও থাক্। ধর্মকে জনগণের আফিম ব'লে কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন। ধর্মকে তেমনি জনগণের জোরালো ব্র্যাণ্ডিও বলা যেতে পারে। 'ধর্ম বিপন্ন' জিগীর তুলে জনগণকে চট ক'রে ক্ষেপিয়েও তোলা যায়। রাজনীতির দুর্নীতির চাকায় ধর্মকে বেঁধে ঘোরানো হয়ে থাকে, এ তো অনেকই দেখেছি। দেখছিও। আরও দেখতে হবে, কেন না, দুনিয়ায় অন্তত আরও কয়েক শতাব্দী ধর্মও থাকবে, রাজনীতিও থাকবে।

বাস্তব রাজনীতিই বল, আর রাজনীতির তত্ত্বই বল, ওসব আমি ভাল বুঝতে পারি নে ধনপতি।—বললেন সোমনাথ, ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা থাকলেই ভাল, নীতির দিক থেকে এইটে বুঝি। কিন্তু রাজনীতি হচ্ছে আসলে কূটনীতি, তাই রাজনীতি ভাঙিয়ে যারা খায় তারা মতলব হাসিল করবার জন্যে ধর্মকেও কাজে লাগাতে এক ফোঁটা দ্বিধাই বা করতে যাবে কেন? কিন্তু এসব জাহাজের ব্যাপারে আদার ব্যাপারী আমাদের কোনও দরকার নেই। আমি শুধু ভাবি, কি বিশ্বাস বুকে নিয়েই না সানন্দার মা চিরবিদায় নিয়ে চ'লে গেছে! সে দৃশ্য একবার ভাববার চেষ্টা কর ধনপতি। ম্যাণ্ডেভিলা নার্সিং হোমের দোতলার একখানা ঘর। সানন্দার মা শুয়ে আছে খাটের ওপর আরাম-বিছানায়। চমৎকার অদ্ভুত খাট! খুশিমত উঁচু-নিচু করা যায়, ইচ্ছামত হেলানো যায় যেদিকে যেমনটি দরকার। খাটের পায়ে পায়ে রবারের চাকা। অনায়াসে নিঃশব্দে খাটের অবস্থান বদলানো যায় ঘরের যেখান থেকে যেখানে খুশি, যেমন নিঃশব্দে হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে সময়ের স্রোত। দাঁড়িয়ে আছি আমি, আছে সানন্দা। দুজন নার্স। লণ্ডন, ভিয়েনা, শিকাগো, বের্লিন, টোকিও, রোম ঘুরে আসা ডাক্তার সেনগুপ্ত। সূচিকাভরণ হয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলেন ডাক্তার। লক্ষ্য ক'রে বিষণ্ণমুখে—ঝানু ডাক্তারের পক্ষে যতটা বিষণ্ণ হওয়া অসম্ভব নয়—মাথা নাড়লেন তিনি। অর্থাৎ মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। কাছে গিয়ে মার কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিলে সানন্দা। একবার আমার পানে তাকালে সানন্দার মা—চোখে তার পিছে-ফেলে-আসা কিশোরী মাধবীর দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন হাতছানি দিয়ে ডাক দিলে পিছে-ফেলে-আসা তরুণ সোমনাথকে। গেলুম

এগিয়ে কাছে। মাধবীর পাশে ব'সে সোমনাথ কোলে তুলে নিলে মাধবীর একখানা হাত। আপন হাতে বুলিয়ে দিতে লাগল সেই হাতে।···

আনমনা হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ সোমনাথ সান্যাল। মনে হ'ল, আমার কাছে ব'সেও অনেক দূরে চ'লে গেছেন তিনি।

মুখে কিছু বললে না সানন্দার মা। বোধ করি কিছু বলতে পারলে না।—আবার বলতে লাগলেন সোমনাথ সান্যাল, দুর্বল ক্ষীণ ডান হাত দিয়ে যা করলে, তা দেখে বুঝলুম, বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আমি এঁকে দিলাম ক্রশ-চিহ্ন। ক্রীশ্চিয়ান নার্সটি এল এগিয়ে। তার সাদা গাউনের ওপরে কালো সুতোয় বুকে দোলানো পবিত্র ক্রশ-চিহ্ন। কালো কাঠের তৈরী ছোট্ট ক্রশ, আর সেই ক্রশে পেরেক-বিদ্ধ ত্রাণকর্তা যীশু। ওই দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল সানন্দার মার মুখে। পরম নিশ্চিন্ত শান্তির হাসি। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল মাধবী। মুখে তখনও সেই হাসিটুকু লেগে আছে। তার সেই ঘুম আর কোনদিন ভাঙল না ধনপতি।

অথচ উত্তরায়ণের তেতলার এই ঘরে সানন্দার মা শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন—বলেছিলেন সোমনাথ। হয়তো এ ঘরের বাইরে ত্যাগ করা নিশ্বাসকে সোমনাথ নিশ্বাস ব'লে স্বীকার করেন না। কল্পনায় ভেসে উঠল, এ ঘর থেকে সানন্দার মায়ের শেষ বিদায়-দৃশ্য। গাড়ি এসেছে তাঁকে ম্যাণ্ডেভিলা নার্সিং-হোমে নিয়ে যেতে। সেখানে তাঁর চিকিৎসা আর শুশ্রূষা হবে বাড়ির চাইতে অনেক ভাল। দুপুরবেলা অফিসে নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে সানন্দা। যদি দরকার হয় নার্সিং-হোম থেকে ফোনও করতে পারবে তাকে তার অফিসের ফোন নম্বরে। নার্সিং-হোমের খরচা অনেক, কিন্তু সেজন্যে তৈরী সানন্দা। মস্ত চৌধুরী কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভুজঙ্গ চৌধুরীর সেক্রেটারি সে।

তুমি প্রশ্ন করছিলে ধনপতি, খ্রীষ্টধর্মে আমি বিশ্বাস করি কি না!—বললেন সোমনাথ সান্যাল, মাঝে মাঝে মনে হয় ধর্মোপদেশদাতা যীশু হয়তো আদৌ ক্রশবিদ্ধ হন নি। ক্রশে যে বিদ্ধ হয়েছিল সে অপর কেউ। কিম্বদন্তীর যাদুতে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চেপে দুটি আলাদা মানুষ এক হয়ে মিশে গিয়ে অমরত্ব লাভ করলে ক্রশবিদ্ধ ত্রাণকর্তা যীশুর রূপে। যেমন, অনেক পণ্ডিত বলেন, ইলিয়াড আর অডিসি কাব্য সব একজনের লেখা নয়, বিভিন্ন

ব্যক্তির লেখা—সেই বিভিন্ন ব্যক্তি মিশে হয়েছে একটি হোমার, আর সেই হোমারেরই নামে চ'লে আসছে ইলিয়াড অডিসি। যে-রূপী যীশুর কথা দুনিয়ার অগুনতি লোকের মুখে, সে-রূপী যীশুর হয়তো কোন বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না। কিম্বদন্তীর পর কিম্বদন্তী জড়িয়ে জড়িয়ে, লৌকিকের সঙ্গে অলৌকিক মিশে, এমন একটা মনোমোহন রূপকথা দাঁড়িয়ে গেল যাকে বাতিল ক'রে দিতে মানুষের হৃদয় রাজী হ'ল না। আর দুনিয়ার মানুষ হৃদয়েরই দাসত্ব করে, বুদ্ধির নয়।

একটু থেমেই আবার বললেন, কিন্তু কি দরকার আমার রক্তমাংসের বাস্তব অস্তিত্বের কথা ভেবে? ধ'রে নিলেম, যীশুখ্রীষ্ট রক্তমাংসে কেউ সত্যি সত্যি ছিল না, ক্রশ-বেঁধার কাহিনীও রূপকথা মাত্র। তবু, ম্যাগ্ডেভিলা নার্সিং-হোমে নার্সের বুকে ক্রশবিদ্ধ যীশুর ক্ষুদে মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে ত্রাণকর্তা যীশুর কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী যে গভীর শান্তিতে চোখ বুজেছিল, তার দাম তো কম নয়। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় দুনিয়ায় রক্তমাংসের বাস্তবটাই একমাত্র দামী বাস্তব নয়, কল্পনার রাজ্যে যে বাস্তব তাও মূল্যবান, কখনো বা অমূল্য।

আমি বললেম, তলিয়ে দেখলে তাই তো বটে। আপনি তো কৃষ্ণের ভক্ত। ভেবে দেখেছেন কি, শ্রীকৃষ্ণ কতটা রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন, আর কতটা কিম্বদন্তী আর কল্পনা?

সোমনাথ বললেন, ছেলেবেলায় বাঁশীর সুর বড় ভাল লাগত ধনপতি। অনেক বাঁশী শুনেছি আর বাজিয়েছি পদ্মানদীর ধারে। বাঁশী-ভক্তি থেকেই বাঁশীয়াল শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি হ'ল। তারপর ব্রজলীলা, বৃন্দাবনলীলা, কুরুক্ষেত্রে গীতার উপদেশ—এ সবে মন আরও দিলে ভুলিয়ে ভুলিয়ে। ভগবানের অবতার ব'লে শ্রীকৃষ্ণকে কল্পনায় মেনে নিয়েছি; বিশ্বাস করি ব'লে নয়, ভাল লাগে ব'লে। মানুষ স্বপ্নবিলাসী জাত। যদিও এইটে অনেক মানুষই সহজে বোঝে না। থাক্ এ সব কথা। এ জাতের আলোচনা শুরু করলে মুখে খই ফোটে, কিন্তু খেই হারিয়ে ফেলি, সময়েরও হিসেব ভুলে যাই। তা ছাড়া খোঁচা লেগে অনেক পুরনো ব্যথা নতুন ক'রে জেগে ওঠে।

শুধালেম, পদ্মাপারে ছিলেন বলছিলেন না?

সোমনাথ বললেন, বলছিলেম ধনপতি। পদ্মাপারেই জীবনের বারো আনা কাটিয়ে এলাম। উদয়াচল ছেড়ে অস্তাচলে এসেছি অস্ত যেতে। নিয়তির বিধান।

না হাসলেই ভাল ছিল। কিন্তু তিনি হাসলেন। সে হাসি দেখে আমাকেও হাসতে হ'ল একটু—না হ'লেই ভাল হ'ত।

এসেছি, মানে, আসতে হয়েছে।—যোগ করলেন সোমনাথবাবু, নিয়তির দুরন্ত তাড়া খেয়ে। ভেবেছিলেম, শেষজীবনটা শান্তিতে স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে যাব। কিন্তু ভারতের ইতিহাসে এল সর্বনেশে ভূমিকম্প, তচনচ ক'রে দিয়ে গেল আমার জীবনের ইতিহাসটাকে। দু দিকে ছোট হয়ে গেল ভারত—পূর্ব পশ্চিম দু দিক থেকে দুটি টুকরো খ'সে পড়ল। সেই খ'সে-পড়া বিচ্ছিন্ন দুটি টুকরো হ'ল এক নতুন রাষ্ট্র—সেই পবিত্র রাষ্ট্রে অপবিত্রদের স্থান নেই ধনপতি। তবু সেখানেই ভিটেমাটি আঁকড়ে প'ড়ে ছিলুম। কিন্তু চ'লে আসতে হ'ল। শুধু প্রাণভয়ে নয়, যে ভয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল তা প্রাণভয়ের চাইতে বেশি। মরণের চাইতে মারাত্মক।

ভূগোল, ইতিহাস আর রাজনীতির ভার বা ধার সইতে পারি নে আমি। এদের ত্রিশূলী আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলেম না। বললেম, ও কথা থাক্ সোমনাথবাবু। অতীতের ব্যথার সুরে হৃদয়-বীণার তার বেঁধে কেন আর মিছে কেঁদে মরা? পিছে যা ফেলে এসেছেন তা পিছেই প'ড়ে থাক্; সামনের আলোয় ভুলে যান পিছনের অন্ধকার।

কিন্তু সামনে কোথায় আলো? আর ভুলে গেলেই কি সানন্দার দাদাকে ফিরে পাব ধনপতি?—বললেন সোমনাথ সান্যাল, আমার চোখের সামনে তাকে ওরা হত্যা করলে। উদ্যত আগুনী হাতিয়ার তারই বক্ষ লক্ষ্য করা দেখে ছুটে গেলুম সামনে, আমার বুক পেতে দিয়েও তাকে বাঁচাতে পারলুম না। শুনলুম একটা আওয়াজ, সঙ্গে সঙ্গে একটা বুকফাটা আর্তনাদ। তারপর সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। যখন চোখ খুললুম, দেখলুম দল বেঁধে যারা এসেছিল, তারা চ'লে গেছে। গেছে আমাকে পুত্রহারা ক'রে রেখে। বাড়ির অন্দর থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে মাধবী, সানন্দা—সদ্য-পুত্রহারা জননী, সদ্য-ভ্রাতৃহারা ভগ্নী। কাঁদছে না তারা, এক ফোঁটা জল নেই একটি চোখে, বুকের ভেতর কান্না শুকিয়ে পাথর হয়ে গেছে। জীবনে সেই আমার প্রথম পুত্রশোক, সেই আমার শেষ পুত্রশোক, কিন্তু সেই শোক আর শেষ হ'ল না ধনপতি। শঙ্কর আমার বুক খালি ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে।

রাস্তায় লছমিপ্রসাদের পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকানে রেডিওতে তখন মজদুর-মণ্ডলীর আসর শেষ হয়ে গেছে; কোনও এক সদ্য-পুত্রবিয়োগ-বিধুর তরুণ পিতা কেঁদে কেঁদে আধুনিক গান গাইছেন মিহিকণ্ঠে।

বললেন সোমনাথ সান্যাল, ভাবি, মানুষ কত অসহায় বিশ্বব্যাপী সেই অকল্যাণ শক্তির হাতে, ইংরিজী ভাষা যার নাম দিয়েছে 'ইভিল'। মানুষকে এই পুতুল-নাচ নাচায়, তাই দুনিয়ায় আজ মানুষই মানুষের সেরা শত্রু, মানুষের জন্যেই আজ পৃথিবীর মানুষ ভালভাবে বাঁচতে পারছে না। পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ জাতটাকে তুলো ধুনে উড়িয়ে দেবার সাধনায় মেতেছে মানুষ। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব পড়েছ ধনপতি?

কেন বলুন তো?

কেন, তা বললেন না সোমনাথ সান্যাল। মনে হ'ল কল্পনা-চোখের সামনে বাইবেলের সৃষ্টিপর্ব খুলে তিনি মুখে মুখে তর্জমা ক'রে যাচ্ছেন:

আদিতে ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন স্বর্গ আর পৃথিবী। পৃথিবী ছিল আকারবিহীন, ফাঁকা। বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর ব্যাপ্ত ছিল অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। ঈশ্বর-আত্মা সেই জলরাশির ওপর বিচরণ করলেন। ঈশ্বর বললেন, 'আলোর আবির্ভাব হোক।' আবির্ভূত হ'ল আলো।...এই হ'ল আদিম অন্ধকারের বক্ষ ভেদ ক'রে প্রথম আলো-আবির্ভাবের বাইবেলী ইতিহাস। পুরাতন বাইবেলের সৃষ্টিপর্বে লেখা। তার পরের ইতিহাস শোন ধনপতি।...সৃষ্টির পালা সাঙ্গ ক'রে ঈশ্বর পড়লেন ঘুমিয়ে। ভাবলেন, চালু ক'রে দিলেম যে রথ তার চলার বেগ থেকেই সৃষ্টি হবে নতুন বেগ; এ রথ চলবে বেগ থেকে বেগান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। এই ভেবে ঘুমিয়ে পড়লেন ঈশ্বর। এখনও ঘুমোচ্ছেন। কান পাততে জানলে শুনতে পাবে তাঁর নাক ডাকার ধ্বনি।

ব'লে একটুখানি কান পেতে বোধ করি নিদ্রিত ঈশ্বরের নাসিকা-ধ্বনি শোনবার চেষ্টা করলেন সোমনাথ সান্যাল। দৃষ্টি তাঁর নীচে রাস্তায় লছমিপ্রসাদের দোকানের দিকে। ওরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফেরে সানন্দা।

দুনিয়ায় বহু প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। বহু নদী খুঁজে পায় না সমুদ্র। অগুনতি পান্থের পাথেয় ফুরিয়ে যায়, পথ ফুরোয় না; কারও বা পথ ফুরিয়ে যায়, ফুরোয় না পাথেয়। কিন্তু সানন্দা-প্রতীক্ষা শেষ হ'ল, ফিরে এল সানন্দা। মৃদু পরিচয়

করিয়ে দিলেন সোমনাথবাবু। হালকা অজুহাতে একবার সোমনাথবাবুকে ঘরান্তরে পাঠিয়ে সেই স্বল্প ফাঁকে বললে সানন্দা, বাবা নিশ্চয় এতক্ষণে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন ধনপতিবাবু? ওঁর সব কথা বিশ্বাস করলে কিন্তু খুব ঠকবেন।

তবে কি ওঁর সব কথা অবিশ্বাস করব?—শুধালেম।

তা হ'লে আরও বেশি ঠকবেন।—ব'লে হাসলে সানন্দা। ঘন্টান্তর থেকে ঘরে ফিরলেন সোমনাথ সান্যাল। তাঁর জিম্মায় আমায় রেখে সাময়িক বিদায় নিয়ে স্নান-কামরায় চ'লে গেল সানন্দা, স্নান ক'রে স্নিগ্ধ হয়ে ফিরবে।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

# কবিয়ালি

হে রাজকন্যে, বাইরে দাঁড়াও আসি
তোমার বাগানে ফুল ফোটে রাশি রাশি—
বেল মল্লিকা জুঁই ফুল রাশি রাশি।

দুপুরে কোথায় ঝরনার জলে
হীরে মোতি আর পোখরাজ জলে
চায় ফিরে মুসাফির।

আকাশের পারে এক ঝাঁক পাখি ছড়াল শুভ্র হাসি।
একমনে ব'সে আলের ওপর ঘাস্থড়ে বাজায় বাঁশি।

রাজহংসের মত উঁচু বুক মুখখানা স্থলপদ্ম গো
তুহিন-শীতল ফোয়ারার জলে স্নান ক'রে এল সদ্য গো।

ঘাস্থড়িয়া ভাই, শোন কথা শোন, হও যদি মোর মিতা,
তোমার বিহনে আহা কন্যের রাজভোগ লাগে তিতা।

শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

# ডানা

( পূর্বানুবৃত্তি )

ডানা আবার সন্ন্যাসীর কাছেই গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না, কারণ আনন্দমোহনবাবুর চ'লে যাওয়ার ঠিক পরেই রূপচাঁদ এসে হাজির হয়েছিলেন আবার। রূপচাঁদের ব্যবহারে কোনরকম অশোভনতা ছিল না, কিন্তু তাঁর দৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে শাণিত ছুরিকার ঝলক চকমক ক'রে উঠছিল যেন মাঝে মাঝে। যাওয়ার আগে তিনি ব'লে গিয়েছিলেন, এখন আমি চললুম। কিন্তু আবার আসব। একবার নয়, বার বার। ওই নীলকণ্ঠ পাখিটা তার সঙ্গিনীকে ঘিরে যে উৎসব করছে, একবার উড়ে চ'লে যাচ্ছে দূরে আবার ফিরে আসছে দ্বিগুণিত উৎসাহে কলকণ্ঠের উচ্ছ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত ক'রে, তা কি দেখতে পাও না তুমি? বাইনাকুলার চোখে দিয়ে কি দেখ তা হ'লে? ওইটেই তো দেখবার মত একমাত্র সত্য। শুধু পক্ষী-জগতে নয়—সর্বত্র। আর একটা জিনিসও এতদিন তোমার হৃদয়ঙ্গম করা উচিত ছিল, চোখে পড়া উচিত ছিল অন্তত। পাখিদের মধ্যে এটা কি তুমি লক্ষ্য কর নি যে, যে পুরুষ-পাখিটা বেশি শক্তিমান সেই অবশেষে প্রণয়-দ্বন্দ্বে জয়ী হয়? শক্তিরই জয় সর্বত্র। বিদেশের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক—সবাই এই কথাই বলছেন। ডারবিনের 'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট' আর নীট্‌শের 'সুপারম্যান' একই তথ্যের দুটো দিক। আমাকে তুমি কি অক্ষম মনে কর? শক্তির পরিচয় যেদিন চাইবে, যেমন ভাবে চাইবে, পাবে। এমনও হতে পারে যে, না চাইলেও পাবে। এখন চললুম, কিন্তু আবার আসব। হয়তো অসময়ে অতর্কিতে আসব···

ডানার দিকে চেয়ে একটু হেসে চ'লে গিয়েছিলেন তিনি। ডানা কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে বসেছিল খানিকক্ষণ, তারপর সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিল।

সমস্ত শুনে সন্ন্যাসী হাসিমুখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ইতিহাস পড়েছ তুমি?

পড়েছি কিছু কিছু।

তা হ'লে তোমার জানা উচিত ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়াটা অসভ্যতার লক্ষণ। মানুষ যখন খুব অসভ্য ছিল, তখন তার পশু-প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করত কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। কিন্তু চারিদিকে যে অদৃশ্য শক্তির প্রতাপ সে

অনুভব করত, যার প্রভাব সে কিছুতেই অগ্রাহ্য করতে পারত না, যার প্রকাশ সে দেখত ঝড়ে-ঝঞ্ঝায়, বজ্রে-বিদ্যুতে, দুর্ভিক্ষ-মহামারীতে, হিংস্র জন্তুতে, তার রূপ ভয়ঙ্কর ছিল তার কাছে। সেই ভয়ঙ্কর কল্পনা যখন দেবতারূপে মূর্ত হ'ল তাদের সমাজ-জীবনে, তখন সে দেবতাও হ'ল ভয়ঙ্কর। তার রূপ হ'ল রক্তপায়ী পিশাচের রূপ। যে সব সভ্যতা অতি প্রাচীন, যেমন ধর—ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, উর, তাতে তুমি কোনও সুন্দর দেবতার সাক্ষাৎ পাবে না। সবই বীভৎস। পশু আর মানুষে মিলিয়ে, দু রকম পশুর সংমিশ্রণ ক'রে যে সব দেবতার মূর্তি তারা নির্মাণ করেছিল তা ছিল তাদের ভয়েরই প্রতীক। মানুষ আরও যখন সভ্য হ'ল, তখন ভয় কমতে লাগল। ও-দেশে বোধ হয় গ্রীসেই প্রথম মানুষের রূপে ভগবানকে কল্পনা করা হয়েছে। আমাদের দেশে বোধ হয় তারও আগে। আমাদের দেশে চিন্তা-ধারা আরও নানাভাবে এগিয়েছে। ভগবানকে আমরা নিজেদের মধ্যেই পেয়েছি, আমরাই বলেছি সোহং, আমরাই জেনেছি প্রেমই ভগবান, আমরাই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। যদিও নানাভাবে নানা সাধক নানা পথে এগিয়েছেন, প্রত্যেকের পথ আলাদা আলাদা হয়েছে, হয়তো বিপরীতমুখী হয়েছে, কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই একমত—ভয়কে কেউ আমল দেন নি, ভয়ের স্থান কোথাও নেই। আমাদের দেশে আত্মার অপর নামই অভয়। তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? রূপচাঁদবাবু কি করবেন তোমার?

যদি অপমান করেন?

সম্মান মানেই আত্মসম্মান। তুমি ছাড়া তোমার সম্মান আর কেউ তো ক্ষুণ্ণ করতে পারে না—

যদি জোর ক'রে গায়ে হাত দেন?

দিলেনই বা। তোমার যদি খারাপ লাগে, বাধা দেবে। তোমার যতটুকু সামর্থ্য আছে তাই দিয়েই প্রতিবাদ করবে—

তা তো করবই। কিন্তু আমার শক্তি আর কতটুকু বলুন?

যতটুকু আছে প্রতিবাদ করবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তোমার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও ও-লোকটা যদি তোমাকে অভিভূত ক'রে ফেলে তা হ'লে তোমার আত্মসম্মান নষ্ট হবে না। তা ছাড়া তোমার যে আসল 'তুমি' তার

গায়ে কেউ হাত দিতেই পারে না। তোমার দেহটা তুমি নও। তুমি ভয় ত্যাগ কর। তা ছাড়া তোমার কাছে চাকর থাকে তো একজন?

তা থাকে। কিন্তু আমার সন্দেহ, চাকরটাও ওঁর দলে। উনিই যোগাড় ক'রে দিয়েছিলেন লোকটাকে। সেদিন দেখলাম, একটা রঙিন জামা আর জুতো কিনে দিয়েছেন। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না।

সন্ন্যাসী আবার কিছুক্ষণ হাসিমুখে থেকে বললেন, আত্মবিশ্বাস ছাড়া আর কোনও বিশ্বাসই টেকে না শেষ পর্যন্ত। নিজের শক্তিতে আস্থাবান হও, ভয় পেও না। ভয়টা মিথ্যা, একমাত্র সত্যই অভয়—

আপনি আমার কাছে গিয়ে থাকবেন চলুন। আমি বাইরের ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।

পরিষ্কার আমি নিজের হাতেই ক'রে নিতে পারি। কিন্তু তোমার ওখানে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। বাধা আছে।

কিসের বাধা?

তা ঠিক তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।

ডানার কান দুটো লাল হয়ে উঠল। লজ্জায় নয়, রাগে। রাগটা হ'ল তার নিজেরই ওপর। ঠিক এই প্রসঙ্গ নিয়ে আর একবার আলোচনা হয়েছিল, ঠিক এই একই অনুরোধ করেছিল সে সন্ন্যাসীকে—তখনও তিনি ঠিক এমনই ভাবে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সেদিন আরও স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, নারীসঙ্গ বিষবৎ আমার পক্ষে। তবু সে কোন্ লজ্জায় ওই একই প্রসঙ্গ তুলেছে আবার! কিন্তু এ অবস্থায় সে করবেই বা কি? হঠাৎ কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে।

চিনতে পারছ?

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে অবাক হয়ে গেল। স্বয়ং রত্নপ্রভা দাঁড়িয়ে। গোলগাল কালো মুখটি হাসির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। হাতে একটি বেঁটে ছাতা, বগলে ফাইল। ডানা কি যে বলবে ভেবে পেল না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল শুধু। বললে, আপনি আসবেন কোন খবর পাই নি তো?

খবর দেওয়ার সময় ছিল না। একাই এসেছি। আনন্দবাবুর বিপদের খবর পেয়ে মনে হ'ল, নিজে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। আমি এসেছি

সকালে। এসেই সদরে গিয়েছিলাম, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আর পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে তিনি নমস্কার করলেন। হাসিমুখে বললেন, আপনি এখনও আছেন এখানে?

এইবার যাব।—সন্ন্যাসীও হাসিমুখে উত্তর দিলেন।

ডানা জিজ্ঞেস করলে, এখানে এসেছেন কতক্ষণ আগে?

এখুনি। সোজা স্টেশন থেকেই তো আসছি। তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। চাকরটার কাছে শুনলাম—তুমি এখানে আছ, তাই এখানেই চ'লে এলাম।

স্মিতমুখে ডানার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অকারণে ডানার কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। মনে হতে লাগল, সে যেন একটা দুষ্কার্য করছিল, হঠাৎ ধরা প'ড়ে গেছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, চলুন, আপনার নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করি তা হ'লে।

সে সব সেরে এসেছি আমি সদরে। চা খাব একটু।

চলুন।

কিছুদূর এসে রত্নপ্রভা প্রশ্ন করলেন, সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে ভাব হ'ল কি সূত্রে?

সূত্র কিছু নেই, এমনি আলাপ করেছিলাম একদিন নিজেই গিয়ে। অদ্ভুত চরিত্রের লোক, নিজেকে নিয়েই থাকেন ওই ভাঙা ঘরে। নদীর চরে একা একা ঘুরে বেড়ান। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে গল্প করি।

আমাদের পাখিগুলোর খবর কি?

মাঝে মাঝে ম'রে যাচ্ছে দু-একটা।

তা তো যাবেই। চা খেয়ে যাব একবার দেখতে। তারপর হেসে বললেন, দেখবার মত বিদ্যে নেই অবশ্য আমার। আমার দৌড় লাহা মশায়ের 'পেট বার্ডস অব বেঙ্গল' (Pet Birds of Bengal) পর্যন্ত। ওঁর সঙ্গে এতদিন থেকেও বিদ্যে বিশেষ বাড়ে নি। তোমার কেমন লাগছে?

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। কি বলবে ভেবে পেল না, অর্থাৎ ঠিক কি বললে যে সত্য কথা বলা হবে তা মাথায় এল না। অমরবাবু তাঁকে যে

নূতন জগতের সন্ধান দিয়ে গেছেন তা যে খারাপ লাগছিল—এ কথা সত্য নয়, কিন্তু যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে থেকে তাকে সে জগতের পরিচয় নিতে হচ্ছিল, সেই পরিবেশটাই ক্রমশ এমন নিদারুণ হয়ে উঠছিল যে কিছুই তার ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, দাঁতের ব্যথা নিয়ে তাকে যেন বাধ্য হয়ে ব'সে কোনও ভাল ওস্তাদের গান শুনতে হচ্ছে। গানের কিছুটা সে বুঝতে পারছে, কিছুটা তাকে মুগ্ধও করছে, কিন্তু দাঁতের ব্যথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। কিন্তু এত কথা সে রত্নপ্রভাকে বুঝিয়ে বলবে কি ক'রে? তাই চুপ ক'রেই রইল। রত্নপ্রভা কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয়। কিন্তু পাখির পালক নিয়ে যে প্রবন্ধটা তুমি ওঁকে লিখে পাঠিয়েছিলে তা প'ড়ে মনে হয়েছিল যে, পাখিদের খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ তুমি।

ও-প্রবন্ধে আমার কৃতিত্ব কিছু নেই। পাঁচটা বই দেখে লিখেছিলাম। পাখিদের কথা আগে তো কিছুই জানতাম না, এখন যত দেখছি তত ভাল লাগছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে—

মুশকিল আবার কি?

চলুন, সব বলছি।

ডানা অবশ্য অকপটে সব কথা রত্নপ্রভাকে বলতে পারে নি। বলা সম্ভবই ছিল না তার পক্ষে। কিন্তু যতটুকু সে বলেছিল, তাতেই রত্নপ্রভা ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাঁর নিটোল ভারী মুখখানা যদিও গম্ভীর হয়েই ছিল, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়ছিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে তিনি বললেন, ওতে ভয় পেয়ো না। সুন্দরী মেয়ে দেখলে সব পুরুষেরই একটু-আধটু মতিভ্রম হয়। ও কিছু নয়। আমাকে তো রূপসী বলা চলে না, সাঁওতালনীর মত চেহারা আমার, আমাকেও ও ভোগ ভুগতে হয়েছে। ও কিছু নয়। দু দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব। আমাদের দেউড়ির সিপাহী সুখন পাঁড়েকে ব'লে যাব, সে তোমার কাছে না হয় থাকবে চব্বিশ ঘণ্টা। আর এক কাজ করলেও তো হয়। এখানে থাকবার দরকার কি? আমাদের বাড়িতে গিয়ে একটা কি দুটো ঘর নিয়ে থাকলেই তো পার।

নদীর ধারে এই জায়গাটা কিন্তু ভারি চমৎকার। গোড়া থেকেই এখানে আছি, মন ব'সে গেছে এখানে। তবে আপনি যদি বলেন—

শেষের কথাগুলো উচ্চারণ ক'রেই সে থেমে গেল, নিজের কানেই অত্যন্ত বেসুরো ঠেকল। তার যে নিজের কোনও স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সে যে একজন বেতন-ভোগিনী দাসী মাত্র, কর্ত্রীর আদেশ অনুসারেই তাকে চলতে হবে, গত্যন্তর নেই—এই ভাবটা যেন কদর্য মূর্তিতে প্রকাশ হয়ে পড়ল শেষের কটা কথায়।

রত্নপ্রভা কিন্তু বিচলিত হলেন না। তাঁর গাম্ভীর্য অটুট রইল। বললেন, বেশ, এখানেই থাক তা হ'লে। সুখন থাকবে তোমার কাছে—তাকে ব'লে যাব।

না, তাকে কিছু বলবার দরকার নেই এখন। ও যেমন দেউড়িতে আছে থাকুক। যদি তেমন দরকার বুঝি আনিয়ে নেব ওকে।

বেশ। চল, এবার পাখিগুলো দেখে আসা যাক।

চলুন।

আনন্দবাবুর ব্যাপারটা কি হ'ল তা রত্নপ্রভা কিছু বলেন নি এতক্ষণ। রাস্তায় যেতে যেতে বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। আনন্দমোহনবাবুর ছাত্র উনি, আমার সঙ্গেও খুব ভদ্র ব্যবহার করলেন।

আনন্দমোহনবাবুর মকদ্দমার আবার দিন পড়েছে?

পড়েছে বোধ হয়। কিন্তু আনন্দমোহনবাবুকে ওঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। আসল খুনী ধরা পড়েছে, দোষও স্বীকার করেছে।

ও! তাই নাকি?

হ্যাঁ। আনন্দবাবুকে এর জন্যে আর ঝামেলা পোয়াতে হবে না, তবে—। আচ্ছা, এখানকার এস. পি. মিস্টার গুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?

না, তেমন আলাপ হয় নি।

আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। আমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। কোথায় বেরিয়েছেন শুনলাম। আজই ফেরার কথা। আমি চিঠি লিখে এসেছি একটা। হয়তো দেখা হয়েও যেতে পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে হাঁটবার পর জাল-ঘেরা পক্ষীনিবাসে এসে হাজির হলেন তাঁরা। একজন চাকর পাখিদের জন্যে নানারকম খাবার নিয়ে আগে থাকতেই ব'সে ছিল। রত্নপ্রভাই সদরে যাবার আগে ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন।

দানা আর ফল ছড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের মধ্যে একটা সোরগোল প'ড়ে গেল যেন, বিশেষ ক'রে টিয়া শালিক আর ছাতারেদের মধ্যে। আলাদা আলাদা খাঁচায় শামা, হরবোলা, দামা, দোয়েল, পাহাড়ী ময়না, হলদে পাখি প্রভৃতি পৃথক পৃথক রাখা ছিল। তারা বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলে না কিন্তু। খাবারের দিকে চেয়েও দেখ লেনা।

হুতোম প্যাঁচাটা ম'রে গেছে ?

হ্যাঁ। ফিঙে দুটোও বাঁচল না। ওই পাহাড়ী ময়নাটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে। গায়ে পোকা হয়েছে বোধ হয়। হলুদ-জলে একদিন স্নান করিয়েছিলাম। কিন্তু বিশেষ কোনও উপকার হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে না। কি করা যায় বলুন তো ?

বেশি অসুস্থ হ'লে ছেড়ে দিও। হরবোলাটা কেমন আছে ? ছেলেবেলায় আমি একটা হরবোলা পুষেছিলাম, কত রকম ডাকই যে ডাকত !

হরবোলার খাঁচার কাছে গিয়ে রত্নপ্রভা অপ্রত্যাশিতভাবে শিস দিলেন একটি। ডানা অবাক হয়ে গেল ; হরবোলা পাখিটাও। খাঁচার ভিতরই সে তুড়ুক ক'রে এগিয়ে এল, ঘাড় বেঁকিয়ে চেয়ে দেখলে একবার রত্নপ্রভার মুখের দিকে, তারপর সেও মিষ্টি সুরে শিস দিয়ে জবাব দিলে। মনে হ'ল, রত্নপ্রভাকে যেন বললে—তুমি যে আমার আত্মীয় তা তোমার শিস শুনেই বুঝেছি। তারপর খাঁচার দাঁড়ে পা দুটো আটকে ডিগবাজি খেয়ে নিজের আর একটা কৃতিত্ব দেখিয়ে দিলে। কিন্তু ওর প্রতি আর বেশি মনোযোগ দেওয়ার অবসর পাওয়া গেল না, আর একজনের ডাক শোনা গেল। ফটি—ক জল, ফটি—ক জল।

ফটিক-জলগুলো বেঁচে আছে না কি ?

না, তিনটে ম'রে যাবার পর বাকিগুলোকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। বন্দী অবস্থায় কেমন যেন মন-মরা হয়ে থাকে।

বেশ করেছ। কিন্তু ডাকটা এল কোথা থেকে ?

ওই বড় গাছটায় ওরা বাসা বাঁধছে বোধ হয়। প্রায়ই ডাক শুনি। বাইনাকুলার দিয়ে দেখতেও পেয়েছি দু-একবার।

চমৎকার দেখতে, নয় ?

সুন্দর।

পক্ষীপ্রসঙ্গ কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হতে পেল না। মোটরের হর্ন শোনা গেল একটা। চাকরটা এসে খবর দিলে—পুলিস সাহেব এসেছেন, মালকাইনের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

পক্ষী-নিবাসের গেটেই দেখা হ'ল মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে। রত্নপ্রভাকে দেখেই মিস্টার গুপ্ত ষ্টিয়ারিং ছেড়ে নেবে এলেন এবং পরিধানে সাহেবী পোশাক থাকা সত্ত্বেও হেঁট হয়ে প্রণাম করলেন তাঁকে।

মাসীমা, আপনি যে এখানে আসতে পারেন তা কল্পনাই করি নি আমি। এখানে হঠাৎ কি সূত্রে এসেছেন ?

এখানে আমার একটা বাড়ি আছে, কিছু সম্পত্তিও আছে। তাই মাঝে মাঝে আসি। তুমি কতদিন হ'ল এসেছ এখানে ?

বেশি দিন নয়। মাস দুয়েক।

এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শ্রীমতী ডানা, আমাদের পক্ষী-নিবাসের কর্ত্রী। এখানেই থাকেন উনি। রিটায়ার্ড প্রোফেসার আনন্দমোহন-বাবু আমাদের জমিদারির ম্যানেজার। তাঁর সঙ্গেও আলাপ ক'রো, চমৎকার লোক, চমৎকার কবিতা লেখেন। এখন এখানে নেই, কলকাতা গেছেন, দু-একদিনেই ফিরবেন।

আচ্ছা, ইনিই কি খুনের মোকদ্দমায় পড়েছিলেন না কি ?

হ্যাঁ। কোনও দুষ্টু লোক ফাঁসিয়ে দিয়েছিল বেচারীকে তোমাদের আইনের জালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন, ওঁকে রেহাই দিয়ে দিয়েছ তোমরা।

মিস্টার গুপ্ত ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নিজের বাটার-ফ্লাই গোঁফে তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সঞ্চালন করতে করতে রত্নপ্রভার কথা শুনছিলেন। রত্নপ্রভা থামতেই বললেন, সে দুষ্টু লোকটিকে চিনি আমি। এ যে আপনাদের জমিদারি, আপনাদের ব্যাপার—কিছুই জানতাম না আমি। আই সি। আপনি যাবেন কখন ?

আজই রাত দশটার ট্রেনে আমি ফিরতে চাই। তোমার মা কোথায় আজকাল ?

ডেরাডুনেই আছেন। মেসোমশায়ের পাখি-বাতিক এখনও আছে ?

বেড়েছে। পক্ষী-নিবাস দেখে বুঝছ না ? তুমি সন্ধ্যেবেলা আজ খাও না আমার কাছে। সুনীরা এখানেই আছে ?

না, সে বাপের বাড়ি গেছে, তার বোনের বিয়ে। আসবে দিন সাতেক পরে। আচ্ছা, আমি আসব আজ সন্ধ্যের পর। সাড়ে সাতটা নাগাদ—

ডানা, তুমিও এস, আমার ওখানেই খাবে আজ।

ডানা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। খাকি-পোশাক-পরা গোঁফ-ছাঁটা ঘাড় কামানো এই বলিষ্ঠ লোকটার সামনে ব'সে খেতে হবে! কিন্তু 'না' বলবার উপায় নেই। চুপ ক'রে রইল।

মিস্টার গুপ্ত বললেন, আপনারা কোথা যাচ্ছেন, আসুন না, পৌঁছে দি।

আমরা বেশি দূর যাব না। এই কাছে-পিঠেই ঘোরা-ফেরা করব। তুমি যাও।

আচ্ছা, সাড়ে সাতটা নাগাদ আপনাদের কাছারিতে পৌঁছব, কাছারিটা চিনি। পাশেই দোতলা বাড়িটাই নিশ্চয় আপনার?

হ্যাঁ।

মিস্টার গুপ্ত চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা পক্ষী-নিবাসটাই ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলেন নীরবে। হঠাৎ এক জায়গায় থেমে জিজ্ঞেস করলেন, এ পাখিটা কি—বেশ সুন্দর দেখতে তো! এটাকে আগে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না!

আপনারা চ'লে যাওয়ার পর একটা পাখিওলা দিয়ে গিয়েছিল।

নাম কি?

বলেছিল, দামা। দামাই লিখে রেখেছি, ইংরেজী নাম খুঁজে পাই নি।

লাহা মশায়ের বইয়ে দেখেছি মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব অরেঞ্জ-হেডেড গ্রাউণ্ড থ্রাশ (Orange-headed Ground Thrush) আরও কিছুক্ষণ নীরবে পাখি দেখে বেড়ালেন। তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, দেখ, আমাদের ছেলেমেয়ে হয় নি। এরাই আমাদের ছেলেমেয়ে। এদের একটু যত্ন ক'রো। তুমি যত্ন করছ নিশ্চয়ই, তবু বললাম কথাটা। এদের নিয়েই জীবন কাটাতে হবে। আচ্ছা, কটা পাখি ম'রে গেছে? লিস্ট ক'রে রেখেছ কি?

রেখেছি। বাসায় আছে।

মরতে দিও না কাউকে। যদি দেখ খাচ্ছে না বা বিমর্ষ হয়ে আছে, ছেড়ে দিও।

আচ্ছা।

ডানার বাসার দিকেই ফিরছিলেন রত্নপ্রভা। হঠাৎ রত্নপ্রভার কানের কাছ দিয়ে শোঁ ক'রে একটা তীর বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

এ কি ব্যাপার, তীর ছুঁড়ছে কে?

পর-মুহূর্তেই তীরন্দাজদের দেখা গেল। বকুলবালা গাছ-কোমর বেঁধে হাঁটু গেড়ে ব'সে তৃতীয়বার শর-সন্ধান করছিলেন, পাশে এক গোছা শর নিয়ে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ছিল, তারও আর এক হাতে ধনুক। ডানা হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে বললে, বকুলদি, কখন এলেন আপনি?

এখুনি এসেছি। এসেই দেখি একটা বাজ না চিল তোমার ওই পাখির বাসার উপর ব'সে আছে। আর একটু হ'লে বাচ্চাগুলোকে শেষ ক'রে ফেলত। ভাগ্যে আমি আর চণ্ডী এসে পড়েছিলাম—

উৎসাহভরে তিনি আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রত্নপ্রভাকে দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন। কোমর থেকে আঁচলটা খুলে গায়ে দিয়ে মাথায় আধঘোমটা টেনে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। ডানা পরিচয় করিয়ে দিলে, ইনি অমরেশবাবুর স্ত্রী। আসুন, আলাপ করুন। বকুলবালার কিন্তু আলাপ করবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ লজ্জিত হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি, আর বার বার আঁচল দিয়ে নিজের স্থূল বপুটি ঢাকবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়েছিল। এগিয়ে এলেন তিনি।

ডানা বললে, ইনি রূপচাঁদবাবুর স্ত্রী। এঁরও পাখি পোষার খুব শখ। তালগাছে ওই যে বাক্সটা আমরা বেঁধে দিয়েছি, তাতে শালিক বাসা বেঁধেছে। বাচ্চাও হয়েছে তাদের। উনি কিছুদিন আগে এসে ডিমগুলো দেখে গিয়েছিলেন—

নমস্কার।—হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন রত্নপ্রভা।

বকুলবালা আর একটু ঘাড় হেঁট ক'রে আঁচলটা গায়ে আর একটু টেনে দিলেন।

আসুন। আপনার যখন পাখি পোষার এত শখ, তখন আপনি তো আমাদের ঘরের লোক। এতদিন আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া উচিত ছিল। আসুন।

একটু দূরে চণ্ডী দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। শুধু দেখছিল নয়, উপভোগ করছিল। তার চোখমুখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল, এই অপূর্ব মিলনের কৃতিত্বটা যেন তারই। বকুলবালা নিম্নকণ্ঠে তাকে বললেন, আমার ধনুকটা তুলে রাখ্ ভাল ক'রে। এখনি বাড়ি ফিরব আমরা। তুই পালাস নি যেন—

না।

এই আদেশ দিয়ে গায়ের কাপড়-চোপড় আবার সামলে-সুমলে বকুলবালা রত্নপ্রভাকে অনুসরণ ক'রে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন।

রত্নপ্রভা চণ্ডীকে দেখিয়ে বললেন, ওটি কে? ছেলে বুঝি?

না। আমার ছেলে হয় নি।

হঠাৎ একটা নীরবতা ঘনিয়ে এল। তিনটি নিঃসন্তান রমণীকে কেন্দ্র ক'রে একটা বিরাট শূন্যতা মূর্ত হয়ে উঠল যেন।

রত্নপ্রভাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, কি পাখি ভালবাসেন আপনি?

অনেক রকম ভাল পাখি পুষেছি আমি। টিয়া, চন্দনা, ময়না, মুনিয়া। একটা হলদে পাখি পোষবার শখ, কিন্তু পাচ্ছি না যোগাড় করতে। একবার একটা পেয়েছিলাম, না খেয়ে ম'রে গেল। ইনি একটা যোগাড় ক'রে দেবেন বলেছিলেন, তাই এসেছিলাম খোঁজ করতে।

চেষ্টা করছি। বাচ্চা পেলেই আপনাকে খবর পাঠাব। আপনার চণ্ডী-গণশাও তো খোঁজে আছে।—ডানা হেসে উত্তর দিলে।

গণশার নাম শোনামাত্র কিন্তু বকুলবালা ক্ষেপে গেলেন। রত্নপ্রভার খাতিরে যে ভব্যতাটুকু এতক্ষণ তিনি বজায় রেখেছিলেন তা আর টিকল না, চোখের দৃষ্টি থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুতে লাগল। ঘাড়ের ঝাঁকানিতে আঁচল স'রে গেল মাথা থেকে।

গণশা মুখপোড়ার কাণ্ড শুনবেন? বলে কিনা—আমাকে একটা ভাল ডিশ্‌কনারি না কিনে দিলে হলদে পাখির বাচ্চা পেলেও উড়িয়ে দেব আমি। মুখপোড়া আমাকে আবার মাসীমা ব'লে সোহাগ জানাতে আসে! অমন বোনপোকে ঝাঁটা মারি আমি।

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল আবার। এক নজরেই তিনি বকুলবালার স্বরূপ অনেকটা টের পেয়েছিলেন। গণশাকে তিনি চেনেন। গণশার মেসোমশাই স্টেটের কর্মচারী ছিলেন, কিছুদিন আগে মারা গেছেন, রত্নপ্রভাই পেনশন বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন তাঁর বিধবার জন্যে, জমিও দিয়েছেন

কিছু। গণশা যে পড়াশোনায় ভাল তাও তিনি জানেন। বকুলবালার কাছে গণেশের নূতন পরিচয় পেয়ে খুব মজা লাগল তাঁর।

ছদ্ম বিস্ময়ে বললেন, এই কথা বলেছে গণশা?

আমার কথা বিশ্বাস না হয়, চণ্ডীকে জিজ্ঞেস করুন। এই চণ্ডে, এদিকে আয়। গণশা তোকে কি বলেছিল বল্ তো এঁদের।

চণ্ডী থেমে থেমে ঢোঁক গিলে গিলে বকুলবালার কথা সমর্থন করলে, না ক'রে উপায়ও ছিল না। কিন্তু প্রিয়তম বন্ধুর নাম এ ভাবে কালিমালিপ্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছিল সে। তার ভয়ও করছিল। কথাটা গণশার কানে গেলে সে যে কি করবে তা কল্পনা ক'রে হৃৎকম্প হচ্ছিল তার। হয়তো আচমকা নাকে একটা ঘুষিই বসিয়ে দেবে কোন্‌দিন। বকুলবালা বললেন, এরা দুটোতে কম জ্বালায় আমাকে! ইনি জেদ ধ'রে ব'সে আছেন একটা এয়ার গান্ কিনে দিতে হবে, উনি বলছেন ভাল ডিশ্‌কনারি চাই। আমি অত টাকা পাব কোথা? বাজারের পয়সা থেকে কিছু কিছু সরিয়ে কতই বা জমানো যায়! ডিশ্‌কনারি জিনিসটা কি? কুড়ুল-টুড়ুল না কি—সাতজন্মে ও-কথা শুনি নি কখনও।

ডানা মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল। রত্নপ্রভা কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, আপনাকে এমন ভাবে জ্বালাতন করা খুব অন্যায় হয়েছে ওদের। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি আপনি হলদে পাখি ঠিক পাবেন এবার।

ধাড়ি পাখি চাই না কিন্তু, বাচ্চা দিতে হবে।

বেশ, তাই পাবেন।

বকুলবালার চোখের দৃষ্টি ঝলমল ক'রে উঠল আনন্দে।

চণ্ডীর দিকে চেয়ে বললেন, শুনলি তো! আর তোদের তোয়াক্কা করব না আমি।

কথাবার্তা আরও হয়তো কিছুদূর অগ্রসর হ'ত, কিন্তু সনাতন মল্লিকের

আকস্মিক আবির্ভাবে তা চাপা প'ড়ে গেল। বকুলবালা তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে দ্রুতপদে স'রে পড়লেন চণ্ডীকে নিয়ে। সনাতন মল্লিক যা করলেন, তা আরও নাটকীয়। তিনি রত্নপ্রভার পদপ্রান্তে দড়াম্ ক'রে শুয়ে পড়ে হাউমাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন। শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন রত্নপ্রভা। উঠে স'রে দাঁড়ালেন। মাথার কাপড়টা টেনে দিলেন একটু। মল্লিক সাশ্রুনেত্রে করজোড়ে বলতে লাগলেন, আপনি আমার মা, বাঁচান আমাকে, ছাপোষা মানুষ আমি, দয়া করুন আমার ওপর।

কি হয়েছে?

মল্লিক তখন জামার পকেট থেকে একটি ছোট চিঠি বার ক'রে রত্নপ্রভার হাতে দিলেন। পেন্সিলে লেখা ছোট চিঠি। এস. পি. লিখেছেন।

মাসীমা, এই লোকটিই সেই দুষ্ট লোক, যার কথা আপনি আন্দাজ করেছিলেন একটু আগে। ইনিই আনন্দমোহনবাবুর নামে মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করেছিলেন পুলিসকে। এঁর লেখা একখানা চিঠি আছে আমাদের কাছে। আনন্দমোহনবাবুর মত নিরীহ ভদ্রলোককে বিব্রত করার জন্যে এঁর শাস্তি হওয়া উচিত। আপনারা যদি এঁর বিরুদ্ধে মামলা করেন আমরা সাহায্য করতে পারি। তবে যদি ক্ষমা করেন, সে কথা স্বতন্ত্র। সন্ধ্যার পর যাব। ইতি—অনিল

রত্নপ্রভা চিঠিখানা প'ড়ে ডানাকে দিলেন সেটা। মল্লিক মশায়ের দিকে ফিরে বললেন, আনন্দমোহনবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা না ক'রে কিছুই বলতে পারছি না আপনাকে এখন। তিনি যদি মামলা করতে চান মামলা হবে, যদি না করতে চান হবে না।

আপনি দয়া করলে—

রত্নপ্রভা আর কোনও জবাব দিলেন না, ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন। ডানা তাঁর পিছু পিছু গেল।

[ ক্রমশ ]

"বনফুল"

# অমৃতায়ন

পথের পথিক আমি, সুদূর প্রদেশগামী, চলেছি যে
একান্ত একাকী। চলেছি দিবস-রাতি, নিজেরি যে নিজে
সাথী,—আর কারো ভরসা না রাখি। পথের কিছু না জানি,
পথ মোরে লয় টানি, দুর্নিবার আকর্ষণ তার। আনি
দেয় কী প্রেরণা, তার প্রতি ধূলিকণা অন্তরের মাঝে
অনিবার। দিবা-দীপ নিভিয়াছে,—সন্ধ্য-সমাগত সাঁঝে
অভ্যর্থনা করেছি তিমিরে। এল ঘিরে অমানিশা, তবু
মিলিয়াছে দিশা—ক্ষণপ্রভা ক্ষণদার শিরে। জ্বালে কভু
লক্ষ বাতি, খদ্যোত-খচিত রাতি—আলোর ঝালর-পরা
কালো। কণ্টক-কান্তার-পথে ছুটিয়াছি মনোরথে; ভরা
আশা, ভাবনা ফুরালো: মৃদুমন্দ সমীরণে কার স্নেহ-
পরশনে প্রশান্তি-প্রবাহ প্রাণে জাগে। মহারণ্য গেহ
মোর, সুখের নাহিক ওর,—আশার চমক চিতে লাগে।

শেষ-যাম রজনীর—সুনিবিড় বনানীর প্রান্তভাগে
আসিনু উতরি'। নেহারি অপূর্ব ছবি—পূর্বাশার কোলে
রবি, মোর উত্তরাশা পূর্ণ করি। কনক-কপাট খোলে,
কনক-তুফান তোলে—সদ্যোমুক্ত দিবস-দুয়ার। উঠে
কমলের হিয়া শতদলে বিকশিয়া, মনোবাঞ্ছা ফুটে
কলিকার। হিরণ-কিরণ-দ্যুতি, সৃষ্টি-যাগে পূর্ণাহুতি,
রূপান্তর লভিছে মানব। দিব্যদৃষ্টি আঁখি-'পরে, শ্রুতি
দিব্য শাক্ত ধরে, মূর্ত বিভু-বিভূতি-বিভব। অচেতন
জড়-ভাগে, প্রসুপ্ত চেতন জাগে,—প্রাণশক্তি-প্রস্ফুরণ
তার। পূর্ণিমার ঊর্মি-মাথে, জ্যোতির জোয়ার সাথে, বয়
অন্তর্বাহী পারাবার। নর নীলকণ্ঠ শিব, চিরঞ্জয়
চিরজীব,—সত্য-ঋত-মহাবতরণ। অমৃত শরণ
করি, নব দিব্যরাজ্যোপরি মর্ত্যভূমে মৃত্যুর মরণ।

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

---

* ত্রিপদী পয়ারের রূপ নিয়েছে ব'লে ছন্দটির নাম দেওয়া চলে—'অপরূপা ত্রিপদী'। ছেদ-চিহ্ন অনুসারে প'ড়ে গেলে প্রচ্ছন্ন ত্রিপদী ছন্দটি স্বতই প্রকাশিত হয়ে পড়বে। —লেখক

# জল

তাঁবুর ভেতরে ডেক-চেয়ারে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে আছি। সুমুখে বৈশাখের রোদে ফুটি-ফাটা অসমতল মাঠ—রোদের তেজে ঝলসানো, বিবর্ণ—যতদূর চোখ যায় সবুজের লেশমাত্রও কোথাও দৃষ্টিতে পড়ে না। ধূসর মাটির ওপর তামাটে ছোপ পড়েছে। সরস, স্নিগ্ধ, কোমল মৃত্তিকা যেন পোড়া ইটের পাঁজায় রূপান্তরিত হয়েছে।

মাঠের মধ্য দিয়ে লাল কাঁকরে ছাওয়া সরু পথ এঁকেবেঁকে দূরের নদীটির দিকে চ'লে গেছে। নির্জলা নদী—যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধু-ধু করে বালি। রোদের দাহ বালুকণায় ঠিক্‌রে সহস্রগুণ হয়ে বেরিয়ে আসছে। পূব থেকে পশ্চিম চোখ-ধাঁধানো বিস্তীর্ণ বালুর রাশি শুকনো নদীর গতিপথকে চিহ্নিত ক'রে রেখেছে। জলের চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও।

এ পথে রঙিন-ঘাঘরা-পরা মেয়ের দলের অবিরত আনাগোনা। তাদের কাঁখে জলের কলসী। শূন্য কলসী নিয়ে দ্রুতপদে তারা নদীর দিকে চলে। ফেরবার সময় জলভরা কলসীর ভারে তাদের কোমর বেঁকে যায়—শ্লথ গতিতে টেনে টেনে তারা হাঁটে। সকাল থেকে সন্ধ্যা এই রাঙা মেঠো পথের ওপর দিয়ে জলান্বেষিণীদের শোভাযাত্রার বিরাম থাকে না। এ গাঁয়ের মেয়েরা শুধু নয়—দক্ষিণে বহুদূরে শালবনের আড়ালে যে গ্রামটি দেখা যাচ্ছে, সেখান থেকেও আসে মেয়েরা।

এ অঞ্চলের দু-তিনটি গ্রামের প্রায় তিন হাজার বাসিন্দার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বৈশাখের শুকিয়ে-যাওয়া ওই উশ্রী নদীর বালুর গর্ভে লুকানো জলটুকু মাত্র সম্বল। বালু খুঁড়ে গর্ত ক'রে অতি কষ্টে জল পাওয়া যায়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আধ কলসী জল মেলে কিনা সন্দেহ। এ গাঁয়ে একটি কুয়ো অবশ্য আছে ডাকবাংলোর প্রাঙ্গণে—তার জল মুখেও তোলা যায় না।

ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে মাথার চাঁদি ফেটে গেলেও ধুঁকতে ধুঁকতে মেয়েরা জল আনতে যায়। বৈশাখের দাহ তাদের চোখে জ্বলে। তপ্ত পাথরের ঘষায় পায়ে ফোস্কা পড়ে। ততোধিক তপ্ত বালিতে গর্ত খুঁড়ে চুঁইয়ে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা জল অতি সাবধানে আহরণ ক'রে কলসী ভ'রে তোলে তারা অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে।

জলকষ্ট যে কাকে বলে—এখানে এসে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছি। অনিঃশেষ জলের পিপাসায় ছটফট করি দিনরাত। অথচ প্রাণ ভ'রে জল খাবার উপায় নেই। সামান্য যেটুকু জল নিয়ে আসে আমার চাকর বাহাদুর, দেখতে দেখতে

যায় ফুরিয়ে। এই কিছুক্ষণ আগে জল চেয়ে জল না পেয়ে রাগ সামলাতে পারি নি। বোমার মত ফেটে প'ড়ে বাহাদুর ও চাপরাসী শশাঙ্ককে উদ্দেশ ক'রে যথেচ্ছ বকুনি দিয়েছি। অতি কষ্টে যোগাড় করা জলের পনেরো আনা ওরা দু জনে মিলে তপ্তখোলার বালির মত যে নিঃশেষে শুষে নিচ্ছে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ প্রকাশ করতেও বাকি রাখি নি।

ফলে বেলা বারোটার সময় কলসী কাঁধে বাহাদুর নদীর দিকে চ'লে গেছে। বেশ রেগে-মেগেই যে গেছে তা তার সবুট সশব্দ পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই প্রকাশ।

জল ভরতে যাওয়ার দৃশ্য যে কবিত্বে টইটম্বুর তা কবিমাত্রেই স্বীকার করবেন। কিন্তু রঙিন চোলী ও ঘাঘরা পরা গাঁয়ের যুবতীদের পরিবর্তে ছ'ফুট লম্বা শার্ট-শর্ট পরা বলিষ্ঠ নেপালীকে এনে দাঁড় করালে কবিত্বের লেশমাত্রও অবশিষ্ট থাকবে কি না সন্দেহ। অথচ ব্যাপারটা একই—তৃষ্ণার জল আহরণ।

কবিত্ব না থাকুক, পিপাসার তাড়নায় সুমুখের আঁকাবাঁকা পথে বাহাদুরের দীর্ঘ দেহটি দেখতে না পেয়ে কাতর হয়ে উঠছিলাম—শ্রীরামচন্দ্রের জন্য শবরীও বুঝি এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করেন নি।

পিপাসায় ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। মনের মধ্যে ঘোরতর সন্দেহের উদ্রেক হ'ল, বুঝি এই মেয়েদের ব্যূহ ভেদ ক'রে জলের ধারেকাছেও পৌঁছুতে পারবে না বাহাদুর। জবরদস্ত সব মেয়েদের দলে একমাত্র পুরুষমানুষ, সে যে কত অসহায় বুঝতে পারছিলুম।

দিগন্তজোড়া অট্টহাসির মত হা-হা ক'রে বইছে তপ্ত হাওয়া—তার হলকা গায়ে যেন ফোস্কা লাগিয়ে দেয়। প্রখর সূর্যের তাপ, এক সেকেণ্ড বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেও চোখে জ্বালা ধরে। তবু একদৃষ্টে চেয়ে আছি।

সামনের অশথগাছের শুকনো ডালে ব'সে ধুঁকছে একটি চিল—স্তব্ধ দিগন্তবিস্তৃত মাঠের বুক ফুঁড়ে মাটির ভেতরকার সমস্ত রস ধোঁয়া হয়ে বেরিয়ে আসছে। যতদূর দৃষ্টি যায় রসশূন্য প্রকৃতি যেন দিগন্তজোড়া পিপাসা নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে আছে নিষ্করুণ উদাস দৃষ্টিতে।

বিশ্বের সমস্ত পিপাসা যেন আমার কণ্ঠে। চোখ দুটিতেও তার উগ্র প্রকাশ। এক ফোঁটা জলের জন্যে এমন কাঙাল বোধ করি নি বুঝি জীবনে।

দেড় ঘণ্টা হ'তে চলল, সামান্য এক কলসী জল ভরতে এত সময় লাগে?

অসম্ভব, এ হতেই পারে না। বিলম্বটা যে সম্পূর্ণ বাহাদুরের ইচ্ছাকৃত এ বিষয়ে আমার লেশমাত্রও সন্দেহ থাকে না। হাঁক দিই, শশাঙ্ক!

শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে শশাঙ্ক।

দেখ তো, বাহাদুরের এত দেরি হচ্ছে কেন? শশাঙ্কর মুখের পানে মুখ না তুলেই বললুম, তেষ্টায় মারা পড়ব নাকি? শশাঙ্ক চ'লে গেল।

এ বাবু!—সুমিষ্ট অথচ তীব্র কণ্ঠের আহ্বানে চমকে মুখ তুলে তাকাই। দেখি, ষোল-সতেরো বছরের একটি মেয়ে জলভরা কলসী কাঁখে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কাজল-আঁকা টানা টানা কালো অপরূপ চোখ দুটিতে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখেই বুঝলুম, মেয়েটি সেই শ্রেণীর, যাদের রাগলে সুন্দর দেখায়।

আমার নির্নিমেষ চাহনি মেয়েটিকে লজ্জা দেয় না মোটেও। রীতিমত রুষ্ট স্বরে সে বলে, তোহার নেপালী নোউকরোয়া বড়া বদমাস্ বা। বালুয়া খোদ কর পানিয়া ভরণকে লাগিস—তব্ কাঁহাসে আ কর্ উ বদমাস্ হামার বালুয়াকা বগলপর খোদনে লাগিস—হামার পানিয়া উন্‌কা গড্‌ঢামে চলা গৈল।

একটু হেসে আমি ভাঙা হিন্দীতে বললুম, কিন্তু তোমার কলসী তো দিব্যি জলে ভরা! তবে আর রাগ করছ কেন?

আমার পানে তীব্র দৃষ্টি হেনে মেয়েটি ঝাঁঝালো গলায় ব'লে ওঠে, উস্‌সে ক্যা ভওল? হামার গড্‌ঢাকা পানিয়া হাম কিন্‌হিকো না দেবো। সুরতিয়া, সুখমনিয়া, ভিখুয়াকা মাতারীকো তু যাকে পুছ—উলোক বতা দেবো, হামার গড্‌ঢা হামার বা, হুঁয়াসে কোই পানি ভরবন্ না করি। তু বাহাদুরকো মনা কর দে বাবু। নেহি তো হামার আদ্‌মি আ কর উস্‌কো মার ডালব।

কথাগুলো ব'লেই মেয়েটি চ'লে যেতে উদ্যত হ'ল আমার বক্তব্য শোনবার জন্যে অপেক্ষা না ক'রে। পায়ের মল বেশ দ্রুত তালে বাজাতে বাজাতে হাঁটতে শুরু করে মেয়েটি। অপরূপ ভ্রূভঙ্গিকে বিস্তারের সঙ্গে দ্রুত রাগত প্রস্থান যে কোনও কবির মনে হয়তো বা প্রেরণা উদ্রেক করতে পারত, কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে যেতে না যেতেই ছন্দপতন ঘটল। জনৈক প্রৌঢ়ার সঙ্গে বেশ জোর ধাক্কা খেল মেয়েটি—উভয়েই পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিল।

প্রৌঢ়ার এক হাতে জপের মালা, অন্য হাতে ঘটি—মালা জপতে জপতে

সে নদীর দিকে যাচ্ছিল। মেয়েটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে চমকে উঠে তার মুখের পানে তাকাতেই কর্কশ একটা আর্তনাদ তার গলা চিরে বেরিয়ে এল, লছমিয়া, তু!

মেয়েটির মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে দেখলাম। জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে কলসীটি কাঁখের মধ্যে চেপে ধ'রে কম্পিতস্বরে সে বললে, হাম তুকো না দেখলকে—তোহার গোড় লাগে ঠাকুরাইন! মাফ কর্।

মাফ!—প্রৌঢ়ার চক্ষু দুটি থেকে আগুন ছুটতে শুরু করেছে তখন।—তু গোয়ালিন্ হো কর্ বাভনকো ছু দিহিন্—তুকো মাফ করবো হাম! ছোটা জাত কুত্তী কাঁহাকা!—ব'লে প্রৌঢ়াটি মেয়েটির গালে বিরাশি সিক্কার একটি চড় বসিয়ে দিল এবং তার কাঁখের জলভরা কলসীটি ঠেলে ফেলে দিল মাটিতে। অঙ্গস্পর্শের অপরাধের শাস্তি অঙ্গস্পর্শ ক'রেই দিল সে—ছোটজাতের দেহের ছোঁয়ায় এবারে সে কতটা অশুচি বোধ করল, তা বোঝা গেল না। বোধ হয় রাগের তাড়নায় ছোঁয়াছুঁয়ি জ্ঞানটা লোপ পায়। কিংবা হয়তো একটিমাত্র স্নানে একাধিক স্পর্শদোষের ক্ষালন সম্ভব জেনে দ্বিতীয়বার মেয়েটির দেহস্পর্শ করতে দ্বিধাবোধ করলে না সে। মেরে আর প্রৌঢ়াটি অপেক্ষা করল না। জপমালা ঘোরাতে ঘোরাতে নদীর দিকে দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

লছমিয়ার কলসীর সবটুকু জল মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিল, শুকনো বেলেমাটি দেখতে দেখতে তার সবটুকু নিল শুষে। রুক্ষ লালচে মাটির খানিকটা অংশ জুড়ে রইল শুধু শোষণের সজল চিহ্নটুকু, তাও চক্ষের পলকে অস্পষ্ট হয়ে এল।

শূন্য কলসী ও ভেজা মাটির দিকে কয়েক মুহূর্ত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে লছমিয়া। তার ঠোঁট দুটি কেঁপে ওঠে বার কয়েক অবরুদ্ধ কান্নার আবেগে। তারপর হঠাৎ তার দু চোখ বেয়ে নামে অশ্রুর বন্যা।

এত জল! আমি একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকি লছমিয়ার মুখের পানে। নির্জলা দেশের মেয়ের দু চোখ ছাপিয়ে এত জল আসে কোথা থেকে?

প্রায় মিনিট পাঁচেক অঝোর ঝরে কাঁদল মেয়েটা। তারপর তার আধময়লা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ দুটি মুছতে মুছতে মাটি থেকে সযত্নে তুলে নিল কলসীটি। তার চোখের সমস্ত কাজল উঠে এল আঁচলে।

নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করে লছমিয়া। একবার পশ্চিম আকাশে ঢ'লে-পড়া সূর্যের দিকে চেয়ে বেলা আন্দাজ ক'রে নিয়ে সে তার গতি বাড়িয়ে দিল।

জলভরা কলসী কাঁধে বিপরীত দিক থেকে আসছিল আমার বাহাদুর। বাহাদুরকে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় লছমিয়া, মুখ তুলে তার মুখের পানে একটা তীব্র ভ্রূকুটি হেনে আবার চলতে শুরু করল।

একটু দাঁড়াও লছমিয়া।—আমি হাঁক দিয়ে উঠি।

আমার আহ্বানে দাঁড়িয়ে পড়ে লছমিয়া। একটু অবাক হয়ে তাকায় সে আমার মুখের পানে, তার চোখ দুটিতে নীরব জিজ্ঞাসা।

বাহাদুরকে বললুম, ওর কলসীতে কিছু জল দিয়ে দাও বাহাদুর। তোমার কলসীর অর্ধেকটা দিলেই ওর কলসীটা ভ'রে যাবে। বেচারীর সব জল প'ড়ে গেছে।

লছমিয়ার টানা টানা চোখ দুটি বিস্ময়ে গোল হয়ে উঠল আমার কথায়। একবার আমার মুখের পানে চেয়ে পরক্ষণে সে তাকাল বাহাদুরের মুখের পানে।

লছমিয়ার চেয়েও বেশি অবাক হ'ল বোধ হয় বাহাদুর। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে রইল সে—মস্তিষ্কবিকৃতির কোনও রকম লক্ষণ আমার মুখে-চোখে প্রকাশ পাচ্ছে কি না তাই দেখবার আশায় বোধ হয়।

তোমার কলসীটি এগিয়ে দাও লছমিয়া। বাহাদুর জল ঢেলে দেবে।

কাহেকো দেগা সাহেব? এত্না তক্‌লিফ করকে পানি লায়া—

তা হোক, ঢেলে দাও খানিকটা জল। কই, লছমিয়া, কলসীটা দাও।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চেয়ে বাহাদুরের দিকে কলসীটি এগিয়ে দিতে উদ্যত হ'ল লছমিয়া। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বাহাদুর কাঁধ থেকে জলের কলসীটি নামিয়ে লছমিয়ার কলসীটির দিকে এগিয়ে নিয়ে আসে।

জল ঢালবার উপক্রম করেছে বাহাদুর, হঠাৎ তার কলসীটি নিয়ে সাত হাত পিছিয়ে গেল লছমিয়া, তার মুখে চোখে ফুটে উঠল একটা আতঙ্কের ভাব।

তু তো উ সাহেবকা নোকর বা!—আমার দিকে চোখ ঠেরে বাহাদুরকে উদ্দেশ ক'রে বললে লছমিয়া, তোহার সাহেবকা তো জাত-উত কুছ ঠিক নেহি বা, উ তো মুরগী-উরগী সব কুছ্ খাওত্ হায়। না লেবো তোহার পানিয়া।

ব'লে মুহূর্তমাত্রও অপেক্ষা না ক'রে লছমিয়া হনহন ক'রে হাঁটতে শুরু ক'রে দিল আবার নদীর উদ্দেশে। বাহাদুরের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

বাহাদুরের দিকে চেয়ে আমার তেষ্টার কথা মনে প'ড়ে যায়।

তাড়াতাড়ি আমাকে এক গ্লাস জল এনে দাও।—চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম।

শ্রীসঙ্কর্ষণ রায়

# ধূমাবতী

১

চতুর্দিকে আলো আছে, অন্ধকার ঘোচে না তথাপি
বিবিধ বিচিত্র ধূমে সমাচ্ছন্ন আমার ধরণী,
ছাগরূপে দেখি যারে আসলে সে রাক্ষস বাতাপি
নয়ন সম্মুখে মোর এ কি মায়া-তিরস্করণী।
ধূমাচ্ছন্ন তমিস্রার তলে
জ্ঞানের প্রদীপ তবু জ্বলে।

২

কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা আসিয়াছে কালান্তক যম
উন্মূলিয়া মহীরুহ হানি বজ্র পর্বত-শিখরে,
ছিন্ন ভিন্ন করি সৃষ্টি তাণ্ডবেতে মেতেছে নির্মম
সেই জানি জাগাইবে শ্যামকান্তি অঙ্কুর-নিকরে।
শ্যাম-শোভা-লোভাতুরা, হায়,
ঝঞ্ঝা-বেগে কোথা উড়ে যায়।

৩

শিবকে পাইবে ব'লে বৃথা জাগে তপস্বিনী উমা
শিব যে উদরে মোর জীর্ণ তারে করি দিবা যামী
ধূমাচ্ছন্না ধূমাবতী উদরস্থ করিয়াছে ভূমা
অবিচ্ছিন্ন হাহাকারে চীৎকারিছে—উমা নয়, আমি।
চীৎকারের অন্তরালে হায়
উমার সঙ্গীত শোনা যায়।

"বনফুল"

আগামী শ্রাবণ সংখ্যা হইতে সজনীকান্ত দাসের "আত্ম-স্মৃতি" 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে।

# "আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে"

সংস্কৃত গীতিকাব্য-মালিকার মধ্যে কালিদাসের মেঘদূত একখানি উজ্জ্বল কোহিনুর। ইহার করুণ-রসঘন ভাব রসিকচিত্তকে বিমুগ্ধ করে। ইহার অন্তবর্তী সুর-মূর্ছনা সহানুভূতিশীল পাঠক-মনের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাহাদের হৃদয় কারুণ্যের রজত-ধারায় অভিষিক্ত করিয়া দেয়।

সাহিত্যের একটি প্রধান কাজ—পাঠকচিত্তে অনাবিল আনন্দ বিতরণ করা। নায়ক-নায়িকার জীবনের সুখের চিত্র দেখিয়া আমরা আনন্দ পাই; তাহাদের দুঃখের কাহিনীও আমাদের অন্তরকে অভিভূত করিয়া তুলে। সাহিত্যের হাস্যরস আমাদের মনে আনন্দের সঞ্চার করে বটে, কিন্তু করুণরসও আমাদের হৃদয়কে কম পরিতৃপ্তি দান করে না। বরং বলা যাইতে পারে, করুণরসের আনন্দ-পরিবেশনী শক্তি অধিকতর। তাই বুঝি ইংরেজ কবি গাহিয়াছেন—

"Our sweetest songs are those
That tell of saddest thought."

মেঘদূতের কাহিনী এইরূপ একটি অশ্রু-সজল বেদনা-কাতর করুণ কাহিনী। ইহাতে একটি বিচ্ছেদ-বিধুর অভিশপ্ত হৃদয়ের মর্মকথা রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তাহা আমাদের এত ভাল লাগে, তাই তাহা আমাদের অন্তরে এত গভীরভাবে রেখাপাত করে।

যক্ষরাজ কুবেরের রাজ্য কৈলাসধাম। রাজধানী অলকাপুরী। সেই অলকাবাসী একজন অজ্ঞাতনামা হতভাগ্য যক্ষ মেঘদূতের নায়ক। তাহার কাজ ছিল প্রত্যহ প্রত্যূষে পদ্মবনে গিয়া রাজার শিব-পূজার জন্য শতদল সংগ্রহ করা। রাজার কাজ সে প্রতিদিনই নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করে। একদিন কিন্তু কার্তিক মাসের শারদী শুক্লা তিথিতে শয্যাত্যাগে বিলম্ব হওয়ায় প্রাত্যহিক কর্মে ত্রুটি হইল। সেদিন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। যক্ষ পদ্মবনে গিয়া দেখিল, ইন্দ্রের হস্তিগণ সরোবরের পদ্মসমূহ বিনষ্ট করিয়াছে। রাজাকে আর সেদিন ফুল দেওয়া হইল না। যক্ষরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া যক্ষকে অভিশাপ দিলেন—"যাহার প্রতি অত্যধিক আসক্তির জন্য কর্তব্যে এই অবহেলা, সেই প্রিয়ার নিকট হইতে যক্ষকে এক বৎসরকাল দূরে থাকিতে হইবে।" যক্ষ অলকাপুরী হইতে স্নিগ্ধচ্ছায়া-তরুসমাচ্ছন্ন সুদূর রামগিরি আশ্রমে নির্বাসিত হইল।

হতভাগ্য যক্ষ আট মাস মধ্যপ্রদেশের চিত্রকূট পর্বতের এই আশ্রমে কোন প্রকারে একাকী অবস্থান করিয়া তাহার কর্তব্যবিমুখতার প্রায়শ্চিত্ত করিল। তাহার শরীর কৃশ হইয়া গেল। প্রকোষ্ঠ হইতে কনকবলয় খসিয়া

পড়িতে লাগিল। তাহার পর একদিন প্রাবৃটের সমাগমের প্রাক্কালে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে আকাশে নব-জলধরের শ্যাম-সমারোহ দর্শনে তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। প্রিয়া-বিরহ-বেদনা তাহার সীমাহারা; উচ্ছ্বসিত হৃদয় তাহার কানায় কানায় ভরা; আর সে পারিল না। বর্ষার মেঘ দেখিলে চির-সুখীজনের হৃদয়ও উন্মনা হইয়া উঠে—কি যেন নাই, কি যেন হারাইয়া গিয়াছে! কল্পনায় হারানো সেই অনির্দেশ্যের জন্য তাহারও মন কেমন করিতে থাকে। আর নির্বাসিত যাহার জীবন, প্রিয়জন যাহার বহুদূরে, সেই প্রবাসী পথিকজনের হৃদয় বর্ষার মেঘদর্শনে আকুল হইয়া উঠিবে—ইহা আর বেশি কথা কি? ক্রৌঞ্চ-মিথুনের বিরহ-ব্যথিত আদি-কবির রামায়ণ মহাকাব্যে সীতার বিরহে শ্রীরামচন্দ্রের যে মানসিক শোক ও হাহাকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই বুঝি মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে মেঘ-মেদুর দিবসে মেঘদূতের যক্ষের বিরহের মধ্যে! পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শ্রীরাধার যে ব্যাকুলতা, তাহাই যেন রূপ পাইয়াছে মেঘদূতের যক্ষের বিরহ-ব্যাকুল অন্তরের আবেগ-ভরা চঞ্চলতায়!

যক্ষ বিরহ-বেদনায় দিশাহারা। উন্মত্ত তাহার আচরণ। সে চায় আসন্ন বর্ষায় তাহার বিরহ-ক্লিষ্টা প্রিয়ার প্রাণরক্ষা করিতে। সে চায় তাহার প্রিয়ার নিকট কাহাকেও পাঠাইতে। সেই বার্তাবহ তাহার প্রিয়ার নিকট গিয়া প্রিয়াকে তাহার কথা জানাইবে আর বলিবে, মাত্র আর চারিটি মাস ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতে। তাহার পরই যক্ষের অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি। প্রিয়ার সহিত তাহার চিরবাঞ্ছিত পুনর্মিলন।

কিন্তু কাহাকে সে পাঠাইবে? কে তাহার জন্য সুদূর অলকাপুরীতে তাহার প্রিয়ার কাছে যাইতে চাইবে? যক্ষের চক্ষুর সম্মুখ দিয়া আকাশে মেঘ ভাসিয়া চলিয়াছে কোন্ সুদূরের উদ্দেশে। যক্ষ তাহাকেই অনুরোধ করিয়া বসিল। যক্ষ যে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য, কিংকর্তব্যবিমূঢ়—চেতন ও অচেতনের ভেদ-বুদ্ধি যে তাহার মন হইতে তিরোহিত। সে ভাবিয়া দেখিল না, অচেতন মেঘ তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবে কি না। সে একেবারেই মেঘকে দূত করিয়া তাহার প্রিয়ার উদ্দেশে তাহাকে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া বসিল।

ইহারই নাম মেঘদূত।

মেঘদূত কাব্যের মাত্র দুইটি ভাগ—পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ। প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মতে, ইহার নাম খণ্ডকাব্য। পূর্বমেঘে যক্ষের জবানিতে কবি

মেঘকে উপদেশ দিতেছেন—কোন্ কোন্ পথ দিয়া তাহাকে যাইতে হইবে, কোথায় কি কি দৃশ্য তাহার দৃষ্টিপথে পড়িবে। আর্দ্রবেতসলতায় পরিপূর্ণ রামগিরি হইতে মেঘকে উত্তর দিকে যাইতে হইবে অলকাপুরীর উদ্দেশে।

উত্তরমেঘে কবি অলকাপুরীর বর্ণনা দিয়াছেন। অলকাপুরীর মণিময়-প্রাঙ্গণযুক্ত উচ্চ প্রাসাদশ্রেণী; মৃদঙ্গধ্বনি-নিনাদিত প্রাসাদসমূহের প্রতি কক্ষে, প্রতি বাতায়নে কত শত মনোহর দৃশ্যের সমাবেশ! সুন্দরী অন্তঃপুরিকাগণের হস্তে লীলাকমল, কুন্দকুসুমগ্রথিত অলকগুচ্ছ, লোধ্রকুসুমের পরাগরঞ্জিতা মুখশ্রী, কেশপাশের উপরিভাগে নব কুরবকপুষ্প, কর্ণে কমনীয় কোমল শিরীষ-কুসুম, সীমন্তে নব-বর্ষার কদম্বকেশর। তাহাদের অব্যাজমনোহর তনুতে প্রকৃতির দেওয়া বিবিধ সাজসজ্জার সুষমা।

ইহার পর যক্ষের নিজের গৃহের কথা। যক্ষরাজ কুবেরের রাজপ্রাসাদের উত্তর দিকে ইন্দ্রধনুর ন্যায় সুন্দর তোরণযুক্ত যক্ষের প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে তন্বী, শ্যামা, শিখরি-দশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, ক্ষীণকটি, হরিণীনয়না, নিম্ননাভি, শ্রোণীভারে অলসগমনা, বক্ষোভারে অবনত-দেহা যক্ষপ্রিয়ার ইন্দীবর অক্ষিযুগল রোদনে স্ফীত, ওষ্ঠাধর দীর্ঘনিশ্বাসে বিবর্ণ, মুখমণ্ডল উন্মুক্ত কেশপাশে আচ্ছাদিত।

যে সময়ে মেঘ যক্ষের প্রাসাদে উপনীত হইবে, তখন যক্ষপ্রিয়া হয়তো নির্বাসিত পতির প্রতিমূর্তি অঙ্কিত করিতেছে, হয়তো বা মঞ্জুভাষিণী সারিকাকে পতির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিংবা হয়তো যক্ষপ্রিয়া বীণা ক্রোড়ে করিয়া যক্ষের নামাঙ্কিত একটি সঙ্গীত রচনা করিয়া তাহাতে সুর দিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু বারে বারে গানের সুর ভুলিয়া যাইতেছে, আর নয়নজলে বীণা অভিষিক্তা হইতেছে। হয়তো বা প্রিয়-বিরহের আর কয়দিন অবশিষ্ট আছে, তাহা গণনা করিতেছে।

যক্ষপ্রিয়া সারা দিবস গৃহকর্মের মাঝে আপনার দুঃখ কোনরূপে ভুলিয়া থাকে; কিন্তু রাত্রিতে তো কোন কাজ থাকে না। নিদ্রাহীনা প্রিয়াকে যক্ষের সংবাদ দিবার পক্ষে রজনীর দ্বিতীয় প্রহরই উপযুক্ত সময়। মেঘ ওই সময়েই প্রাসাদের গবাক্ষ দিয়া প্রিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিবে।

এইরূপে কবি বিরহীজনের শোকার্ত হৃদয়ের প্রতিটি চিত্র পাঠকমনের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছেন। মেঘের ঘনঘটার মত মেঘদূতের ধ্বনি অতি গম্ভীর ও মর্মস্পর্শী। ধ্বনিই মেঘদূত কাব্যের প্রাণ।

"যক্ষ বিরহকাতর। তাহার হৃদয় গুরুভারে পীড়িত। শোকে ও দুঃখে তাহার চিন্তাগতি মন্থর। বেহাগের ন্যায় করুণ মর্মস্পর্শী সুরে মন্দাক্রান্তা ছন্দে যক্ষ ধীরে ধীরে বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার ভারাক্রান্ত হৃদয়ের কথা বলিতেছে। ভাবের সহিত ছন্দের অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। কাব্যের ধ্বনি, ছন্দ ও রীতি যক্ষের করুণ কণ্ঠে মিশিয়া এক অপূর্ব কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছে।"

মেঘদূত-কাব্যের নায়ক কে—এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। অভিশপ্ত ব্যক্তির নাম-গ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কাব্যের নায়ক অলকাবাসী যক্ষটির নাম উল্লিখিত হয় নাই—ইহাই কাহারও কাহারও মত।

অনেকে বলেন, মেঘদূতকাব্যের নায়ক বিরহী যক্ষ আর কেহ নহেন—তিনি স্বয়ং কবি কালিদাস। কবি মেঘদূতের মধ্যে নিজেরই বিরহী জীবনের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের আদেশে কবিকে বহুদিন উজ্জয়িনী ছাড়িয়া প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের অন্তর্গত সুদূর কুন্তলপ্রদেশে কর্মব্যপদেশে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত বাকাটক-রাজবংশের দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সহিত নিজকন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ দেন এবং জামাতার অকালমৃত্যুর পর বিশ্বস্ত কর্মচারীর দ্বারা কন্যার নামে বাকাটক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কালিদাসও বাকাটক রাজ্যে গিয়াছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের দৌহিত্রগণের শিক্ষক ও রাজপরিবারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কবি কালিদাস যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দূত হিসাবে কুন্তল-রাজসভায় গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ রাজশেখর-রচিত কাব্যমীমাংসায়, ভোজরাজ-প্রণীত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ও শৃঙ্গার-প্রকাশে এবং ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য-বিচার-চর্চা নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ভোজরাজ-প্রণীত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে, কালিদাস কুন্তলেশ্বরের রাজসভা হইতে উজ্জয়িনীতে প্রত্যাবর্তন করিলে বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে-প্রশ্ন করিলেন,—"কুন্তলেশ্বর কি করিতেছেন?" ইহার উত্তরে কালিদাস বলিলেন, "কুন্তলরাজ আপনার উপর সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া প্রিয়াগণের আনন-মধু-পানে ব্যস্ত আছেন।"[১] ইহার প্রত্যুত্তরে বিক্রমাদিত্য ওই কথাটিই একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "কুন্তলেশ্বর আমার উপর রাজ্যভার ছাড়িয়া দিয়া প্রিয়াগণের আনন-মধু পান

(১) "পিবতি মধুসুগন্ধীন্যাননানি প্রিয়াণাং
ত্বয়ি বিনিহিত-ভারঃ কুন্তলানামধীশঃ॥"

করিতে থাকুক।" রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায়ও "ত্বয়ি বিনিহিত-ভারঃ কুন্তলানামধীশঃ" শ্লোকটি দৃষ্ট হয়।

ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য-বিচার-চর্চা নামক গ্রন্থে কুন্তলেশ্বর-দৌত্যে বর্ণিত আছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দূত হইয়া কালিদাস স্বীয় সামন্তরাজ কুন্তলেশ্বরের রাজসভায় গমন করিলে একবার নাকি তিনি স্বীয় পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন পান নাই। কিন্তু স্বীয় কার্যসিদ্ধির জন্য তিনি এই অপমান উপেক্ষা করিয়া ভূমিতলেই উপবেশন করিলেন ও ধরাসনের গৌরব বর্ণনাচ্ছলে বলিলেন, "এই ধরণীপৃষ্ঠে পর্বতরাজ মেরু ও সপ্তসাগর অবস্থান করিতেছে, এই বসুন্ধরা নাগ-রাজের ফণার উপর অবস্থিত—আমাদের মত সামান্য লোকের বসিবার পক্ষে এই ধরাসনই উপযুক্ত স্থান।"[২]

কালিদাস যে বিক্রমাদিত্যের দৌহিত্র প্রবরসেনের গৃহশিক্ষক ছিলেন ও ছাত্রের নাম দিয়া প্রাকৃত ভাষায় একখানি কাব্য রচনা করেন, তাহার প্রমাণ, প্রবরসেন-রচিত সেতুবন্ধ-কাব্য। অনেকেরই ধারণা, কাশ্মীররাজ প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর যে সেতুবন্ধন করেন, তাহার স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তিনি এই সেতুবন্ধ-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা যে ভিত্তিহীন, তাহা ক্রমশই প্রতিপন্ন হইতেছে। সেতুবন্ধ-কাব্যের রচয়িতার নাম 'কুন্তলেশ্বর' বলিয়া কোনও কোনও পুঁথিতে উল্লিখিত আছে। উপরন্তু কৃষ্ণকবি-রচিত ভরত-চরিত-কাব্যেও সেতুবন্ধকার-রূপে কুন্তলেশ্বরের নাম পাওয়া যায়।[৩] অতএব সেতুবন্ধকাব্য-রচয়িতা প্রবরসেন ও কুন্তলেশ্বর প্রবরসেন যে একই ব্যক্তি, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই প্রবরসেনের জন্যই কবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আদেশে সেতুবন্ধ-কাব্য রচনা করেন, ইহার প্রমাণ সেতুবন্ধ-কাব্যের টীকাকার রামদাসের উক্তির মধ্যেই রহিয়াছে।[৪] সেই

---

(২) "ইহ নিবসতি মেরুঃ শেখরঃ ক্ষাধরাণা-
মিহ বিনিহিতভারাঃ সাগরাঃ সপ্ত চান্যে।
ইদমহিপতিভোগস্তম্ভবিভ্রাজমানং
ধরণিতলমিহৈব স্থানমস্মদ্‌বিধানাম্।"—কুন্তলেশ্বর-দৌত্যে কালিদাসঃ।

(৩) "লোকেষলঙ্কারমপূর্বসেতুং
ববন্ধ কীর্ত্যা সহ কুন্তলেশঃ।"—ভরতচরিতম্।

(৪) "ধীরাণাং কাব্যচর্চাচতুরিমবিধয়ে বিক্রমাদিত্যবাচা
যং চক্রে কালিদাসঃ কবি-কুমুদ-বিধুঃ সেতুনাম প্রবন্ধম্।"

হইতে প্রবরসেনের নামেই সেতুবন্ধ-কাব্য চলিয়া আসিতেছে। আসলে কিন্তু উহা কালিদাসের রচনা।

প্রবরসেনের সহিত কালিদাসের যে ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাহার আরও একটি প্রমাণ এই যে, প্রবরসেনের পট্টন-শাসন-লিপির রচয়িতা বলিয়াও কালিদাসের নামের উল্লেখ আছে। প্রবরসেনের তাম্রশাসন ও শিলালিপি রচনা করিবার ভার যে কবি কালিদাসের উপরই অর্পিত ছিল, এরূপ মনে করাও অসঙ্গত নহে।

এক সময়ে কুন্তলরাজমাতা প্রভাবতী গুপ্তা রামগিরি-প্রদেশে 'ভূদান-যজ্ঞ' সম্পন্ন করেন। সে সময়ে রাজপরিবারের সহিত কালিদাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কবি হয়তো সেই সময়েই মেঘদূত রচনার প্রেরণা-লাভ করেন। "হয়-তো বর্ষার কোন্ এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসে প্রবাসী কবির চিত্ত প্রিয়তমার বিরহে বেদনাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রভু বিক্রমাদিত্যের আদেশে বাকাটক রাজ্যে আসিয়াছিলেন। রাজরোষ-ভয়ে বা কর্তব্যের অনুরোধে কবিকে দেশত্যাগী হইতে হইয়াছিল। আজ নবমেঘদর্শনে রাজাদেশ তাঁহার কাছে অভিশাপ বলিয়া মনে হইল। তখন নিজ হৃদয়ের গভীর ভাবাবেগকে তিনি বিরহী যক্ষের বেদনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিলেন।"

তাই বলি, মেঘদূত কাব্যের নায়ক মহাকবি কালিদাস স্বয়ং।

দূত-কাব্য হিসাবে মেঘদূত প্রথম কাব্য কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ কালিদাসের সমসাময়িক ঘটকর্পর-কবি-কৃত একখানি যমক-কাব্য আছে, সেখানিও দূত-কাব্য। কাব্যখানি ২২টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাও একখানি 'মেঘ-দূত'। কারণ, কোনও বিরহিণী তাহার পতির নিকট মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়াছিল—এই কাহিনী কাব্যটির ১১টি শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া তাঁহার মেঘদূত-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কি না কে বলিতে পারে? ইহা ভিন্ন রামায়ণের মধ্যে তো শ্রীরামচন্দ্র হনুমানকে দূতরূপে সীতার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহা হইতেও কবির মনে মেঘদূতের কল্পনা জাগিতে পারে।

কালিদাসের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য—মেঘদূত। প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রে কিন্তু গীতিকাব্যের কোনও উল্লেখ ছিল না। তখনকার দিনে 'গীতিকাব্য' বা

'গীতিকবিতা'র নামের প্রচলন হয় নাই। সেকালে কাব্যের মধ্যে গীতিকাব্য বলিয়া বিশেষ কোনও বিভাগ ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মতে তাই মেঘদূত খণ্ডকাব্যের অন্তর্গত।

"আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে" যক্ষ মেঘকে স্বাগত জানাইয়া অলকায় প্রিয়ার নিকট যাইবার জন্য তাহাকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে ওই দিনে মেঘদূত-উৎসব পালন করেন। কিন্তু আষাঢ়ের প্রথম দিনেই যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইয়া ছিল কি না—এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন। যাঁহারা ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁহারা বলেন, মেঘদূতের শ্লোকে যে "আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে" বলা হইয়াছে, তাহা ভুল। উহার আসল পাঠ হইবে "আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে"। এবং উহার অর্থ হইবে—আষাঢ় মাসের শেষ দিনে যক্ষ মেঘকে দূত নিযুক্ত করিয়াছিল, প্রথম দিনে নহে। তাহাদের এইরূপ মতপ্রকাশের যুক্তি এই প্রকার।—

মেঘদূতে পূর্বমেঘের প্রথম দিকে একটি শ্লোকে[৫] বর্ণিত হইয়াছে—"আসন্ন শ্রাবণ মাসে বিরহিণী প্রিয়ার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য যক্ষ মেঘের সাহায্যে প্রিয়ার উদ্দেশে নিজের কুশলবার্তা প্রেরণের মানসে, তাহাকে কুটজকুসুম দিয়া পূজা করিয়া স্বাগত জানাইয়াছিল।" এক্ষণে দেখিতে হইবে, আষাঢ় মাসের কোন্ -দিন শ্রাবণ মাসের নিকটবর্তী? প্রথম দিন, না, শেষ দিন? নিশ্চয়ই শেষের দিন। অতএব আষাঢ়ের শেষ তারিখই মেঘদূত প্রেরণের উপযুক্ত দিবস।

এই মতের উত্তরে বলা যাইতে পারে, নৈকট্য দিনের হিসাবে কল্পনা না করিয়া মাসের হিসাবে করিলে দোষ কি? সমগ্র আষাঢ় মাসই তো শ্রাবণ মাসের নিকটবর্তী। অতএব মাত্র নৈকট্যের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আষাঢ় মাসের তারিখের প্রশ্ন উঠে না। তাহাই যদি হয়, তবে যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথম দিনটিকে বাদ দিয়া মেঘের দেখা পাইবার জন্য মাসের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে কেন?

শ্রাবণ মাস 'অতি-নিকটবর্তী' বলিলেও না হয় আষাঢ় মাসের শেষ তারিখে দূত-প্রেরণের কথা মনে হইতে পারিত, কিন্তু কাব্যে তাহা তো বলা হয় নাই।

---

(৫) "প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি-প্রমুখ-বচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥"

যক্ষ আষাঢ় মাসের প্রথমেই মেঘ দেখিয়াছিল, কিন্তু প্রিয়ার প্রাণ বাঁচাইবার কথা তাহার শেষ দিনে মনে পড়িল—এরূপ যুক্তিও কার্যকরী নহে, কারণ ওই কথা মেঘদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই যক্ষের মনে পড়া উচিত ছিল।

হয়তো বা কেহ কেহ বলিবেন, যক্ষ বিরহশোকে উন্মত্ত, তাহার পক্ষে এরূপ বিবেচনাপূর্বক কাজ করা সম্ভবপর নহে। এরূপ কথা বলিলে বর্ষায় প্রিয়ার বিরহ-যন্ত্রণা লাঘব করিবার মানসে মেঘকে তাহার নিকট পাঠাইবার সুপরিকল্পিত আয়োজনও যক্ষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহা হইলে মেঘদূত-কাব্যরচনাই তো অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। এইরূপ যুক্তির অবতারণা না করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যক্ষ মেঘের দেখা পাইয়া তাহাকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছিল—এরূপ মনে করাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

এই সব অসুবিধা ও বাদানুবাদ দূর করিবার জন্য টীকাকার নাথ "প্রত্যাসন্নে নভসি" ( আসন্নবর্তী শ্রাবণ মাসে ) পাঠের পরিবর্তে "প্রত্যাসন্নে মনসি" ( যক্ষের মন প্রকৃতিস্থ হইলে ) এরূপ পাঠ করেন। কিন্তু এরূপ পাঠ-পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। "প্রত্যাসন্নে নভসি" ও "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে"—এই দুই পাঠের মধ্যে যে কোনও অসঙ্গতি নাই, তাহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু তাই বলিয়া পয়লা আষাঢ় তারিখে মেঘদূত-উৎসব পালন করা সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবস' ও 'পয়লা আষাঢ়' তো এক জিনিস নহে। বর্তমান কালে আমরা ক্যালেণ্ডারের মাস হিসাবে কার্য করি। ক্যালেণ্ডারের মাস পয়লা তারিখে আরম্ভ ও সংক্রান্তিতে শেষ হয়। এইরূপ মাসের নাম 'সৌর-মাস'। এক সংক্রান্তি হইতে পরবর্তী সংক্রান্তি পর্যন্ত যে মাস, তাহারই নাম সৌরমাস। কারণ, উহা সূর্যের রাশি-সঞ্চারের উপর নির্ভর করে। সূর্য দ্বাদশটি মাসে দ্বাদশটি রাশিতে সংক্রমণ করেন। ওই সংক্রমণের দিনের নাম সংক্রান্তি। সেকালে কিন্তু সৌরমাসের হিসাব না ধরিয়া চান্দ্রমাসের হিসাবে ধর্মকর্ম ও অন্যান্য কার্য অনুষ্ঠিত হইত। চান্দ্রমাস আবার দুই প্রকার—মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। এক অমাবস্যা তিথি হইতে পরবর্তী অমাবস্যা তিথি পর্যন্ত যে মাস—তাহার নাম মুখ্য চান্দ্রমাস, এবং এক পূর্ণিমা তিথি হইতে পরবর্তী পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত যে মাস—তাহার নাম গৌণ চান্দ্রমাস। যক্ষের মেঘদর্শন ও মেঘদূত প্রেরণ সৌর আষাঢ় মাসের পয়লা তারিখে হয় নাই, মুখ্যচান্দ্র আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে অর্থাৎ

শুক্লা-প্রতিপদ তিথিতে হইয়াছিল। অতএব "মেঘদূত উৎসব" পালন করিতে হইলে পয়লা আষাঢ় তারিখে না করিয়া মুখ্যচান্দ্র আষাঢ়ের শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে পালন করাই যুক্তিসঙ্গত।[৬]

মেঘদূতে উত্তরমেঘের শেষের দিকে একটি শ্লোকে[৭] বলা হইয়াছে—"ভগবান্ নারায়ণ অনন্তশয্যা হইতে উঠিলে যক্ষের শাপের অবসান হইবে। তখন শারদী পৌর্ণমাসী তিথিতে নিশিযাপন করা যক্ষদম্পতির পক্ষে সম্ভবপর হইবে।" অতএব প্রিয়ার প্রতি যক্ষের অনুরোধ—"অবশিষ্ট চারিটি মাস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোনক্রমে কাটাইয়া দাও।"

সকলেই জানেন, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে নারায়ণ অনন্তশয্যা ত্যাগ করেন। তাই উক্ত তিথিকে "উত্থান একাদশী" বলে। তাহা হইলে বুঝা গেল, কার্তিকের শুক্লা একাদশীতে যক্ষের শাপাবসান হইবে। তাহাই যদি হইল, তবে আষাঢ়ের প্রথম দিন হইতে গণনা করিলে শাপাবসান হইতে চারি মাস দশ দিন অবশিষ্ট থাকিবার কথা। পুরাপুরি চারি মাস অবশিষ্ট থাকে কিরূপে?

'আষাঢ়স্য প্রশমদিবসে' পাঠ ধরিলেও এ বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হয় [redacted] কারণ সে ক্ষেত্রে, আষাঢ়ের শেষ দিন হইতে গণনা করিলে শাপাবসান হইতে তিন মাস দশ দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। প্রথম হিসাবে চারি মাস অপেক্ষা দশ দিন অধিক ও দ্বিতীয় হিসাবে চারি মাস অপেক্ষা কুড়ি দিন কম হয়। কোন হিসাবেই পুরাপুরি চারি মাস হয় না। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে উক্ত দশ দিনের আধিক্য গণনা না করিয়া মোটামুটিভাবে চারি মাস অবশিষ্ট আছে ধরিতে হইবে। ইহাই মল্লিনাথের অভিমত।

সেকালে অগ্রহায়ণ হইতে বর্ষ আরম্ভ হইত। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসকে বর্ষাকাল এবং আশ্বিন ও কার্তিক মাসকে শরৎকাল বলিয়া মনে করা হইত।

---

(৬) বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত দিবস ১৬ই আষাঢ় ১৩৬১, ইংরাজী ১লা জুলাই ১৯৫৪ তারিখে পড়িয়াছে।

(৭) "শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহ-গণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু।"

এই জন্যই শ্রাবণ মাসে বর্ষাগমে প্রিয়ার প্রাণরক্ষার জন্য যক্ষের এত উৎকণ্ঠা এবং কার্তিক মাসেও শারদী পূর্ণিমা তিথির অবস্থান সম্ভবপর হইয়াছে।

মেঘদূতের শ্লোক-সংখ্যা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। টীকাকার বল্লভদেবের মতে শ্লোকসংখ্যা ১১১, দক্ষিণাবর্তের মতে ১১০, অন্যের মতে ১২৬; মল্লিনাথ কিন্তু ১১৮টি শ্লোকই কালিদাসের লেখা বলিয়া মনে করিয়াছেন ও সেই শ্লোক-গুলির উপরই টীকা লিখিয়াছেন। অবশিষ্ট শ্লোকগুলি তাঁহার মতে প্রক্ষিপ্ত বা অন্য কবির লেখা।

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে মেঘদূতের কিরূপ পাঠ ছিল, তাহা জানা যায় জিন-সেন-কৃত পার্শ্বাভ্যুদয় নামক কাব্যগ্রন্থে। উক্ত গ্রন্থে মেঘদূতের শ্লোকের চরণগুলি সমস্যাপূরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকগুলির পাঠ মল্লিনাথের পাঠ হইতে পৃথক।

মেঘদূতের বিষয়বস্তু, ইহার ভাব ও ভাষার সম্মোহনী শক্তি সংস্কৃত কাব্য-জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। কালিদাসের পরবর্তী যুগে বহু কবি ইহার অনুকরণে বিভিন্ন "দূতকাব্য" রচনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধোয়ী-কবিকৃত পবনদূত, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বেদান্ত-দেশিক-কৃত হংসসন্দেশ, খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রূপগোস্বামী-কৃত হংসদূত এবং খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণানন্দ সার্বভৌম-কৃত পদাঙ্কদূত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ভিন্ন কবি শ্রীহর্ষ-রচিত নৈষধচরিতেও হংসদূতের কথা আছে।

শুধু যে ভারতীয় রসতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বজ্জনগোষ্ঠী মেঘদূতের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইউরোপীয় বহু মনীষী ইহার রচনাকৌশলে ও কবিত্ব-প্রতিভায় বিস্মিত ও বিমোহিত। জার্মান কবি গেটে কালিদাসের শকুন্তলার মতই তাঁহার মেঘদূতকেও ভালবাসিয়াছেন। কবি গেটে ও কবি শিলার মেঘদূতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়াছেন। শিলার মেঘদূতের ঐন্দ্রজালিক মোহজালের প্রভাব অতিক্রম করিতে না পারিয়া ইহারই অনুকরণে তাঁহার মেরিয়া স্টুয়ার্ট ( Maria Stuart ) রচনা করিয়াছেন।

দেশে ও বিদেশে মেঘদূতের সমাদর এত অধিক যে, বিভিন্ন ভাষার কবিগণ তাঁহাদের ভাষায় মেঘদূতকে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক কালে বঙ্গভাষায় বহু কবি মেঘদূতের পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য-ভারতীকে সমৃদ্ধা করিয়াছেন। ইহা মেঘদূতের অত্যধিক জনপ্রিয়তাই প্রমাণিত করে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

# প্রসঙ্গ কথা

কয়েক বৎসর আগে জনৈক সুপরিচিত সাহিত্যিক সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় সাহিত্য-আলোচনা প্রসঙ্গে দাবি জানিয়েছিলেন—'চাই আনন্দের সাহিত্য'। 'আনন্দের সাহিত্য' অর্থাৎ এমন সাহিত্য, যে সাহিত্য পাঠে মন আশায় ও আনন্দে ভরপূর হয়ে ওঠে, বেঁচে থাকার সার্থকতায় বিশ্বাস ফিরে পাওয়া যায়, মানুষকে ভালবাসতে সাধ যায়। বেশ কিছুকাল হ'ল বাংলা-সাহিত্যের আবহাওয়া নৈরাশ্যবাদের কালিমায় ঘুলিয়ে উঠেছে, তথাকথিত রিয়ালিষ্টিক সাহিত্যসৃষ্টির নামে সর্বপ্রকার কদর্যতা, কুশ্রীতা বাংলা-সাহিত্যের দরবারে নির্বিচারে প্রশ্রয় পাচ্ছে—ক্লেদপঙ্কিল আবর্জনার স্তূপে সাহিত্যের আঙিনা ভ'রে উঠল। প্রধানত সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য সাহিত্যের দৃষ্টান্তে এমন রচনাদর্শ বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগের চেষ্টা চলছে, যার পরিণামফল বাংলার সাহিত্য ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়ে পারে না। এ জাতীয় কৃত্রিম আদর্শাশ্রিত রচনা একনাগাড়ে খানিকক্ষণ পড়বার চেষ্টা করলে মনের ভিতর হাঁপ ধ'রে যায়, মনে হয় শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, পায়ের নীচে থেকে বাংলার চিরাভ্যস্ত সংসার ও সমাজের মাটি স'রে যাচ্ছে, সবলে আঁকড়ে থাকবার মত কোন প্রত্যয়ই যেন আর নিজের ভিতর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এক কথায়, চিত্তবিমর্ষকারী, মানবপ্রীতিবিবর্জিত, অবিশ্বাসী সাহিত্যসৃষ্টির কোলাহলে বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত হয়ে উঠল। এই অসুস্থ কোলাহল দূর করতে হ'লে চাই আনন্দের প্রতিষেধ, আশার প্রতিষেধ, প্রেমের প্রতিষেধ। বেঁচে থাকা যে নিরর্থক নয়, সর্বপ্রকার সাময়িক পতন স্খলন পরাজয় ও মৃত্যুর পরপারে নতুন আশা ও আনন্দের আলো বাঙালী সমাজের দিগন্তে চিকচিক করছে, মানুষকে ভালবেসে এবং মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়ে আজও যে সুখ পাওয়া যায়—এই সুর বাংলা-সাহিত্যে আবার ফিরিয়ে আনা দরকার। নতুন লেখকের দল এই সুস্থ জীবনাদর্শ তাঁদের লেখায় সজ্ঞানে অনুসরণ করলে তবেই সাহিত্যের মঙ্গল; নয়তো যে পথ ধ'রে বাংলা-সাহিত্য অগ্রসর হচ্ছে সে পথেই যদি বাধাবন্ধহীন ভাবে তার পরিক্রমণ চলতে থাকে, তা হ'লে বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিতরূপে অন্ধকার।

কথাটা ভাববার মত। সত্যই তো, আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে

আনন্দের বার্তা কোথায়? গোড়া ধ'রে বিষয়টির আলোচনা করা যাক। আমাদের জীবনের কী লক্ষ্য?—সুখ শান্তি ও আনন্দ। যে সাহিত্য-পাঠে এই সুখ-শান্তি-আনন্দের প্রত্যাশা প্রতি পদে পীড়িত ও খণ্ডিত হয়, সে সাহিত্য কখনও সমাজজীবনের মূলে শক্তি সঞ্চার করতে পারে না। নৈরাশ্য ও নিরানন্দের চিত্র ক্রমাগত চোখের সামনে তুলে ধরলে চোখেই যে শুধু জ্বালা ধরে তা-ই নয়, মনও বিষিয়ে ওঠে। ব্যক্তিমনের এই বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে সমাজমনে সঞ্চারিত হয়, আর তার ফলে সমাজজীবনে সহস্রবিধ গ্লানির উদ্ভব হয়ে সমাজকে সুনিশ্চিত ধ্বংসের অভিমুখে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমরা সকলেই জানি, সাহিত্য ও সমাজ পরস্পর নিবিড় সম্পর্কে সম্পর্কিত। তার মানে শুধু এ নয় যে, সাহিত্য সমাজের দর্পণ; তার মানে এও বটে যে, সাহিত্য সমাজের নিয়ামক। সাহিত্যের আবহাওয়া অনিবার্যভাবে সমাজের উপর প্রতিফলিত হয়ে তার রূপ বদলায়। আমাদের আধুনিক লেখকদের দূরদৃষ্টির অভাবের ফলে সাহিত্যের ভিতর কেবলই যদি জীবনবিমুখতা আর নৈরাশ্যবাদের বাণী প্রচারিত হতে থাকে, তা হ'লে এক সময় না এক সময় সমাজও জীবন-বিমুখ তথা হতাশাকবলিত হয়ে উঠতে বাধ্য। সে অসুস্থ পরিণাম অনুমানের স্তর থেকে সম্ভাবনার স্তরে অবনীত হওয়ার আগেই সময় থাকতে প্রক্রিয়াটিকে কঠোর হস্তে রোধ করা দরকার। কাজেই সম্মিলিত বলিষ্ঠ স্বরে এখন থেকেই দাবি জানাতে হবে—'চাই আনন্দের সাহিত্য'। তার সঙ্গে আরও একটু কথা যোগ করলে ভাল হয়—'চাই নিষ্কলুষ সাহিত্য'। বাস্তবচারিতা তথা তথাকথিত মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের নামে কলুষিত চিন্তনমনন কল্পনার পরিবেশন ঢের হয়েছে; আর কোন কারণে না হোক, সাহিত্যিক শুচিতার জন্যই এ জিনিস অবরুদ্ধ হওয়া দরকার।

কেউ কেউ বলতে পারেন, অসম সমাজব্যবস্থার অত্যাচার-অবিচারের ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের দিকে দিকে যখন কুশ্রীতার আবিলতা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, তখন সাহিত্যকে সৌন্দর্যাশ্রিত করা কি সম্ভব? এমন কোন্ যাদুদণ্ড আছে যার সংস্পর্শ-প্রভাবে নিরানন্দ পরিবেশকে আনন্দময় পরিবেশে রূপান্তরিত করা যায়? রাষ্ট্র, অর্থ ও সমাজনৈতিক অব্যবস্থার কারণে জাতীয়

জীবনের বারিধি মথিত হয়ে ঝলকে ঝলকে গরল উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে, সাহিত্যের সঙ্গে বাস্তবের নিগূঢ় সম্পর্ক স্মরণ ক'রে লেখকদের যদি বাস্তব অবস্থাকে কিছু পরিমাণেও লেখার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হয়, তা হ'লে সে গরলের খানিকটা ঝাঁজ সাহিত্যের উপরও অর্শাতে বাধ্য। জীবনে যেখানে আনন্দ নেই, পরন্তু বিমর্ষতারই প্রাধান্য, সে স্থলে সাহিত্যকে আনন্দময় ক'রে তোলা কী প্রকারে সম্ভব? সাহিত্যব্যপদেশে বাস্তবসঙ্গতির আদর্শ একটি বড় কথা, তা যদি হয় তো অসৌন্দর্য ও আনন্দহীনতাকে সাহিত্য থেকে আমরা বাদ দিয়ে চলব কেমন ক'রে?

কথাটি প্রণিধানযোগ্য। বাস্তবিক, অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের সমাজজীবন নানা দিক থেকে গ্লানিময় হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অন্তর্নিহিত বদ্ধমূল ত্রুটি, শাসনতান্ত্রিক অপদার্থতা, জাতিভেদের অভিশাপ, তথাকথিত আভিজাত্য ও বনেদিয়ানার ভেদবুদ্ধিপ্রসূত অমার্জনীয় আচরণ, প্রবীণদের অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও অতীতাশ্রয়ী মনোভাব, পক্ষান্তরে নবীনদের আত্যন্তিক পাশ্চাত্যমুখিনতা ও নকল আধুনিকতা, পুরুষের প্রভুত্ব-প্রিয়তা তথা স্ত্রীজাতির হীনম্মন্যতা, ছাত্রসম্প্রদায়ের অসংযম, প্রগতিশীলতার নামে যৌন অনাচার ইত্যাদি বিবিধ বিসদৃশ অবস্থার সমবায়ে এমন জটিল ও অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, ভাল ক'রে সমাজের দিকে চোখ চেয়ে তাকানো যায় না। এই যদি দেশের সত্যিকার পরিস্থিতি হয় তো সাহিত্যে তার প্রতিফলন না ঘ'টেই পারে না। অন্তত আংশিক প্রতিফলন তো ঘটবেই। সুতরাং কেন অভিযোগ, কী নিয়ে অভিযোগ? বাস্তবসঙ্গতির আদর্শের প্রতি মুখে আমরা আনুগত্য প্রকাশ করব, অথচ কার্যত তা রূপায়িত হতে দেখলে আঁতকে উঠব—এ-জাতীয় স্বতোবিরোধমূলক আচরণ স্বতই অগ্রাহ্য।

এ কথার জবাব এই যে, বাস্তবতায় আমাদের আপত্তি নেই, আপত্তি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। বাস্তবচিত্রণের নামে ক্লেদরতিটাই যদি মুখ্য হয়ে ওঠে, সে ক্ষেত্রে সবল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাতেই হয়। একই বস্তু নানা জনের মনে নানা রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এখানে বস্তু মৌলিক পদার্থ হয়েও উপলক্ষ্য মাত্র; প্রতিক্রিয়াটাই আসল। বাস্তব সম্বন্ধেও সেই কথা। একই ঘটনা বা আচরণ বিভিন্ন লোকের চোখে পড়ে, কে কোন্ দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে সেই

ঘটনার বিচারে প্রবৃত্ত সেইটেই হচ্ছে এই প্রসঙ্গে সব চাইতে দামী কথা। তার অর্থ, বাস্তবের চাইতেও বেশি জরুরি হ'ল বাস্তব থেকে আহৃত সিদ্ধান্ত। একই বস্তু থেকে কে কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছে তা দিয়েই দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্থতা-অসুস্থতার বিচার। প্রবণতা-ভেদে আমরা একই বাস্তব ঘটনা থেকে আশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। যদি এমন হয় যে, আধুনিক লেখকগণ রিয়ালিস্ট সাহিত্যসৃষ্টির নামে সমসাময়িক কালের বাঙালীর সমাজ-জীবন থেকে কেবলই নৈরাশ্যবাদী সিদ্ধান্ত আকর্ষণ ক'রে চলেছেন, অবসন্ন, ক্লিন্ন বিমর্ষ চিন্তার দ্বারা পাঠকের মনে হাঁপ ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কোন করণীয় নেই, ক্লেদরতিতে তাঁদের অস্বাভাবিক উল্লাস; সে ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে তাঁদের এই আত্মঘাতী প্রয়াস প্রতিহত করবার জন্য এগিয়ে আসতেই হয়। সাহিত্য আনন্দের জিনিস, তার অর্থ তা কল্যাণবাহীও বটে। নীরন্ধ্র নৈরাশ্যবাদ আর বিকৃত মনোভাবের প্রাধান্যের ফলে এই কল্যাণের আদর্শ ক্রমাগত পীড়িত হতে থাকলে কোন সমাজহিতকামী ব্যক্তিই স্থির থাকতে পারেন না।

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে বিমর্ষতার আবহাওয়ার প্রাধান্যের দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। প্রথমে মন্বন্তর-সাহিত্যের কথা ধরা যাক। পঞ্চাশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং তৎপরবর্তী অবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে বাংলা-ভাষায় বহু গল্পোপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। সে সকল সাহিত্যসৃষ্টির প্রভাব অধুনা কিঞ্চিৎ ম্লান হয়ে পড়লেও তদানীন্তন কালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের অব্যবহিত-পরবর্তী বৎসরগুলিতে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল—আশা করি সে কথা অনেকেরই স্মরণ আছে। নিতান্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, সে সকল সাহিত্যপ্রয়াসের অধিকাংশেরই মূল উপজীব্য ছিল উৎকট নৈরাশ্যবাদ—এ কথা যদি বলি, আদৌ অত্যুক্তি করা হবে না। অন্নাভাবের নির্মম তাড়নায় স্বামী স্ত্রীকে বিকিয়ে দিচ্ছে, পিতা সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির সঙ্গে কন্যার অনুচিত সম্পর্কের গ্লানি দেখেও দেখছেন না, স্ত্রী অশক্ত রুগ্ন স্বামী ও বুভুক্ষু সন্তানাদির মুখে অন্নদানের জন্য নারীজীবনের সব চাইতে গর্বের বস্তু সতীত্বকে ধূলায় লুটিয়ে দিতে দ্বিধা করছে না, মোটা অঙ্কের কণ্ট্রাক্টের লোভে এবং চাকুরিতে প্রমোশনের আশায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অক্লেশে আপিসের বড়কর্তাদের লালসার যূপকাষ্ঠে পারিবারিক

সম্মান বলি দিচ্ছে, ইত্যাদি ও প্রভৃতি। যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে মনুষ্যত্বের এমন চরম অবমাননাকর ঘটনা বাংলা দেশে ঘটে নি তা নয়—হয়তো আমাদের আত্মপ্রসাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায়ই ঘটেছে,—তা ব'লে সেইটেই বাস্তব পরিস্থিতির সবটুকু দিক নয়। বাস্তবের আরও একটি দিক ছিল, যেখানে শত বিপর্যয়ের আঘাত-সংঘাতের মধ্যেও নারী কিছুতেই তার গৌরব ধূল্যবলুণ্ঠিত হতে দেয় নি, অভাব-অনটনের সুতীব্র পীড়ন উপেক্ষা ক'রে আত্মসম্মানী মানুষের মনে বড় হয়ে উঠেছে জাতীয় মর্যাদার চেতনা। মানুষ অনাহারের জ্বালায় ক্ষিপ্তবৎ হয়ে খাদ্যের সন্ধানে দিগ্বিদিকে ছুটেছে, খাদ্যের অভাবে শুকিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেছে, তবু তার সম্মান বিসর্জন দেয় নি। দারিদ্র্যের চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার মধ্যেও নারীকে সত্যপথভ্রষ্ট করতে পারা যায় নি। কিন্তু এই গৌরবোজ্জ্বল শেষোক্ত দিকের চিত্র উপস্থাপিত করতে আমাদের লেখকবৃন্দ উৎসাহ পান নি, তাঁরা তাঁদের সবটুকু মনোযোগ ও উদ্যম ন্যস্ত করেছিলেন প্রথমোক্ত বিষয়ের চিত্রণের উপর। যেন সেইটেই একমাত্র রিয়ালিটি, সেইটেই একমাত্র পরিবেশনযোগ্য সাহিত্যিক বিষয়। এর থেকে মিথ্যা, এর থেকে জাতীয় চরিত্রের অপমান আর কিছু হতে পারে না। অথচ এই প্রচণ্ড মিথ্যার বেসাতিই যুদ্ধকালীন বাংলা-কথাসাহিত্যের একাংশের প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছিল।

প্রশ্ন হতে পারে, বর্ণিত চিত্র যদি সত্য না-ই হবে, তবে কেন লেখকগণ সেই চিত্রের রূপায়ণে দৃষ্টিগ্রাহ্য অধ্যবসায় প্রদর্শন করেছিলেন? তার উত্তর এই যে, মনোবৃত্তির অধোগামিতাই এর কারণ। আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীল আধুনিক লেখকদের চারিত্রশক্তি যদি আরও উচ্চ মানের হ'ত, তাঁদের আত্ম-সম্মানবোধ আরও সুতীব্র হ'ত, তা হ'লে এ জাতীয় অঘটন কখনই ঘটতে পারত না। আসলে তাঁরা অল্পবিস্তর সকলেই পরাজিতের মনোভাবসম্পন্ন লেখক, স্বকীয় পরাজিতসুলভ মনোভাবকে নিতান্ত অনুচিতভাবে তাঁদের সেই সময়কার সৃষ্ট চরিত্রাদির উপর প্রক্ষেপ করেছিলেন। মহৎ মানবিক মূল্যবোধের প্রতি যে শ্রদ্ধা থাকলে শত বিপর্যয়ের মধ্যেও চরিত্রকে অবিকৃত রাখবার প্রেরণা পাওয়া যায়, সে শ্রদ্ধা যেমন তাঁদের নিজেদের মধ্যে নেই, তেমনই অপরের মধ্যেও সে শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারে তাঁদের উৎসাহ অনুপস্থিত। কাজেই মনুষ্যত্বের অবমাননার

চিত্র-অঙ্কনে তাঁদের রুচিবোধ পীড়িত হয় না, বরং এ থেকে কেমন একপ্রকারের বিকৃত সুখ তাঁরা লাভ করেন, মনস্তত্ত্বের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে পীড়ন-মূলক বা সাদীয় (sadistic) সুখ। এক মুষ্টি চালের জন্য বা অনুরূপ তুচ্ছ সামান্য সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের টোপ সামনে ঝুলিয়ে রেখে যে লেখক তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে নারীকে তার শ্রেষ্ঠ সম্মান বিসর্জন দিতে প্রবোচিত করেন, সে লেখক বাস্তবসঙ্গতির নামে স্বকীয় হীন মনোবৃত্তিকেই সকলের সামনে তুলে ধরেন মাত্র। এতে বাস্তবসঙ্গতির আদর্শ কতখানি রক্ষা পায় জানি না, তবে এটি যে স্বীয় ক্লেদাক্ত রুচির সমর্থন অপরের আচরণের মধ্যে খোঁজবার একটি সূক্ষ্ম অথচ সজ্ঞান প্রয়াস সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। বড়ই দুঃখের এবং তাজ্জবের ব্যাপার যে, মানুষ যেখানে চারিত্রভ্রষ্ট, অধঃপতিত, ক্ষুদ্র, কোন কোন লেখকের দৃষ্টি যেন সেখানেই বিশেষভাবে নিবদ্ধ; পক্ষান্তরে মানুষের চরিত্রের মহত্ত্বের দিক, সৌন্দর্যের দিক, মাধুর্যের দিক যেন তাঁদের চোখেই পড়তে চায় না। যে মানুষ সংযমে সুদৃঢ়, সহিষ্ণুতায় অবিচল, শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও যার চিত্তের স্থৈর্য ক্ষুণ্ণ হয় না, রক্তমাংসে গড়া দেহের স্বাভাবিক দুর্বলতা স্বীকার ক'রে নিয়েও আত্মার তেজে যে তাকে অতিক্রম ও পরাভূত করার সৎসাহস রাখে, সততার দ্যুতিতে যে মানুষের ভিতর-বাহির প্রভাময়, সেই সংগ্রামশীল মানুষের চিত্র ফুটিয়ে তোলবার মধ্যে একটা গৌরব আছে, আছে লেখনীর একটি স্বাভাবিক স্ফূর্তি। অথচ আশ্চর্য, এই স্ফূর্তি বা এ গৌরববোধ দ্বারা উদ্দীপ্ত হবার জন্য 'বাস্তবনিষ্ঠ' আধুনিক লেখকদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না, বরং তাঁরা যেন সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন জাতির মানুষকে কত কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা যায় সেই অপসাধনাকে জয়যুক্ত ক'রে তুলতে। দেশের ভিতর খারাপ মানুষ যেমন আছে তেমনই ভালো মানুষের সংখ্যাও অগুনতি। বস্তুত, ভালয় মন্দে গড়া মনুষ্যস্বভাবের ভিতর খতিয়ে দেখতে গেলে ভালত্বের উপাদানই বেশি। মানুষ সহজাতভাবে ভাল; অবস্থাবৈগুণ্যই যা তাকে মন্দ ক'রে তোলে। এই যদি মনুষ্যস্বভাব সম্পর্কে সর্বস্বীকৃত মত হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে বাস্তববাদের নামে তাকে অযথা কালিমালিপ্ত করবার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না। যে বাস্তববাদ একচক্ষু হরিণের মত ভালত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে মন্দত্বের উপর জোর দেয়, আশাবাদের ঊর্ধ্বে নৈরাশ্যকে স্থাপন করে, মানবপ্রীতির

বদলে মানববিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে, সে বাস্তববাদ এবং তৎলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যকে বিনা পরীক্ষায় গ্রহণ করা চলে না।

মানবপ্রীতি বনাম মানববিদ্বেষের কথায় মনে পড়ল, বাংলার একজন আধুনিক খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত হবার পর থেকে গল্প-উপন্যাসের মারফতে শ্রেণীবিদ্বেষ প্রচারের কাজে উঠে-প'ড়ে লেগেছেন। গত ছয়-সাত বছরে তাঁর যত লেখা পড়েছি, প্রায় তার সব কটিরই মূল সুর এক—মানুষকে বিশ্বাস করতে নেই, ভালবাসতে নেই, মানুষের কাছ থেকে কিছু পাবার আশা করতে নেই। রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে শ্রেণী-সংগ্রামের যৌক্তিকতা-অযৌক্তিকতার প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করতে চাই না, রাজনীতির ছাত্ররা তা নিয়ে অন্তহীন বিতর্ক করুন; কিন্তু কথা হচ্ছে সাহিত্য রাজনীতি নয়। বাস্তবপন্থী সাহিত্যই হোক আর সমাজসচেতন সাহিত্যই হোক, সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় হ'ল আনন্দ। শ্রেণীসংগ্রামের আদর্শ প্রচারের নামে শ্রেণীবিদ্বেষের তিক্ততা দ্বারা এই আনন্দের মাধুর্য যদি কেবলই পীড়িত হতে থাকে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। অতি-প্রাচীন কাল থেকে শুরু ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যমাত্রেই আনন্দ ও সৌন্দর্যের জয়জয়কার। আনন্দের ভূরিভোজনে পাঠককে পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতার তারতম্যের দ্বারাই এ যাবৎ সাহিত্যের আপেক্ষিক উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ণীত হয়ে এসেছে। সর্বাবস্থায় এই আনন্দ সৌন্দর্য তথা মাধুর্যের আদর্শকে জিইয়ে রাখার মধ্যেই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা। তা যদি হয়, তবে অকারণ তিক্ততা ও আক্রোশ প্রকাশ ক'রে সাহিত্যের আবহাওয়াকে ঘুলিয়ে তোলবার কি অর্থ? আমাদের সাম্প্রতিক বাঙালী-জীবন সহস্রবিধ অসৌন্দর্য ও কুশ্রীতার আকর হতে পারে, অন্যায় অবিচার অত্যাচারের গ্লানিভারে সমাজদেহ যৎপরোনাস্তি জর্জরিত হতে পারে, তা ব'লে এই ইদানীন্তন বিসদৃশ অবস্থাটাই আমাদের জীবনের শেষ কথা নয়। সভ্যতার পুরাতন দেহে সকল দেশেই সম্প্রতি যে ঘোরতর জীর্ণতার অবক্ষয় দেখা দিয়েছে, যে প্রচণ্ড ওলট-পালটের মধ্য দিয়ে মানুষকে শিথিল হাতে মাটি আঁকড়ে দোদুল্যমান চিত্তে সম্মুখপথে এগিয়ে চলতে হচ্ছে, সেই অবক্ষয় এবং বিভ্রান্তিকর অনৈশ্চিত্য কখনই মানব-সম্প্রদায়ের চিরন্তন বিধিলিপি হতে পারে না। বাঙালী-জীবনের সাম্প্রতিক

ক্ষয়িষ্ণুতা ও সঙ্কটকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য কৃষ্ণ অধ্যায় মনে করলে তবেই বুঝি তার যথার্থ পরিমাপ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিত ভুলে গিয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যদি ক্ষাণকের উপর চিরন্তনের মর্যাদা আরোপ করেন, অতিক্রান্তব্য সাময়িক বিরূপ অবস্থাকে অপরিবর্তনীয়তার লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত করবার চেষ্টা করেন, তা হ'লে তাঁদের মস্তিষ্কের উপর বিচার-বুদ্ধির ভ্রংশতা-দোষ চাপানো ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমাদের সাম্প্রতিক সমাজজীবন নানাবিধ কলঙ্কে কলঙ্কিত তাতে সন্দেহ কি, কিন্তু সেইটেই তার একমাত্র সত্য দিক নয়। কলঙ্কের পাশে পাশে অকলঙ্কের দৃষ্টান্তও বহু আছে, শুধু তাকে দেখবার চোখ থাকা চাই। কিন্তু সাহিত্যে যিনি মুখ্যত গান্ধীজী-কথিত ড্রেন-ইন্‌স্পেক্টরের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁর দুই চক্ষুর মধ্যে যেটি স্বভাবত প্রসন্ন নির্মল চোখ সেটি অবারিত হওয়ার আশা কম। তিনি বামপন্থাভিমুখী, তাই তাঁর বাম চক্ষু সর্বদা বাম হয়েই আছে। দক্ষিণ চক্ষুর দাক্ষিণ্যের দ্বারা সাহিত্যকে অভিষিক্ত করতে তাঁর আগ্রহও নেই, সামর্থ্যও নেই। তা যদি থাকত, তা হ'লে তাঁর ছোট বকুলপুরের যাত্রী পথ চলতে গিয়ে পথের মধ্যে কেবল পিচ্ছিল কর্দম আর খানাখন্দই দেখত না, পথিপার্শ্বস্থিত দু-একটি ফুলও তার চোখে পড়ত। আজ কাল পরশুর গল্পে যিনি অদ্য কল্য পরশ্বের নিতান্ত সাময়িক বিরূপ অবস্থার চিত্রণ ছাড়া আর কোন বিষয়কে চিত্রিতব্য বিষয় ব'লে মনে করেন নি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে কোন ক্রমেই প্রশস্ত জ্ঞান করা চলে না। বাংলা-সাহিত্যে এ জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার কঠোরহস্তে রোধ করার সময় এসেছে। বাস্তবনিষ্ঠার নামে ক্লেদরতি ঢের হয়েছে, চাই আশা-আনন্দ-সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দ্বারা সাহিত্যের আবহের সুস্পষ্ট পরিশোধন। হাঁ, একে আমরা ক্লেদরতিই বলব। নিজের মনের ক্লেদকে সাহিত্যের পাতায় প্রক্ষেপ করবার এ এক ধরনের বিকৃত মানসিক বিলাস। রিয়ালিজ্‌মের অজুহাতে এ বিলাসকে প্রশ্রয় দিলে অপবুদ্ধিরই পরিচয় দেওয়া হয় মাত্র।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা। পরাজিতের মনোভাব বা defeatism কখনও সৎসাহিত্যের লক্ষণ হতে পারে না। সর্বপ্রকার বিরূপ অবস্থার মধ্যে মানুষের ব্যক্তিসত্তার গহন গুহায় নিহিত আত্মা বা চৈতন্যকে অপরাজেয় রাখবার বাণীই হ'ল শাশ্বত সাহিত্যের বাণী। এ কথা কি এ-দেশীয় সাহিত্য কি পাশ্চাত্য

সাহিত্য—সকল সাহিত্যের প্রতিই সমান প্রযোজ্য। শুধু সাহিত্যের পুরাতন ধারা নয়, আধুনিক ধারারও এই কথা। আমাদের একালের পাশ্চাত্য-দৃষ্টিভঙ্গী-ঘেঁষা লেখকগণ কথায় কথায় ইউরোপীয় সাহিত্যের নজির টানেন—প্রকৃত প্রস্তাবে, ইউরোপীয় শিল্পীগুরু সাহিত্যাচার্যদের নামোচ্চারণ ছাড়া তাঁরা বাংলা-সাহিত্যের সংস্পৃষ্ট এক গণ্ডুষ জল পান করতেও রাজী নন—কিন্তু তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করি, এমন কটি শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় উপন্যাস তাঁরা দেখাতে পারবেন মানবমহিমায় বিশ্বাস তথা আশাবাদ যার কেন্দ্রমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নয়? সমাজ-জীবনের পুঞ্জীভূত ক্লেদ ঘেঁটে কে কবে ইউরোপীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছেন? জানি, এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদীরা স্তেধাঁল, ফ্লবেয়ার, জোলা, প্রুস্ত, কুপরিন এবং অতি সাম্প্রতিক কালের সার্তর, কেমু প্রমুখ অতিরিক্ত বাস্তববাদী লেখকদের নাম করবেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য আপাতবিচারে যতই চোখ-ধাঁধানো আর জৌলুসময় হোক, থ্যাকারে, ডিকেন্স, হার্ডি, ভস্টয়েভস্কি, টলস্টয়, ভিক্টর হুগো, রোমাঁ রোলাঁ, আনাতোল ফ্রান্স প্রভৃতির সঙ্গে তুলনায় কোথায় তাঁদের স্থান? ছোটগল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী মোপাসাঁকে বাস্তববাদের একজন প্রধান পুরোহিত মনে করা হয়ে থাকে, কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, মোপাসাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব বাস্তববাদে নয়, পরন্তু বাস্তবের নির্যাস দ্বারা তৎসৃষ্ট সাহিত্যকে শিল্পরসান্বিত করার দুর্লভ ক্ষমতায়। সুগূঢ় মানবপ্রীতি তাঁর সাহিত্যের পরতে পরতে অন্তর্লীন হয়ে আছে। মোপাসাঁর ভাবশিষ্য এ-যুগের সমারসেট মমও তাঁর গুরুর মত একজন প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী লেখক, আঙ্গিকনৈপুণ্যে তাঁর তুল্য কুশলী লেখক সহসা খুঁজে পাওয়া ভার, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ইউরোপীয় রসিক-মহলে প্রথম শ্রেণীর লেখকরূপে গণ্য নন। তার কারণ, যে উদার মানবপ্রীতি ও জীবনবিশ্বাস থাকলে সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্য হয়, মমের মানসিক গঠনের ভিতর তার কিঞ্চিৎ অভাব পরিদৃষ্ট হয়। বিদ্রূপে তিনি ক্ষুরধার, দৃষ্টিভঙ্গীর তির্যক চাতুর্যে এবং ভঙ্গীপ্রধান রচনারীতির প্রখরতায় পাঠককে চমৎকৃত করবার অদ্ভুত যাদু তিনি জানেন, কিন্তু আসলেই ফাঁকি। চরিত্রের সহজাত নৈরাশ্যবাদকে ছাড়িয়ে তিনি কখনও মানবপ্রেমের উন্মুক্ত বিশাল প্রাঙ্গণে উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। ছোট ছোট কারুকর্মে তিনি নিখুঁত ওস্তাদ শিল্পী, কিন্তু

ভস্টয়েভস্কি কিংবা টলস্টয়ের মত কল্পনার উদার ঐশ্বর্য তাঁর নেই। সীনিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে সহজাত অপূর্ণতা আছে সেই অপূর্ণতার কারণে মম-সাহিত্য ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও আংশিক খণ্ডিত হয়ে রইল। আর কেউ এ কথা স্বীকার করুন না করুন, মম স্বমুখে স্বকীয় সাহিত্যের এই মজ্জাগত ত্রুটি স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র পশ্চাদ্‌পদ হন নি। তাঁর আত্মকথনমূলক গ্রন্থ *The Summing Up* এই অকপট স্বীকৃতির ঔদার্যে উজ্জ্বল।

দৃষ্টান্ত ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায়। তার প্রয়োজন দেখি না। শুধু আমাদের আধুনিক সাহিত্য থেকে দুটি নাম এখানে উল্লেখ করব।—বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর-সৃষ্ট সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লক্ষণ এক কথায় যদি চিহ্নিত করতে বলা হয়, তা হ'লে মুহূর্তেকের দ্বিধা না ক'রে আমরা বলব, সে লক্ষণ হ'ল মানবপ্রেম তথা ভাবের নিষ্কলুষতা। মানুষের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস, জীবনের সার্থকতায় আস্থাশীলতা, চিরাভ্যস্ত মহৎ মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি নিগূঢ় সম্ভ্রমবোধ এ দুয়ের [illegible]ত সাহিত্যকে অবধারিতভাবে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বিভূতিভূষণ কিংবা তারাশঙ্কর এ দুয়ের কেউ ভঙ্গীপ্রধান রচনারীতিকে প্রশ্রয় দেন নি, একালীন উপন্যাসসুলভ মনস্তত্ত্বের জটিলতার চিত্রণ এঁরা দুজনেই সযত্নে এড়িয়ে চলেছেন, তেরছা চোখে না দেখে জীবনকে তাঁরা দেখেছেন সহজ সরল দৃষ্টিতে এবং বিদ্রূপের পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের সাহিত্যের কেন্দ্রমধ্যে স্থাপিত করেছেন মানবপ্রীতিকে। আধুনিক রুচির মানদণ্ডে রচনারীতি কথঞ্চিৎ অমার্জিত আর অচেতন হ'লেও এখানেই এঁদের সাহিত্যের অসংশয় সাফল্যের অভ্রান্ত সঙ্কেত নিহিত আছে ব'লে মনে করি। নয়তো এতদুভয়ের সমসাময়িক কত কত চতুর বিজ্ঞ ইউরোপীয়-সাহিত্য-মন্থন-করা লেখক ভাষার চাতুর্যে, আঙ্গিকের পারিপাট্যে আর মননশীলতার দ্যুতিতে আধুনিক সাহিত্য-পাঠকের চোখ ধাঁধিয়ে দিলেন, কই, তাঁরা তো বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের মত জনমনে প্রবেশের দ্বিধাহীন ছাড়পত্র পেলেন না! এ আপাত-রহস্যের একমাত্র মানেই হয়, সে মানে হ'ল মানববিদ্বেষী নৈরাশ্যবাদ তথা জীবনবিমুখতার আদর্শ যত সুনিপুণভাবেই সাহিত্যে পরিবেশিত হোক না কেন, তদ্দ্বারা জনমনের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না।

উচ্চ স্তরের শিল্পসৃষ্টির স্তরে এসে সকল প্রকার ভাবদৈন্যগোপনপ্রয়াসী চাতুর্য আর ভঙ্গী আর বুদ্ধির অসাধুতা আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে যায়। উদার গম্ভীর সৎ অনুভূতি যে সাহিত্যের প্রধান উপকরণ নয়, সে সাহিত্য স্বতই শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যলোকে প্রবেশের অনধিকারী; নিম্নস্তরের সাহিত্যপিপাসার পরিতৃপ্তি-সাধনে এ-সাহিত্যের আবেদন বিনিঃশেষে ক্ষয়িত, সুতরাং তা অশ্রদ্ধেয়।

আধুনিক বাংলা-কথাসাহিত্যের আর একটি অভিশাপ হ'ল অতিরিক্ত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ-প্রবণতা। এ প্রবণতা আমরা ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসের সংস্কার থেকে লাভ করেছি। বিষয়টির আভাস পূর্বে সামান্য দেওয়া হয়েছে, এক্ষণে তাকে বিস্তারিত করব। উপন্যাস শিল্পে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রীতি হিসাবে অগ্রাহ্য তা বলি না; বরং রচনার ভিতর এর কিঞ্চিৎ সদ্ভাব থাকলে রচনা অধিকতর সুপাঠ্যই হয়। কিন্তু উৎকট অন্তর্নিবেশের আগ্রহের তাড়নায় প্রক্রিয়াটিকে যদি অসম্ভবের সীমায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হ'লে সমস্ত ব্যাপারটিই নিতান্ত হাস্যকর হয়ে পড়ে। পূর্বে মানুষের মন এত জটিল ছিল না, মনের জটিলতা সম্পূর্ণত ইউরোপীয় নগরকেন্দ্রিক শি সভ্যতার দান। পশ্চিম-ইউরোপের শিল্পবিপ্লব মনের জগতে এ অভাবনীয় সংঘটনের মূল কারক। তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যাশ্রিত ভাবাদর্শের খাত বেয়ে এ ঢেউ আমাদের দেশের মানুষের মনের তীরে এসে ঘা দেয়। সেই থেকে নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে আমাদের মনও ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে। বিশেষ, নগরেই যাদের অধিষ্ঠান ও কর্মস্থল বরাবরের জন্য নির্দিষ্ট, তাদের মনে নানাবিধ ঘোরপ্যাঁচ দেখা দেয়। তার পর এক সময় সাহিত্য এই সূত্রটিকে তুলে ধরে। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের রেওয়াজ ধীরে ধীরে উপন্যাসশিল্পে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বর্তমানের বৈচিত্র্যহীন জীবনে ঘটনার প্রাধান্য ক'মে যাওয়ায় এবং তদনুপাতে মনোজীবিতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অভ্যাসটি আরও জোরদার হয়। মধ্যযুগীয় বা সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশের বর্ণনামূলক উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না; তার কারণ তদানীন্তন মানুষের মন দিবালোকের মতই ছিল স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। এখন মনের অনেক গলিঘুঁজি, অনেক তার অন্ধকার কোণ। এই অজ্ঞাত মনের উপর আলোকসম্পাতের জন্য আধুনিক উপন্যাসকারেরা কোমর বেঁধে লেগেছেন।

প্রথম-যুদ্ধোত্তর বিশ বছরের ইউরোপীয় উপন্যাসের দৃষ্টান্ত আমাদের সাম্প্রতিক লেখকদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের আগ্রহকে আরও দুর্নিবার ক'রে তুলেছে। মনকে চিরে-ফেঁড়ে কেটে দেখাবার অসুস্থ উত্তেজনায় এক ধরনের বিকারময় অনুসন্ধিৎসা কথা-সাহিত্যিকদের লেখনীমূলে প্রশ্রয় পেয়ে চলেছে। কৌতূহল জিনিসটা জ্ঞানবুদ্ধির সহায়ক হ'লেও সব কৌতূহলই সমান সুস্থ নয়। এমন কোন কোন কৌতূহল আছে, যা পরিতৃপ্ত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হ'লেই সমধিক মঙ্গল। অতিরিক্ত মনোবিশ্লেষণের আগ্রহ এ জাতীয় এক কৌতূহল। কৌতূহলটির চরিতার্থতায় কারও কোন লাভ হয় ব'লে মনে হয় না। মনের গলিঘুঁজির নিরালায় কি কামনাবাসনা সক্রিয় বা পাত্র-পাত্রীদের কোন্ আচরণের কি সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা তা জেনে আমাদের কী লাভ, যদি-না সেই বিশ্লেষণের দ্বারা রচনাকে শিল্পরসোত্তীর্ণ করার সহায়তা হয়? অথচ আমরা জানি, প্রায় ক্ষেত্রেই এ-জাতীয় প্রক্রিয়ায় উপন্যাসের আকর্ষণযোগ্যতা বুদ্ধির কোন সহায়তা হয় না, উল্টো উপন্যাসকে অনাবশ্যক বাক্যভারে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা হয় মাত্র। প্রক্রিয়াটি শুধু যে নিরর্থক তা-ই নয়, তা শিল্পসৌন্দর্যের হানিকরও বটে।

এইখানেই আপত্তির শেষ নয়; আমাদের আপত্তির মূল আরও গভীরে নিহিত। শুধু যে বন্ধ্যা মনোবিশ্লেষণের অভ্যাসেরই আমরা বিরোধী তা-ই নয়, আধুনিক মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে জটিল মননের সংস্কারটির উচ্ছেদেরও আমরা পক্ষপাতী। মানুষ সহজ হোক, সরল হোক, ঘোরপ্যাঁচ-বর্জিত হোক—এই আমরা চাই। সততা মানুষের শ্রেষ্ঠ ভূষণ হোক। অর্থাৎ সমস্যাটি আর সাহিত্যের এলাকায় সীমাবদ্ধ রইল না, এর ভিতর সমাজতত্ত্ব এসে পড়ল। বিধিবৈগুণ্যে মানুষের মন জটিল হয়েছে ব'লেই না সে জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনের জন্য আজকের দিনের সাহিত্যে কত না মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি-প্রকরণের উদ্ভব হয়েছে। মনোবিশ্লেষণরূপ দুরারোগ্য ব্যাধির সুতোয় ক্রমাগত ঢিল দেওয়ায় সে সুতো এক্ষণে গুটিয়ে আনা নিতান্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। মনোনিবদ্ধতার মূল্যে একঘেয়েমিপনা ক্রয় ক'রে আমরা উপন্যাসশিল্পে ঘটনার স্বাদ ভুলতে বসেছি। মানুষের মন জটিলতামুক্ত হয়ে আরও বেশি বহির্মুখী হ'লে এ অশুভ সম্ভাবনা বহুলাংশে তিরোহিত হতে পারত।

নারায়ণ চৌধুরী

# গ্রন্থ-পরিচয়

গত বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত সদ্য-প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটা স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পর আরও দুইখানি গ্রন্থ পাইয়াছি—অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ' ও জয়দেব রায়ের 'রবীন্দ্র-গীতি'। বিশ্বভারতী হইতে ৩৩ ও ৩৪ নং "স্বরবিতান" 'কাব্যগীতি' ও 'গীতিবীথিকা' বাহির হইয়াছে। এই দুইটিতে কয়েকটি অতিপরিচিত গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে; সব কয়টি স্বরলিপিই দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত।

অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'ঋষি রবীন্দ্রনাথ'কে (জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড) কোন্ পর্যায়ে ফেলিব বুঝিতে পারিতেছি না। ইহা জীবনী নয়, সাহিত্য নয়। তত্ত্বান্বেষী শ্রদ্ধাবান সাধকের গভীর চিন্তাপ্রসূত এই গ্রন্থ দর্শনের পর্যায়ে স্থান পাইবে হয়তো। অতি সাধারণ অসাবধানী মানুষও গ্রন্থখানি পড়িলে অভিভূত হইয়া ভাবিবেন, তাই তো! বইখানি যে পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বদর্শনের ফল তাহা বিতর্কমূলক শুষ্ক কচকচি হইতে ইহাকে রক্ষা করিয়াছে। লেখকের গভীর অনুভূতি ও জিজ্ঞাসা পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হইবে এবং তাঁহারা ফাঁকা "ঋষি" বিশেষণে নয়—সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে স্বীকার করিবেন, "রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ।"

জয়দেব রায়ের 'রবীন্দ্র-গীতি' (বুক হাউস) রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় আড়াই শো পাতার একখানি বই। বাংলা গানের ইতিহাস ও বাংলার গীতিচর্চাকে ভিত্তি করিয়া কুড়িটি অধ্যায়ে কুড়িটি বিভিন্ন দিক দিয়া লেখক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনা করিয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এবং অন্যান্য বহু গুণী ব্যক্তির মতামতও লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। গানগুলির শ্রেণীবিভাগে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। বইখানি অনেক সাধনা ও গবেষণার ফল।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস,' 'বঙ্গের মহিলা কবি' ও 'শিশুভারতী' শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে খ্যাতিমান ও আবালবৃদ্ধবনিতার আত্মীয় করিয়াছে। তাঁহার সম্প্রতি-প্রকাশিত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' (ভট্টাচার্য সন্স লিমিটেড) তাঁহাকে চিন্তাশীল ভাবুক ও রসিক সমাজে প্রতিষ্ঠাদান করিবে। রামপ্রসাদের রচনাবলী আমরা অনেক আকারে পাইয়াছি। তাঁহার জীবনী ও সঙ্গীত-আলোচনা ঈশ্বর গুপ্ত হইতে অমিয়লাল মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকের কৃপায় অল্প-বিস্তর জানিয়াছি। তন্মধ্যে কৈলাসচন্দ্র সিংহ, দয়ালচন্দ্র ঘোষ, অতুলচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় ও দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতুলচন্দ্র বিপুল উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। যোগেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে যাবতীয় উপকরণসম্ভার জুড়িয়া দিয়া সকলের মহা উপকার সাধন করিলেন।

ভারতী লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত যোগেশচন্দ্র বাগলের *Peasant Revolution in Bengal* ('বাংলা দেশে চাষী বিদ্রোহ') আকারে ক্ষুদ্র হইলেও বিষয়বস্তুতে গুরু। আচার্য যদুনাথের ভূমিকা ইহার গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। এই ব্যাপারে তখন-অখ্যাতনামা দরিদ্র সামান্য একজন পল্লীবাসী শিশিরকুমার ঘোষের কৃতিত্ব এই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' বেনামে ও অনামে প্রকাশিত তাঁহার ১২খানি অতি মূল্যবান পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলি "সর্বপ্রথম এখানেই প্রকাশিত হইল" যোগেশচন্দ্রের এই উক্তি ঠিক নহে। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্গত ব্রজেন্দ্রনাথের 'শিশিরকুমার ঘোষ' গ্রন্থে পত্রগুলির উল্লেখ আছে এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পত্রখানি ( Letter ix ) সম্পূর্ণ উদ্ধৃতও হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ৭৩ সংখ্যক ও ১০৪ সংখ্যক গ্রন্থ যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন-বঙ্গ-সাহিত্যে হিন্দুমুসলমান' ও যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার উচ্চশিক্ষা'। চৌধুরী মহাশয়ের আলোচনা exhaustive নয়, কিন্তু interesting। যোগেশ-বাবু বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাস গোড়া হইতে সংক্ষেপ পরিসরে অতি সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রামাণিক বই।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ছাড়া ইদানীং কয়েকটি পুস্তক-প্রকাশক প্রতিষ্ঠান পুরাতন ও হালি নূতনের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। যে সব বই এই শতাব্দীতেই বাহির হইয়াছে অথচ অধুনা দুষ্প্রাপ্য, সিগনেট ও ওরিয়েণ্ট তাহার কয়েকটি প্রকাশ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং বিপিনবিহারী গুপ্তের 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' দুই খণ্ড এখনও পুনঃপ্রকাশিত হইবার অপেক্ষায় আছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ( পুরাতন ) ও বিশ্বভারতী প্রমথ চৌধুরীর ( নূতন ) বইগুলির পুনঃপ্রকাশে ব্রতী হইয়া বাংলা দেশ ও সাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিতেছেন। মহর্ষির 'ব্রাহ্মধর্ম', 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান' ও

'আত্মজীবনী' পূর্বেই পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' বাহির হইল।

বিশ্বভারতী হইতে পূর্বে প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' ১ম খণ্ড যখন বাহির হয়, তখন হইতে আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ডে ভারতবর্ষ, সমাজ ও নানা বিচিত্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একত্র সংগ্রহ পাইয়া পুলকিত হইলাম। বাংলা গদ্য-রচনায় একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির প্রবর্তক হিসাবে প্রমথ চৌধুরী চিরস্মরণীয় থাকিবেন—যদি তাঁহার প্রবন্ধগুলির প্রচার থাকে। বিশ্বভারতী এই প্রচারের কাজ নিষ্ঠার সহিত করিতেছেন। তাঁহারা এই সঙ্গে 'বীরবলের হালখাতা' ও 'চার-ইয়ারি কথা'রও পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন—অতি সুরুচিসঙ্গত মুদ্রণ। বাংলা-সাহিত্যে 'সবুজ পত্র'-যুগের ইতিহাস এই বইগুলিতে খানিকটা বিধৃত রহিল।

মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজী বাংলা পুস্তক ও ছড়ানো রচনাগুলির পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড। তাঁহাদের প্রশংসা একমুখে করিতে পারি না। মাত্র এক টাকা দক্ষিণায় খণ্ডে খণ্ডে বিপিনচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের এই সাধুসঙ্কল্প সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইলে এক দিকে যেমন বাংলা-সাহিত্যের কল্যাণ হইবে, অন্য দিকে তেমনি বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসও পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। বিপিনচন্দ্র শুধু রাজনীতি করেন নাই, তাঁহার রাজনীতিও সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে—এইটিই তাঁহার বিশেষত্ব। বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনায়ও তাঁহার দান কম নয়। এই সকলই শুধু রক্ষিত নয়, নিত্য অধীত হইবার বিষয়। যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেড সম্প্রতি ইংরেজীতে এক খণ্ড 'Writings and Speeches of Bipin Chandra Pal, vol. I, part I. এবং বাংলায় তিন খণ্ড 'নবযুগের বাংলা' প্রথম অংশ, 'নবযুগের বাংলা' দ্বিতীয় অংশ ও 'মার্কিনে চারিমাস ও বিলাতের কথা' প্রথম অংশ বাহির করিয়াছেন। পরে পরে অন্যান্য খণ্ডও বাহির হইবে। কিন্তু প্রকাশিত খণ্ডগুলির যথোচিত সমাদর যদি বাঙালী জাতি না দেখায় তাহা হইলে এই চমৎকার প্রচেষ্টা মধ্যপথে খণ্ডিত হইবার আশঙ্কা আছে। সেই বিপর্যয় যাহাতে না ঘটে, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর সে বিষয়ে চেষ্টিত হওয়া উচিত। এইসঙ্গে যুগযাত্রী প্রকাশক লিমিটেডের বিপিনচন্দ্রের

'Swadeshi Swaraj' পুস্তকখানির প্রকাশও উল্লেখযোগ্য। প্রায় তিন শত পাতার এই পুস্তকখানি ১৯০২ হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ আমাদের জাতীয় জীবনের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণকালে লিখিত প্রবন্ধ অথবা ওই কালে প্রদত্ত বক্তৃতার সঙ্কলন। ১৯০৭ সনে মাদ্রাজে প্রদত্ত তাঁহার সুবিখ্যাত স্বদেশী বক্তৃতাগুলিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপিনচন্দ্রের পরিচয় এই পুস্তকে বিধৃত হইয়াছে।

ভারত সরকার আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলনে মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি ভারতে বিপ্লববাদ সম্পর্কিত দুইখানি বিখ্যাত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে এই ইতিহাস-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছে। একখানি ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' (নবভারত পাবলিশার্স) ও দ্বিতীয়খানি শ্রীনলিনীকিশোর গুহের 'বাংলায় বিপ্লববাদ' (এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং লিঃ)। ভারতের বিপ্লব-আন্দোলন স্বদেশে এবং বিদেশে কি ভাবে দানা বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ডক্টর দত্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সেই ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এমন অনেক গুহ্য ও রোমাঞ্চকর খবর তিনি দিয়াছেন যাহা অন্যের জানা ছিল না। এই ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের পর্যায়ে স্থান পাইবে।

'বাংলায় বিপ্লববাদে' বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের মর্মকথা উদ্ঘাটিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ঘটনার দ্বারা বাঙালী উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সাহিত্যের কোন্ কোন্ রচনা তাহার সঙ্কল্পে শক্তিদান করিয়াছে, বাংলায় ও বাংলার বাহিরে বাঙালীর বিপ্লব-আন্দোলনের স্বরূপ কি—এই সকল কথা আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে হেমচন্দ্র কানুনগো-লিখিত 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'র বিবিধ উক্তির সত্যাসত্য নির্ণয়ে গ্রন্থকার বিশদভাবে চেষ্টা করিয়া ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। "ঘটনাবলীর দিনপঞ্জী" অধ্যায়গুলি সকলের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে।

'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব লিখিত (কত-কথা) পূর্ববঙ্গের লোকগীতির ইতিহাস। গ্রন্থকার প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ব্যক্তিগত চেষ্টায় বিভিন্ন জেলা হইতে পল্লীগীতিগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, এগুলির ইতিহাস ও মর্মকথাও ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতগুলি লোকগীতি ইতিপূর্বে আর

একত্র প্রকাশিত হয় নাই। লেখক যাত্রা পালাগান প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। পরবর্তী সংস্করণে বইখানি নির্ঘণ্টাদি সহ আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে ছাত্র ও গবেষকদের উপকার হইবে।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়-সম্পাদিত বাংলা বার্ষিকী 'নববর্ষ' ১৩৬১ রূপে যেরূপ মনোহর, গুণেও সেইরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে; সম্পাদকের সাহিত্য ও শিল্প-রুচি প্রশংসনীয়। পত্রসাহিত্য-অংশে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-কেদারনাথ-প্রমথ চৌধুরী-গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-রমেশচন্দ্র দত্তের চিঠিগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রবন্ধ গল্প কবিতাও সুনির্বাচিত, ফোটো-চিত্রগুলিও চমৎকার।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর 'বিংশোত্তরী সূক্ষ্ম ও প্রাণদশা' (৮৬।১।১-এ বেলতলা রোড) জ্যোতিষ-গণনা বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিবে। এ বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ; শুধু এইটুকু বলিতে পারি, সমস্ত গ্রহের প্রত্যন্তর্দশার সূক্ষ্ম-ভুক্তি নিরূপণ করিয়া শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী যে টেবিল প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার সম্ভাবনা সুদূরপ্রসারী।

নববিধান-পাবলিকেশন-কমিটি ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর 'ব্রাহ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ' পুনর্মুদ্রিত করিয়া সমাজের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। এই উপদেশগুলির প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই।

ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের কয়েকটি পুরাতন পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি—১। প্রবেশিকা স্বাস্থ্যবিধি, ২। প্রবেশিকা গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিধি, ৩। বাংলার প্রাথমিক কৃষিপাঠ, ৪। স্বাস্থ্যবিধি প্রথম ভাগ। পুস্তকগুলি বিদ্যালয়পাঠ্যরূপে লিখিত হইলেও সর্বসাধারণের উপকারে আসিবে। প্রকাশক বি. বাগচী এণ্ড সন্স।

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা রচিত ও তাঁহাদের দর্শন সম্পর্কিত যে সকল ইংরেজী-বাংলা পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলির আলোচনা পরে করিব।

বাংলা-কথাসাহিত্যে হালি-পুরাতনের পুনরুজ্জীবনে নূতনের প্রচারে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটড পাবলিশিং কোং লিঃর প্রশংসনীয় চেষ্টা পরে আলোচিত হইবে।

# হ্যামলেট, ডেনমার্কের কুমার

২য় দৃশ্য। দুর্গপ্রাসাদের একটি কক্ষ

হ্যামলেট ও নটগণের প্রবেশ

হ্যাম্। এই অংশ বলবার সময় আমি যেমন আলতো জিভে কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে গেলাম, সেই ভাবে উচ্চারণ করতে হবে। তা না ক'রে যদি গালভরা বক্তৃতা আরম্ভ কর, যেমন অনেক অভিনেতা ক'রে থাকে, তবে আমার রচনাটি ফেরিওয়ালাদের মুখে শুনলেই ভাল হয়। আর অভিনয়ের সময় করাত-চালানো ভঙ্গিতে এই রকম হাত নেড়ো না, সবই বেশ সংযতভাবে করতে হবে। ভাবাবেগের প্রকাশে কখনো বন্যা ছুটবে, কখনো ঝড় উঠবে, কখনও বা ঘূর্ণাবর্ত ঘুরবে, সে তো হবেই; কিন্তু সব সময় এমন একটি সুষ্ঠু সংযম অভ্যাস করতে হবে, যাতে মনে হয় সবই যেন বিনা আয়াসে এসে পড়ছে। পরচুলো প'রে, গালপাট্টা এঁটে ভীমকায় অভিনেতা যখন বক্তৃতার চোটে আসল ভাবটিকেই টুকরো টুকরো ক'রে ফেলে আর চিৎকারে মেঠো শ্রোতাদের কর্ণকুহর বিদীর্ণ ক'রে দেয়, তখন আমার হাড় জ্ব'লে যায়। ওই সব শ্রোতারা হাত-পা নাড়া আর চিৎকার ছাড়া কি বোঝে? অমন ষণ্ডামার্ক অভিনেতাকে চাবুক লাগানো দরকার। দোহাই তোমাদের, সে রকম অভিনয় যেন ক'রো না।

১ম অভি। তা করব না, আপনাকে কথা দিচ্ছি।

হ্যাম। তা ব'লে একেবারে মিইয়ে যাবে না, নিজের বিচারবুদ্ধির অনুসরণ করবে। বাচনের অনুযায়ী অঙ্গভঙ্গী হবে, আবার অঙ্গভঙ্গীর অনুযায়ী হবে বাচনভঙ্গী; কেবল খেয়াল রাখবে কোনখানে যেন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। বাড়াবাড়ি করলে অভিনয়ের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ। কি অতীতকালে, কি বর্তমানে, অভিনয় ব্যাপারটাই হচ্ছে যেন প্রকৃতির সামনে দর্পণ তুলে ধরা; পুণ্য দেখতে পাবে স্বীয় প্রতিকৃতি, পাপ দেখবে নিজের প্রতিচ্ছায়া, আর যুগ দেখতে পাবে স্বকীয় বয়স, রূপ, গঠন ও ছাপ। সুতরাং বাড়াবাড়ি করলে বা তার উল্টো পথে চললে অরসিকে খুশি হতে পারে, কিন্তু যাঁরা গুণী ও বিচক্ষণ তাঁরা ব্যথিত হবেন; এমন একজনের ব্যথার মূল্য নাট্যশালা-ভর্তি

খুশির চেয়ে অনেক বেশি'। নট আমি অনেক দেখলাম, তাদের প্রশংসাও যথেষ্ট শুনলাম, তাদের কদর্য উচ্চারণ, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী দেখে মনে হয় নটরাজের কারখানার কাঁচা শিক্ষার্থীরা তাদের গড়েছে, মানবতার বিকৃত অনুকরণ ছাড়া তারা কিছুই জানে না।

১ম অভি। আশা করি আমরা এ বিষয়ে অনেকটা উন্নতি লাভ করেছি।

হ্যাম। অনেকটা নয়, পুরোপুরি হওয়া চাই। আর তোমার বিদূষককে ব'লে দেবে, নাট্যকার যা লিখেছেন তা ছাড়া কিছুই যেন বানিয়ে না বলে, নিজের কথায় নিজে হেসে বেরসিক শ্রোতাদের হাসাতে না যায়। ওদিকে হয়তো তখন নাটকের আসল ভাবটিকে রূপায়িত করবার সময় ব'য়ে যাচ্ছে। এটা ওদের অমার্জনীয় অপরাধ, বিদূষক-শ্রেণীর আত্মম্ভরিতার চরম নিদর্শন। বেশ, যাও, প্রস্তুত হয়ে নাও গে।

[ নটদের প্রস্থান ]

[ পলোনিয়স, রোজেনক্রানজ ও গিলডেনস্টার্নের প্রবেশ।

কি সংবাদ প্রভু!
রাজা দেখিবেন এই নাট্য-অভিনয়?

পলো। রাণীও আসিতেছেন, দেরি নাই আর।

হ্যাম। যারা অভিনেতা, তাদের তাগাদা দিন।

[ পলোনিয়সের প্রস্থান ]

তোমরাও দুইজনে দেখ না ওদের,
বিলম্ব না করে যেন আর।

রোজেন ও গিলডেন } চলিনু কুমার। [ উভয়ের প্রস্থান ]

হ্যাম। আরে, হোরেসিয়ো!

হোরে। [ প্রবেশ করিয়া ] এসেছি কুমার, আপনার চির অনুগত।

হ্যাম। হোরেসিয়ো, এ জীবনে দেখিলাম অনেক মানুষ
তোমা সম ন্যায়নিষ্ঠ দেখি নি কারেও।

হোরে। এ আবার কি কথা কুমার?

হ্যাম। ভেবো না এ তোষামোদ ;
প্রাণের মহত্ত্ব ছাড়া
অন্য কি সম্পত্তি আছে তব ?
দরিদ্রে কে তোষামোদ করে ?
মধুমাখা চাটুবাণী হোক উচ্চারিত
মদমত্ত ধনীর শ্রবণে,
বার বার নত হোক নমনীয় জানু
যেখানে জঘন্য চাটু পায়ে পুরস্কার।
শোন হোরেসিয়ো,
যেদিন স্বাধীন ভাবে এ মোর হৃদয়
মানুষকে চিনিতে শিখিল,
সে দিন সে বেছে নিল তোমারেই তার
একান্ত আপন বলি'। তুমি সেই লোক,
সব দুঃখ সহিয়াও দুঃখ নাহি পায়,
সমভাবে সানন্দে যে করেছে গ্রহণ
ভাগ্যের নিগ্রহ পুরস্কার।
ধন্য তারা, চিত্তে যাহাদের
আবেগের সাথে সাথে হিতাহিতবোধ
সমভাবে হ'ল সমন্বিত,
তারা নহে নিয়তির হাতের বাঁশরী,
যে সুরে বাজাতে চাহে বাজিবে সে সুরে।
যে নহে রিপুর দাস সে মানুষ পেলে
রাখি তারে হৃদি মাঝে মনের মানসে,
যেমন রেখেছি তোমা।—
বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কিছু।—শোন তবে,
আজ রাত্রে রাজসন্নিধানে
আছে নাট্য-অভিনয় ;
পূর্বেই বলেছি তোমা, হেন দৃশ্য আছে তাহে

যার সাথে
সাদৃশ্য রয়েছে মোর পিতার মৃত্যুর।
সেই দৃশ্য যখন হইবে অভিনীত,
মন বুদ্ধি একাগ্র করিয়া
লক্ষ্য ক'রে যেয়ো ভাই পিতৃব্যে আমার।
সে দৃশ্যের অভিনয় দেখিবার কালে
যদি তাঁর মনের গোপন অপরাধ
আপনারে না করে প্রকাশ,
তবে জেনো—যে আত্মার পেয়েছি সাক্ষাৎ
নিশ্চয় সে দুরাত্মা পিশাচ,
জঘন্য নরককুণ্ড আমারও অন্তর।
ভাল ক'রে লক্ষ্য রেখো;
আমিও আমার চক্ষু অনিমেষ করি
নিবদ্ধ রাখিব তাঁর মুখের উপর;
শেষে মোরা দুইজন দেখিব মিলায়ে
মুখভাবে কি ধারণা হ'ল আমাদের।

হোরে। কুমার নিশ্চিন্ত হোন;
অভিনয়-কালে তাঁর মুখভাব যদি
তিলমাত্র ফাঁকি দেয় আমার আঁখিরে
সে ফাঁকির বাটা দিব আমি।

হ্যাম। তাঁহারা আসেন ওই;
উদাসীন হতে হবে মোরে;
তোমার নিজের স্থান তুমি বেছে নাও।

[ তূর্যধ্বনি; রাজা, রাণী, পলোনিয়স, ওফেলিয়া, রোজেনক্রান্জ, গিল্ডেনস্টার্ন ও অপর সকলের প্রবেশ ]

রাজা। বৎস হ্যামলেট, কেমন আছ?

হ্যাম। চমৎকার আছি। বায়ুভুক বহুরূপীর মত প্রচুর আশ্বাস পান করছি। এ খোরাকে মুর্গি বাঁচানো যেত না।

রাজা। আমি তো তা বলি নি হ্যামলেট। ও কথাগুলি তো আমার কথা নয়।

হ্যাম। আমার কথাও নয়। (পলোনিয়সের প্রতি) মান্যবর, আপনি বলেছিলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে একবার অভিনয় করেছিলেন?

পলো। তা করেছিলাম কুমার। ভাল অভিনেতা ব'লে কিছু খ্যাতিও হয়েছিল।

হ্যাম। কোন্ ভূমিকায় নেমেছিলেন?

পলো। জুলিয়স্ সিজারের ভূমিকায়। রোমের মন্দিরে আমায় হত্যা করা হ'ল; ব্রুটাস হত্যা করলে।

হ্যাম। মন্দিরে অমন গোবৎস হত্যা! অতি নিষ্ঠুরের কার্য। নটেরা সব প্রস্তুত হয়েছে?

রোজেন। হয়েছে কুমার। আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছে।

রাণী। বৎস হ্যামলেট, এদিকে এস, আমার পাশে ব'স।

হ্যাম। না মা, তার চেয়ে আকর্ষণের বস্তু এখানে রয়েছে।

পলো। (রাজাকে) দেখলেন? লক্ষ্য করলেন?

হ্যাম। দেবি, তোমার কোলে শুতে পারি কি?

(ওফেলিয়ার পদতলে বসিলেন)

ওফে। না কুমার।

হ্যাম। মানে, কোলে শুধু মাথাটা রাখব।

ওফে। আজ মনটা বেশ খুশি দেখছি, কুমার।

হ্যাম। কার? আমার?

ওফে। হ্যাঁ কুমার।

হ্যাম। হরি হরি! অধম তো তোমারই পাঁচালী-রচয়িতা। খুশি না হয়ে মানুষের উপায় কি? দেখ না আমার মাতার মুখখানি কেমন খুশিতে ভরা; দু ঘণ্টা হয় নি আমার পিতা মারা গিয়েছেন।

ওফে। না কুমার, দু-দুমাস হয়ে গেল।

হ্যাম। তাই নাকি? তা হ'লে কালো পোশাকটা শয়তানকে দিয়ে

আমি একটা আলপাকার পোশাক গায়ে চড়াই। জয় ভগবান! দু মাস হ'ল মৃত্যু হয়েছে, এখনও মনে রয়েছে! তা হ'লে আশা করা যেতে পারে, কোন প্রকৃত বড়লোক মারা যাওয়ার পর তাঁকে ছ মাস লোকে মনে রাখবে! অবশ্য তাঁকে নিজের স্মৃতিমন্দির তৈরি ক'রে যেতে হবে। নইলে কোথায় যাবেন তিনি তলিয়ে, রূপকথার সেই কাঠের ঘোড়ার মত; কাঠের ঘোড়া, কাঠের ঘোড়া, জল পি পি পি!

( বাদ্যধ্বনি। মূক অভিনেতাদের প্রবেশ )

[ এক রাজা ও এক রাণী পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া প্রেমপূর্ণ ভঙ্গীতে প্রবেশ করিলেন। রাণী নতজানু হইয়া রাজাকে প্রেম নিবেদন করিলে রাজা তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিলেন। অবশেষে রাজা পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে রাণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন। এমন সময় অন্য একজন আসিয়া রাজার মুকুট খুলিয়া তাহা চুম্বন করিল ও রাজার কর্ণবিবরে বিষ ঢালিয়া প্রস্থান করিল। রাণী ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, রাজা মৃত। তখন তিনি গভীর শোক প্রকাশ করিলেন। বিষপ্রয়োগকারী অপর দু-তিনজন মূকের সহিত পুনরায় প্রবেশ করিয়া শোকপ্রকাশে যোগ দিল। রাজার শবদেহ স্থানান্তরিত করাইয়া বিষপ্রয়োগকারী নানা উপঢৌকন সহ রাণীকে প্রেম নিবেদন করিল। রাণী প্রথমে স্বীয় অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া ক্রমে তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ]

ওফে। কুমার, এ সবের অর্থ কি?

হ্যাম। ভিতর থেকে একটা গোপন অনিষ্টের আশঙ্কা উঁকি মারছে।

ওফে। হয়তো এইটেই সমস্ত নাটকের গল্পাভাস।

[ সূত্রধারের প্রবেশ ]

হ্যাম। এর মুখেই সব জানা যাবে! নটেরা কিছুই গোপন রাখতে পারে না, সবই প্রকাশ ক'রে বলবে।

ওফে। মূকচিত্রে যা দেখানো হ'ল তাও বলবে?

হ্যাম। নিশ্চয়; এমন কি যা তুমি দেখাবে, তাই ও দেখাবে; তুমি যদি দেখাতে লজ্জা না পাও, ও সব খুলে বলতে লজ্জিত হবে না।

ওফে। কী যে বলছেন ঠিক পাই নে। অভিনয়টা দেখি।

সূত্র। নাট্য এবং তাঁর প্রযোক্তা নটগণ
সবার হইয়া করি সবিনয় নিবেদন,
ধৈর্য ধরিয়া সবে করিবেন দরশন।

হ্যাম। এ আবার কি হ'ল? নাটকের নান্দী, না, উদ্ভট শ্লোক?

ওফে। অতিশয় সংক্ষিপ্ত।

হ্যাম। যা বলেছ, যেন রমণীর প্রেম।

[ রাজা ও রাণীরূপে দুইজন নটের প্রবেশ ]

রাজা ( নট )। ত্রিংশবার ঘুরে গেল অরুণের জ্যোতির্ময় রথ,
বরুণের লবণ-ভবন আর দিক্‌চক্রপথ,
দ্বাদশগুণিত ত্রিংশ চন্দ্রমার ঋণোজ্জ্বল ভাতি
উজলিল ধরিত্রীর দ্বাদশগুণিত ত্রিংশ রাতি,
প্রেম আসি বাঁধি দিল এ দুটি হৃদয় পরস্পর
প্রজাপতি বাঁধিলেন তব করে আমার এ কর।

রাণী ( নট )। চন্দ্র সূর্য নিজ কক্ষে ঘুরে যাক আরও তত বার
অক্ষুণ্ণ রহুক তবু এই প্রেম তোমার আমার।
কিন্তু প্রিয়, দেহ তব প্রায়ই সুস্থ থাকে না এখন,
পূর্বের সে স্ফূর্তি নাই, তাই আমি দুশ্চিন্তামগন।
তা ব'লে সেবার ত্রুটি ঘটিবে না জানিও নিশ্চয়,
রমণীর প্রকৃতি যে, যত প্রেম তত তার ভয়।
প্রেম যেথা বলবান তুচ্ছ ভয়ও হয় যে বৃহৎ,
ভয় যেথা যত বেশি প্রেমও সেথা তত বলবৎ।

রাজা ( নট )। প্রিয়তমে, ছেড়ে যেতে হবে তোমা হয়তো সত্বর,
ক্ষীয়মান দেহযন্ত্র পূর্ববৎ নহে তো তৎপর।
তখনো থাকিবে তুমি সুন্দর এ ধরণী মাঝারে,
হয়তো সজ্জন কেহ প্রিয়া বলি—

রাণী ( নট )। ও-কথা আমারে
ব'লো না ব'লো না প্রিয়, পত্যন্তর নারীর মরণ,
প্রথমে যে হত্যা করে সেই করে দ্বিতীয়ে বরণ।

হ্যাম। ( স্বগত ) মর্মান্তিক !

রাণী ( নট )। যে নারী বিধবা হয়ে বিবাহ করয়ে পুনর্বার,
সে শুধু লাভের লোভে, প্রেম কভু নহে হেতু তার।
যখনই চুম্বিবে মোরে শয্যা 'পরে সে নূতন স্বামী,
তখনই দ্বিতীয় বার স্বামী হত্যা করিলাম আমি।

রাজা ( নট )। এখন যা বলিতেছ তাই তব মনোভাব মানি,
কিন্তু যাহা বলি আজ, কাল তাহা প্রায়ই মোরা ভাঙি।
সংকল্প স্মৃতির দাস, তারই সাথে ক্ষয় পেয়ে যায়,
জন্মকালে দৃঢ়কায়, কিন্তু অল্প পরমায়ু হায়।
কাঁচা ফল অনায়াসে দুলে থাকে জন্মবৃন্ত 'পরে,
পাকিলে আপনা হ'তে ভূমিতলে খসিয়া সে পড়ে।
প্রথম হৃদয়াবেগে যে কাজ করিব মনে করি
আবেগ কাটিয়া গেলে অনায়াসে সে কথা পাশরি।
অতি দুঃখ অতি সুখ এ জগতে আত্মঘাতী তারা,
যেখানে অধিক হাসি সেখানে অধিক অশ্রুধারা।
অনিত্য জগৎ নিজে, প্রেমও তাই নিত্য বস্তু নয়;
ভাগ্যের সহিত তারও ঘ'টে থাকে বৃদ্ধি আর ক্ষয়।
আজিও এ সমস্যার মিলে নাই চূড়ান্ত প্রমাণ,
ভাগ্য আর প্রেম দুয়ে কে কম কে বেশি বলবান।
আসিলে দুঃখের দিন মহতেরও বন্ধুরা পলায়,
নীচ যদি উচ্চ হয় শত্রুরাও বন্ধু ব'নে যায়।
যে কথা বলিতেছিনু,—ভাল ক'রে ভেবে দেখি যদি
দেখিব, যা ইচ্ছা করি ভাগ্য তার একান্ত বিরোধী।
ভাবিতেছ আর কারে করিবে না পতিত্বে বরণ।
সে কথা থাকিবে কোথা হবে যবে আমার মরণ ?

রাণী ( নট )। আমার ক্ষুধার খাদ্য বসুন্ধরা যেন না যোগায়,
আকাশের আলো যেন না ফুটে এ আঁখি-তারকায়,
আমি যেন চিরতরে দিবসের আনন্দ হারাই,

আমি যেন একদিনও রজনীর শান্তি নাহি পাই,
ব্যর্থ যেন হয় মোর সর্ব আশা সকল আশ্বাস,
উদাসীর নিরানন্দে যেন মোর কাটে বারো মাস,
ইহকাল পরকাল আমার সকলি যেন যায়
বিধবা হইয়া যদি পরিণীতা হই পুনরায়।

হ্যাম। এমন শপথও ভাঙবে নাকি ?

রাজা ( নট )। করেছ অনেক দিব্য। প্রিয়তমে, বড় ক্লান্ত তাই
ভাবিতেছি দীর্ঘবেলা কিছুক্ষণ ঘুমায়ে কাটাই।

রাণী ( নট )। বেশ কথা প্রাণনাথ, নিদ্রা যাও নিশ্চিন্ত আরামে,
তোমার আমার মাঝে কালো মেঘ যেন নাহি নামে।

[ প্রস্থান ]

( ক্রমশ )

অনুবাদ—শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

# এপিঠ-ওপিঠ

সেদিন কি বার ঠিক মনে নেই। হাতে বিশেষ কাজ ছিল না, ভাবলাম, এই বেলা একটু বেগার খেটে আসি। অর্থাৎ আমার এক দূর-সম্পর্কের ভাই মাল সরবরাহের ব্যবসা করে—ক'দিন থেকে ধরেছে, এক বিলাতী জুট মিলে কন্‌ট্রাক্ট পাওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করতে। বলা বাহুল্য, ওই আপিসে আমার বাল্যবন্ধু বিজয় কাজ করে, তারই কাছ থেকে খবরাখবর সংগ্রহ ক'রে আনতে হবে।

অনেক দিন বাদে আমাকে দেখে বিজয় খুশি হ'ল।

ব্যাপার কি, গরিবের আপিসে ?

হেসে বললাম, কেন আসতে নেই বুঝি ?

নিশ্চয় কোন দরকারে ?

একথা সেকথার পর আসল কথা পাড়লাম। বিজয় হেসে বললে, তোকে দেখেই বুঝেছি কোন মতলব আছে। তবে ঠিক সময়ে এসেছিস, নতুন কন্‌ট্রাক্ট পরের মাসেই বেরুবে।

কাকে ধরতে হবে, বল্ তো ?

মিত্তির সাহেবকে, ওঁর হাতেই সব।

কোন্ মিত্তির ?

বাণ্টি মিত্তির, বড় অফিসার, ও যা বলবে তাই হবে।

বাণ্টি মিত্তির নামটা শোনা-শোনা মনে হ'ল। জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম দেখতে বল্ তো ?

কেন, চিনিস নাকি ?

ঠিক বুঝতে পারছি না। বেঁটে, ফরসা, টাক মাথা, গোঁফ আছে ? কালো ফ্রেমের পুরু চশমা ?

ঠিক ঠিক, চিনিস দেখছি। কোথায় আলাপ হ'ল ?

একটা পার্টিতে।

তবে আর কি, দোতলায় ওঁর ঘরে চ'লে যা।

ভাবলাম, কথাটা মন্দ নয়। মিত্তিরের সঙ্গে কথা ব'লে যাওয়াই ভাল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছি, বিজয় জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ রে, ওঁর বউয়ের সঙ্গে আলাপ হয় নি ? মাথা নাড়লাম, না।

হবে।—বিজয় অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

বাণ্টি মিত্তিরের সঙ্গে একটা ককটেল পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। বাণ্টি সেই ধরনের মানুষ, যারা পার্টিতে গিয়ে অপরিচিতের সঙ্গে সহজে আলাপ জমিয়ে ফেলতে পারে। সেদিন পার্টিতে আমি একজনের অতিথি-হিসেবে গিয়েছিলাম। চেনা মুখ বেশি ছিল না। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছি, বাণ্টি এসে ইংরিজীতে কথা শুরু করলে, আজ কি বিশ্রী গরম !

বললাম, হ্যাঁ, সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি।

ঘরের মধ্যে না হয়ে পার্টিটা বাইরের মাঠে হ'লে ভাল হ'ত।

বৃষ্টির ভয় আছে তো।

তা সত্যি।

কথা চলল অনেক রকম। দেখলাম, বেশির ভাগ লোকই বাণ্টির পরিচিত। কয়েকজনের সঙ্গে আমার আলাপও করিয়ে দিলে। দু-তিন

ঘণ্টার মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য জানতাম, এ ধরনের পার্টির পর কারুর কথাই মনে থাকে না। তবু ভাবলাম, দেখি না বাল্টি মিত্তির চিনতে পারে কি না!

আশ্চর্য, বাল্টির ঘরে ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা করলে।

আরে, কি ব্যাপার, আসুন, মিঃ—

পাদপূরণ ক'রে দিলাম, রায়।

হাঃ, হাঃ, রায় রায়, কি করতে পারি বলুন?

এতখানি আন্তরিক ব্যবহারে অভিভূত হয়ে পড়লাম। অনেক চেষ্টা ক'রে সব কিছু গুছিয়ে বললাম, ভাইয়ের তাগিদে ওঁকে বিরক্ত করতে এসেছি। উনি সে কথায় কান না দিয়ে কয়েকটা দরকারী কথা জিজ্ঞেস করলেন, যার উত্তর কিছুই ঠিকমত দিতে পারলাম না। বাল্টি মিত্তির হেসে বললেন, এ সব ব্যাপার আপনার না বোঝাই স্বাভাবিক, বরং কাল একবার ভাইকে পাঠিয়ে দিন, ওর সঙ্গেই কথা বলব।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। খুব ভাল কথা, কোন্ সময় আসতে বলব?

দুপুরবেলা—আড়াইটে থেকে তিনটের মধ্যে।

আর আপনার সময় নষ্ট করব না, চলি।

তাও কি হয়? চা খেয়ে যান।—বাল্টি কিছুতেই ছাড়ল না, চা খাওয়াল। নোট-বইতে আমার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর লিখে নিলে। বললে, বলা যায় না মিঃ রায়, হঠাৎ যদি দরকার পড়ে।

বাল্টির ব্যবহারে সত্যিই খুশি না হয়ে পারি নি। কত অল্প সময়ের মধ্যে আপন ক'রে নেয়। নীচে নেমে এসে বিজয়ের সঙ্গে আর দেখা হ'ল না—আপিসের কাজে বেরিয়ে গেছে।

সেই দিনই ভাইকে খবর দিতে গেলাম এযাদির বাপের বাড়ি। বিকেল থেকেই ওরা এখানে জমা হয়, বিশেষ ক'রে এখন চ্যারিটি শো-র তোড়জোড় চলছে ব'লে। আমি বড় একটা যাই না। ভাবলাম, মন্দ নয়, এই সূত্রে সকলের সঙ্গে দেখাও হয়ে যাবে।

অমল সব শুনে খুশি হয়ে বললে, সেই জন্যেই তো তোমায় পাঠালাম, জানি, চেনা লোক বেরিয়ে যাবে।

যাই হোক, ঠিক সময়ে যেও।

সে আর বলতে হবে না, সময়ের আগেই হাজিরা দেব।

এষাদি উঠে এসে জিজ্ঞেস করলেন, পথ ভুলে এলেন না কি?

হাসলাম। বললাম,না, অমলকে একটা খবর দেবার ছিল।

তাই বলুন, নইলে হঠাৎ—

আপনি মিথ্যে ভাবছেন।

মোটেই না, একটা কাজও আমাদের হয়ে করেছেন?

কি করব বলুন?

কিছু টিকিট বিক্রি ক'রে দিন।

সম্মতি জানালাম, দেব।

ক টাকার?

এক শো।

এষাদি আর দ্বিরুক্তি করলেন না। ব্যাগ থেকে টিকিট বার ক'রে হাতে ধরিয়ে দিলেন, দেখবেন, শো-র দিন বলবেন না যেন—টিকিট বিক্রি হয় নি, সব ফেরত দিয়ে গেলাম।

হেসে বললাম, সে ভয় নেই, বিক্রি হোক না হোক টাকা আপনি ঠিক পাবেন।

সেখান থেকে বেরিয়ে অমলকে বললাম, খবর দিতে এসে কি বিপদে পড়লাম দেখলে, এক শো টাকা গেল।

অমল কিন্তু মোটেই আমার কথায় সায় দিলে না। বললে, উনি একলা আর কত করবেন! আমরা তো জানি, সকাল থেকে রাত্তির পর্যন্ত খাটছেন। তুমি যদি পার আরও কিছু টিকিট বিক্রি ক'রে দিও।

এষাদির কথা অমলদের মুখে সব সময় শুনি, ভদ্রমহিলা খুব খাটতে পারেন। অত্যন্ত সাধারণ বেশভূষা, চালচলন। চ্যারিটি আর রিলিফের কাজে ব্যস্ত থাকেন। ওঁর বয়স কেউ ঠিকমত বলতে পারে না, তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁকে সকলের দিদির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমিও এষাদি ব'লেই ডাকি। এঁর সঙ্গে কাজ ক'রে দেখেছি, কি নিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের সেবা করেন! বিশেষ ক'রে পরিচয় হয়েছিল উদ্বাস্তুরা যখন

পিলপিল ক'রে কলকাতায় আসছিল, সেই সময়। যে ক্যাম্প ওঁর অধীনে ছিল, কি সুশৃঙ্খলায় কাজ হয়েছে। আমি কত দিন বলেছি, আপনি আমার ধারণা বদলে দিয়েছেন এষাদি।

কি রকম?

আমি ভাবতাম, আমাদের দেশের মেয়েরা লোক-দেখানো দেশের কাজ করে—খবরের কাগজে ছবি ছাপাবার কিংবা সরকারী দপ্তরে পোশাকী চাকরি পাবার লোভে। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে, সুভদ্রা এ দেশে জন্মাতেও পারেন।

এষাদি হেসে বলতেন: এত বড় কথা বললেন, দেখুন তার মর্যাদা রাখতে পারি কি না!

নিশ্চয় পারবেন। কাজ আপনি ভালবাসেন, এমন লোক কজন পাওয়া যায়?

এষাদিকে তখন থেকেই আমার বেশ ভাল লাগত। অমলরা তাঁর ভক্ত ছিল বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। কতদিন তাকে বলতে শুনেছি, এষাদি যে কি ধরনের মেয়ে, তা ভাবতেও পারবে না। কি নিঃস্বার্থ কাজ, সকলের সঙ্গে মেশবার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! অথচ কত বড়লোকের বউ।

ওঁর স্বামী কি করেন?

খুব বড়লোক। এষাদি বলেন, ওর কাজে কখনও বাধা দেন না। নিজে যে খুব বেশি সাহায্য করেন, তাও নয়।

এষাদিরা যে পয়সাওয়ালা লোক, তা কোনদিন মনে হয় নি। বিশেষ ক'রে তাঁর চালচলনে এতটুকু উগ্রতা নেই। সহজ সাবলীল।

বললাম, তা সত্যি, চালিয়াতি মোটেই নেই।

অথচ লীলাদের দেখ, কি মীরাদের—উঃ, অসম্ভব। যেমনি মেয়েরা তেমনি মায়েরা—কে কত বিশ্রী সাজতে পারে তার পাল্লা দিচ্ছে।

ফোড়ন কাটলাম, পয়সা থাকলে খরচ করতে হবে তো।

তাই তো বলছি, এষাদিরাও বড়লোক, কিন্তু পয়সা কি ভাবে খরচা করতে হয় তা জানে। লোকের কাছে ভিক্ষে চেয়েও—

আপন মনেই বললাম, সবাই ওই ধরনের হ'লে আর এষাদির বিশেষত্ব কি থাকত ?

দিন কয়েক বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে বাণ্টি মিত্তিরের টেলিফোন পেলাম—হ্যালো, মিঃ রায়, আমি মিত্তির কথা বলছি।

সুপ্রভাত, বলুন।

আজ একবার আপিসে আসুন না।

কি হ'ল ?

টেলিফোনে সব কথা বলা উচিত নয়।

আড়াইটে তিনটের সময় যাব।

আপিসে গিয়ে দেখা করতেই বাণ্টি বুঝিয়ে দিলে, কত কষ্ট ক'রে অমলের জন্যে কনট্রাক্ট সে যোগাড় ক'রে দিচ্ছে। সাহেবদের একজন পেয়ারের লোক আছে, সেও ওই কাজটা পাবার চেষ্টা করছে। তবে বাণ্টির বিশ্বাস, তাকে কাটিয়ে অমলকে যোগাড় ক'রে দিতে পারবে।

অভিভূত হয়ে বললাম, এ আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।

না না, ওসব ব'লে লজ্জা দেবেন না।

সত্যি বলছি, আজকালকার দিনে কে কার জন্যে ক'রে বলুন তো ?

তা বললে চলে ! বাঙালী হয়ে বাঙালীর জন্যে করব না !

বাণ্টি সত্যি গ'ল্পে লোক, কয়েক মিনিটের মধ্যে জমিয়ে তুলতে পারে। কথায় কথায় পেটের ভেতর থেকে খবর বার ক'রে আনে।

বিয়ে করেছেন ?

কৌতুক বোধ করলাম, কেন বলুন তো ?

খবরদার, খরচে-বউ বিয়ে করবেন না, ফতুর হয়ে যাবেন।

আপনি ঠাট্টা করছেন।

মোটেই না, খাঁটি সত্যি কথা বলছি। যদি কাউকে পাগল করতে চান একটি খরচে-মেয়ে যোগাড় ক'রে বিয়ে দিয়ে দিন, বাস্।

উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলাম।

আপনি হাসছেন, কিন্তু আমি মরছি।

চোখ তুলে তাকালাম।

বাণ্টি সিগারেট ধরিয়ে বললে, প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করেছিলাম। আমার স্ত্রী সুন্দরী, শিক্ষিতা, কিন্তু আশ্চর্য রকম খরচ করে।

কিসে?

জিনিস কিনে। শাড়ি, গয়না, মার্কেটে কত রকম ফ্যান্সি জিনিস আছে—আর মশাই, পেরে উঠছি না।

উনি জানেন, আপনি এসব পছন্দ করেন না?

ভাল ক'রেই।

তবে?

তবে কি!—বাণ্টি মিত্তির হো-হো ক'রে হাসে: মেয়েদের আপনি চেনেন না, একবার যাদের খরচ করার হাত হয় কিছুতেই সামলাতে পারে না। এদের নামে ডাকে বিল ছাড়া আর কিছু আসে না।

কি মনে হ'ল, বললাম, আপনি জোর করলেই—

বাণ্টি ম্লান হেসে বললে, তা হয় না, আজকের স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্বামীর জোর চলে না। একটু থেমে ধরা-গলায় বলে, বিপদ কি জানেন মিঃ রায়, আমার স্ত্রীকে আমি সত্যিই ভালবাসি।

বাণ্টি মিত্তিরের কথায় উত্তরোত্তর আশ্চর্য হচ্ছিলাম। এত অল্প আলাপে কেউ যে স্ত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারে তা জানা ছিল না। সময় বুঝে উঠে পড়লাম, বললাম, পরে আর একদিন আসব এখন।

যখন খুশি আসবেন।—চেয়ার থেকে উঠে নিজেই দোরগোড়া পর্যন্ত এগিয়ে দিলে, আস্তে আস্তে বললে, অনেকগুলো বাজে কথা ব'লে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।

না, না। সে কি কথা!

নীচে নামতেই বিজয়ের সঙ্গে দেখা। নীচু গলায় জিজ্ঞেস করলাম, বাণ্টি মিত্তির লোকটা পাগল নয় তো?

কেন?

কি সব বলছিল।

বিজয় হেসে বললে, বউয়ের কথা?

হ্যাঁ।

নেশার ঝোঁকে, না, এমনি ?

তার মানে ?

সব সময় টানছে, আপিসেও বোতল নিয়ে আসে।

বলিস কি !

সত্যি ট্র্যাজিক, ভদ্রলোকের জীবনে এতটুকু শান্তি নেই। টাকা টাকা ক'রে পাগল।

কি খেয়াল হ'ল, বললাম, চল্ না, বাইরে কোথাও চা খেয়ে আসি। সেই সঙ্গে বাণ্টির বউয়ের গল্পও শোনা যাবে।

বিজয়কে নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকলাম। খাওয়ার চেয়ে গল্প শোনার দিকে মন বেশি ছিল। বিজয় যা বললে তা গুছিয়ে নিলে সহজ ভাষায় এই দাঁড়ায়—বাণ্টি মিত্তির বড়লোকের একমাত্র ছেলে, প্রেমে প'ড়ে বিয়ে করে, বউ সুন্দরী এবং অত্যন্ত বেশি মাত্রায় আধুনিক। প্রত্যেক রাত্রে তার পার্টি লেগে আছে। অমুক ক্লাব, অমুকের বাড়ি—পার্টির আর শেষ নেই। বিরক্ত হ'লেও বাণ্টিকে তার স্ত্রীর পেছু পেছু যেতে হয়। তার একমাত্র কাজ স্ত্রী দোকান থেকে জিনিস কিনে আনলে বিল মেটানো, আর কোন পার্টিতে গায়ের চাদর ফেলে এলে কুড়িয়ে আনা।

সব শুনে বললাম, আশ্চর্য, আজকের দিনে এ রকম স্বামী পাওয়া যায় জানতাম না।

বউটিকে একবার দেখবার ইচ্ছে আছে, একটা ফোটো তুলে রাখতাম।

আমি হ'লে ও রকম স্ত্রী ত্যাগ করতাম।

আমরা হ'লেও তাই, কিন্তু বাণ্টি তার বউকে ভালবাসে।

এ ভালবাসার দাম কি ?

তা জানি না, কিন্তু বউয়ের জন্যে ও পাগল। গাড়ি নিয়ে পেছু পেছু ছুটে বেড়ায়। কতদিন দেখেছি, বউয়ের কাছে গাড়ি চ'লে গেছে, ও আপিসে একলা ব'সে থেকে থেকে ট্যাক্সি নিয়ে চ'লে গেল।

একটু থেমে বললাম, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

বাণ্টির অবস্থা শুনলে আরও খারাপ লাগে, টাকায় কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

সে কি ?

হ্যাঁ, অত বড় একটা অফিসার, আমাদের মত লোকের কাছ থেকেও টাকা ধার নিয়েছেন, সকাল-বিকেল পাওনাদার বাড়িতে আসছে।

এত কথা জানলি কি ক'রে ?

ওঁর কাছেই শুনেছি, পয়লা বোশেখে আমার বাড়ি এসেছিলেন কুড়িটা টাকা চাইতে—হাতে দশ টাকা ছিল তাই দিলাম। এখন শুনছি অফিসের সকলের কাছেই উনি টাকা ধার করেছেন, কোথাও দশ, কোথাও পনের—কাউকে শোধ করেছেন, কাউকে করেন নি। বুঝতে পারি উনি কুলিয়ে উঠতে পারছেন না। কি অশান্তি বল্ তো! বিজয় গম্ভীর মুখে বলে, কিন্তু লোকটা খারাপ নয়, ব্যবহার খুব ভাল। হাতে পয়সা থাকলে একে ওকে দেয়ও শুনেছি।

বিজয়ের তাড়া ছিল। অফিসে ফিরে গেল।

ক'দিন পরের কথা। এষাদি খবর পাঠিয়েছেন যদি এক শো টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকে, আরও কিছু ক'রে দিলে ভাল হয়। এক মাড়োয়াড়ীর কাছে দশ টাকার দশখানা টিকিট বিক্রি করেছিলাম। ভাবলাম টি. বি. হাসপাতালের জন্যেই যখন, আরও কিছু ক'রে দিলে হয়।

সন্ধ্যের দিকে এষাদির কাছে গেলাম। উনি বললেন, আপনাকে বেশি কষ্ট দেব না, একটি মাত্র অনুরোধ আছে। গোটা পঞ্চাশ টাকার টিকিট আরও বিক্রি ক'রে দিতে হবে, 'না' বলতে পারবেন না কিন্তু। হেসে বললাম, নাই যখন বলতে দেবেন না, তখন আর অনুরোধ বলছেন কেন ? বলুন না হুকুম।

এষাদি হাসলেন, সে যাই বলুন, আপনারা পাঁচজন সাহায্য করেন ব'লেই যা হোক একরকম কাজ চলছে।

পাঁচজনের জন্যে চলছে না, চলছে আপনি আছেন ব'লে।

এখানে অমলের সঙ্গে দেখা হবে জানতাম। আজ অবশ্য অন্যদিনের চেয়ে দেরিতে সে এল, বললে, তোমার কাছেই যাব ঠিক করেছিলাম।

কি হ'ল ?

ওদিকের ব্যাপার অনেকদূর এগিয়েছে, তবে কিছু খাওয়াতে হবে।

কাকে ?

অমল আমাকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গিয়ে বললে, বাণ্টি মিত্তির কিংবা ওর ওপরের সাহেবকে।

কে বললে?

কে আর বলবে, কিছু না খরচ করলে কি আর কনট্রাক্ট পাওয়া যায়?

মনে মনে প্রমাদ গনলাম, বাণ্টি মিত্তিরকে ঘুষ নেবার কথা কি ক'রে বলব! বললাম, আচ্ছা, আমি ভেবে-চিন্তে বুদ্ধি বার করছি।

এর দিন তিনেক বাদে হগ মার্কেটে গিয়েছিলাম ফল কিনতে। আমাদের পাড়ায় ভাল ফল মোটেই পাওয়া যায় না, তাই ফল কিনতে এখানে আসতে হয়। কুলির মাথায় ফল চাপিয়ে বেরিয়ে আসছি, বাণ্টি মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। আমি প্রথমে লক্ষ্য করি নি, সে ডাকলে, পৃথিবীটা ছোট্ট দেখছি, দেখা না হয়ে উপায় নেই। হাসলাম, তা বইকি, এসেছিলাম ফল কিনতে।

বাণ্টি হাসে, শুনেছি এখানে ফল ভাল পাওয়া যায়, কেনা হয় নি কখনও।

কেন?

আমার স্ত্রীর দয়ায় এখানকার দামী দামী জিনিসের দোকানগুলো সব চিনি, শাড়ি কাপড় যা চান। তবে ফলমূলের দোকানের ওপর ওর নজর পড়ে নি। ব'লেই বাণ্টি হো-হো ক'রে হাসে, বলে, চলুন, একটা ঠাণ্ডা-ঘরে ঢুকে আইসক্রীম খাওয়া যাক।

খাবার খুব ইচ্ছে ছিল না, অমলের কথা মনে প'ড়ে যেতে ভাবলাম, দেখা যাক, কি করা যায়! বললাম, চলুন।

কুলির মাথার জিনিসগুলো ড্রাইভারের জিম্মায় দিয়ে বাণ্টি মিত্তিরের সঙ্গে রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলাম। দুটো বড় আইসক্রীম নিয়ে আমরা মুখোমুখি বসেছি। বাণ্টির মুখে ভকভক করছে বীয়ারের গন্ধ। বিজয় ঠিকই বলেছিল, লোকটা সারাক্ষণ পান করে। মনে হ'ল, বাণ্টিকে শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে—

না, এমন আর কি?

শরীর ভাল আছে?

বাণ্টি ম্লান হাসে, এ শরীরে কি আর সহজে কিছু হয়?

বড্ড শুকনো দেখাচ্ছে।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বাণ্টি মিত্তির করুণ চোখে বলে, টাকা—টাকা—আর আমার কোন চিন্তা নেই।

ঠিক এ ধরনের কথা শুনব আশা করি নি। চুপ ক'রে রইলাম।

সত্যি বলছি, মিঃ রায়, মান মর্যাদা—এরা আমায় বাঁচতে দেবে না, সবাই আমায় বিশ্বাস করে, সে বিশ্বাসের দাম আমাকে দিতেই হয়, কোন উপায় নেই।

ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলছেন!

বাণ্টি মিত্তিরের চোখ সজল হয়ে ওঠে, বলে, কেউ বুঝতে পারবে না আমায়, তা আমি জানি। একটু থেমে বলে, আমার স্ত্রীর কথা আপনাকে বলেছিলাম, তিনি যে কোন দোকান থেকে জিনিস নিয়ে আসেন সই ক'রে, তারা আমায় চেনে, জিনিস ছেড়ে দেয়। কিন্তু দাম তো আমায় দিতে হবে, কত আর দেব? এখন আমি নিঃস্ব, যা রোজগার করি তাই ভরসা।

বললাম, এভাবে চলবেন কি ক'রে?

অসহায় ভাবে মিত্তির বললে, আর পারছি না, দম বন্ধ হয়ে আসছে। এক গয়নার দোকানে আজই তিন শো টাকা দিতে হবে, শেষ দিন। দেড় শো টাকা পকেটে আছে, বাকি টাকা কোথায় পাব জানি না। দোকানে গিয়ে ব'লে ক'য়ে সময় চেয়ে নিতে হবে, অথচ তিনি আমায় না জানিয়ে খেয়ালের মাথায় সাজপোশাকের গয়না নিয়ে এসেছেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাণ্টি বলে, আর বেশি দিন নয়, সত্যি বলছি, এমনি চললে আমি পাগল হয়ে যাব।

বাণ্টির স্ত্রীর মত বিবেচনাহীন ভদ্রমহিলার কথা আগে শুনি নি, তবু মিত্তিরের জন্যেও আমার মনে সহানুভূতি জাগে না, এ ধরনের স্ত্রৈণ ভদ্রলোকের কি প্রয়োজন এ জগতে! তবু অমলের কথা মনে পড়ায় ভাবলাম, এ তো মন্দ সুযোগ নয়। প্রকারান্তরে শ দুই টাকা একে দেওয়া হয়ে যাবে। বললাম, এ নিয়ে ভাবছেন কেন, দু শো টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি। বাণ্টি মিত্তির লজ্জায় রঙিন হয়ে বললেন, সে কি, আপনি টাকা দেবেন কেন?

তাতে কি হয়েছে?

না, তা হয় না।

আহা, আপনার দরকার, টাকা ধার দিচ্ছি, পরে শোধ দিয়ে দেবেন।

সামনের মাসের গোড়াতেই আমি দিয়ে দেব।

সঙ্গে টাকা ছিল না, বাল্টি মিত্তিরকে রেস্তরাঁয় বসিয়ে রেখে কাছেই আমার এক আত্মীয়ের দোকান থেকে টাকা এনে দিলাম। নিজে থেকেই সে হ্যাণ্ডনোট কেটে দিল। সেদিকে আমার মোটেই নজর ছিল না, অমল কন্‌ট্রাক্ট পেলেই আমি খুশি, টাকা ফেরত পাবার খুব আগ্রহ ছিল না।

কিন্তু আশ্চর্য, এ ঘটনার ক'দিন পরেই অমল হাঁপাতে হাঁপাতে আমার বাড়ি এসে বললে, হ'ল না, বাল্টি মিত্তির কন্‌ট্রাক্ট অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত হলাম, বলিস কি ?

এক মাড়োয়াড়ী টাকা খাইয়ে বার ক'রে নিয়েছে।

আমিও তো টাকা দিয়েছি।

অমল ম্লান হাসে, সে আরও বেশি দিয়েছে।

কি জানি বাবা, এসব আমার মাথায় ঢোকে না, দু শো টাকা নিলে—

আমিও এদিক সেদিক ক'রে কম খরচ করি নি, বাড়িতে ভেট পাঠিয়েছি, হুইস্কির বোতল, বিয়ার, কত কি—ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল।

মনে মনে বাল্টির উপর না রেগে পারলাম না। এত লম্বা-চওড়া কথা বলবার কি দরকার ছিল! বললাম, দেখা করে একদিন বোঝাপড়া করা যাবে।

দিন কয়েক বাদে চীনে হোটেলে খেতে গেছি—আমি, এষাদি আরও দুজন। শো শেষ হয়ে গেছে, সকলেই নিশ্চিন্ত। আমিই বললাম, চলুন না এষাদি, আজ বাইরে খাওয়া যাক।

কোথায় ?

চীনে হোটেলে।

ছোট্ট কামরার মধ্যে কজনে বসা গেছে। প্রায় মিনিট দশেক কেটে গেল খাবার ফরমাশ করতে, একজনের একটা পছন্দ হয় তো অন্যদের হয় না, সেই নিয়ে হৈ-হৈ, হাসি ঠাট্টা। একজন বললে, দেখো, খাবারের সঙ্গে না আরশোলা দিয়ে দেয়! সাবধান ব্যাঙ, ব্যাঙাচি যা খুশি পেতে পার।

এষাদি হেসে বললেন, এ ভূতগুলোকে নিয়ে কেউ চীনে হোটেলে আসে!

ফরমাশমত খাবার আসতে আরও পনের মিনিট দেরি হ'ল, কিন্তু এসে পড়তেই আর দেখে কে! টানাটানি ক'রে খাওয়া শুরু হ'ল।

সবাই বললে, সত্যি, আজ বেশ মজা করা গেল।

এষাদি বললেন, মিঃ রায়কে ধন্যবাদ দাও, ওঁর জন্যেই এখানে আসা।

কথা শেষ হতে পেল না, পাশের কেবিনে কিসের হৈ-চৈ শুরু হয়ে যায়, মাতাল অবস্থায় কে যেন চেঁচাচ্ছে, অন্যদের গালাগাল, মনে হ'ল এক প্রস্থ কিল-চড়ও যেন কার ওপর পড়ল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ছিলাম, এষাদি বললেন, দেখুন তো কি ব্যাপার! বললাম, কেউ খেয়ে-দেয়ে বোধ হয় টাকা দিতে পারে নি, তাই গোলমাল হচ্ছে।

এ সব জায়গা ভাল নয়, দেখে আসবেন একবার।

বেরিয়ে এসে দেখি, লোকের ভিড় জ'মে গেছে, পাশের কেবিন থেকে এক ভদ্রলোককে টেনে বার করেছে, তিনিও মত্ত অবস্থায় মুখ খারাপ করছেন, ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম, বাণ্টি মিত্তির। আশ্চর্য যে হই নি তা বললে মিথ্যে বলা হবে। কেন জানি না, ওর দুরবস্থা দেখে ভালই লাগল। মনে মনে বললাম, ঠিকই হয়েছে, যেমন শয়তান।

দেখলাম, বাণ্টি মিত্তির কি যেন বলতে চাইছে, কেউ শুনছে না। কাছে এগিয়ে গেলাম, আমাকে দেখে ও যেন বুকে বল পেল, টলতে টলতে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে জড়ানো গলায় বললে, এরা কেউ আমার কথা বিশ্বাস করছে না, পকেট থেকে টাকা তুলে নিয়েছে।

কে?

বাণ্টি কেঁদে ফেলে, জানি না।

চীনে ওয়েটার ভাঙা ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিলে, বাণ্টি মাঝে মাঝে এখানে আসে আর মাতলামি করে, আজ একটু বেশি বাড়াবাড়ি করেছে। ওই কেবিনে বাণ্টির সঙ্গে এক মেমসাহেব ছিল, সে খানিক আগে চ'লে গেছে। বাণ্টি মাতাল অবস্থায় টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। পঁচিশ টাকার বিল্ হয়েছে, একটা পয়সাও ওর কাছে নেই, মিছিমিছি মুখ খারাপ করছে।

বাণ্টি আবার আমায় সালিশী মানে, সত্যি বলছি আমার কাছ পঞ্চাশ টাকা ছিল, দশ টাকার পাঁচখানা নোট। একটু থেমে আঙুল গুনে বললে, না, না, পাঁচ টাকার দশখানা নোট।

বুঝলাম, বাণ্টি একেবারেই প্রকৃতিস্থ নয়, এই বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে

থাকতে ইচ্ছে করল না। ওয়েটারকে বললাম, ওর বিল আমি মিটিয়ে দিচ্ছি, এই নাও পঁচিশ টাকা। একটা ট্যাক্সি ডেকে ওকে উঠিয়ে দাও।

চীনে ম্যানেজার ভদ্রলোক বললে, সে জন্যে ভাববেন না, ট্যাক্সি ডেকে ভাড়া দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি। গোলমাল মিটিয়ে দেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ। বাণ্টি মিত্তির একটা চেয়ারে ব'সে পড়েছিল, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, কি ব'লে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব জানি না, একটা কাগজ দিন, আমি হ্যাণ্ডনোট লিখে দিচ্ছি।

মাতাল অবস্থায় জিদ্ চাপলে আর ছাড়ানো যায় না, অগত্যা রাজী হতে হ'ল। সাদা কাগজে পেনসিল দিয়ে কি হিজিবিজি লিখে চ'লে গেল। হঠাৎ দেখি, এযাদিও কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন, বললেন, ভদ্রলোককে এ অবস্থায় একা ট্যাক্সিতে পাঠানো উচিত হবে না, আমাদের কারুর যাওয়া উচিত।

বললাম, আপনারা কি ক'রে যাবেন, একেবারে মাতাল।

সে আমার অভ্যাস আছে।

ভাবলাম, সে আর আশ্চর্য কি, শোয়্যাল ওয়ার্ক করতে গেলে এ রকম লোকের দেখা পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বললাম, চলুন তা হ'লে, আমিও যাব।

আমি কেবিনে ফিরে, বিল মিটিয়ে সবাইকে চ'লে যেতে বললাম। দোকানের বাইরে এসে দেখি, বাণ্টি একটা চেয়ারে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। তখনও ট্যাক্সি পাওয়া যায় নি। ধরাধরি ক'রে আমার ছোট গাড়ির পিছনের সিটে তাকে তোলা হ'ল। সামনের সিটে আমি আর এযাদি।

চীনে ম্যানেজার আর একবার ধন্যবাদ জানাল। তার কাছেই বাণ্টির বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। গাড়ি চলা শুরু করে। বাণ্টির কোন হুঁশ নেই। সেদিকে তাকিয়ে এযাদি বললেন, এ ধরনের মাতালদের টাকা দিয়ে সাহায্য করা অন্যায়, তাদের অপকার করা হয়।

কি উপায় বলুন? চোখের সামনে একজন অপমানিত হচ্ছে—

হ'লেই বা, তাই তার প্রাপ্য।

মনে মনে হাসলাম, এযাদির আদর্শবাদী মন, কি ক'রে এ ব্যাপারে সায় দেবে! তবু বললাম, ও লোকটা খুব সুখী নয়।

কেন?

শুনেছি ওর স্ত্রী ভীষণ স্বার্থপর, দামী দামী জিনিস কিনে পয়সা নষ্ট করে, স্বামীর দিকে ফিরেও তাকায় না, শুধু ক্লাব আর সোসাইটি—এই তার জীবন।

সে মেয়ের জন্যেও করুণা হওয়া পাপ।

হেসে বললাম, তা আমি বুঝি, কিন্তু বাণ্টি তার স্ত্রীকে ভালবাসে।

এষাদি বিদ্রূপ ক'রে বললেন, আপনি তা বিশ্বাস করেন?

ওর সঙ্গে আলাপ না হ'লে বুঝতে পারবেন না।

একটু পরে এষাদি জিজ্ঞেস করলেন, ও ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার কত দিনের আলাপ?

বেশি দিন নয়, মাস কয়েক।

ওর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

সাক্ষাৎ হয় নি, তবে পরোক্ষ ভাবে কয়েকবার। গয়নার কথা মনে পড়তেই হাসি পেল। বললাম, এমন কি তাঁর গয়না কেনার জন্যে দু শো টাকা দিয়েছি।

এষাদি হেসে বললেন, বলেন কি? না দেখেই তাঁকে গয়না দিয়ে ফেললেন?

বাড়ি পৌঁছতে বেশি দেরি ছিল না, সেদিনকার কথা বললাম।

এষাদি মন্তব্য করলেন, অজ্ঞানের বলি ভগবান এমনি ক'রেই আদায় করেন।

এ কথা কেন বলছেন?

বাণ্টির স্ত্রীকে আমি চিনি। তিনি মোটেই ও-ধরনের মেয়ে নন।

তা হ'লে বাণ্টি যে স্ত্রীর কথা বলে, তিনি কে?

এষাদি ম্লান হাসলেন, বললেন, যে ধরনের স্ত্রী বাণ্টি চেয়েছিল, যা পায় নি, তার কথাই বলে।

আর একটু বুঝিয়ে বলুন?

বাণ্টি তার বউয়ের রূপটা ভালবেসেছিল, তাকে নয়। রূপের নেশা ছুটতে মদের নেশা ধরল। তারই পরিণাম যা দেখছেন।

নম্বর দেখে বাণ্টির বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামালাম। বেল টিপতে দরজা খুলে বেয়ারা বেরিয়ে আসে। ধরাধরি ক'রে বাণ্টিকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলাম। এষাদি বললেন, একটা কথা, চ্যারিটি শোর কত টাকার টিকিট

বিক্রি করেছেন? বললাম, দু শো টাকার কিছু ওপরে, কাল আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

পাঠাতে হবে না। আপনার কাছে রেখে দিন।

মানে?

ও টিকিটের টাকাটা আমি দিয়ে দেব।

সে আবার কি?

গয়নার খেসারত আর আজকের হ্যাণ্ডনোটের দাম।

এযাদি কি বলছেন বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

এযাদি ম্লান হেসে বললেন, বুঝতে পারলেন না? বাল্টি মিত্তির আমার স্বামী। আজকের সুন্দর খাওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ।—ব'লে হাত তুলে নমস্কার ক'রে এযাদি বাড়ির ভেতরে চ'লে গেলেন।

এই প্রথম মনে হ'ল, এযাদি সুন্দরী, বাল্টি মিত্তির চিরকাল মিথ্যে কথা বললেও এই একটি কথা অন্তত সে সত্যি বলেছে, তার স্ত্রী রূপসী।

তরুণ রায়

# সংশয়

দেহাবদ্ধ ছিলে যবে, ঘটেছিল নিবিড় মিলন;
তবু ছিল সদা ক্ষুব্ধ মন।
যত কাছে টানি বক্ষে, কভু না ঘুচিত ব্যবধান,
দেহ-বাধা পর্বতপ্রমাণ।
অশরীরী আজি তুমি মম দেহে গিয়াছ মিশিয়া;
প্রতি রক্তকণা আলিঙ্গিয়া,
আছ সদা দেহ মাঝে, কভু মোরে যাও না ছাড়িয়া,
তবু তৃপ্ত নহে কেন হিয়া?
নিশীথ-শয়নে কারে সুপ্তিভঙ্গে করি অন্বেষণ;
হস্তে তার পাই না স্পর্শন?

কর্ম অন্তে দিবাশেষে গৃহে যবে ফিরি ক্লান্ত মন,
খোঁজে কারে তৃষিত নয়ন ?
কাহার শীতলহস্ত-স্পর্শ লভি' রোগতপ্ত শিরে,
ব্যর্থ দৃষ্টি ক্লান্ত আসে ফিরে ?
বিলম্বিত আশা কভু হয় পূর্ণ যদি কারে স্মরি'
সুখ আসে দুঃখ রূপ ধরি ?
সুরভিচন্দন সম লিপ্ত অঙ্গে, নয়নে অঞ্জন,
শ্রুতিযুগে মধুর গুঞ্জন ;
ঘ্রাণ মাঝে আছ মম সুমধুর পারিজাত বাস
রসনায় অমৃত বিলাস।
মনোমাঝে বসি সদা খুলিতেছ স্মৃতির বন্ধন,
অতীতে ডুবিয়া রহে মন।
কলুষিত করি চিত্ত নাহি জাগে রোষ অভিমান,
জানি প্রিয়ে তোমারি যে দান।
তব ইচ্ছা চিত্তমাঝে আসে ইচ্ছারূপে মম,
পূরণেতে আনন্দ পরম।
তবু তো ভরে না চিত্ত, সংশয়ের নিষ্ঠুর তিমিরে
প্রবেশিয়া মনের গভীরে,
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ধ্যান-লব্ধ অনুভব মোর,
অশান্তি জাগিয়া ওঠে ঘোর।
তাই ভিক্ষা হে বিদেহী, ক্ষণ তরে দেহ ছাড়ি মম
ধর তব রূপ মনোরম ;
ডাক মোরে, বল "আছি, শূন্য মাঝে হই নি বিলীন,
দেহ মরে, আত্মা মৃত্যুহীন।"

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

# সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা এইবার খুব একহাত লইয়াছেন। তিব্বতে চীনা অনুপ্রবেশের সময় কর্মনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসাবে তিনি লাসাতেই যে ছিলেন, সে সংবাদ আমরা জানি। পরে তিনি পুনরায় ধর্মনিষ্ঠ হইয়া পলাইয়া কাটমুণ্ডুতে আসেন। সেখান হইতে মাঝে মাঝে তীব্র বাক্যবাণ ছুঁড়িয়া আমাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছিলেন। শুনিয়াছি, তেনজিং-হিলারির দলে শেরপা সাজিয়া তিনি এভারেস্টের মাথা অবধি ধাওয়া করিয়াছিলেন। হঠাৎ হিমালয়ের কোন অজ্ঞাত অঞ্চল হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণশর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"এখান হইতেই জওহরলালের নূতন গান শুনিতে পাইতেছি। তোমরা বেশ আছ। এবার তোমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়া ধর—

যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে
জানি নে, জানি নে।
সে কি আপন রঙে ফুল রাঙাবে।
সে কি মর্মে এসে ঘুম ভাঙাবে।
ঘোমটা আমার নতুন পাতার হঠাৎ দোলা পাবে কি তার
গোপন কথা নেবে জিনে
জানি নে, জানি নে।

কিন্তু জওহরলাল না জানিলেও ওই পাশ্চাত্ত্য শক্তিদের কিছু জানিতে বাকি নাই। তাহারা জানে, চীনের ওই আপন রঙ রুশীয় লাল ছাড়া কিছু নয়। ভারতবর্ষের নূতন পাতার ঘোমটা খুলিয়া যাহারা হোলি খেলিতে আসিতেছে, তাহাদের পিচকারিটা চীনা হইলেও রঙ খাস মস্কৌ লিমিটেড। তাহারাও কিন্তু বসিয়া নাই। পাকিস্তানে ঘাঁটি করিয়া তাহারা তোমাদেরই শুনাইয়া শুনাইয়া গাহিতেছে—

না, না গো না।
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায় যাব না, যাব না।
যখনি চলে যাই আসিব বলে যাই ;

আলোছায়ার পথে করি আনাগোনা।
দোলাতে দোলে মন মিলনে বিরহে,
বারে বারেই জানি, তুমি তো চির হে॥

স্টেট্‌সম্যানে তোমাদের শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর ও গোরওয়ালার লেখা পড়িয়াছ তো? খুব সাবধান। তিব্বতে আমার নিজের অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। এই দুইজন সংশয়বাদীর কথা একেবারে ফেলিয়া দিবার মত নয়।

আচ্ছা, তোমাদের একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। দুই প্রাচীন মহাদেশের আঁতাত, মহান্ ঐতিহ্যের যোগাযোগ—এ সব কথার অর্থ কি? মিল কোথায়? তোমরা আর্য তৎসম ও তৎভব, উহারা মোঙ্গোল। তোমরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ইহারা শুধু নীতি মানে। তোমরা অহিংস নিরামিষাশী; উহারা নির্মম—মানুষ মারিতে উহাদের দ্বিধা নাই, উহারা খায় না এমন প্রাণী জগতে জন্মায় নাই। উহারা কাঠের কারবারী, তোমরা মাটির কারবার কর। উহারা ছাতার কাপড় কাটিয়া ইজের কোর্তা পরে, তোমরা টাহা মাথায় দাও। তোমরা লেখ বাঁ হইতে ডাহিনে, উহারা লেখে উপর হইতে নীচে। উহারা অনুস্বার-প্রধান, তোমরা বিসর্গ-প্রধান। পুরাতন চীনাংশুকের যোগ বহুকাল হইল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। কালীপূজায় এতদিন চীনা পটকা ছুঁড়িয়াছ, এইবার আসল চীনা পটকার বহর দেখিতে পাইবে। বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালী তন্ত্রের যোগ যেটুকু ছিল তাহা তো শঙ্কর লাথি মারিয়া আগেই দূর করিয়াছে! চীনা হোটেলের পাখির বাসার ঝোল খাইয়া এতদিন তারিফ করিয়াছ। এবার নিজের বাসা সামলাও। চো এন্ লাই যে তোমাদের চাউ-চাউ খাওয়াইতে আসেন নাই—এ কথাটি উদাসী জওহরলাল ভুলিয়া গেলেও তোমরা মনে রাখিও।"

আমরা পলিটিক্সই বুঝি না, ইণ্টারন্যাশনাল পলিটিক্স তো দূরের কথা। তাই গোপালদার কথাগুলি পড়িয়া কেমন বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছি। একটু ভয় ভয় করিতেছে।

* * *

গোপালদা আমাদের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত একাডেমিগুলি লইয়াও রহস্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"সাবাস! এই যে তোমরা দিল্লীতে এক-আদমি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছ, উত্তম হইয়াছে। ভারতবর্ষে এক আদমি ছাড়া দ্বিতীয় নাই। একা কৃষ্ণ তাঁর ষোল শো গোপিনী। আবুল কালাম আজাদ আদমির মত আদমি, তাহাতে সন্দেহ কি? আর এক আদমি আছেন বাংলা দেশে বিধানচন্দ্র রায়। শুনিলাম, তিনি ক্ষেপিয়াছেন এবং বাংলা দেশে স্বতন্ত্র এক-আদমি স্থাপন করিবেন। নৃত্যে নাট্যে অভিনয়ে তিনজন ছোট ছোট আদমি লইয়া তিনি নাকি অচিরে কাজ আরম্ভ করিবেন। নাট্য-বিভাগে শুনিলাম শিশিরকুমারকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার ছোট আদমি হইতে রাজী নন। সুতরাং অহীন্দ্র চৌধুরী। নৃত্যে তো এক আদমিই আছেন—উদয়শঙ্কর। শুনিলাম, সঙ্গীতে নাকি আদমি পাওয়া যায় নাই, বিধানচন্দ্র বিবিদের শরণাপন্ন হইবেন স্থির করিয়াছেন। এই সব উড়ো খবরের সত্যমিথ্যা যতদূর সম্ভব নির্ধারণ করিয়া আমাকে অবিলম্বে খবর দাও, আমি ভারতবর্ষে এক-আদমি সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক থীসিস প্রস্তুত করিতেছি। তোমাদের রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য এই বৎসরেই দাখিল করিতে চাই। টাকার বড় টানাটানি যাইতেছে।"

গোপালদা তো হুকুম দিয়াই খালাস, আমরা এখন খবর পাই কোথা হইতে?

—

খণ্ডিত বঙ্গের পশ্চিমাংশে পূর্বাংশ হইতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ উদ্বাস্তু পাকাপাকি রকম আসিয়া জুটিয়াছেন, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন। এ প্রয়োজন তাহার একান্ত ন্যায্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের এমন অনেক স্থান আছে, যাহা একদা বাংলা দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনও যেখানে বাঙালীয়ানাই প্রধান। বাংলা দেশ সেইগুলি দাবি করিতেছে। ভারত সরকার সীমানা নির্ধারণ কমিশন বসাইয়াছেন; বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফৎ স্ব স্ব দাবি পেশ করিয়াছেন। পূর্বদিকে হেলান দেওয়া চলিবে না, কারণ তাহা আন্তর্জাতিক নীতির আওতায় পড়িবে। অথচ দেখিতেছি, আষাঢ়ের 'প্রবাসী' "বিবিধ

প্রসঙ্গে" এমন এক দলের উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা সীমানা-নির্ধারণ ব্যাপারে এই আন্তর্জাতিক নীতি অমান্য করিয়া মৌলভী ফজলুল হককে বিপন্ন করিয়াছেন। 'প্রবাসী' লিখিতেছেন—

"আর একদল লোক সম্প্রতি কল্পনাপ্রসূত ইচ্ছার ভেলায় ভাসিয়া ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গের সাহায্যে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যস্থ রাষ্ট্রীয় সীমানা উড়াইয়া দিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কলিকাতায় একদল সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী নাগরিকই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উন্মত্ত ভাবোচ্ছ্বাসের ফলে মৌলবী ফজলুল হক পদচ্যুত ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় আটশত পদস্থ নাগরিক বন্দী।"

পূর্ববঙ্গের আকস্মিক বিপর্যয়ের কারণ নানা জনে নানাভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যুক্তফ্রন্টের প্রভাবকে খর্ব করিবার জন্য গবর্মেণ্ট-পুষ্ট লীগের চক্রান্তের কথাও শুনিয়াছি; বাঙালী ও পশ্চিমী মুসলমানদের বিরোধের কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। কিন্তু আসল কারণ যে "কলিকাতার একদল সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী নাগরিক," ইহা আমাদের জানা ছিল না। 'প্রবাসী'র এই তথ্য পরিবেশনের পর পাকিস্তানী সরকারের পক্ষে মৌলবী ফজলুল হকের বিচার সহজ হইবে।

—

আসাম-মন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সম্প্রতি-প্রদত্ত বক্তৃতায় যে মর্যাদা দিয়াছেন তাহাতে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে বিহারের শ্রীকৃষ্ণ সিংহের ব্যক্তিগত মনোভাবও খুব ভাল। কিন্তু রাষ্ট্রীয়-পরিষদে কাজের কথা যখন হয়, তখন তিনি ঠিক উল্টা কথা বলেন। আশা করি, শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীবিষ্ণু এই ব্যাপারে "এক অংশে চারি অংশ হইল প্রকাশ" হইবেন না। হিন্দী যাহাই হউক, বাংলা, আসামী ও ওড়িয়া যে ভারতের পূর্বাঞ্চলের একই ভাষার বিভিন্ন রূপ—এই কথাটা মানিয়া লইলে এই তিন প্রদেশের লোকেরই কল্যাণ হইবে। তখন আর মেধী মহাশয়কে আলাদা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তারিফ করিতে হইবে না।

—

ভেজালের বিরুদ্ধে কলিকাতায় যে ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আওয়াজই বেশি, কাজে যে বিশেষ কিছু হইতেছে তাহা মনে হয় না। ইহার আসল কারণ, আইনের অব্যবস্থা। ক্রোধের বশে মানসিক অস্থৈর্যের অবস্থায় একটা মানুষ খুন করিলে অপরাধীর ফাঁসি হয়। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন ঠাণ্ডারক্তে রীতিমত চক্রান্ত করিয়া ভেজাল তেল ও ওষুধের সাহায্যে প্রত্যহ হাজার হাজার প্রাণী বধ করিতেছে, ধরা পড়িলে তাহাদের শাস্তি সামান্য কিছু টাকা জরিমানা। এক সরিষার তেলের ভেজালেই যে ভারতবর্ষে কত নরহত্যা হইয়াছে, কত সুস্থ সবল মানুষ পঙ্গু ও অন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই গুরু অপরাধের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা ভারতবর্ষের নূতন বিধানে নাই। নরহত্যাকারীরা সামান্য জরিমানা ও মুনাফার কিছু অংশ ঘুষ বা চাঁদা দিয়া পরিত্রাণ পাইতেছে, এদিকে সরলবিশ্বাসী মানুষের পরিবারকে পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে—এই ব্যবস্থা যতই ডেমোক্রেসি-সঙ্গত হউক, ধর্মসঙ্গত নয়। আমাদের রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান নাই, কাজেই ব্যবসায়ীরা অবাধে ব্যবসায়ে ধর্মকে বিসর্জন দিয়া চলিতেছে। সামান্য ভেজাল নিবারণে অসমর্থ যাঁহারা, তাঁহারাই এ দেশে রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন—এইটিই আমাদের সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্য।

—

আরও দুর্ভাগ্য কলিকাতার সাধারণ ভদ্র নাগরিকের। কলিকাতার পুলিস-ব্যবস্থা এমনই অপটু যে প্রত্যেক পাড়ায় দেখা যাইতেছে, কয়েকজন দুর্ধর্ষ-প্রকৃতির গুণ্ডার হাতে ভদ্র গৃহস্থেরা পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছেন। গৃহস্থের রোয়াকে বসিয়া ইহারা গৃহস্থ-কন্যাদেরই অপমান করিয়া চলিতেছে, অথচ কিছু বলিবার উপায় নাই—বলিলেই ছুরি অথবা বোমার আঘাতে বিপন্ন হইবার আশঙ্কা আছে। প্রতিদিন সংবাদপত্রে এই জাতীয় লাঞ্ছনার কথা পড়িতেছি। কলিকাতার পুলিস কি করিতেছেন? তাঁহারা শক্ত নহেন বলিয়াই সাধারণ নাগরিকের মনোবল ভাঙিয়া গিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার অবিলম্বে আবশ্যক।

—

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায় গত ১লা জুলাই কংগ্রেস-ভবনে তাঁহার জন্মদিবস উৎসবে সবিনয়ে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ জনসেবা, তাঁহার তীর্থ দীনের চরণ। তিনি যেখানে বসিয়া রাজকার্য অর্থাৎ জনসেবার কার্য পরিচালনা করেন, তাজ্জব এই যে সেখানে দীনেদের প্রবেশাধিকার নাই। ভারতবর্ষের আদর্শ পাশ্চাত্ত্য আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। রাইটার্স বিল্ডিংকে ক্রেমলিন বানাইয়া গেস্টাপোর সাহায্যে শাসন ভারত-আদর্শের বিরোধী। দীনেদের চরণ যাহাতে অবাধে তাঁহার কাছ পর্যন্ত পৌছিতে পারে, এই ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রবর্তিত না হইলে তাঁহার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য ঘটিবে না। একান্তে কঠিন রাজকার্য করিবার অবসর তাঁহার নিশ্চয়ই থাকিবে, কিন্তু দিনের এক প্রহরও অন্তত দেওয়ানি-আমে দীনেদের চরণ তিনি দেখুন। তাঁহার আওতায় অদীন যাঁহারা পুষ্ট হইতেছেন তাঁহারাও যে পুলিস-মোড়কের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য হইয়া থাকিবেন, ইহা যে সত্যকার জনসেবার আদর্শ-বিরোধী, এই সহজ সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ নূতন ভারতীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করুন। মহাত্মা গান্ধী পুলিস-প্রহরাবদ্ধ হইয়া জনসেবা করিতেছেন, এ দৃশ্য আমরা কল্পনাই করিতে পারি না।

—

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক অতি পুরাতন কথাতেই আমরা আসিয়া পড়িতেছি—হিংসা করিও না, প্রতিবেশীকে ভালবাস, পরস্পর নির্বিবাদে বসবাস কর। দিল্লীতে চীন-ভারত সাক্ষাৎকারের পর দুই মহাদেশের দুই মহামন্ত্রী যে পঞ্চচূড়াময় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন, তাহার সর্বশেষ চূড়া হইতেছে—peaceful co-existence বা নির্বিবাদ প্রতিবেশিত্ব। আমাদের বিধানচন্দ্রও জন্মদিনে এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ কি, তাহা প্রণিধান করার শক্তি আমাদের নাই; কিন্তু ব্যক্তিগত সমাজ-জীবনে আমরা দেখিতেছি, দুর্বলের পক্ষে কথাটা উপহাস ছাড়া কিছু নয়। আমরা পথের এক পাশ দিয়া সন্তর্পণেই চলি, কিন্তু মদমত্ত যাহারা তাহারা চাবুক না চালাইয়া, কনুইয়ের গুঁতা না মারিয়া পথ চলেন না। পাড়াতেও সেই ব্যাপার। পীড়িত রোগীকে লইয়া নিশি জাগিতেছি, পাশের

বাড়িতে লাউডস্পীকার-যোগে হিন্দীতে "আমি-তুমি"র গান চলিয়াছে। বাড়ির সামনে একদল ইতর লোকে অশ্লীল রসিকতা সশব্দে করিয়া চলিয়াছে, সমর্থ কন্যাদের লইয়া আমি তটস্থ হইয়া আছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা উপযুক্ত না হইলে দরিদ্র ও দুর্বলের পক্ষে peaceful co-existence কথাটা মর্মান্তিক রসিকতামাত্র। সম্ভবত রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক ব্যাপারেও অবস্থা অনুরূপ। দরিদ্র দুর্বল দেশ কাহাকেও ঘাঁটাইতে চাহে না, কিন্তু তাহারা সবলকে পথ ছাড়িয়া দিয়া অন্যের অস্তিত্বকে বিপন্ন করিবার সহায় হয়। বর্তমান পৃথিবীতে তো সব জাতিই প্রায় শান্ত ও নিরুপদ্রব আছে, কিন্তু হাইড্রোজেন-নাইট্রোজেন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রতিবেশীর আকাশ-পাতাল বিষাক্ত করিতেছে, তাহার উপায় কি? ভারতবর্ষ-পাকিস্তানে কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু পাকিস্তান সীমান্তে আমেরিকার সাহায্যে ঘাঁটি নির্মাণ চলিয়াছে তাহার ভয় আমার মন হইতে দূর হইবে কিসে? যখন পথ চলিতেছি, তখন দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কা বা কাদা খাইব ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি peaceful co-existence কথার কথা মাত্র। রাষ্ট্র সমাজ ও ব্যক্তির ভদ্রতা ও রুচির শিক্ষা আশানুরূপ না হইলে শান্তির মুখোসটাই থাকিবে, আসলে অশান্তির বিষে দুর্বল মানুষ জর্জরিত হইতে থাকিবে—যেমন আমরা কলিকাতার নিরীহ নাগরিকেরা হইতেছি।

বিশেষ ঘোষণা :

'শনিবারের চিঠি' সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ফোন নম্বর গত ২৩শে জুন হইতে বড়বাজার ৬৫২০-এর পরিবর্তে বড়বাজার ২৮৩৮ হইয়াছে। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস এবং শনিরঞ্জন প্রেস সম্পর্কেও এই নূতন নম্বরে খোঁজ করিতে হইবে।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা ৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : বড়বাজার ২৮৩৮

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

শনিবারের চিঠি
২৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬১

# আত্ম-স্মৃতি

## তৃতীয় প্রবাহ—ষষ্ঠ তরঙ্গ

### মোক্ষারম্ভ

[ 'আত্ম-স্মৃতি' দীর্ঘ ছাব্বিশ মাস 'মাসিক বসুমতী' এবং পরে তিন মাস 'কথাসাহিত্যে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পাঠক ও অনুগ্রাহকবর্গের বিশেষ অনুরোধে নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠি' প্রকাশের কাল হইতে এই স্মৃতি-কথা 'শনিবারের চিঠি'ভুক্ত করিতে বাধ্য হইলাম। এই কথা যাঁহারা গোড়া হইতে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে ইতিপূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত স্মৃতি-কথা অংশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া পূজার পূর্বেই বাহির হইবে।—লেখক ]

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে অশোক চট্টোপাধ্যায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন পুরা দেড় বৎসরেরও অধিক কাল পরে—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। 'প্রবাসী'র রাজত্ব তখন সম্পূর্ণ জ্যেষ্ঠের করায়ত্ত, কনিষ্ঠ আর আসর জমাইতে পারিলেন না। সুতরাং অবস্থা-পরিবর্তনের যে আশাজড়িত প্রতীক্ষায় ছিলাম তাহা সফল হইল না, কিঞ্চিদূর্ধ ছয় বৎসরের আশ্রয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কলেজ-জীবন অকালে খণ্ডিত হওয়া অবধি এতাবৎকাল 'প্রবাসী'-'শনিবারের চিঠি'র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলাম, অশোক চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহার সরস মধুর সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া বাংলা-সাহিত্যাকাশের বৃহত্তর বিস্তারে পক্ষ মেলিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। সার্ আশুতোষ-পরিবারের "বঙ্গবাণীর নৈবেদ্যে"র লেখকরূপে, 'আত্মশক্তি'র বেনামী সমালোচকরূপে, 'বনে-জঙ্গলে'র গুপ্ত লেখকরূপে এবং 'যুগবাণী'র কর্ণধাররূপে তখন যথেষ্ট আত্ম-প্রত্যয় অর্জন করিয়াছি; 'ভারতী'র ভাঙা দল ও 'কল্লোল'-'কালি-কলমে'র দলেরও কাহারও কাহারও সঙ্গে হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে পূর্বের দলীয়তার গণ্ডীও ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে, অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত-নিরপেক্ষভাবেও যে 'শনিবারের চিঠি' পুনঃপ্রকাশ করিতে পারি—এ বিশ্বাসও মনে মনে জন্মিয়াছে।

বলি-বলি করিয়াও ক্ষুদুদাকে নানা কারণে মনের কথা খুলিয়া বলিতে দেরি হইতে লাগিল। অপ্রীতিকর আবহাওয়ার মধ্যে তিনি নিজেই তখন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণের জন্য তিনিও যে ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতেছিলেন, সে আভাসও পাইতেছিলাম। সুতরাং তাঁহার পরামর্শ চাহিয়া তাঁহাকে বিপন্ন ও ব্যথিত করা নিরর্থক বোধ করিলাম। মোহিতলাল দূরে থাকিলেও বরাবরই আমার শুভানুধ্যায়ী, মুরুব্বি বলিলেও চলে। সমস্ত খুলিয়া লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলাম। তিনি অত্যন্ত সাবধানী লোক, অনেক বুঝাইয়া, যুক্তি দিয়া আরও কিছুকাল ধৈর্য ধরিতে বলিলেন। 'শনিবারের চিঠি'র লেখক ও শুভানুধ্যায়ী আরও যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলকেই স্বাধীন হইবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। মাহিগঞ্জ, রংপুর হইতে বন্ধুবর রবীন্দ্রনাথ মৈত্র একটা শক্ত সমস্যার কথা তুলিলেন,—

"শেষে একটা problem [ সমস্যা ]এর কথা বলি—হয় 'শনিবারের চিঠি'র সব্যসাচী সজনী দাস সত্য—অথবা 'অজয়ে'র গ্রন্থকার সজনী দাস সত্য। একটা সত্য হ'লে আর একটা অভিনয়। কোন্‌টা সত্য জানি নে। ভিতরে যদি আগুন থাকে তবে শুকনো পাতা চেপে তাকে নেভাতে যাওয়া বৃথা।"

এই ইঙ্গিতমাত্র করিয়া রবি প্রশ্ন করিলেন, এইবার তুমি কোন্ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতে চাও? আমি সহসা এই কঠিন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারিলাম না, কারণ আমার নিজের মনের মধ্যেও নিজের সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। 'অজয়' রচনা করিবার কালে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, কয়েক বৎসর পরে 'রাজহংসে'র কবিতাগুলি লিখিতে লিখিতে তাহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে, কিন্তু মধ্যবর্তী কালে প্রচুর দ্বিধা ও সংশয় ছিল যাহার পরিচয় আমার এইকালে রচিত "ব্যর্থতা" কবিতার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। 'অজয়' যে কবির জীবন-কাব্য, এই কবিতা তাহারই রচিত। কলহ-কোলাহল নিন্দা-প্রশংসা ব্যঙ্গ-পরিহাস কোন কিছুরই ভক্ত বা দাস সে নয়, তাহার সাধনা যেমন সহজ তেমনই কঠিন। তাহার প্রশ্ন শুধু—

বাধা কখন ঘুচিবে সখি, আঁধার কবে হইবে আলো—
প্রদীপ-আলোয় দেখব কবে, কে তুমি এই প্রদীপ জ্বালো!

রবির সন্দেহ খুবই সমীচীন ছিল, এই কবির সহিত 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্তের যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া সহজ ছিল না। তাই ছন্দোবদ্ধ পত্রে রবিকে ইঙ্গিতেই জবাব দিলাম—

জীবন-প্রভাতে দীপ্ত অরুণালোকে
অনেক আশায় তরণী ভাসানু জলে,—
উচ্ছ্বাস ছিল অধীরতা ছিল মনে,
শুনেছিনু সুর নদীজল-কলকলে।
কে অজানা দূর পার হতে দিল ডাক,
ভাবিনু 'মিথ্যা' পিছনে পড়িয়া থাক্,
চলার আবেগে তরণী দিলাম খুলি'
দৃপ্ত প্রভাতে নবযৌবন-বলে;
পার হব—কোথা পার নাহি থাক্ জানা,
না হয় জুটিব দিক্-হারাদের দলে।

নদীতে তখন ছিল না ত খরবেগ,
মনের কোণেতে ছিল না শঙ্কা-ভয়;
গগনের বুকে ছিল না মেঘের রেখা,—
পূর্ব আকাশে সূর্য জ্যোতির্ময়।
অনুকূল বায়ে দিলাম তুলিয়া পাল,
অনেক আশায় ধরিয়া বসিনু হাল,
ছুটিল তরণী উচ্ছল কলরবে—
কূল মিলিবার না রহিল সংশয়;
পৌঁছিনু কত নিত্য নূতন দেশে,
কত অজানার লভিলাম পরিচয়।

স্রোতের আঘাতে চলিতেছিলাম সুখে,
পথ-সম্ভারে ভরিল তরণীখান,
সুদূর হইতে তখনো শুনিনু কানে
সাগর-পারের আশাভরা আহ্বান—

"এস হে যাত্রী, এখানে পথের শেষ,
সকল খোঁজার হেথা পাবে উদ্দেশ,
এস এস এই চির আলোকের দেশে"—
হৃদয়ে জাগিল আলোকের জয়গান;
তরতর করি চলিল তরণী মোর,
মধ্য গগনে সূর্য জ্যোতিষ্মান।

জানি না কখন গগনে উদিল মেঘ,
উত্তাল নদী বহে বেগে ক্ষুর-ধার,
প্রবল ঝঞ্ঝা গর্জ্জি' আসিল ছুটি'—
নদী আর কূল আঁধারেতে একাকার।
ব্যাকুল হইয়া তুফানের আগে লড়ি,
ছিঁড়ে গেল পাল ছিঁড়ে গেল দড়াদড়ি,
অন্ধকারেতে না পাই পথের দিশা—
দূর আহ্বান পশে না শ্রবণে আর—
কোথায় চলেছি কিছু নাহি মোর জানা,
ব্যাকুল বক্ষে উঠিতেছে হাহাকার।

পথ-সঞ্চয় ফেলিলাম নদীবুকে—
ব্যর্থ ভারেতে তরণী ডুবিবে কি রে?
কখনো অগাধ জলে করে টলমল,
কখনো সবেগে আঘাত হানিছে তীরে।
বেলা কত হ'ল—শেষ কিবা দিনমান,
কোন্ পথে যাই মিলে না সে সন্ধান,
ব'সে আছি শুধু ভাঙা হালখানি ধরি'
গভীর নিরাশা বক্ষ ফেলেছে ঘিরে;
বিদ্যুৎ শুধু রহি রহি চমকায়
দীপ্ত কুঠারে তিমির-বক্ষ চিরে।

ভাঙিল কি তরী, ডুবিবে কি তরীখান,
আরো কত দূরে যাত্রা-পথের শেষ?
কিছু নাহি জানি, পথ-হারানোর দুখে
ভুলিব কি আমি বৃথা-যাত্রার ক্লেশ!

প্রভাত-স্বপন মনে নাহি আর লিখা,
শুধু চোখে জাগে ব্যর্থতা-বিভীষিকা,
কোন্ পথে মোর মিলিবে সাগর-কূল—
আজি কোথা হায় মিলিবে সে উদ্দেশ ;
নাহি আর মনে যৌবন-অধীরতা,
পথ চলিবার নাহি আর সে আবেশ।

যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে ওরে,
হতাশা আমার চিত্ত ভরেছে হায় ;
কেটেছে তুফান অসীম সাগর-মাঝে—
আলো নাহি হেরি কোনো দূর কিনারায় ;
স্তব্ধ সাগরে ক্ষীণ তরঙ্গ জাগে,
দূরের রাগিণী কানে আর নাহি লাগে,
ডুবিব কখন তাহার আশায় আছি—
ভাঙা হালে তরী বহা যে বিষম দায় ;
কূলে ভিড়িবার নাহি আর মোর আশা,
তল মিলিবার রয়েছি অপেক্ষায়!

"ব্যর্থতা" নাম লইয়া এই পত্রই আমার 'আলো-আঁধারি'তে স্থান পাইয়াছে। রবি স্বভাব-সুলভ সরস ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, কুছ পরোয়া নেহি, আগে বাঢ়্হ।

সুতরাং আগে বাড়াই স্থির করিলাম।

ইতিমধ্যে আরও একটা বিভ্রাটের সম্মুখীন হইতে হইল। ঘোষ লেনের বাস আর না উঠাইলেই নয়, পরিবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেখানে আর কিছুতেই কুলাইতেছে না। প্রবাসী প্রেসের হেড কম্পোজিটর মানিকচন্দ্র দাস গোড়া হইতেই অর্থাৎ আমার একক ঘোষ লেনে বাসের সময় হইতেই সপরিবারে আমাদের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন, সরস্বতী নামা এক বৃদ্ধা একচক্ষু দাসী আমাদেরই উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া আসিয়া জুটিয়াছিল। 'মহাকালে' "রাহু-ভারত" মহাকাব্যের প্রথম কিস্তি প্রকাশ করিয়া সদ্য-পণ্ডিচেরী-ফেরত বারীনদা একদিন উপযাচক ভাবে আমার ঘোষ লেনের বাড়িতে মধ্যাহ্ন-ভোজনে আপ্যায়িত হইয়া

শ্রীমান রঞ্জনকে "প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্" আখ্যা দিয়াছিলেন; প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের আর কোনও দাবি না থাকুক, একসঙ্গে মানিকবাবুর ও সরস্বতীর পূর্ণ সেবা গ্রহণের প্রবল দাবি ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুইজনই তাহাকে মানুষ করিতেছিলেন, কাজেই স্থানাভাবের অজুহাতে কাহাকেও ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। বাড়ি ও বাসস্থান বিষয়ে যোগানন্দদা আমার চিরদিনের মুরুব্বি। অনেক ঘোরাঘুরি করিয়া ৫সি রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটের চারতলা বাড়িখানি তিনিই সন্ধান এবং সংগ্রহ করিয়া দিলেন, মাসিক ভাড়া আশি টাকা। একতলায় আমার বৈঠকখানা ও মানিকবাবুদের বাস নির্ধারিত হইল, দ্বিতলে আমার লাইব্রেরি (আমার সঞ্চয় ও সংগ্রহ দক্ষতায় তখনই বিপুলায়তন), শয়নঘর ও রান্নাঘর, ত্রিতলে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রাচী' মাসিক পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মনোরঞ্জন চৌধুরী সপরিবারে (তাঁহার গৃহিণী ইন্দু দেবীও শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী) অধিষ্ঠিত হইলেন, বিখ্যাত "কাজল-কালি"র শ্রীহিতেন্দ্র নন্দী হইলেন তাঁহাদেরই স্বয়ং-ব্যয়বাহী অতিথি; চারতলার একখানি ঘর কিছুদিন খালি ছিল, পরে "বিশাল ভারত হিন্দী পুস্তকালয়ে"র মালিক শ্রীঅযোধ্যা সিং সপরিবারে তাহা অধিকার করিলেন। শহরের প্রায় উপান্তে বহু বিচিত্রের সম্মিলনে আমরা প্রায় এক পরিবারভুক্ত হইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে লাগিলাম।

অদলবদলের হাঙ্গামাকে বিভ্রাট বলিলাম বটে, কিন্তু আসলে এই বাড়িতেই কল্যাণ নানা মূর্তিতে আমাকে দেখা দিতে লাগিলেন। সঙ্কীর্ণ ঘোষ লেনের বদ্ধ ঘিঞ্জি আবহাওয়া হইতে সহসা উদার উন্মুক্ততার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেন বাঁচিয়া গেলাম। বাড়ির পূর্বভাগেই বৃহৎ বৃহৎ কাঠের গোলা, তাহার পরেই খাল। সকাল-সন্ধ্যা সুন্দরবন হইতে সুঁদরিকাঠ-বোঝাই নৌকা আসিয়া আমাদের খালঘাটে লাগে, একটা তীব্র অথচ মিষ্ট গন্ধ পাই, অজ্ঞাত অপরিচিত হিংস্র শার্দুল-সর্প-সমাকুল অরণ্যের আভাস মনের পটে ভাসিয়া উঠে। সুঁদরিকাঠ-ধোওয়া রাঙা জলে মনও রঙিন হইয়া উঠে, শহরের মধ্যে থাকিয়া

শহরের ক্ষুদ্রতা-সঙ্কীর্ণতাকে ফাঁকি দেওয়ার উল্লাস মনে জাগে। কলিকাতার পাষাণ-কারাগারে বন্দী হইয়া প্রায় এক যুগ পরে বিস্মৃত পল্লীপ্রকৃতির মধুর স্পর্শ গায়ে আসিয়া লাগে।

প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও দক্ষিণ হস্তের স্পর্শ পাই। কন্যা উমা তখন সবে হামাগুড়ি ছাড়িয়া হাঁটি-হাঁটি-পা-পা শুরু করিয়াছে, মানিকবাবু-সরস্বতীর স্নেহসম্বর্ধনা-লালিত খোকনের তুলনায় উমার অবস্থা ছিল প্রায় ঘুঁটেকুড়ানীর কন্যার সামিল, অবহেলার মধ্যেই সে মানুষ হইতেছিল; গুট্‌গুট্‌ করিয়া কোনরকমে সকলের অজ্ঞাতসারে চৌকাঠ ডিঙাইয়া অন্ধগলিতে গিয়া পড়ে, খানিকক্ষণ পরে খোঁজ্‌ খোঁজ্‌ সাড়া পড়িয়া যায়। কল্যাণের দক্ষিণহস্ত প্রথম তাহারই দিকে প্রসারিত হয়।

আমাদের লাইনে গলিতে তিনখানি মাত্র বাড়ি—৫এ, ৫বি ও আমাদের ৫সি। ৫বি একটি স্কুলবাড়ি। ৫এতে থাকিতেন নাটোরের ভাগিনেয় ও ময়মনসিংহ-গৌরীপুরের জামাতা ব্রজেন্দ্রবাবু—বাংলা দেশের ডবল আভিজাত্যের অনুগ্রহপুষ্ট হালি নবাবির শেষ নিদর্শন সম্ভবত। দিনের আলোর সঙ্গে চিরন্তন বিবাদ বংশপরম্পরায় তিনিও বজায় রাখিয়া চলিতেন, সুতরাং তাঁহাকে কখনও দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বহু বৎসর পরে তাঁহার পুত্র বিমলাকান্তের বিবাহে তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম। তাঁহারই গৃহিণী শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর কন্যা হেমন্তবালা দেবীই আমার নবভাগ্যোদয়ের শুকতারা।

উমা প্রথম পদক্ষেপের নেশায় টলিতে টলিতে গলির শেষ প্রান্ত অর্থাৎ বড় রাস্তার ধার অবধি চলিয়া যায়, তিনি বারান্দা হইতে তাহাকে লক্ষ্য করেন এবং পরিচারিকা পাঠাইয়া উপরে ধরিয়া লইয়া যান—ইহাই হইল দুই পরিবারের আলাপের সূত্রপাত। অনিচ্ছুক সরস্বতী সুধারাণীর সকাতর অনুরোধে গজগজ করিতে করিতে দুষ্ট মেয়েটাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া সন্ধান লইয়া আসে, মেয়ে জমিদার-গৃহিণীর সহিত বিশ্রম্ভালাপে ব্যস্ত, এখন আসিবে না, পরে তাহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পরে সে যখন সত্যই আসে একেবারে পুতুল-খেলনার ভারে

ভারাক্রান্ত হইয়া। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। সুতরাং জমিদার-গৃহিণীর সহিত মধ্যবর্তিনীর মাতার অর্থাৎ আমার গৃহিণীর পরিচয় হইতে বিলম্ব হইল না। এ-পক্ষের মত ও-পক্ষেরও এক পুত্র এক কন্যা, তবে তাহারা বয়সে বড়। ও-পক্ষের কন্যা শ্রীমতী বাসন্তী অচিরাৎ সুধারাণীর ভগ্নী ও সখী পর্যায়ভুক্ত হইলেন। সেই সুবাদে হেমন্তবালা দেবী হইলেন আমাদের মাসীমা। পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইলে আমি তাঁহাকে মা বলিলাম, তিনিও আমাকে চিঠিপত্রে ছেলে সম্বোধন করিলেন। আজ শতাব্দীপাদ ধরিয়া সেই সম্পর্ক বজায় আছে।

গোড়ায় তাঁহাকে একজন স্নেহশীলা প্রতিবেশিনীমাত্র জ্ঞান করিয়াছিলাম; কিন্তু কয়েক দিন যাইতে না যাইতে বুঝিতে পারিলাম, সহজ মধুর সম্পর্কও কঠিন বিপদের কারণ হইতে পারে। মাতা হেমন্তবালা ও কন্যা বাসন্তী পরিচারিকাবাহিত চিরকুট মারফৎ আমার জবাব দাবি করিয়া গৃহিণীকে সাহিত্য-বিষয়ক এমন সব প্রশ্ন যখন-তখন করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন যে, আবার বাড়ি বদল করিব কি না সে ভাবনায়ও পড়িতে হইয়াছিল। ক্রমশ বুঝিতে পারিলাম, মাতা সাহিত্যের তথা চিন্তারাজ্যের গভীরতম প্রদেশের অধিবাসী, কন্যা বাসন্তী বাহিরের টুকিটাকি সংবাদ-আহরণে ব্যগ্র। কন্যার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু মাতার সাহিত্যিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সমাধান আমার সাধ্যায়ত্ত নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই জানিতে পারিলাম, তিনি প্রশ্নে প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকেও নিত্য নিয়মিত জর্জরিত করিয়া থাকেন। একান্ত রবীন্দ্র-পরিবেশের বাহিরে রবীন্দ্রনাথের যত ভক্ত দেখিয়াছি, হেমন্তবালা দেবীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। সাহিত্যে তাঁহার শিক্ষা স্বয়ংলব্ধ, রবীন্দ্রনাথের তিনি একলব্য-উপাসিকা। তিনি গোঁড়া অভিজাত ব্রাহ্মণ-পরিবারের নানা দুর্নিবার সংস্কারের অধীন হইয়াও রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম ও সংস্কার-মুক্তির শিক্ষাপ্রভাবে দোটানায় পড়িয়া বিবিধ সংশয় নিরসনে রবীন্দ্রনাথকে বিব্রত করিয়া তোলেন। বিপন্ন রবীন্দ্রনাথের সংশয়-ছেদন-প্রয়াস ১৩৩৮-৩৯ বঙ্গাব্দের 'প্রবাসী'তে "পত্রধারা" শিরোনামায়

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, মূলপ্রশ্নকারিণীর প্রশ্নগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। হইলে রবীন্দ্রনাথের জবাবের সহিত মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ সকলের হইত এবং এই সংশয়লাঞ্ছিত মহিয়সী মহিলার দুরূহ চিন্তাশক্তি এবং তাঁহার সাবলীল প্রকাশক্ষমতা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইতেন। তাঁহার অনেক রচনা পরে 'শনিবারের চিঠি'তে নামে ও বেনামে প্রকাশিত হইয়াছে।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মাতা অচিরকাল মধ্যে বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার উপাস্য রবীন্দ্রনাথ ও নবলব্ধ পুত্রের মনান্তর দুস্তর হইলেও দুরতিক্রম্য নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমার অপরিসীম ভক্তির কথাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। এই ব্যবধান তাঁহাকে পীড়িত করিত এবং গোপনে গোপনে দেবতার ও ভক্তের পুনঃসংযোগ স্থাপনে তিনিই যে পুরোহিতের ভূমিকা লইয়াছিলেন তাহা পরে জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি যখন আঘাতে আঘাতে বীতরাগ রবীন্দ্রনাথকে সহস্র যোজন দূরে অবস্থিত মনে করিতেছিলাম, তখনই যে হেমন্তবালা দেবী সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পত্রে আমারই দৈনন্দিন কৃতকর্মের ও পারিবারিক খুঁটিনাটির খবর দিয়া তাঁহাকে আমার প্রতি ক্ষমাশীল ও স্নেহশীল করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন তাহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরিয়া গেল। তাঁহার সহৃদয় চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, এবং সফলতার দ্বারাই ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। সে ইতিহাস ক্রমশ-প্রকাশ্য।

নূতন বাড়ির সর্বাধিক কল্যাণ-প্রসূতা প্রকাশ পাইল 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাবে। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৯ই ভাদ্র (২৬ আগস্ট ১৯৩১, বুধবার) আমার ৩১তম জন্মদিনে বন্ধুবান্ধবদের হৈ-হল্লার মধ্যে সঙ্কল্প স্থির হইয়া গেল। আমার ডায়ারিতে দেখিতেছি, প্রবাসী প্রেসের ম্যানেজারের ঘরে সেদিন প্রায় সকলেই সমবেত হইয়াছিলেন— অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, হরিপদ রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমাপ্রসাদ দাস। ছাপাখানার ছুটির পর ব্রিজখেলার আড্ডা চলিতেছিল। খেলিতে খেলিতেই স্থির হইয়া গেল, 'শনিবারের চিঠি'

পুনঃপ্রকাশিত হইবে এবং এবার নিজস্ব ছাপাখানা হইতে। টাইপ-কেস-র‍্যাক ইত্যাদি খরিদ করিবার জন্য বন্ধুবর রমাপ্রসাদ নয় শত টাকা ঋণ দিবেন ঘোষণা করিলেন।

পরদিন হইতেই তৎপর হইলাম। গৌরীকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতায় তখনও পুরাতন আপিসের অর্থাৎ রঞ্জন প্রকাশালয়ের ঠাটটা বজায় ছিল; কিন্তু ছাপাখানা বসাইতে হইলে উপযুক্ত ঘরের প্রয়োজন—তা হউক না আপাতত যন্ত্রহীন ছাপাখানা। কারবালা পুষ্করিণীর ঠিক দক্ষিণে বিডন স্ট্রীটের উপরেই একতলা কতকগুলি দোকানঘর সদ্য নির্মিত হইয়াছিল। সন্ধান লইয়া জানা গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের মহেন্দ্র শ্রীমানি বাড়ির মালিক। তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম। পুরাতনপন্থী নিষ্ঠাবান রাসভারী ভদ্রলোক, তাঁহার ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে একটা আভিজাত্যের প্রকাশ ছিল। তিনি আমাকে নামে চিনিতেন। ব্যবসায় সম্পর্কে বিস্তর সদুপদেশ দিয়া বিডন স্ট্রীটের পাশাপাশি দুইখানি ঘর তিনি আমাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্পহারে ভাড়া দিলেন। অর্থাৎ ছাপাখানার একটা ঠিকানা হইল—৩২।৫।১ বিডন স্ট্রীট। ইহারই একান্ত সংলগ্ন ডাফ হস্টেলেই আমার কলিকাতাবাসের গোড়া-পত্তন। সুতরাং গোড়া হইতেই ছাপাখানা-বাড়ির প্রতি একটা মমতা জন্মিল। রক্ষিত কোম্পানিকে হরফ ইত্যাদি এবং সামন্ত কোম্পানিকে কেস র‍্যাক ইত্যাদির অর্ডার দিয়া লেখাসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম। দূরে যাঁহারা ছিলেন অর্থাৎ মোহিতলাল, সুশীলকুমার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বনবিহারী, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সকলকেই আমাদের সঙ্কল্প বিজ্ঞাপিত করিয়া দীর্ঘ পত্রে লেখার জন্য আবেদন জানাইলাম। আমাদের সৌভাগ্য, প্রায় সকলেই অচিরাৎ সাড়া দিলেন। কলিকাতা-সফরও নিষ্ফল হইল না, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী "মহাত্মা" নামে একটি চমৎকার কবিতা দিলেন। শত্রুপক্ষীয় ব্রজেন্দ্রনাথও নিরাশ করিলেন না, তিনি পুরাতন 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে কবিওয়ালা হরু ঠাকুরের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলেন। কবি কৃষ্ণধন দে একটি কবিতা ও একটি গল্প দিয়া শনিমণ্ডলী-ভুক্ত হইলেন। সর্বাপেক্ষা অভিভূত করিলেন কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"হিজলী-দর্শন" নামে একটি অপরূপ অশ্রুসিক্ত ব্যঙ্গ রচনা দিয়া, ঠিক এই ধরনের "স্যাটায়ার" বাংলা-ভাষায় সামান্যই রচিত হইয়াছে। মোহিত-লাল, সুশীলকুমার ও রবীন্দ্র মৈত্র তো কোমর বাঁধিয়াই আমার মোক্ষ-সাধনায় সাহায্যার্থ আগাইয়া আসিলেন, হরিপদ রায় ছবির পর ছবি আঁকিতে লাগিলেন, এমন কি উদাসীন যোগানন্দও যোগ দিলেন; গীতাপন্থী "মা ফলেষু কদাচন" অশোক চট্টোপাধ্যায় কবিতায় বান ডাকাইয়া দিলেন। মোটের উপর অল্প কয়েক দিনের চেষ্টায় লেখার আয়োজন যাহা হইল, তাহাতে উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। আমার স্বাধীনতা-সঙ্কল্পে সর্বাধিক সমর্থক রবীন্দ্রনাথ মৈত্র শুধু "হরিকুমারের বাণী" পাঠাইয়াই নিরস্ত হইলেন না, তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি "ত্রিলোচন কবিরাজ"কেও পাঠাইলেন। বস্তুত, এই নব পর্যায় 'শনিবারের চিঠি'কে আত্মনির্ভরশীল ও প্রতিষ্ঠাপন্ন করিবার জন্য তিনিই সর্বাধিক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই এক বৎসরেই অপরিমেয় সাহিত্যিক দানে নবজন্মান্তরিত 'শনিবারের চিঠি'কে পরিপুষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন।

লেখা কম্পোজ ও গেলিবদ্ধ হইয়া মানিকতলা স্ট্রীটের একটি যন্ত্রে ফর্মায় ফর্মায় মুদ্রিত হইতে লাগিল এবং আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রায় দুই বৎসর পরে 'শনিবারের চিঠি' পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল নিজস্ব শনিরঞ্জন প্রেস হইতে। আমার জীবনে সে এক স্মরণীয় দিন। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহা যথারীতি প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছে এবং অন্যান্য বহু ব্যাপারে মাথা গলাইতে হইলেও ইহাই এখন পর্যন্ত আমার স্বাধীনতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজস্ব ছাপার যন্ত্রও হইয়াছে।

দীর্ঘ দুই যুগ কালের কৃষ্ণ যবনিকা ভেদ করিয়া আমাদের সেদিনের অবস্থার কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছি। নূতন পরিবেশের একটা খণ্ডিত পরিচয় 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠাতেই রহিয়া গিয়াছে। এ যুগের পাঠককে তদানীন্তন স্থান কাল পাত্রের কিঞ্চিৎ আভাস দিবার জন্য তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—'শনিবারের চিঠি'র ইতিহাসে এই নূতন করিয়া পথ চলার-

মুহূর্তে সম্পাদকের মনের সংশয়-সন্দেহ সাময়িক হইলেও স্থান পাইবার যোগ্য। "সংবাদ-সাহিত্যে"র গোড়াতেই যদিও এই বলিয়া মনকে চোখ ঠারিয়াছিলাম—

শাস্ত্রমতে ভগবান নিরন্তর ধরাধামে বসবাস করেন না, বা 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষে'র মত বরাবর নির্দিষ্ট তারিখে আবির্ভূত হন না; তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। যুগের সঞ্চিত পাপভারে মেদিনী যখন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে, মানুষের ন্যায় অন্যায় বিচারবোধ রহিত হয়, দুষ্টের অত্যাচারে শিষ্টেরা লাঞ্ছিত হয় তখনই অবতাররূপে ভগবানের আবির্ভাব হয়।

পূরা দুই বৎসর পর 'শনিবারের চিঠি'র পুনরাবির্ভাব হইতেছে যুগের প্রয়োজন ঘটিয়াছে বলিয়াই; 'শনিবারের চিঠি' ভগবান নহে, অবতারও নহে; তবে সে বলে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'।

কিন্তু এই বড়াই সত্ত্বেও যুগের আসল প্রয়োজন যে কি তাহা লইয়াই ছিল তাহার সংশয় দ্বিধা এবং বেদনা, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে নিম্নোদ্ধৃত রচনায়—

সমস্ত দ্বিপ্রহর অফিসের খোলা দরজার পথে ঊর্ধ্বে ধূম্রকলঙ্কিত লঘু খণ্ডমেঘাচ্ছাদিত আকাশ এবং নিম্নে ইঁটকাঠরাবিশ ও পুরাতন লোহে ভরাট অতীতের কারবালা পুষ্করিণীর বর্তমান অসমতল বীভৎস রূপ ও তাহারই আশেপাশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অট্টালিকা এবং নোংরা বস্তির ছাদ দেখিতে দেখিতে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বন্ধুর ভূমিখণ্ডের মাঝখানটায় পূর্বসমৃদ্ধ জলাশয়ের ভারাক্রান্ত জলাবশেষ যেখানে পঙ্কশয্যায় বাষ্পবুদ্বুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল—রৌদ্রক্লান্ত মোটবাহী গাড়ির মহিষগুলি দ্বিপ্রহরে আজিও বপ্রক্রীড়ায় যে পঙ্কিল জলভাগকে আলোড়িত করিতে দ্বিধা করে নাই—তাহাও এখন আর দেখা যায় না, জমির মালিক সম্মুখে ঘর তুলিয়া সে আরামটুকুকেও অন্তরাল করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের বস্তির মেথরদের অপোগণ্ড শিশুরা বহু কষ্টে সংগৃহীত অর্থে ক্রীত বিয়ারের বোতল লইয়া ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এখন আর প্রত্যেকে এক একটি ছোট্ট মাটির খুরি ও ঘুগনির চাট লইয়া মৌতাত করিতে বসে না, চারিদিকে প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহারা হয়তো দেয়ালের ওপারেই রোজকার মত মৌজ সারিয়া লইয়াছে। বিশ্বকর্মাপূজা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ ঘুড়ি উড়াইয়াও কেহ চোখের অবকাশ সৃষ্টি করে নাই। একটা এরোপ্লেন ও একটা দিকভ্রষ্ট মাতাল ফানুষ ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। আজিকার খোরাক সেইটুকুই।

পাশের কামরার দপ্তরীরা আমার অফিসঘরের সম্মুখের খোলা মেটে বারান্দায় তাহাদের উদ্বৃত্ত দুইখানা চৌকি ফেলিয়া রাখিয়াছিল তাহারই একটাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম ধোঁয়াটে নীল আকাশে কেমন করিয়া আসন্ন শীতের কুয়াশায় ম্লান কালো অন্ধকার

নামিয়া আসে। মাথাটা একটু ধরিয়াছিল। পূর্ব দিগন্তের পটভূমিতে টালিছাদওয়ালা তেতালা বাড়ি এবং আমার অতি প্রিয় নিষ্পত্র অষ্টাবক্র বৃক্ষপঞ্জরটিও যখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পশ্চিম দিগন্তে মুখ ফিরাইলাম। ধোঁয়া আর অন্ধকারের পীড়নে পশ্চিমাকাশের রঙের শেষ আমেজটুকুও মিলাইয়া আসিতেছিল; ভূতপূর্ব ডাফ হোস্টেলের বিপুলায়তন কোণাটা খাড়া পাহাড়ের মত চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালো হইয়া রেখামাত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া চোখের পাতাকেও ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল—ভাগ্যে বিদেশী তখন তোলা উনুনটায় কয়লা দিয়া আগুন ধরাইয়াছে—ধোঁয়ার বন্যাস্রোত আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমার মাথাটা একটু হাল্কা হইল। ভাবনার তবু বিরাম নাই। ভাবিতে লাগিলাম—রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স তো ফাঁসিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিতেছেন। আবার আইন অমান্য শুরু হইবে; খবরের কাগজগুলা পড়িয়া মনে হয়—নেতারা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য কেহই বাহিরে থাকিবেন না। যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহী আয়র্লণ্ডকে শাসন করিয়াছেন* বাংলা দেশের ভাগ্যে তিনিই আসিলেন গবর্নর হইয়া! এমনিতেই তো বেকার বাঙালী যুবকের ভাবনার অন্ত নাই—অর্ডিনান্স-প্রপীড়িত দেশে তাহারা কি নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্গতির কথা, সাহিত্য বেচিয়া এই দুদিনে অন্নসংস্থানের কথাও মনে হইল। হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, মুখ ভ্যাংচাইয়া, সমালোচকের চাবুক হাতে রসসৃষ্টি ও রসভঙ্গ করিবার সময় আর থাকিবে না—'শনিবারের চিঠি'কে হয়তো ভিন্ন মূর্তি ধরিতে হইবে—তা ছাড়া কাগজ কিনিয়া পড়িবে কে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনা-সমুদ্রে কোনই কূলকিনারা দেখিলাম না।

এই সংশয়-তিমিরাচ্ছন্ন নিশীথে নূতন যাত্রারম্ভ, অধীনতাপাশ তখনও ছিন্ন হয় নাই; কিন্তু শৃঙ্খলভঙ্গ-প্রয়াসের বেদনায় আমার সমস্ত সত্ত্বা কম্পিত মথিত হইতেছিল, 'শনিবারের চিঠি'র মলাটে মুরগির বদলে আমি রক্তজবার স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। আমার সে স্বপ্ন সফল হয় নাই, অনেক পরিবর্তন, অনেক বিপর্যয় সত্ত্বেও মুরগি মুরগিই রহিয়া গিয়াছে।

[ক্রমশ]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

* সার্ জন অ্যাণ্ডারসন।

# টাইফয়েড

মাধবীলতা অসুখ থেকে উঠল। খুব বড় রকমের অসুখ। টাইফয়েড। একুশ দিন পরে জ্বর ছেড়ে গেল। মাধবীলতার বাবা রাজেন রায় অফিস থেকে ছুটি নিয়েছেন এক মাসের। গত একুশ দিনের মধ্যে একটা দিনও তিনি অফিসের কথা ভাবেন নি, ভাবেন নি আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের কথা। মায়ের অবস্থা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছিল। হেমনলিনী দেবী সেই যে মেয়ের বিছানার পাশে এসে ব'সে পড়েছিলেন, আজ একুশ দিন পরে তিনি যেন বিছানা থেকে তাঁর নিজের অস্তিত্ব আলাদা ক'রে ভাবতে পারছেন।

রাজেনবাবু বললেন, মাধবী এখন ঘুমুচ্ছে, তুমি চান ক'রে নাও। তারপরে একটু কিছু মুখে দিয়ে ঘণ্টা দুই তুমিও ঘুমিয়ে নিও।

মাধবী যদি আমায় খোঁজে ?—হেমনলিনী দেবী যেন প্রশ্নটার জবাব চাইলেন না। চেয়ে রইলেন মেয়ের মুখের দিকে। রাজেনবাবু তাঁর স্ত্রীর মধ্যে একটা গভীর উদ্বেগের লক্ষণ দেখতে পেলেন।

কি দেখছ হেম ?

দেখছি ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। টাইফয়েড রোগটা তো ভাল নয়, একটা কিছু দাগ সে রেখে যায়। ডাক্তার এলে ওষুধ-পথ্যির কথা ভাল ক'রে জেনে রেখো। আর—। চুপ ক'রে রইলেন রাজেনবাবুর স্ত্রী।

'আর' কি ?

আর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে রেখো যে, মেয়ের মধ্যে তিনি তেমন কোন ক্ষতি দেখতে পাচ্ছেন কি না !

না, না—ক্ষতি কিছু হয় নি। আর হ'লেও তো কোন উপায় নেই। বেঁচে যে গেছে এই যথেষ্ট।—অভয় দিলেন রাজেনবাবু।

আচ্ছা, আমি যাচ্ছি চান করতে। ডাক্তারবাবু এলে আমায় ডেকে পাঠিও।

একটু বাদেই ডাক্তারবাবু এলেন। মাধবীকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন তিনি। পরীক্ষা শেষ ক'রে ডাক্তার সেন ঘোষণা করলেন, আর কোনও ভয়ের কারণ নেই।

—মাধবীলতা চেয়ে ছিল ডাক্তার সেনের দিকে। রাজেনবাবুর মনে হ'ল,

মাধবী যেন এখনও গত একুশ দিনের ভয়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। জীবন-নৌকোটা যেন ঝড় পার হয়ে এইমাত্র ঘাটে এসে লাগল। ঘাটের বাস্তব মাধবীর চোখে অদ্ভুত রকমের এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

রাজেনবাবু বসলেন এসে মেয়ের কাছে। ওর হাতটা তুলে নিলেন নিজের মুঠোর মধ্যে। আঙুলের চাপে অনুভব করলেন তিনি, মাধবীর হাতে মাংসের ছিটেফোঁটাও নেই। মেয়ের হাঁতে মাংসের ছিটেফোঁটা খোঁজবার জন্যে মাধবীলতার হাতটা তিনি তুলে নেন নি। রাজেনবাবু চেয়েছিলেন একুশ দিনের ঘুমন্ত মেয়ের দৃষ্টিটা তাঁর নিজের দিকে ফিরিয়ে আনতে। ডাক্তারদের দিকে অমন ক'রে দৃষ্টি না দেওয়াই ভাল। মাধবীর হয়তো তাতে ভয়ের মাত্রা বাড়বে।

হেমনলিনী দেবী ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল মেয়ের চোখের দিকে। মাধবীলতার দৃষ্টিটা যেন তাঁর কাছে খুবই অস্বাভাবিক ঠেকল। ডাক্তার সেনের দিকে অমন ভাবে চেয়ে আছে কেন? কৃতজ্ঞতা? আট বছরের মেয়ের পক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভঙ্গি এটা নয়, ভাবলেন হেমনলিনী দেবী।

ডাক্তার সেন চ'লে যাচ্ছিলেন। মাধবীলতা অতি ক্ষীণস্বরে ডাকলে, ডাক্তারবাবু! ডাক্তার সেন দাঁড়ালেন। আমায় ডাকছ মা?—এই ব'লে তিনি ফিরে এলেন মাধবীলতার কাছে। রাজেনবাবুর হাতের মুঠো থেকে সে তার হাতটা টেনে নেবার জন্যে একটু চেষ্টা করতেই রাজেনবাবুই ওর শীর্ণ হাতটা তুলে ধরলেন ডাক্তার সেনের দিকে। তুলে ধরতে চেয়েছিল মাধবীলতা নিজেই।

আমায় ফেলে কোথায় যাচ্ছিলেন ডাক্তারবাবু?

তোমায় ফেলে যাচ্ছিলুম না মা, রেখে যাচ্ছিলুম। কাল আবার আসব আমি। তুমি তো ভালই হয়ে গেছ।

আপনি কাছে না থাকলে আবার আমার অসুখ বাড়বে।

তোমার অসুখ আর একটুও নেই। দু-তিন দিনের মধ্যেই তো তুমি ভাত খাবে। দেখুন রাজেনবাবু, মাধবীর জন্যে কি মাছ আনবেন বলুন তো? মাগুর মাছ। কিন্তু সেদিন যদি না পাওয়া যায়? এক কাজ করুন আপনি। কাল সকালে আপনি নিজেই একবার লেক বাজারে যান। চাকর-বাকরের

ওপর নির্ভর করবেন না। মাছগুলো তো ওদের হাঁড়ির মধ্যে দু-চারদিন থাকে আবদ্ধ হয়ে। মিসেস রায়, আপনাদের চৌবাচ্চা নেই?

আছে, বেশ বড় চৌবাচ্চা আছে।—বললেন হেমনলিনী দেবী।

তা হ'লে দু দিন আগেই মাছগুলোকে এনে চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিলে ভাল হবে। মাগুর মাছের স্বাস্থ্যের ওপরেই এখন মাধবীলতার স্বাস্থ্য নির্ভর করবে। তা হ'লে—। ডাক্তার সেন মাধবীর হাতটা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, তা হ'লে এবার আমি চললুম। আরও তো রোগী দেখতে হবে মা। তুমি এবার ঘুমিয়ে পড়।

ঘুমুতে আমার ভয় ক'রে।—বললে মাধবীলতা।

ভয়? ভয় কিসের?—জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার সেন।

আপনি কাছে না থাকলে আমার ভয় করে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার সেনের মত ব্যস্ত ডাক্তারের পক্ষে মাধবীলতার ভয় সম্বন্ধে গবেষণা করা সম্ভব নয়। গবেষণা করা তো দূরের কথা, চিন্তা করারই বা সময় কই? চিন্তা করতে গেলেই সময় নষ্ট হয়, অতএব টাকা নষ্ট হয়।

একতলায় নেমে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সেন। পেছন থেকে হেমনলিনী দেবী ডাকলেন, ডাক্তারবাবু! পেছন থেকে কেউ ডাকলে ডাক্তার সেন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। বিরক্ত বোধ করবার কারণ আছে। কারণ না থাকলে অতবড় একজন ডাক্তার বিরক্ত বোধ করবেন কেন? কারণটা যেন কি? ও, হ্যাঁ, পেছন থেকে কেউ ডাকলে তাঁর প্রফেশনের বড্ড বেশি ক্ষতি হয়। দিনটা তাঁর ভাল যায় না। রোগীর সংখ্যা ক'মে যায়, অতএব টাকার অঙ্ক বাড়ে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মধ্যে পেছু ডাকের রহস্য কেমন ক'রে যে এসে খানিকটা জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে, সে কথা ভেবে ডাক্তার সেন মাঝে মাঝে খুবই বিস্ময় বোধ করেন। কিন্তু বেশিক্ষণ বিস্মিত হয়ে ব'সে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। টেলিফোনের আওয়াজ তিনি শুনছেন। তিনি ছুটে আসেন তাড়াতাড়ি ক'রে টেলিফোন ধরতে।

'হ্যালো? কে?—ও, আপনি? না, খোকা বাড়ি নেই। রোগী-বাড়ি থেকে টেলিফোন আসে নি। নতুন রোগীর কাছ থেকে টেলিফোন আজ আর আসবে না। সকালবেলাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। খোকার মা পেছন

থেকে তাঁকে ডেকে ফেলেছিলেন। খোকার মা মানে নিজেরই স্ত্রী। সুতরাং মুখ বুজে তাঁকে পেছু-ডাক সহ্য করতে হয়েছে। আজ আবার বার বার দুবার তিনি পেছু-ডাক শুনলেন। বাকি দিনটার কি অবস্থা হবে তা তিনি রাজেনবাবুর বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খানিকটা অনুমান করতে পারলেন।

ডাকছেন আমায়?—সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞাসা করলেন ডাক্তার সেন। না ডাকলে তিনি দাঁড়ালেন কেন? স্থান পরিবর্তন না করলে, হয়তো পেছু-ডাকের ক্ষতি খানিকটা রুখতে পারবেন তিনি। তা ছাড়া ক্ষতি কেবল তাঁর একলারই হয় না, রোগীর ক্ষতিও হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে মাধবীলতারও।

হেমনলিনী দেবী বললেন, টাইফয়েড রোগটা তো ভাল নয়—

হোক না খারাপ, আপনাদের তাতে ভয় কিসের? অসুখ তো সেরেই গেছে। দু-তিন দিন বাদেই ভাত দেব। তাজা মাগুরের সুপ পেটে পড়লে দশ দিনের মধ্যে মাধবীলতা গায়ে-পায়ে গজিয়ে উঠবে সাঁই সাঁই ক'রে। বড্ড বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছে মিসেস রায়, আমায় যেতে হবে শ্যামবাজার।

কিন্তু টাইফয়েড তো শুনেছি কোন একটা কিছু নষ্ট না ক'রে যায় না?

মেয়ে তো আপনার সামনেই রয়েছে, কোন কিছুই ওর নষ্ট হয় নি। হাত-পা নাড়ছে, কথা কইছে এবং স্মরণশক্তিও আছে পুরোপুরি। লেখাপড়ায় কেমন ছিল আপনার মেয়ে?

—খুব ভাল। ক্লাসের প্রথম মেয়ে ছিল মাধবীলতা।

থাকবেও তাই। ভয় করবেন না। হাঁড়িতে আবদ্ধ মাগুর মাছগুলোকে ছেড়ে দিতে বলবেন চৌবাচ্চায়। টাটকা জল পেলে ওদের শরীরের জড়তা যাবে কেটে—ব্লাড সারকুলেশন ভাল হওয়া চাই। নইলে সুপের মধ্যে আর থাকবে কি? আচ্ছা, আমি এবার চলি।—চলি ব'লেও তিনি সিঁড়ি থেকে নড়লেন না। মিসেস রায় ওখান থেকে না গেলে তিনি যেতে পারছেন না। যেতে ভয় পাচ্ছেন। আবার যদি মিসেস রায় পেছন থেকে ডাকেন? প্রোফেশনের ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এবার ডাকলে রোগীর ক্ষতি তিনি আর আটকাতে পারবেন না। এই ভেবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ব'লে হেমনলিনী দেবীও ওখান থেকে নড়লেন না এক

ইঞ্চিও। একটু পরেই ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত মনে হ'ল তাঁর কাছে। ডাক্তার সেন কেন অপেক্ষা করছেন ?

ডাক্তার সেন, আমায় কিছু বলবেন ?—জিজ্ঞাসা করলেন মিসেস রায়।

না, যা বলবার সবই তো ব'লে গেলাম। আচ্ছা, আমি চলি—

পেছন থেকে রাজেনবাবু ডাকলেন, ডাক্তার সেন!

ডাক্তার সেন জবাব দিলেন না, উঠে এলেন ওপরে। এলেন বেশ দ্রুত-গতিতে। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ ব'লে খবর না পেলে বড় ডাক্তাররা সাধারণত এত দ্রুতভাবে সিঁড়ি ভাঙেন না। ডাক্তার সেন রাজেনবাবুর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হ'ল, জ্বরটা রি-ল্যাপ্‌স্ করল না কি ?

কই, গা তো ওর গরম নয়।

তবে ?

মাধবী আপনাকে একবার ডাকছে।

এক ভিজিটে রোগীকে দেখতে হ'ল দুবার। তার ওপরে তিনবার পেছু-ডাক, তাও তাঁকে সহ্য করতে হ'ল!

কি মা, কি হয়েছে ?—কপালে হাত রাখলেন ডাক্তার সেন।

ভয় করছে।—বললে মাধবীলতা।

কিসের ভয় ?—জানতে চাইলেন ডাক্তার সেন।

আপনি কাছে না থাকলে এখানে আমি একলা একলা থাকব কি ক'রে ?

কেন, মা বাবা তো রইলেনই।

ডাক্তার কেউ কাছে না থাকলে আমি বাঁচব না।

কোনও ভয় নেই মা, মাগুর মাছের সুপ পেটে পড়লে, ভয়-ডর সব পালিয়ে যাবে মন থেকে। মিসেস রায়, শরীরে স্বাস্থ্য না এলে, ভয়ের ভূত ওর মনে চেপে ব'সে থাকবে। থাকবেই। কিন্তু তাতে অস্থির হবার কোন কারণ নেই, ওসব স্নায়বিক দুর্বলতা, মানে—। আচ্ছা, আচ্ছা, নমস্কার।

কাউকে আর ডাকবার সুযোগ না দিয়ে ডাক্তার সেন দৌড়ে নেমে গেলেন নীচে।

তার পরে প্রায় পাঁচ বছর অতীত হয়েছে। রঙ ধরেছে মাধবীলতার

স্বাস্থ্যে। হাত-পা সব ঠিকই আছে। চোখের দৃষ্টি কমে নি একটুও। মগজের হানি হয় নি তিলেকমাত্র। লেখা-পড়ায় মাধবীর মাথা আগের মতই প্রখর। ক্লাসে সে এবারও প্রথম হ'ল। বেশি নম্বর পেল গেলবারের চেয়ে। মা-বাবার স্ফূর্তি হ'ল মেয়ের চেয়েও বেশি। টাইফয়েড দাঁত বসাতে পারে নি কোথাও।

কিন্তু ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাধবীলতা শুয়ে পড়ে বিছানায়। হেমনলিনী দেবী মেয়ের পেছনে পেছনে ছুটে আসেন ঘরে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কি রে মাধু, শুয়ে পড়লি যে?

মাথাটা আমার ধরেছে মা।

তোর বাবাকে বলি ওষুধ দিতে?

বাবার ওষুধে সারবে না।

মাথা ধরার ওষুধ তো সব দোকানেই কিনতে পাওয়া যায়।—ব'লে হেমনলিনী দেবী মাধবীলতার মাথা টিপে দিতে থাকেন।

মাথা ধরার ওষুধ তো ক দিনই খেলুম, কিন্তু সারে কই? ডাক্তারকে ডাক মা।—মাধবীলতা পাশ ফিরল।

একটু মাথা ধরার জন্যে রোজ রোজ কি ক'রে ডাক্তার ডাকা যায়?

তা হ'লে মাইনে দিয়ে বাড়িতেই একজন ডাক্তার রাখ।—ও-পাশ ফিরেই বললে মাধবীলতা।

সে কি কথা মাধু? মাথা ধরা কিংবা সর্দি-কাশি তো এমন কিছু ভয়ের ব্যারাম নয়?

মুখ ঘুরিয়ে মাধবীলতা বললে, হাতের কাছে ডাক্তার না থাকলে আমার বড্ড ভয় করে মা।

কেন?

মনে হয়, আমি যেন কোন্ এক অজানা অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি। ডাক্তার ছাড়া কেউ আমায় সেখান থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

হেমনলিনী দেবী ভাবলেন একটু। ডাক্তারের সাহায্য ছাড়াই ব্যাপারটা তিনি বুঝে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন অদ্ভুত ধরনের ভয় মেয়ের মনে এল কি ক'রে?

তিনি মেয়ের কপালে হাত রেখে বললেন, তোর মনে আছে কি না জানি না, একবার তোর টাইফয়েড হয়েছিল। একুশ দিন পরে জ্বর ছেড়ে যায়। একুশ দিনের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা তোর মন থেকে বোধ হয় আজও কাটে নি। সত্যিই, তোর মাথা ধরেছে ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না মাধু।

তবে আমার কি হয়েছে?—প্রশ্ন করলে মাধবীলতা।

তোর কিছুই হয় নি।

আমার বোধ হয় তা হ'লে আবার টাইফয়েড হয়েছে। কিংবা টাইফয়েড হয়তো আমার কোনদিনও সারে নি মা।

## দুই

আঠারো বছর বয়সে মাধবীলতা আই. এস-সি. পাস করল। বেশ ভাল ভাবেই পাস করল।

ওর পাস করা উপলক্ষ্যে রাজেনবাবু ও হেমনলিনী দেবী তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের একদিন নেমন্তন্ন করলেন।

সকালবেলায়ই মা জিজ্ঞাসা করলেন, মাধু, তোর কলেজের বন্ধুদের কাউকে বলবি না?

ও, হ্যাঁ, রমলাকে তো বলতেই হবে। তা ছাড়া মিঠু—মিঠুর ভাল নামটা যেন কি? অতি সহজ ও পরিচিত নামগুলো মাঝে মাঝে ভুলে যাই মা। যাক, ভাল নাম না জানলেও চলবে, মিঠুকে টেলিফোন ক'রে ব'লে দিলেই হবে। গাড়িটা পেলে অবিশ্যি আমারই যাওয়া উচিত। কোথায় যেন থাকে? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে কলেজ স্কোয়ারের ও-পাশটায়। আচ্ছা মা, আর যদি দু-একজনকে বলি? দুজন নয়, একজনকে বললেই আমায় আর কেউ দোষ দিতে পারবে না।

হেমনলিনী দেবী চেয়ে ছিলেন মেয়ের দিকে, কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন না। মাধবীলতার চোখে যেন কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব আজও রয়েছে, রয়েছে ভয়ের চিহ্নও। কথাগুলো ও ব'লে গেল বটে, কিন্তু বললে যেন অন্য কোন এক অজানা দেশ থেকে। এখানে সে উপস্থিত নেই। প্রায়

সময়েই সে এখানে উপস্থিত থাকে না। থাকতে ভয় পায় মাধবীলতা। ওর আজও বিশ্বাস, হাতের কাছে একজন ডাক্তার না থাকলে যে-কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। কপালের ওপরে ছোট্ট একটা ফুসকুড়ি উঠেছিল ব'লে মেয়ের সে কি কান্না! দু দিন তো কলেজেই গেল না। বাবার কাছে গিয়ে মেয়ে পরামর্শ করতে লাগল, আমাকে তুমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি ক'রে দেবে বাবা। আমি ডাক্তার হব নিজেই। কারও ওপর আমি নির্ভর করতে চাই নে।

তোমার তো মা আমি গত দশ বছরের মধ্যে কোন অসুখ হতে দেখি নি; তবে কেন দিন-রাত ডাক্তার হওয়ার কথা ভাবছ?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু।

বল কি বাবা, অসুখ আমার সারল কই? একবার যার টাইফয়েড হয়, সে চিরকাল ভোগে। আমি ডাক্তারি পড়বার জন্যেই তো আই. এস-সি. পড়েছি।

রাজেনবাবু মেয়ের কথা বুঝতে পারেন না। গত দশ বছরের মধ্যে তিনি বোঝবার চেষ্টাও করেন নি।

আজকে নেমন্তন্ন করবার কথা উঠতেই হেমনলিনী দেবী মেয়ের চোখের মধ্যে স্বাভাবিকতা দেখলেন না। কথার মধ্যেও ওর অসংলগ্নতার সুর রয়েছে। ব্যাপার কিছুই তিনি বুঝতে পারলেন না, দশ বছর ধ'রে বুঝতে পারছেনও না। তিনি বললেন, গাড়ি নিয়ে যাও। রমলাকে গিয়ে আগে নেমন্তন্ন ক'রে এস। তার পরে মিঠুর কাছে যাও। আর একজন কোথায় থাকে বললে না তো?

আর একজন—মানে, মিঠুর দাদা। ডাক্তারি পড়ে। তোমাদের অবিশ্যি আপত্তি থাকলে আমি কক্ষনো নেমন্তন্ন করতে যাব না।

না, না, আপত্তি থাকবে কেন? আমাদের নাম ক'রে তাকে নেমন্তন্ন করিস। মিঠুর দাদার নাম কি রে?

নাম? এই দেখ, ভাল নামটা তো মনে নেই!

ডাক-নামটা জানলেই হবে।

কি দরকার তোমাদের জেনে? মানে, কদিনই আর দেখা হয়েছে বল?

তবুও নামটা তার না জানলে আমরা কি ব'লে ডাকব মাধু!

সে তো ঠিক কথাই মা। আমি তো 'শম্ভুদা' ব'লেই ডাকি। মিঠু ডাকে; তাই আমাকেও ডাকতে হয়।

মিঠুর বাবা কি কাজ করেন ?

সে আমি জানি না। তাঁকে আমি কখনও দেখিও নি। কোন অফিসে খুব সাধারণ একটা কাজ করেন ব'লে শুনেছি। ডাক্তার হ'লে কত টাকাই না তিনি রোজগার করতে পারতেন !

তা হ'লে তুই যা, নেমন্তন্নটা সেরেই আয়। উনি সঙ্গে যাবেন মাধু ?

গেলে তো খুবই ভাল হয়, শম্ভুদাকে বাবাই বলতে পারেন। কিন্তু—। থেমে গেল মাধবীলতা—কিন্তু বড্ড নোংরা বাড়িঘর। বাবার গিয়ে কাজ নেই। শম্ভুদা হয়তো মনে করবে, নোংরা বাড়িঘর দেখাবার জন্যেই বাবাকে ডেকে নিয়ে গেছি। গরিব লোকেদের অপমানবোধ বেশি হয়, তা কি তুমি জান না মা ?

জানি ব'লেই তো প্রথমে আমি তোকে একলাই যেতে বলেছিলুম।

হ্যাঁ, সেই ভাল।—এই ব'লে মাধবীলতা গিয়ে ঢুকল নিজের ঘরে। দাঁড়াল এসে আয়নার সামনে। চুলটা বেঁধে নিল ভাল ক'রে। শাড়িটা টেনে-টুনে ঠিকঠাক ক'রে নিতে ওর পাঁচ মিনিটও লাগল না। এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তাই সময় নষ্ট ক'রে সাজবার প্রয়োজনই হয় না মাধবীলতার।

মেয়ে বেরিয়ে যাবার পরে হেমনলিনী দেবী এলেন স্বামীর কাছে। রাজেনবাবুর অফিস নেই—রবিবার। আরাম-কেদারায় পা ছড়িয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তিনি।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মেয়ের এবার বিয়ের ব্যবস্থা কর।

খবরের কাগজে চোখ রেখেই রাজেনবাবু বললেন, দিল্লী থেকে দেবেনবাবুর এখনও কোন জবাব আসে নি।

এদিকে মেয়ে যে কোন্ এক শম্ভুদাকে নেমন্তন্ন করতে গেল !—বললেন, হেমনলিনী দেবী।

শম্ভুদা ?—রাজেনবাবু খবরের কাগজটা ফেলে রাখলেন মেঝের ওপর, বললেন, শম্ভুদা কে ?

ডাক্তারি পড়ে, থাকে কলেজ স্কোয়ারের ও-দিকটায়। বোধ হয় কোন এঁদো গলি-ফলি হবে। নতুন মডেলের অস্টিন গাড়িও হয়তো গলিতে ঢুকবে না। মেয়ে তো গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে।

কই, আমি তো কিছুই জানি না!

জানলেই বা কি করতে?

ট্যাক্সি ক'রে যেতে বলতুম। আমার নতুন অস্টিনের দফা সেরে দেবে আজ হয়তো!

না, ড্রাইভার তোমার পাকা আছে। কিন্তু তোমার অস্টিনের চেয়ে মেয়ের ভবিষ্যৎটা কি বড় নয়? ওর ভবিষ্যৎটা যদি নষ্ট হয়ে যায় ওই গলির মধ্যে?

কি ক'রে?—নতুন অস্টিন থেকে এবার রাজেনবাবু তাঁর মনোযোগ সরিয়ে নিয়ে এসে ফেললেন মেয়ের ওপর।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মেয়েটা যায় সেখানে মাঝে মাঝে। শম্ভুদার বোন মিঠু ওর বন্ধু।

পাগল না কি! শম্ভুদা, না, ঘোড়ার ডিম। মেয়ে আমার তেমন আজেবাজে কাজ করতেই পারে না। তা ছাড়া, দেবেনবাবুর ছেলে রামানন্দকে আমি আজ নেমন্তন্ন করেছি। মাধবীর সঙ্গে আজ ওর প্রথম পরিচয় হবে।

কিন্তু ওর শম্ভুদার সামনে এসব হবে কি ক'রে?—জিজ্ঞাসা করলেন হেমনলিনী দেবী।

তাই তো, ম্যানেজ না করতে পারলে ব্যাপারটা তো বায়স্কোপের মত ইন্‌টারেস্টিং হয়ে উঠবে।

মেয়েকে নিয়ে এসব হালকা রসিকতা করতে যেও না।

রসিকতা নয় হেম, আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লুম। একে তো ওর মাথায় রয়েছে টাইফয়েডের গোলমাল, তার ওপরে আবার এসে জুটল শম্ভুদা। না, কি করি বল তো? শম্ভুদাকে আলাদা ঘরে বসানো যায় না?—রাজেন-বাবুর কথায় হালকা সুর ভেসে উঠল ব'লে হেমনলিনী দেবী মেঝে থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুপুরবেলা মাধবীলতা বসবার ঘরখানা ভাল ক'রে সাজিয়ে রাখলে। রাজেনবাবু সাজালেন নিজের অফিস-ঘরটা। শম্ভুদাকে এখানে এনে মাধবী যদি বসায়, তা হ'লে কোন আর অসুবিধে হবে না। হেমনলিনী দেবীর মনের ভয় কাটবে। কাটলও।

সন্ধ্যের সময় সবাই এলেন। রামানন্দ এল সবার শেষে। মাধবীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন রাজেনবাবুই। ভাল ছেলে, কোন এক কলেজে যেন সবে ঢুকেছে ছাত্রদের পড়াবার জন্যে। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রামানন্দ দাশগুপ্ত। সে যদি কেবল অধ্যাপকই হ'ত, তা হ'লে রাজেনবাবু মাধবীলতার বিয়ের প্রস্তাব ক'রে রামানন্দর বাবার কাছে চিঠি লিখতেন না। দেবেনবাবু দিল্লীতে মস্তবড় একজন ডাক্তার। প্রচুর টাকা জমিয়েছেন। লেক-অঞ্চলে জমি কিনে রেখেছেন। ভাল একজন কনট্রাক্টরের সন্ধান পেলেই তিনতলা বাড়ি তিনি এই শীত না ফুরোতেই তুলে ফেলবেন ব'লে সব ঠিক ক'রে রেখেছেন। রামানন্দের কাছে এই সম্বন্ধে দেবেনবাবু একটা বড় চিঠিও লিখেছেন। ইট, সুরকি, সিমেণ্ট ইত্যাদির দরদস্তুর সবই তিনি লিখেছেন রামানন্দর কাছে। কলকাতার বাজারদর সম্বন্ধে দেবেনবাবুর জ্ঞান পাকা এবং নির্ভুল। ডালমিয়ার সিমেণ্টের সঙ্গে রোটাসের খাঁটি সিমেণ্টের দামের কতটা ফারাক তাও তিনি লিখেছেন রামানন্দের কাছে। আর কার কাছেই বা লিখতেন তিনি? ছেলে তো ওই একটি। দেবেনবাবুর স্ত্রী সেই জন্যে রামানন্দকে নীলমণি ব'লে ডাকতেন। তিনিই কেবল ডাকতেন নীলমণি ব'লে। কিন্তু তিনিও মারা গেছেন আজ তিন বছর হ'ল।

ইট, সুরকি আর সিমেণ্টের বাজারদর সব আলোচনা করবার পর দেবেনবাবু চিঠিতে 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছেন: রাজেনবাবুর মেয়েটি খুবই ভাল। সেন-হাটির বংশ, অতএব আপত্তি করবার কি আছে? রাজেনবাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বিয়ের তারিখটা তুমি ঠিক ক'রে নিও। তোমার সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চয়ই সব খবর নিয়েছেন। লেক অঞ্চলে দশ কাঠা জমি আমি কিনে রেখেছি প্রায় এক লাখ টাকা দিয়ে, তা কি ওঁরা জানেন? এই চিঠিখানা ওঁদের দেখাবে, তা হ'লে ওঁরা ইট-সুরকি ইত্যাদির দাম থেকে পুরো বাড়িটার মোট খরচ ধরতে পারবেন। আমি একটা আনুমানিক অঙ্ক লিখে দিলুম—তিন লাখ। তোমার সম্বন্ধে আর ওঁরা কি জানতে চান? ভবানীপুরে আমার একটা ওষুধের দোকান আছে, তার খবর ওঁরা রাখেন না। ঠিকানাটা তুমি তাঁদের জানিয়ে দিও। সেখানে যে দিবারাত্র ওষুধ তৈরি এবং বিক্রি হয়, সে খবরটা ওঁদের জেনে রাখা ভাল। ওষুধের দরকার হ'লে এবার থেকে ওঁরা ভবানীপুর থেকেই

যে ওষুধ আনবেন, সে সম্বন্ধে আমি এক রকম নিশ্চিন্ত হয়েই রইলাম। কেন থাকব না? ডাওয়ারি ব'লে তো আমি কিছুই নিলাম না। আর ওঁরা তোমার সম্বন্ধে কি জানতে চান? সার্ গজেনের আমলে তুমি যদি এম. এ. পাস করতে পারতে, তা হ'লে তিনিও তোমায় লুফে নিতেন, বসিয়ে দিতেন বড় অফিসের বড় চেয়ারে। কিন্তু এম. এ. পাস করা তো দূরের কথা, সার্ গজেনের আমলে তুমি কোথায় ছিলে, আমি তা জানতুম না। আমি নিজে তখন জন্মেছি কি? তোমার সম্বন্ধে আর কি ওঁরা জানতে চান? আমি নিজেও তো আর কিছু জানি না। কোথায় কি একটা কাজ যেন তুমি করছ ব'লে আমি শুনেছি। শোনাবার মত হ'লে ওঁদেরও তুমি শোনাতে পার। আমার মত দিয়ে রাজেনবাবুকে আজকেই আমি চিঠি দিলাম। সময়মত চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, দিল্লীতে এখন এপিডেমিক। পাঞ্জাব থেকে গাদা গাদা রিফিউজি এসেছে—মন্ত্রীদের কাজ বেড়েছে প্রচুর। তার ওপরে আবার এপিডেমিক। কোন্ দিক সামলাই বল তো? পাঞ্জাবের রিফিউজিরা আমাদের ওদিককার মত একেবারে সর্বহারা নয়। অনেকে কাঁড়ি কাঁড়ি পাকা সোনা সঙ্গে এনেছে—স্বাস্থ্য যা এনেছে, দেখলে মনে হয় সবাই এরা মস্কো-ডাইনামোর হয়ে ফুটবল খেলে। দিল্লীর এপিডেমিক বড় সাংঘাতিক ব্যারাম নীলমণি। বিয়ের ব্যাপারটা যতটা পার নিজেই ম্যানেজ ক'রে নিও। তুমি নিজে গিয়ে মেয়েটিকে দেখে আসবে। ফোটোর ওপর বিশ্বাস ক'রো না। রাজেনবাবু তাঁর মেয়ের একখানা ফোটো আমায় পাঠিয়েছেন। দেখে আমার নিজেরই তাক লেগে গেছে। মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার মত ছবি! আমেরিকার ফিল্ম-শিল্প ছাড়া অন্য কোথাও এত বড় শিল্প জন্মায় ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না খোকা। অতএব তুমি নিজে গিয়ে দেখে আসবে। সব পাকাপাকি ক'রে আমায় চিঠি দিলে আমি দু দিনের জন্যে কলকাতায় যাব। মে মাসের দিকে বিয়ের তারিখটা পড়লে ভাল হয়, প্রধান মন্ত্রী তখন দিল্লীতে থাকবেন না। এখানকার লোক একটু হালকা বোধ করবে। খবরের কাগজ পড়বার জন্যে কাউকে তখন ভোর রাত্রেই ঘুম থেকে উঠে ব'সে থাকতে হবে না। আমার রোগীদের মধ্যে অনেকেই খবরের কাগজ প'ড়ে প'ড়ে নার্ভের বারোটা বাজিয়েছে। আমার আশীর্বাদ নিও। ইতি—

রামানন্দ চিঠিখানা সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে। ড্রইং-রুমের ভিড়ের মধ্যে ব'সে সে চিঠিখানা রাজেনবাবুর হাতে দিয়ে বললে, বাবার চিঠি।

আমায় লিখেছেন?—জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু।

না, আমার কাছে লেখা বটে, কিন্তু আসলে বোধ হয় আপনার জন্যেই তিনি লিখেছেন। এত বড় চিঠি বাবা আমায় লেখেন না।

তুমি পড় নি?

এক পাতা পড়েছি। এক পাতার বেশি হ'লে আমার বড্ড অসুবিধে হয়।

কি অসুবিধে?

সময় ক'রে উঠতে পারি না। আমার নিজের আবার লেক্‌চার তৈরি করতে হয়। আমি যে কলেজে পড়াই, বাবা বোধ হয় তা জানেন না। জানলেও মনে রাখতে পারেন না। খুবই ব্যস্ত, বড় ডাক্তার কিনা।

ড্রইং-রুমের উপস্থিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের মুখে বেশ একটু প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস দেখতে পেলেন রাজেনবাবু। মাধবীলতার কিন্তু ভাল লাগল রামানন্দকে। সেটা বুঝতে পেরেই রাজেনবাবু ঘোষণা করলেন, রামানন্দর সঙ্গে মাধবীর বিয়ের প্রস্তাব আজ পাকা হয়ে গেল। দেবেনবাবুর চিঠি আমি এই একটু আগেই পেয়েছি।

গুরুজনেরা সবাই আশীর্বাদ করলেন মাধবীলতা ও রামানন্দকে। খাবারের টেবিলে গিয়ে সবাই বসলেন। হেমনলিনী দেবী নিজের হাতে পরিবেশন করবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন ঘরের মধ্যেই। আনন্দের আতিশয্যে রাজেনবাবু ছানার ডালনা খেতে ভুলে গেলেন। হাজার রকমের আলোচনা নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন। অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে শুরু ক'রে ফুটবল খেলা পর্যন্ত সব রকম গল্পগুজবই চলতে লাগল। মাধবীলতা বসেছে রামানন্দর ঠিক উল্টো দিকে। বসিয়েছেন রাজেনবাবু নিজেই। টেবিলের চারদিকে একটা চেয়ারও খালি নেই। খালি রাখেন নি রাজেনবাবুই। খবরের কাগজ নিয়ে সকালবেলাটা নষ্ট করলে কি হবে, তাঁর সাংসারিক বুদ্ধি অসাধারণ। তিনি অন্তত মনে করেন, অসাধারণ। শম্ভুদার জন্যে রাজেনবাবু একটা চেয়ারও খালি রাখেন নি। মাধবীর শম্ভুদা বোধ হয় আর আসবে না। এলেও তিনি

তাঁর অফিস-ঘরে সব ম্যানেজ ক'রে ফেলবেন। রামানন্দর সামনে তাকে না আনলেই হ'ল।

হেমনলিনী দেবী মাধবীলতার দিকেই চেয়ে ছিলেন। ভাবী জামাইয়ের মধ্যে দেখবার কিছু ছিল না। রামানন্দ কেবল সুশ্রী নয়, বড়লোক। লেক-অঞ্চলে দশ কাঠা জমি আছে, ভবানীপুরে আছে একটা ওষুধের দোকান। তার ওপরে সে কলেজ থেকেও আয় করে কিছু টাকা। অতএব, রামানন্দর মধ্যে দেখবার কি আছে? রামানন্দকে দেখছেন তো মাধবীর মীরা-পিসীমা। চোখ দিয়ে তিনি যেন রামানন্দকে গিলছিলেন। মীরা-পিসীমার মেয়ে নন্দরাণী বি. এ. পাস ক'রে ব'সে আছে প্রায় বছর দুই হ'ল, আজও সুযোগ্য পাত্র একজন জুটে উঠল না। নন্দরাণী ব'সে ছিল রামানন্দর এক পাশেই। মন্দ মানায় নি, ভাবলেন মীরা-পিসীমা।

বিরিয়ানির স্তূপ থেকে একটা মুরগীর ঠ্যাঙ বার ক'রে তিনি অনেকক্ষণ থেকে নাড়াচাড়া করছিলেন। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই পাকা হয় না। অতএব—

মীরা-পিসীমা মাধবীর দিকে চেয়ে বললেন, ও কি হচ্ছে মাধু? ছানার ডালনার সঙ্গে দই-মাছ মেখে ও কি করছ মাধবী? ওই দেখো, মাংসের ঝোলটা আবার ওতে মিশিয়ে ফেললে!

হেমনলিনী দেবী একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, মেয়েটা বড্ড বেশি অনমনস্ক হয়ে পড়েছে—লেখাপড়া নিয়ে মাধু চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকে।

ব্যস্ত না থাকলে পরীক্ষায় এত ভাল করতে পারত না। সায়ান্স নিয়ে পড়া তো আর চারটিখানি কথা নয় হেম। বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন আমার মাধবীলতা।—বললেন রাজেনবাবু।

রাজেনবাবুর কথায় সায় দিল রামানন্দ। দিয়ে সে বললে, কলেজের কমন-রুমে ব'সে আমি গেজেট দেখছিলুম, খুবই ভাল করেছেন উনি।

কিন্তু—। আসল কথাটা বলবার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ভেবেই মীরা-পিসীমা তাড়াতাড়ি ক'রে গলায় সহানুভূতির সুর তুলে বললেন, তুমি যাই বল বড়দা, মাধবী কিন্তু মাঝে মাঝে অদ্ভুত সব কাজ ক'রে বসে।

কি রকম?—কৌতূহল দেখালেন নন্দরাণীর বাবা দুর্গারতনবাবু। স্ত্রীর উদ্দেশ্য তিনি ধরতে পেরেছেন।

মীরা-পিসীমা রামানন্দের দিকে চেয়ে বললেন, সেদিন তো মাধবী গিয়ে উপস্থিত নন্দরাণীর কাছে। দুপুরবেলাই হবে। পরীক্ষার বোধ হয় তখনও মাস দুই বাকি। গিয়ে বললে যে, সে আর পরীক্ষা দেবে না। মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে। নন্দরাণী শুনে তো অবাক! আই.এস-সি. পাস না ক'রে মেডিকেল কলেজে ভরতি হবে কি ক'রে? মাধবীর বিশ্বাস, শম্ভুদা ওকে ভরতি করিয়ে দেবে। শুনে আমি কি বললুম, জান বড়দা?

রাজেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না তো।

আমি বললুম, মাধু, শম্ভুদাকে দিয়ে তোর মাথাটা একবার পরীক্ষা করিয়ে নে। বছর দশেক আগে তোর একবার টাইফয়েড হয়েছিল।—এই ব'লে খুব সরল হাসি হাসবার চেষ্টা করতে লাগলেন মীরা-পিসীমা।

খাবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ডাক্তার সেন। শেষের কথাগুলো শুনলেন তিনি। এগিয়ে এসে বললেন, শম্ভুদা ব'লে কোন ডাক্তারের নাম তো আমি টেলিফোন গাইডে দেখি নি? মাধুর চিকিৎসা তো করেছিলুম আমি। আমার নিজের তো তিনটি মেয়ে আর তিনটি ছেলে। এই ছটির মাথা একসঙ্গে করলেও, আমার মাধু-মার মত এমন জোরালো মাথা হবে না।—ডাক্তার সেন দাঁড়ালেন গিয়ে মাধবীর পেছন দিকে। রাজেনবাবু অত্যন্ত লজ্জায় প'ড়ে গেলেন। ডাক্তার সেনকে তিনি এমন দিনে নেমন্তন্ন করেন নি। ডাক্তার সেনের কথা তাঁর মনেই ছিল না। মনে থাকবার কথাও নয়। গত দশ বছরের মধ্যে মাত্র বার-দুই তাঁকে ডাকতে হয়েছে। ডাকতে হয়েছে হেমনলিনীর জন্যে, মাধবীর জন্যে নয়। মাধবীলতার পেছনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার সেন বললেন, রোগী দেখে বাড়ি ফিরতে প্রায় বেলা একটা বেজে গিয়েছিল। এসে দেখি, মাধু-মা আমার ব'সে আছে। সেই সকাল থেকে এসে অপেক্ষা করছিল নেমন্তন্ন করবার জন্যে। টেলিফোন করলেও আমি আসতুম।

এবার মাধবীলতা মুখ তুলে বললে, আপনার ওখানে ব'সে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ডাক্তারের বাড়িতে আমার ঘুম আসে ভাল। জান মা, দেরি

হয়ে গেল ব'লে আর কাউকে আমি নেমন্তন্ন করতে পারি নি। রমলা, মিঠু—এরা সব কি ভাববে?

কেউ কিছু আর ভাববে ব'লে হেমনলিনী দেবীর মনে হ'ল না। ভাবনার যা তার সবটুকুই রইল এখন রামানন্দর। টাইফয়েড এবং শম্ভুদা দুটোই সে শুনল। শুনিয়ে দিলেন মীরা-পিসীমা। এখন ভগবানের ওপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

খাওয়া শেষ হ'ল। সবাই উঠে পড়লেন। মীরা-পিসীমার প্লেটে অনেক খাবার প'ড়ে রইল। নন্দরাণী অবিশ্যি ভাল ক'রেই খেয়েছে।

সবার শেষে উঠল রামানন্দ। উঠে সে রাজেনবাবুকেই জিজ্ঞাসা করলে, বাবাকে তবে কি লিখব?

রাজেনবাবু যেন এখানে উপস্থিত ছিলেন না, অন্য কোন্ এক জায়গা থেকে ঘুরে এলেন। রামানন্দর প্রশ্নটা তিনি বুঝি শুনতেই পান নি, এমন ভাব দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই তো বাবাকে তুমি আর কি লিখবে?

আপনি বললেই আমি লিখতে পারি। মে মাসের দিকে দিনটা হ'লে বাবার পক্ষে খুব সুবিধেই হয়।

ও, হ্যাঁ। বিয়ের দিন আমি মে মাসেই ঠিক করব রামানন্দ। দেবেনবাবুর সুবিধে আমাদের দেখতেই হবে।

দ্বিতীয় বার মাধবী ও রামানন্দ সবার কাছে আশীর্বাদ পেল। আশীর্বাদের বন্যা নামালেন ডাক্তার সেন। আশীর্বাদ তিনি শেষ করলেন এই ব'লে যে, দেবেন তাঁর সহপাঠী ছিল। তার প্রচুর পয়সা আর প্রচুর হাতযশের সংবাদ তিনি রাখেন। মাধবীলতা লাকি। লাকি রামানন্দও।

সবাই চ'লে যাওয়ার পরে বাড়িটা খুব নির্জন মনে হ'ল মাধবীলতার কাছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে দেখতে লাগল ভাল ক'রে। কোথাও সে খুঁত পেল না এতটুকু। খুঁত কেবল তার মনের। সে ভেবেছিল, একজন ডাক্তারের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। মিঠুদের বাড়িতে সে যেত শম্ভুদার সঙ্গে দেখা করতে। শম্ভুদা ডাক্তারি পড়ছে, সেইটেই ছিল ওর কাছে একটা মস্তবড় বাস্তব। তার সঙ্গে দেখা হ'লেই ওর মনের মধ্যে কোন রকম আশঙ্কাই থাকত না। মাধবীলতার সর্বক্ষণের ভয় ছিল যে, ডাক্তার কাছে না থাকলে সে আবার

তলিয়ে যাবে একুশ দিনের আচ্ছন্নতায়। মাধবীলতার মনের মধ্যে টাইফয়েড বুঝি চিরদিনের জন্যে র'য়েই যাবে।

পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন হেমনলিনী দেবী। তিনি এলেন ওর ঘরের মধ্যে। জিজ্ঞাসা করলেন, রামানন্দকে কেমন লাগল?

খুব ভাল।

খুশি হয়েছিস তো?

না।

কেন?

আমার বোধ হয় একজন ডাক্তারের সঙ্গে বিয়ে হ'লেই ভাল হ'ত মা।

তোর শম্ভুদার সঙ্গে বিয়ে হ'লে আমি আত্মহত্যা করতুম মাধবী। আমায় সমাজ ও সংসারের নিয়মকানুন সব মেনে চলতে হয়।

হেমনলিনী দেবীর পায়ের ধুলো নিয়ে মাধবীলতা বললে, আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন রামানন্দকে সুখী করতে পারি।

বেঁচে থাক মা সতীলক্ষ্মী হয়ে।—মাধবীলতার গালে চুমু খেলেন হেমনলিনী দেবী।

## তিন

বিয়ের পরে পাঁচটা বছর কেটে গেল।

মাধবীলতা প্রমাণ করলে যে, তার মত সতীলক্ষ্মী হিন্দু-ভারতবর্ষের সর্বত্রই পাওয়া যায় না। খুঁজে বার করতে হয়। রামানন্দকে খুঁজতে হয় নি, মাধবীলতা নিজেই এসেছে ওর কাছে। আসার পর থেকে মাধবী আর নড়ে-চড়ে নি। পাঁচ বছরের মধ্যে একটা দিনও সে সুস্থ থাকে নি। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর দার্শনিক রামানন্দ মাধবীলতাকে ওষুধ খাওয়ালে আর মাথা টিপে দিলে বিছানার পাশে ব'সে। পঞ্চম বর্ষের শেষের দিকে রামানন্দ নিজের বিছানা আলাদা ক'রে নিয়ে এল তিনতলার ঘরে—প্রকাণ্ড সেই লাইব্রেরি-ঘরটায়।

দেবেনবাবু মারা গেছেন। লেক অঞ্চলের তিনতলা বাড়িটা তৈরি ক'রে তবে তিনি মারা গেলেন। ভবানীপুরের ওষুধের দোকানটা খুব ভাল চলছিল,

কিন্তু গত বছর থেকে সেখানে লোকসান হচ্ছে। কর্মচারীরা ঠকাচ্ছে। রামানন্দ ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হারাচ্ছে সবার ওপরে। সংসারটা ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে ব'লে রামানন্দর ধারণা। একতলার ভাড়াটে ভাড়া দেয় না। টাকাগুলো সব কোথায় যেন মনি-অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দেয়। কি সেই অদ্ভুত নামটা যেন? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রেণ্ট-কণ্ট্রোলার। ভাড়া চেয়ে পাঠালেই সতীশের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেয় ভাড়াটে। চিঠিতে আর কিছুই লেখা থাকে না, কেবল ওই নামটা ছাড়া। সতীশ বলে, বাবু, তুমি ওদের উঠিয়ে দাও। দরকার হয় কিছু টাকা না হয় ওদের নগদই দিয়ে দেবে। দুজন মাদ্রাজী বাবু ক মাস থেকে আমাকে খোসামোদ করছে। হাজার টাকা আগাম তো দেবেই, তার ওপরে মাসের পয়লা তারিখে ভাড়া পাওয়া যাবে। বাঙালী বাঙালী ব'লে হাই তুললে তো আর টাকা আসে না!

কিন্তু আমি তুলব কি ক'রে?

আদালত কর।

আদালত? সে আমি চিনি না। তা ছাড়া তোর বউমাকে ফেলে আদালতে গিয়ে ব'সে থাকব কি ক'রে? এর ওপর আবার লেক্‌চার তৈরি করতে হবে। না সতীশ, পৃথিবীতে আমি ঠকতেই এসেছি। ওষুধের দোকানটাও গেল। কেবল চুরি করছে ওরা।

কর্মচারীরা বলে কি জান?

কি ব'লে?

বলে যে, বউমা নাকি ওষুধ খেয়ে দোকানটা ফেল করিয়ে দিচ্ছে! কম্পাউণ্ডার ব্যাটাকে খুব শুনিয়ে দিয়েছি।

সর্বনাশ করেছিস সতীশ।

কেন বাবু?

ওরা রেগে গেলে আরও বেশি ক'রে চুরি করবে যে! নাঃ, সংসারটা বড্ড গণ্ডগোলের জায়গা। কে এক শম্ভুদা অন্তরালে ব'সে কি খেলাই যে খেলছে! দে, ওই মোটা বইখানা দে তো। লেক্‌চার তৈরি করতে হবে। ছেলেগুলো আজকাল কি বজ্জাতই যে হয়েছে! কেবল প্রশ্ন করে দিনরাত। সিলেবাসের বাইরে থেকে আমিই বা পড়াতে যাব কেন? দুনিয়ায় আর

যেন কোন দর্শনই নেই, কেবল মার্কসবাদ ছাড়া। দে, ওই কার্ল মার্কসকে এদিকে ঠেলে দে।

কি নাম বললে বাবু?

কিচ্ছু না, রেণ্ট-কণ্ট্রোলার না কি সব ছাইভস্ম নাম আজকাল হয়েছে! ঘরের পুঁজি সব ওইখানে গিয়ে জমা হচ্ছে। কর্পোরেশনের খাজনা বাকি পড়ে গেল। ওই দেখ্, বউমা বোধ হয় ডাকছে!

দোতলায় থাকে মাধবীলতা। বিছানার সঙ্গে একটা সুইচ ক'রে দিয়েছে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি। ওটা টিপলেই তিনতলায় লাইব্রেরি-ঘরে আওয়াজ হয়। আওয়াজ শুনে সতীশ ছুটে গেল মাধবীলতার কাছে।

মোটা বইখানা নিয়ে রামানন্দ নাড়াচাড়া করতে লাগল। পড়বার মত মনের অবস্থা তার নেই। শুরুতেই যেন সে বুড়িয়ে গেছে। দক্ষিণ-খোলা বাড়িটায় লেক থেকে তাজা হাওয়া আসে দিন-রাত। তিনতলার ঘরে জানলা খুলে বসা যায় না, বাতাস এসে সব কাগজপত্র উড়িয়ে ফেলে দেয় মেঝেতে। রামানন্দ জানলাগুলো তাই বন্ধ ক'রেই রাখে। সতীশ চ'লে যাওয়ার পর রামানন্দ মোটা বইখানা তুলে রেখে দিয়ে এল শেল্‌ফের ওপর। সিলেবাসের বাইরে সে কোন আলোচনাই করবে না। কিন্তু শম্ভুদা? সে-ই বা মোটা বইটা থেকে কম যায় কি? সাংসারিক জীবনে গোলমাল তো সেই বাধিয়েছে। কি দরকার ছিল বাপু, আমাকে বিয়ে করবার? শম্ভুদার সঙ্গে পালিয়ে গেলেই তো হ'ত? এখনও যদি মাধবীলতা যেতে চায়, তা হ'লে রামানন্দ টাকা-পয়সা দিয়ে ওদের সাহায্যও করতে পারে। কিন্তু এখানেও আবার গোল বাধিয়েছে রেণ্ট-কণ্ট্রোলার। মাসিক তিন শো ক'রে টাকা তাঁর কাছে গিয়ে জমা হচ্ছে প্রায় এক বছর থেকে। বাড়িটা তৈরি ক'রে রেখে গিয়ে বাবা যে কি মুশকিলেই ফেলে গেছেন রামানন্দকে! তার চেয়ে হ্যারিসন রোডের কোন একটা হোটেলের ভাত খেয়ে কলেজে অধ্যাপনার কাজ করাই ছিল ভাল। দশ কাঠা জমি আর ওষুধের দোকানটা না থাকলে মাধবীলতার সঙ্গে তার বিয়ে হ'ত না। কিন্তু এখন সে কি করবে? ক্যাশ টাকা কই? ডাক্তারেরা সবাই মিলে আজ পাঁচ বছর থেকে কি কাণ্ডই না করছেন! শ্বশুর-শাশুড়ীর ওপরেও রামানন্দর আর বিশ্বাস নেই। তাঁরা জেনেশুনে এমন একটা

কাণ্ড ক'রে বসলেন! শম্ভুদাকে মেয়ে তাঁদের ভালবাসত, সে কথা তাঁরা ভাল ক'রেই জানতেন। কিন্তু লেক অঞ্চলের দশ কাঠা জমির লোভ ওঁরা ছাড়তে পারলেন না। বিয়ে দিলেন রামানন্দর সঙ্গে। এখন তবে সে কি করবে? সন্ধ্যের সময় শ্বশুর এলে, সে বাড়ির দলিলটা শ্বশুর-বাড়ির নামে লিখে দেবে ব'লেই মনে মনে ঠিক করল। সিন্দুক থেকে দলিলটা সে বার ক'রে রাখবে। দলিলটা দিয়ে দেওয়ার পরে রামানন্দর কর্তব্য কি? হ্যারিসন রোডের কোন পান্থশালায় গিয়ে সে উঠবে ব'লে কর্তব্য তার স্থির করল।

আরও এক বছর কেটে গেল। কোন কিছুই পরিবর্তন হ'ল না। উন্নতি হ'ল না মাধবীলতার স্বাস্থ্যের। সেই মোটা বইটা নিয়ে কলেজে তার গণ্ডগোল লেগেই রইল। রামানন্দ আর কোন দর্শনের বই পড়বে না ব'লে মনস্থির ক'রে রেখেছে। ভাড়াটের কাছে সতীশকে আর পাঠায় না। ভাড়া সে কমিয়ে দিয়েছে অনেক। তিন শো থেকে দু শো হয়েছে ভাড়া। তাও সে সময়মত পায় না। আর শম্ভুদা? তাকে জয় করবার চেষ্টা করছে রামানন্দ। সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে এবার জয় করবে। অন্তরালের রহস্য আর থাকতে দেবে না সে।

মাইনের টাকা খরচ ক'রে রামানন্দ সব ডাক্তারী বই কিনতে লাগল। কিনল সে একটা স্টেথেস্কোপও। কলেজ থেকে বেরিয়ে সে প্রতিদিন হাঁটতে হাঁটতে চ'লে আসে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত। পূবদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে রামানন্দ বেরিয়ে আসে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর ফটক দিয়ে। এই পথটা অতিক্রম করতে ভাল লাগে ওর।

লাইব্রেরি-ঘরটা ভ'রে উঠেছে ডাক্তারী বই দিয়ে। দর্শনের বইগুলো বস্তার মধ্যে ভরতি ক'রে চিলেকোঠায় তালাবন্ধ ক'রে রেখেছে। দেওয়ালের গায়ে ব্রাকেটের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছে স্টেথেস্কোপ। বাবারটাও ছিল ওর কাছে। কিন্তু বাবার ওপরে রামানন্দর ভীষণ রাগ। দশ কাঠা জমি কিনে তিনি ওর সর্বনাশ ক'রে গেছেন। অতএব বাবার স্টেথেস্কোপের ওপর ওর আর এক রত্তি আস্থা নেই।

ভবানীপুরের ওষুধের দোকান উঠে গেছে। উঠিয়ে দিয়েছে রামানন্দই। ওষুধগুলো সব বাড়িতে নিয়ে এসেছে। লাইব্রেরি ঘরের দু দিকের শেল্‌ফে

সাজিয়ে রেখেছে ওষুধের শিশি আর বোতলগুলো। শম্ভুদার সঙ্গে সে এবার লড়বে। মাধবীলতার শম্ভুদাকে ভাল লাগে কেন? শম্ভুদা ডাক্তার। আচ্ছা, তোমার ডাক্তারী বিদ্যে কত এবার আমি দেখে নেব! রামানন্দর সংগ্রাম-শক্তি বাড়তে লাগল প্রতিদিন। ডাক্তারী বই সে পড়তে লাগল সংসারের সব কিছু ভুলে গিয়ে।

সতীশ একদিন জিজ্ঞাসা করলে, বাবু, এ তুমি কি করছ? শোবার ঘরটা যে ডাক্তারখানা ক'রে তুললে?

ওষুধ তৈরি করছি সতীশ, গোলমাল করিস নে।

নিজের চেহারাটা একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখো তো? পাগলামির একটা সীমা আছে তো?

কি বললি?

কিছু না। বউমা তোমায় ডাকছে।

এ ঘরের খবর বউমা যেন কিছু না জানতে পারে, বুঝলি?

বুঝেছি। এখন যাও তার কাছে। সর, ঘরটা এখন ঝাঁট দিয়ে দি। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা নষ্ট ক'রে কেবল বই কিনছ! এত টাকা পেলে কোথায়?

বাড়িটা বাঁধা দিয়েছি।—ফস ক'রে ব'লে ফেলল রামানন্দ।

অ্যাঁ, করেছ কি? সর্বনাশ!—ছোট ছেলে হ'লে সতীশ বোধ হয় ঝাঁটা দিয়ে দু-চার ঘা লাগিয়ে দিতে পারত।

ঠিকই করেছি আমি। সর, নীচে যাই।—এই ব'লে রামানন্দ এল মাধবীলতার কাছে। বসল এসে বিছানার পাশেই।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়েছে কেন? চোখের নীচে কালি পড়েছে। আমি তোমায় সুখী করতে পারলুম না।

না না, কি যে বল তার ঠিক নেই। আমি তো ভালই আছি। অসুখ তো তোমার লতা।

অসুখটা আমার কি যেন এক অদ্ভুত রকমের। ঘুমুলেই মনে হয়, আমি যেন কোথায় চ'লে যাচ্ছি। ঘুমুতে ভয় করে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে ডাক্তার

সেনের মুখটা। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো তাঁর যতক্ষণ না দেখতে পাই, মনে হয়, আমি আর বাঁচব না। আজ কি ডাক্তার সেন আসবেন না?

আসবেন। তাঁকে তো বলাই আছে।

ডান দিকের কপালের রগটা আমার আজ সকাল থেকেই দবদব করছে। রাত্রিতে যে কি হবে, জানি না।

ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। ভয় নেই।

রামানন্দ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মনে মনে ভাবতে লাগল সে, ডাক্তার সেনের মুখটা দেখতে পায় লতা, আঙুলগুলোও নাকি তাঁরই! শম্ভুদার নামটা সে আমার কাছে গোপন ক'রেই যাচ্ছে। করুক গোপন, আমিও দেখে নেব।

দুপুরবেলা কলেজে গিয়েই রামানন্দ খবর পেল যে, প্রধান অধ্যক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। রামানন্দ গেল তিনতলায় তাঁর অফিসে। প্রধান অধ্যক্ষ বললেন, ব্যাপার কি আপনার? দাড়ি কামান নি, নোংরা কাপড়, কলেজ কামাই করছেন যখন-তখন? ছেলেরা সব নালিশ জানিয়েছে যে, আপনার নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে!

কই, না তো!—রামানন্দ তার নিজের মাথার ওপরেই হাত রাখল।

না? দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে ওসব ওষুধের নাম এল কি ক'রে? পড়াবেন আপনি দর্শনশাস্ত্র, অথচ হাতে ক'রে বই নিয়ে এসেছেন ফার্মাকোলজির?

রামানন্দ হাতের বইখানা আরও শক্ত ক'রে ধরল।

প্রধান অধ্যক্ষ বললেন, গভর্নিং বডির মীটিং হয়ে গেছে। এই নিন তাঁদের চিঠি। আপনাকে ছ মাসের জন্যে ছুটি দেওয়া হ'ল বিনে মাইনেতে। মাথার ব্যারাম যদি না সারে, তা হ'লে—। নমস্কার, আসুন আপনি।

কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে এসে রামানন্দ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এবার সে ডাক্তারী বই পড়বার অনেক সময় পাবে। কলেজে চাকরি করতে হয় ব'লে তার সময় অনেক নষ্ট হচ্ছিল। পা চালিয়ে হাঁটতে লাগল রামানন্দ। মেডিকেল কলেজের মধ্যে দিয়ে হাঁটবার সময় চলার গতি দিল কমিয়ে। এদিক ওদিকের বাড়িগুলোর মধ্যে কি হচ্ছে? ডাক্তারি। শম্ভুদাও নাকি এখানকার

ডাক্তার হয়েছে! ফুঃ! দেখে নেব, এবার প্রচুর সময় পাওয়া গেছে।—এই ভেবে রামানন্দ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে বাস ধরল।

রাত অনেক হয়েছে। লাইব্রেরি-ঘরে রামানন্দ ব'সে ওষুধ তৈরি করছিল। ব্রেন থেকে সব ময়লা সাফ করবার ওষুধ। খেলে পুরনো স্মৃতি সব সাদা কাগজের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। সাফ করতে না পারলে রামানন্দর আর বেঁচে থেকে লাভ নেই। মাধবীলতাকে নিয়ে সে যদি আবার গোড়া থেকে জীবনটা শুরু করতে না পারে, তা হ'লে দর্শন পড়াবার জন্যে সে আর বেঁচে থাকবে না। সিদ্ধান্ত তার অনড়। মাধবীলতার ওষুধের শিশিটা সে লুকিয়ে নিয়ে এসে রেখেছে। কাল সকালে সে যখন প্রথম দাগ ওষুধটা খাবে, তখন থেকেই রামানন্দর আরম্ভ হবে নতুন জীবন। আঃ, জীবন! দক্ষিণ দিকের জানলা দিয়ে ফুরফুর ক'রে বাতাস আসছে। রামানন্দর সামনে তৈরি হচ্ছে নতুন বেদ। পাঁচ রকম শিশি থেকে ওষুধ নিয়ে সে একটা গেলাসে ঢালল। গেলাসের মুখটা কাচের প্লেট দিয়ে ঢেকে খুব জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ব্রেনের ময়লা সাফ করবার ওষুধ তৈরি করল দার্শনিক রামানন্দ। এবার? এবার সে মাধবীলতার ওষুধের শিশিতে সেটা ভ'রে রেখে ছিপি দিয়ে মুখটা বন্ধ ক'রে রাখল। তার পরে? দেখে নেব, মহাবীর শম্ভুদাকে, দেখে নেব, কত বড় প্রতিদ্বন্দ্বী সে! এটা বিজ্ঞানের যুগ, হেলেনকে উদ্ধার করতে হবে বিজ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে। শিশিটা দু হাত দিয়ে চেপে ধ'রে তুলে নিয়ে এল বুক পর্যন্ত। বুকের সঙ্গে ঠেকিয়ে রেখে রামানন্দ চোখ বুজে লেক-অঞ্চলের হাওয়া খেতে লাগল। এমন সময় ঘরে ঢুকল সতীশ।

মাধবীলতার ঘুম আসছে না। সন্ধ্যের সময় মা এসেছেন। আজ থাকবেন তিনি। হেমনলিনী দেবী ডাকলেন সতীশকে।

সতীশ, বাবু ওপরের ঘরে ব'সে কি করেন দিনরাত?

বই পড়েন। আর—

আর কি?

ওষুধপত্তর তৈরি করেন। মা, বাবু আর বেশিদিন বাঁচবেন না। এখন তো প্রায় পাগলই হয়ে গেছেন।

মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, কারণটা কি? আমার অসুখের জন্যে বুঝি?

সতীশ জবাব দিল না।

হেমনলিনী দেবী বললেন, মাধু, ওর সর্বনাশ আমরাই করেছি। শম্ভুর সঙ্গেই তোর বিয়ে হওয়া উচিত ছিল। তুই যে তাকে বিয়ের পরেও ভুলতে পারবি নে, তা আমি ভাবি নি।

এসব কথা আজ তুমি আমায় বলছ কেন মা?

সতীশ বললে, উনি ঠিক কথাই বলেছেন বউমা। বাবু তো সেই কোন্ এক শম্ভুদার সঙ্গে দিনরাত লড়ছেন! তিনি ডাক্তার হয়েছেন বই প'ড়ে।

কথাগুলো সব অদ্ভুত ঠেকল মাধবীলতার কাছে। শম্ভুদা কোত্থেকে এল? তার কথা তো মাধবীর কিছুই মনে নেই। তা ছাড়া শম্ভুদাকে সে বিয়ে করবে ব'লে কোনদিনও মনে মনে ঠিক করে নি। দু-চার দিনের বেশি তার সঙ্গে তো ওর দেখাও হয় নি। হ্যাঁ, ডাক্তার সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। রামানন্দ ডাক্তার হ'লেও তার আপত্তি হ'ত না। যে কোন একজন ডাক্তার হ'লেও বোধ হয় মাধবী সুখী হতে পারত। ভয় ওর কেটে যেত।

রাত হয়েছে অনেক। মেয়ের পাশে শুয়ে হেমনলিনী দেবী আজ সব কথাগুলোই নতুন ক'রে ভাবতে লাগলেন। মেয়েকে তিনি বুঝতে পারেন নি। ডাক্তার সেন ধরতে পারেন নি মাধবীলতার অসুখ। সব ব্যাপারটা আগে থেকে বুঝতে পারলে জীবন দুটো ওদের এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেত না। চেষ্টা করলে হয়তো এখনও সব বাঁচানো যেতে পারে। কাল সকাল থেকে তিনি সেই চেষ্টাই করবেন। রামানন্দকে বুঝিয়ে দেবেন তিনি মাধবীর আসল ব্যারামটা। সত্যিকারের মায়ের কর্তব্য তিনি করতে পারেন নি। মেয়ের মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করলে এমন বিপদ ঘটত না।

হঠাৎ মাধবীলতা বললে, মা, আমি আজ ওঁর কাছেই যাব। বিছানা থেকে উঠে পড়ল মাধবীলতা। বিছানার সঙ্গেই সুইচ।

হেমনলিনী দেবী সুইচ টিপে আলো জালিয়ে দিলেন। শাড়িটাকে গুছিয়ে নিল মাধবী, গুছিয়ে নিতে সাহায্য করলেন হেমনলিনী দেবী।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে মাধবী তিনতলায় উঠতে লাগল। সব কিছু ভয়কে

আজ সে তাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। স্বামী তাকে ভুল বুঝেছেন। শম্ভুদাকে সে কোনদিনও ভালবাসে নি।

ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেল মাধবীলতা। সতীশ তার স্বামীর বিছানায় শুয়ে আছে খালি গায়ে। রামানন্দ সতীশের বুকে স্টেথেস্কোপ লাগিয়েছে।

তুমি? আমার এখানে?—রামানন্দ এসে ধ'রে ফেলল মাধবীলতাকে।

তোমার ডাক্তারি দেখতে এলাম। ওগো, এবার আমি আমার সত্যিকারের ডাক্তার পেয়েছি।—শম্ভুদা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী টাইফয়েড।

বিছানার ওপর মাধবীলতাকে বসিয়ে দিল রামানন্দ। হেমনলিনী দেবী এসে উপস্থিত হলেন মেয়ের পেছনে পেছনে। তিনি বললেন, আট বছর বয়সে ওর একবার টাইফয়েড হয়েছিল। সেই সময় ওর মনের মধ্যে কি রকম একটা ভয় ঢুকে যায়। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর সামনে এসে দাঁড়ায় ডাক্তার সেন। ডাক্তার কেউ কাছে না থাকলে ও ভাবে, ওকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। রামানন্দ, এবার বোধ হয় মাধবী তার ডাক্তারকে পেল। আয় বাবা সতীশ, আমরা যাই। সতীশ যাবার জন্যে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল আগেই। হেমনলিনী দেবী সতীশকে নিয়ে চ'লে গেলেন। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেলেন।

বিছানার চারদিকে স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে ডাক্তারী বই। মাধবীলতা জিজ্ঞাসা করলে, ওগো, তুমি সত্যিই কি ডাক্তার হয়েছ?

মাধবীর কপালে চুমু খেয়ে রামানন্দ বললে, সত্যিই। তারপর সে ওষুধের শিশিটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল লেক-অঞ্চলের দিকে। দিয়ে বললে, ভগবান রক্ষা করেছেন, ওষুধটা তুমি খাও নি।

ডাক্তার সেনের দেওয়া ওষুধের শিশিটা কি ক'রে তিনতলায় এল, সে কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মাধবীলতা।

দীপক চৌধুরী

# আমার সাহিত্য-জীবন

## বারো

'দুই পুরুষে'র তৃতীয় রাত্রির অভিনয় দেখে বাড়ি চ'লে গেলাম। প্রথম রাত্রির অভিনয় হয়েছিল শুক্রবার, তার পরদিন শনি, তার পরদিন রবি। তিন দিনে চারটি অভিনয় হ'ল—রবিবার দিন দুবার অভিনয়। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে একটু বদল করা হ'ল। বদল অন্য কিছু নয়, শেষ দৃশ্যের পূর্ববর্তী একটি ছোট দৃশ্য টেনে এনে ওই শেষ দৃশ্যের সঙ্গে যোগ ক'রে দেওয়া হ'ল। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি যেন একটু স্তিমিত হয়ে পড়ছিল।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

রঙ্গালয় সম্পর্কে নানান ধরনের অবান্তর ধারণা আছে। আমারও ছিল। একটা ধারণার কথাই বলছি। শোনা যেত এবং এখনও যায় যে, রঙ্গালয়ে নাট্যকার যে নাটক হাতে ক'রে ঢোকেন, সে নাটক তাঁর ভাগ্যক্রমে অভিনীত হ'লে নাটকের নামটাই থাকে, বাকি সবই ওলট-পালট অদল-বদল হয়ে যায়; লেখক হুঁকো দিলে সেটা হয়ে যায় ফরসি বা গড়গড়া, ফরসি গড়গড়া দিলে সেটা হয়ে যায় হুঁকো বা পাইপ; অর্থাৎ খোল নলচে সব পাল্টে দেন রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ। অবশ্য মহারথী নাট্যকারদের নাটকের কথা বাদ দিয়ে বলছি। কিন্তু আমার 'কালিন্দী' 'দুই পুরুষ' দুখানা নাটকেই কর্তৃপক্ষ কোন পরিবর্তন করেন নি। 'কালিন্দী' নাটক অভিনয়ের আগে কাগজে প্রকাশিত হয় নি; 'দুই পুরুষ' "পিতাপুত্র" নামে 'শনিবারের চিঠি'তে বের হয়েছিল, 'শনিবারের চিঠি'র সেই সংখ্যাগুলি দেখলেই এ সত্য প্রমাণিত হবে। শুধু বাঁধা সময় আড়াই ঘণ্টা থেকে পৌণে তিন ঘণ্টার মধ্যে অভিনয় শেষ করতে হবে ব'লে দৃশ্যগুলিকে অতি সাবধানে কেটে ছোট ক'রে নেওয়া হয়েছিল। পাত্র-পাত্রীদের বক্তব্য থেকে কিছু কিছু লাইন বাদ দিয়েছিলাম এবং ওই তৃতীয় অঙ্কে শেষ দৃশ্যে আগের একটি ছোট দৃশ্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। একটু বোধ হয় ভুল হ'ল। লিখতে লিখতে মনে প'ড়ে গেল কথাটা। লাইন পাঁচ-ছয় যোগ করাও হয়েছিল। সেটা ওই প্রথম দিনের অভিনয়ের সময় দুই দিক্‌পাল অভিনেতা কবির লড়াইয়ের মত

হাস্য-পরিহাসের বাক্‌যুদ্ধ ক'রে যোগ ক'রে দিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের প্রম্‌টিং কপিতে লেখা হয়ে গেল। অভিনয়ের সময় দর্শকেরা সে সরস রসিকতায় কৌতুকরসে হেসে ভেঙে পড়ল। আমি প্রেসে কপি দেবার সময় সে লাইন কটিকে নাটকে যথাস্থানে বাসয়ে দিলাম অকুণ্ঠিত চিত্তে। বড়বাবুর ভূমিকায় অভিনয় করতেন 'সীতা'র নাট্যকার ৺যোগেশ চৌধুরী এবং গোপীনাথের চরিত্রে অভিনয় করতেন নরেশ মিত্র। চা খাওয়ার কথা আছে একটি দৃশ্যে। গোপীনাথকে চা দিতে বললেন বড়বাবু। গোপীনাথ বললে, চা তো আমি খাই না হুজুর। চা তো আর ডালভাত নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব'লেই সে বললে, জীবনে চা খেয়েছি হুজুর তিনবার। একবার আপনার ১৩০৫ সালে, সেবার ভীষণ বর্ষা, তারিখ ১২ই আষাঢ়।

ঠিক এইখানেই যোগেশবাবু প্রশ্ন ক'রে বসলেন, কি বার?

সঙ্গে সঙ্গে নরেশবাবু উত্তর দিলেন, বৃহস্পতিবার।

আবার যোগেশবাবু পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তিথি-নক্ষত্র মনে আছে বাবা—তিথি নক্ষত্র?

নরেশবাবুর জিভের ডগায় যেন উত্তর জোগানো ছিল, হাত দুখানি জোড় ক'রে হেসে বললেন, আজ্ঞে, অমাবস্যে তিথি, উপবাস করেছিলাম কিনা! তবে নক্ষত্রটা মনে নেই হুজুর।

উপবাস করেছিলাম কিনা, তবে নক্ষত্রটা মনে নেই হুজুর—এ একেবারে অদ্ভুত! সন-তারিখ-স্মৃতিধর গোপীনাথ ওই উপবাসের স্মৃতি এবং নক্ষত্র সম্পর্কে বিস্মৃতির ভারসাম্যে নিখুঁত হয়ে উঠল। আমি মনে মনে নমস্কার জানিয়েছিলাম দুজনকে।

রবিবারের অভিনয় দেখে সোমবার সকালে 'শনিবারের চিঠি'র প্রেসে 'দুই পুরুষ' ছাপতে দিয়ে বিকেলে রওনা হয়ে গেলাম লাভপুর। যাবার সময় চাঁদসীর ওষুধ এবং প্যাকেট কতক অ্যাস্‌প্রো সঙ্গে নিলাম এবং লাভপুর গিয়ে বিছানা নিলাম। বিছানায় ছিলাম পুরো এক মাস। যাবার আগে বরানগরের বাড়ির ভাঙা দরজা মেরামত করিয়ে আবার

নতুন তালাচাবি বন্ধ ক'রে গেলাম। এ সব করছিল আমার ভাই যতীন দত্ত মশায়ের সাহায্য নিয়ে। মাস খানেক পর রোগের উপশম হ'ল। উদ্যোগ করলাম, কলকাতায় ফিরব। হঠাৎ চিঠি পেলাম, আবারও চোরেরা বরানগরের বাড়ির তালা ভেঙেছে এবং চুরির চেষ্টা করেছে। অবশ্য আগের বারও কিছু পায় নি, এবারও কিছু পায় নি। বাড়িতে মূল্যবান বস্তু বিশেষ কিছু ছিল না। যা ছিল, তাও একখানা ছোট ঘরে বন্ধ ক'রে নিজের হাতে তার দরজা জানলা সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথনি ক'রে বন্ধ ক'রে গিয়েছিলাম—চোরেরা তার হদিসই পায় নি। কিছু যাক বা না-যাক, এ খবরে আমার গৃহিণী মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, ও-বাড়িতে তিনি যাবেন না। চোরেরা দুবার তালা ভেঙে কিছু না পেয়ে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। এবার ও-বাড়িতে গেলে, কোন্ দিন কোন্ সুযোগে তারা এসে গলা কেটে সব নিয়ে যাবে। তিনি কিছুতেই যাবেন না ও-বাড়িতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তবে বাড়িটা হবে কি ?

বললেন, প'ড়ে পচুক।

বাড়ি পচে কি না—এ নিয়ে গবেষণা করবার বা রসিকতা করবার মন-মেজাজ তখন থাকবার কথা নয়। আমাকে আসতেই হবে। আমার কর্মজগৎ আমাকে তখন দু হাত বাড়িয়ে ইশারা ক'রে ডাকছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার সম্মুখে প্রসারিত পথ। কাগজে কাগজে 'দুই পুরুষে'র অকুণ্ঠ প্রশংসা বেরিয়েছে। একখানি কাগজ, বোধ হয় 'আনন্দ-বাজার' লিখেছে, বাংলার রঙ্গমঞ্চের রুদ্ধপ্রায় গতি নূতন গতি পেল এই নাটকে এবং সেই গতির সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের গতির নিবিড় একাত্মতা আছে; বাঙালীর জাতীয় জীবনের সত্য এবং সার্থক নাটক; কথাশিল্পী তারাশঙ্কর নাট্যকার হিসাবে বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাগজে সংবাদ পাচ্ছি, লোকমুখেও সংবাদ পাচ্ছি, বন্ধুবান্ধবের চিঠি পাচ্ছি, পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে করতালি-মুখরতার মধ্যে নাটক অভিনয় হচ্ছে। আমি প'ড়ে আছি লাভপুরে!

কাত্যায়নী বুক স্টলের গিরীনবাবু চিঠি লিখছেন, 'ভারতবর্ষে'র

'গণদেবতা' যত দিনে শেষ হোক, বইখানির যত দূর প্রকাশিত হয়েছে তাই নিয়ে প্রথম খণ্ড বের করতে চান তিনি। 'ভারতবর্ষ' আপিস মারফৎ পত্র পাচ্ছি পাঠকদের। কাগজের তাগিদ তো আছেই।

শেষ স্থির করলাম, থাকুক বরানগরের বাড়ি যেমন প'ড়ে আছে। এখন গিয়ে উঠব ১।১এ, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজারে। সে বাসা খালিই প'ড়ে আছে।

তাই এসে উঠলাম। বাড়ির মালিক, তাঁর স্ত্রী—আমাদের দিদি আপন জনের মতই গ্রহণ করলেন। শ্রদ্ধেয় যামিনীদাদা হেসে বললেন, ভাল করলেন ভাই। জনশূন্য কলকাতা, সন্ধ্যে হ'লে ঠুঙি প'রে জুজু-বুড়ীর মত ভয় দেখায়। এখন এখানেই ভাল। এক বছর গেছেন, ভাল লাগছিল না। যা হোক পরের অভিনয়ের দিনে নাট্যভারতীতে গেলাম, মল্লিক সাহেব সতু সেন হাসিমুখে সম্বর্ধনা জানিয়ে বললেন, বেশ নাট্যকার আমাদের! বই চলছে হৈ-হৈ ক'রে, লোকে এসে নাট্যকারকে দেখতে চাচ্ছে, আলাপ করতে চাচ্ছে। আপিসের খাতায় পাওনা টাকা জ'মে যাচ্ছে। আর নাট্যকার কোথায় তার ঠিকানা নেই!

বললাম, বড় অসুস্থ ছিলাম।

আবার পালাবেন নাকি?

না। আর পালাচ্ছি না।

মেয়েছেলেরা এসেছেন?

এসেছেন।

কাল তাঁদের নিয়ে আসুন। অভিনয় দেখুন। আজকেই সীটের ব্যবস্থা ক'রে নিয়ে যান। আর টাকাটা? নিয়ে যাবেন আজ?

বললাম, নিয়েই যাব।

সত্যি কথা বলতে কি, টাকার তাগিদেই গিয়েছিলাম সেদিন। মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রায় রিক্তহস্তেই কলকাতা এসেছি। গৃহিণী কোনক্রমে শ দুয়েক টাকা সরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সম্বল সেইটে। 'দুই পুরুষে'র টাকাটাই সেদিন আমার ভরসা।

কাদন আগে অর্থাৎ এই ১৯৫৪ সনের জুলাই মাসেই আমার

এক সাহিত্যিক অনুজ সাহিত্য-জীবন প'ড়ে বলছিলেন, দাদা, তুমি যেন নাটক সম্পর্কে একটু বেশি লিখছ। রঙ্গমঞ্চের স্মৃতি যেন বোশ মনোরম তোমার কাছে। অথচ সাহিত্যিক জীবনের স্মৃতিই বড় হওয়া উচিত।

সেদিন তাঁকে কিছু বলি নি। চেপে গিয়েছিলাম। আজ বলি, আমার সাহিত্যিক জীবনে এই রঙ্গমঞ্চের সাহায্য পরিমাণে সামান্য হ'লেও দুঃসময়ের পাওনা হিসেবে অসামান্য। সেদিন রঙ্গমঞ্চের এই সাহায্য না পেলে সাধনার অকৃত্রিম নিষ্ঠা সত্ত্বেও আমার জীবনে এ সাফল্য অর্জন সম্ভবপর হ'ত না। শুধু আর্থিক সাহায্যই করে নি রঙ্গমঞ্চ, নাট্যকার হিসেবে আমার খ্যাতিকে ত্বরিতগতিতে বিস্তৃত করেছিল। এই 'দুই পুরুষে'র সময়েই বাংলা দেশের সাহিত্যিক শিল্পী শিক্ষাবিদ চিকিৎসক ইঞ্জিনিয়ার গায়ক গুণী ধনী বহুজন অভিনয় দেখে গেছেন। লাভপুর থেকে ফিরে কলকাতায় আসবার পর থেকে নাটকের নগদ বিদায়ের নেশায় প্রতিটি অভিনয়ে আমি উপস্থিত থেকেছি। নগদ বিদায় মানে নাটকের রয়ালটি নয়। 'দুই পুরুষে'র রয়ালটি পঁচিশ রাত্রির পর মাত্র পাঁচ টাকা হিসেবে নির্ধারিত ছিল। যুদ্ধের বাজার হেতুও বটে, নিজের জীবনের সাফল্য হেতুও বটে, পাঁচ টাকার মূল্য আমার কাছে আগের কালের মত ছিল না। একদিন পাঁচ টাকার জন্য কোন পত্রিকার আপিসে বেলা বারোটা থেকে ছটা পর্যন্ত ব'সে থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে পায়ে হেঁটে মনোহরপুকুর রোড গিয়েছিলাম। সে স্মৃতি তখন আমার মুছে এসেছে। নগদ বিদায় বলতে আমি নাটকের রসাস্বাদনের তারিফের কথা বলছি। কখনও হাসিতে প্রেক্ষাগৃহ ভেঙে পড়ছে; কখনও নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ; কখনও হাত-তালি পড়ছে; আমি কোথাও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুনতাম। আপিসে, বাইরের দোতলা বা একতলার লবিতে কত জনের সঙ্গে আলাপ হ'ত। কত জন খুঁজে এসে আলাপ করেছেন! একদিন কে যেন ডেকে নিয়ে গেলেন—তখনকার ডাঃ বিধান রায়—ভাইস-চ্যান্সেলর 'দুই পুরুষ' দেখতে এসেছেন। আমাকে দেখতে চেয়েছেন। পরিচিত

শিল্পী অধ্যাপকেরা ডেকে অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। সাহিত্যিকদের মধ্যে সজনীকান্তকে বাদ দিয়ে সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানিয়েছিলেন অমলদা—অমল হোম। তাঁর সঙ্গে তখনও খুব হৃদ্যতা হয় নি। পরে হয়েছে। সে পরে বলব। তার পরই জানিয়েছিলেন—নরেনদা এবং রাধারাণী-বউদি। নরেনদা এবং রাধারাণী-বউদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল 'কালিন্দী' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার পর। এই সাহিত্যিক-দম্পতিটির এইটিই সবচেয়ে বড় গুণ। নবীন লেখকদের লেখা নিজেরা প'ড়ে ডেকে সমাদর ক'রে উৎসাহিত করেন। বউদি 'কালিন্দী' সম্পর্কে যে সব কথা বলেছিলেন; সে সব আমার জীবনে সেদিন পাথেয় হয়েছিল। প্রেমেন্দ্র একদিন এসেছিলেন, সঙ্গে সুশীল মজুমদার ছিলেন, প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় তখন সামান্যই—'কল্লোলে'র সময় সব সুদ্ধ বোধ হয় তিন-চার দিন দেখা হয়েছে মাত্র। প্রেমেন্দ্র আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আর জানিয়েছিলেন শৈলজানন্দ। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি; কিন্তু শৈলজানন্দ তাঁর শুভেচ্ছা রেখে গিয়েছিলেন শিশির মল্লিকের কাছে। এমনও হয়েছে—আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চ'লে গেছেন কেউ কেউ। বাংলা-সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি-ঔপন্যাসিক একজন—একদিন সস্ত্রীক অভিনয় দেখতে এসেছেন, স্ত্রীও লেখিকা। প্রথম অভিনয় শেষ হয়েছে, আমি টিকিট বিক্রির জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, কথা বলছি একজনের সঙ্গে। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনিই আমাকে বললেন, —বাবু আর তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী — যাচ্ছেন। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, তাঁরা দুজনে নামছেন; স্ত্রীর দৃষ্টি এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, আমার উপস্থিতির কথাই স্বামীকে বলছেন। ভদ্রলোকও আমার দিকে তাকালেন এবং মুহূর্তে মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর হাত ধ'রে একটু টান দিয়ে বেরিয়ে যাবার ইঙ্গিত জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম, তিনি বললেন, ওঁর সঙ্গে কি আপনার পরিচয় কি কথাবার্তা নেই নাকি?

এ সব ঠিক লেখবার কথা নয়।

আজ জীবনের ছাপ্পান্ন বছর চ'লে গেল এই শ্রাবণে। আজ পাওনার হিসেবের মধ্যে অমৃতই বড় হোক—সকল তিক্ত স্মৃতি বিস্মৃতির মধ্যেই সমাহিত হোক। এই স্মৃতি-কথা লেখবার সময় সেই চেষ্টাই ক'রে আসছি। সব তিক্ত স্মৃতি বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। নাট্যকার হিসেবে রঙ্গালয়ে এই তিক্ত স্মৃতির পরিমাণ কম। আনন্দের স্মৃতিই বেশি। রঙ্গমঞ্চের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেয়ে অভিনন্দন পেয়েছি বেশি, এবং সর্বস্তরের বহু জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

নিন্দাও পেয়েছি—আঘাতও পেয়েছি।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে 'দুই পুরুষে'র রিহারশ্যালের সময় বাজারে র'টে গিয়েছিল, আমি দুর্দান্ত মাতাল হয়ে পড়েছি। কথাটা আমার কানে এল, লাভপুর থেকে ফেরবার কিছুদিন পর। আমার খের দিনের বন্ধু, রোগের ধন্বন্তরী ডাঃ পশুপতি ভটচাজ একদিন আমাকে দেখতে এসে আমার কাছে অভিযোগ করলেন, এ কি কাণ্ড! আপনি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সংস্রব ছেড়ে দিন।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

কেন, তাও কি বলতে হবে আপনাকে? কি অধোগতি হ'ল আপনার? না না না, ও-জায়গাটাই এমনি। যে যায় সেই মদ খেতে শেখে।

ডাক্তারবাবুর বন্ধু একজন সাহিত্যিকের কথা বললেন তিনি, এবং বললেন, আপনাকে লোকে দেখেছে, আপনি রিক্‌শায় রাত্রে ফিরেছেন, আপনার খাড়া হয়ে বসবার ক্ষমতা নেই, কাত হয়ে প'ড়ে আছেন আপনি।

আমি এবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলাম।

পশুপতিবাবু সবিস্ময়ে বললেন, আপনি হাসছেন? এককালে আপনি দেশসেবা করতেন। মাদক-নিবারণ করতে পিকেটিং করেছেন। আর আজ— ছি-ছি-ছি!

আমি বললাম, সেটা মদ খেয়ে নয় ডাক্তারবাবু, সেটা অর্শের যন্ত্রণায়। সোজা বসতে পারতাম না। আজও ঠিক পারি না। ওই দেখুন ওই রবার কুশনটা, ওইটের ওপর ব'সে লিখতে হয়।

অর্শ! তা আমার কাছে গেলেন না কেন?

আপনাদের হ্যাডেন্সায় কোন ফল হয় নি। এর পর শুনেছি চিকিৎসা নাকি ছুরি-কাঁচির সাহায্যে। ওতে ভয় খেয়েছি। কাপুরুষ ভীরু বলেন, মাথা পেতে সহ্য করব। কিন্তু মাতাল বললে, আপনি দোষী হবেন। আর এতে না হেসে করি কি?

কই, দেখি আপনার অর্শ?

ডাক্তারবাবু দেখলেন। দেখে বিশ্বাস করলেন। বললেন, তাই তো, কি মিথ্যে রটনা দেখুন তো!

কিন্তু আপনাকে বললে কে?

ডাক্তারবাবু একটু চুপ ক'রে রইলেন। কিছুক্ষণ পর নাম করলে দুটি ছেলের। একজন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পুত্র, আমার বাসার কাছে তাদের বাসা। অপর জন এক প্রবীণ সাহিত্যিকের পুত্র।

আর একবার এক বিশিষ্ট অভিনেতার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনান্তর হয়েছিল মতভেদ থেকে তার উৎপত্তি। আমারই একখানি নাটকের অভিনয় নিয়ে মতভেদ হয়েছিল। মঞ্চের কর্তৃপক্ষ মল্লিক সাহেবের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিল ব্যাপারটা।

আমার 'পথের ডাক' নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল 'দুই পুরুষে'র পরই। নাটকখানি 'দুই পুরুষে'র পর্যায়ের নাটক না হ'লেও, ভাল নাটক—এ কথা বলতে আমি সংকোচ বোধ করি না। মঞ্চে 'দুই পুরুষে'র চেয়ে কম সফল হওয়ার কথা নয়। কিন্তু গোড়াতেই ভূমিকা-বণ্টনের ভুলে বইখানি 'দুই পুরুষে'র মত সফল হতে পারে নি। তা হ'লেও ক্রমান্বয়ে সাতাশি রাত্রি চলেছিল। ভূমিকা-বণ্টনের ভুল আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে কথা বলেওছিলাম। কিন্তু বড় অভিনেতা জেদ ক'রে নিজে ভুল ভূমিকা নিলেন এবং অভিনয়ের সময় মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকের টিট্‌কারিতে চঞ্চল হয়ে পড়লেন। প্রধান ভূমিকার দুটি ভূমিকা এই ভাবে মার খেল। অভিনেতারা তখন চেষ্টা শুরু করলেন বইকে মারতে। নিষ্কৃতি পেতে হবে তাঁদের। আমার মনের মধ্যেও অসন্তোষ জ'মে রইল। এই সময় একদিন একটি ব্যাপার ঘটল।

আমি স্টেজের ভিতরে গিয়েছি, আমাকে দেখে একটি অভিনেত্রী
ম ক'রে বললে, কই তারাশঙ্করবাবু, আপনি যে বলেছিলেন—পার্টে
ক্ল্যাপ পাব, তা তো আমি পেলাম না ?
য়েটিকে যখন ভূমিকা দেওয়া হয়, তখন আমি এ কথা বলেছিলাম।
য় কয়েকটিই হাততালি পাবার কথা। কিন্তু নাটকের পরিচালক তার
ও প্রস্থানের নাটকীয়তা বর্জন ক'রে প্রবেশ-প্রস্থানের সময়, ভঙ্গী
ন্ট দিয়েছিলেন। এমনই একটি প্রবেশের সময় তখন নাটকে
কয়েক মিনিট পরেই আসছে। আমি তাকে বললাম, ক্ল্যাপ পাও
কারণ তুমি তো আমার নির্দেশমত স্টেজে ঢোক না বা কথা
বাগ লে, আমাকে ডিরেক্টার যেমন ব'লে দিয়েছেন তেমনি করি।
আ কর। সেই জন্যেই পাও না। বেশ তো, এই তো সামনেই
দুঃ পার্ট, কই, আজ ঢোক তো স্টেজে আমার ডিরেক্শন মত, দেখ
আ ও কি না ?
আ ভাশালিনী ৺প্রভা দেবীও পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে এবং
ক দুজনকেই বুঝিয়ে দিলাম কি ভাবে কখন ঢুকতে হবে। প্রভাকে
, আপনি নিশ্চয় বুঝেছেন, ওকে ঠিক সময়ে ঢুকিয়ে দেবেন।
লই আমি স্টেজ থেকে বেরিয়ে এলাম। অডিটোরিয়ামের শেষ
যখন এসেছি, তখন শুনতে পেলাম হাততালি পড়ছে। ভিতরে
মরে দেখলাম, দেখলাম সেই মেয়েটিই দীপ্তমুখে তার কথা ব'লে
।
কদিন পরেই আমাকে মল্লিক সাহেব বললেন, আপনার সঙ্গে
কথা আছে।
। নির্জনে বললেন, আপনি কি — অভিনেত্রীকে ডিরেক্টারের
য় দেওয়া এণ্ট্রান্সের সময়-ভঙ্গী পাল্টে অন্যরকম করতে বলেছিলেন ?
বললাম, বলেছিলাম। তাতে তো সে ক্ল্যাপ পেয়েছে।
তা পেয়েছে। কিন্তু ডিরেক্টার আমার কাছে কম্‌প্লেন করেছেন।
কিন্তু আমি নাট্যকার। স্টেজের খাতিরে আমার লেখা ডিরেক্শন্

পাল্টাবার অধিকার যদি ডিরেক্টারের থাকে, তবে স্টেজের খাতিরেই নাটক যাতে জমে তার জন্যে তাঁর ডিরেক্শনের ত্রুটি সংশোধনের অধিকার আমার অবশ্যই আছে।

সেটা ওঁকে ব'লে করলেই ঠিক হ'ত। সেইটেই নিয়ম।

প্রথম অনিয়ম উনি করেছেন। কারণ আমার ডিরেক্শন বদলাবার সময় আমাকে কোন কথা বলেন নি। তা ছাড়া এত কথা উঠতে পারে, এ কথা আমি ভাবিই নি মিঃ মল্লিক। আমি স্টেজের মধ্যে গেলাম। মেয়েটির সঙ্গে দেখা হ'ল। ও আমাকে বললে।

আমি সমস্ত বিবরণটি তাঁর কাছে খুলে বললাম। বললাম, এর মধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে—এ কথা আমি ভাবতেই পারি নি। আমি অত্যন্ত সরলভাবেই বলেছিলাম—দেখ, এইভাবে ঢুকে হয়! তাতে ও ক্ল্যাপ পেয়েছে। এতে দোষের কি হয়েছে বুঝ পারছি না।

মিঃ মল্লিক বললেন, উনি বলেছিলেন, এভাবে এন্ট্রান্সটা নাটুকে হ

আমি হেসে বললাম, এ যে নাচতে নেমে ঘোমটা টানা মিঃ মল্লি করছেন নাটক, অথচ নাটুকেপনা বাদ দেবেন—এটা কেমন ক আমাকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, গল্প লিখতে ব'সে যারা গল্প না-ে ভান ক'রে তাদের দলে যে নাম লেখাও নি, তাতেই আমি বেশি হয়েছি। কথাটা আজ মনে প'ড়ে গেল।

মিঃ মল্লিক একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর একখানি পত্র ে ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন, প'ড়ে দেখুন। কথাগুলি আপনা মুখে বলতেও আমার বাধছে। এঁরা—

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, এঁদের সঙ্গে মেলামেশা করা অত বিপদের কথা তারাশঙ্করবাবু। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কিন্তু কি ব উনি চিঠি লিখেছেন ডিরেক্টার হিসেবে।

দেখলাম, চিঠিতে লিখেছেন, অভিনেত্রীদের প্রেমাভিলাষী হয়ে অ স্টেজের মধ্যে যাই।

চিঠিখানা মল্লিক সাহেবকে ফিরিয়ে দিলাম। বললাম, আর আমি আসব না। নমস্কার।

নাট্যভারতীর যবনিকার ও-ধারে আর আমি কোনদিন যাই নি। এবং 'দুই পুরুষে'র পর দীর্ঘকাল আর নাটক লিখি নি।

* * *

মঞ্চের কথা বলতে গিয়ে অনেক পরের কথা ব'লে ফেললাম। উপরের কথাটা প্রায় এক বছর পরের কথা।

কলকাতায় ফিরে এসেছিলাম ১৯৪২এর জুলাই মাসে। তখন আগস্ট-বিপ্লবের ভেরীতে ঘা পড়েছে। চারিদিক থমথম করছে। সে সময় কলকাতায় একটি বিচিত্র বেহারী যুবক আবির্ভূত হয়েছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম বীর আরার কুমারসিংয়ের বংশের ছেলে। ইউরোপীয়দের মত রঙ, চোখ দুটি ছোট, সবল স্বাস্থ্য, ভয়হীন দুরন্ত দুঃসাহসী। অফুরন্ত প্রাণশক্তি। হাসিতে উল্লাসে সদাই মুখর। বাল্যকালে ঘর থেকে পলাতক। বাংলায় বই লিখেছে 'রোমাঞ্চক রাশিয়া'। ছেলেবেলায় ঘর থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বাঙালী বিপ্লববাদী এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। সেখান থেকে গিয়েছিল ইউরোপে। ইউরোপে জার্মানি পোলাণ্ড রাশিয়া ঘুরে—আবিসিনিয়ার যুদ্ধে সৈনিক হয়েছিল। ভারতবর্ষে ফিরে কলকাতায় এসেছে। 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে এসেছিল। সেখানেই আলাপ হল। সবিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তার গল্প শুনতাম। কথায় কথায় সে বিপ্লব-প্রবাহের স্বপ্ন-রচনা করত। কংগ্রেস কোন্ পথ নেবে—সে নিয়ে প্রশ্ন করত। একদিন 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে এলেন অধ্যাপক নির্মল-কুমার বসু। পিঠে বাঁধা হাভারস্যাক। পরনে ঢিলে পায়জামা, গায়ে শার্ট, পায়ে যতদূর মনে পড়ছে—রবারসোল ক্যাম্বিসের জুতো। বললেন, এ. আই. সি. সি.র প্রোগ্রাম আনতে যাচ্ছি। আগস্ট মাস। কে জানে সবে ধরা পড়েছেন কি পড়বেন এমন দিন। মনে আছে নির্মল-বাবু 'দুই পুরুষ' দেখবেন ব'লে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আগস্ট

MENDEC-2008



বিপ্লবের আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য সে দেখা হ'ল না; তিনি চ'লে গেলেন। আমি তখন 'গণদেবতা' নতুন ক'রে লিখতে শুরু করেছি।

'ভারতবর্ষে' 'গণদেবতা' নামে উপন্যাস তখনও ধারাবাহিক প্রকাশ হয়ে চলেছে, শেষ হয় নি। 'গণদেবতা' যখন লিখতে শুরু করি তখনই মনে পরিকল্পনা ছিল, বইখানির নাম হবে 'গণদেবতা,' তার দুটি ভাগ থাকবে— প্রথম ভাগ "চণ্ডীমণ্ডপ," দ্বিতীয় ভাগ হবে "পঞ্চগ্রাম"। 'চণ্ডীমণ্ডপ' প্রেসে দেবার সময় মনে হ'ল, যা বলতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক বলা হয় নি। মাসে মাসে কিস্তিবন্দিতে লিখতে গিয়ে গ্রন্থন শিথিল হয়েছে, গল্প এলোমেলো হয়েছে; বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি। তখন পাঁচ ফর্মা—আশি পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেছে। আমি প্রকাশক গিরীনবাবুকে বললাম, বাকি কপি প্রেস থেকে ফিরিয়ে আনুন। ও ছাপা হবে না।

শঙ্কিত হয়ে গিরীনবাবু বললেন, তা হ'লে?

বললাম, বাকি আমি নতুন ক'রে লিখব। আপনি ভয় করবেন না, আপনার প্রেসের কাজ বন্ধ হবে না। আমি ঠিক চালিয়ে দেব।

বসলাম লিখতে। তখন শরীরে ছিল বল, মনে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। লিখে যেতে লাগলাম। গিরীনবাবু রোজ আসতেন দশটা আগে, কপি তৈরি থাকত, নিয়ে যেতেন।

এই সময়েই 'কবি' পুস্তকাকারে বের হ'ল। [ক্রমশ]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

## প্রশ্ন

কেন বেঁচে থাকি,—বার বার এই প্রশ্ন নিজেরে করি,
মেলে না সদুত্তর,
তবু বেঁচে থেকে ব্যর্থ প্রাণের বোঝা ব'য়ে ব'য়ে মরি
সারা দিন রাত ভর।
নিকটে যা পাই ঠেলে ফেলে দিয়ে দূরের পিছনে ছুটি,
বিধি-নিষেধের যত বেড়াজাল কঠিন দু করে টুটি',
তবুও মেটে না আশ;
ভালবাসবার ছল ক'রে শুধু দিনে দিনে সংসার
গলায় জড়ায় ফাঁস।